সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

আধুনিক যুগ

বিষয় | পৃষ্ঠা

বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায় | ভূমিকা

[এক] বাঙ্‌লা ও বাঙালী :

বাঙ্‌লা সাহিত্যের অধ্যয়নে পটভূমিকা-রূপে বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'লো।

বাঙালী বিমিশ্র জাতি, কিন্তু কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হ'য়েছে, সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নন। আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভারত আগমনের পূর্বে যারা ভারতে ছিল বা এসেছিল, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ছিল নিগ্রো জাতির একটি শাখা—নিগ্রোবটু। কিন্তু কালে কালে তারা ভারতের মূল ভূমি থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর পর ভারতে আসে অস্ট্রীক বা নিষাদ জনগোষ্ঠীর একটি ধারা। তারা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এসেছিল অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম ক'রে ভারতে এসেছিল—এ বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। এরা গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও প্রধানতঃ মধ্য ভারত ও পূর্ব ভারতেই স্থায়িভাবে উপনিবিষ্ট হ'য়েছিল। এদের পরবর্তী বংশধররাও আজকের ভারতের প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী—সাঁওতাল, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজ, শবর, খাসী ও নিকোবরী প্রভৃতি। এদের পর যারা ভারতে এসেছিল, তারা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন জন। অনেকে অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকেই এরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হ'য়ে প্রথমে উত্তর ভারত ও পরে পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো, কালিবঙ্গাই প্রভৃতি স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই সভ্যতার প্রধান স্থপতি ছিল এই দ্রাবিড়গণ—এই অভিমতটিই মোটামুটিভাবে প্রচলিত। পরে আর্যগণ এসে সপ্তসিন্ধুর কূলে আপনাদের অধিকার বিস্তৃত ক'রে দাস-দস্যু-আদি নামে অভিহিত এই দ্রাবিড়দের উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত করে। দ্রাবিড়গণ পরে দক্ষিণ ভারতকেই তাদের প্রধান স্থায়ী আবাস ক'রে নেয়। তাদের কিছু কিছু অবশ্য মধ্য ভারত এবং পূর্ব ভারতেও আশ্রয় গ্রহণ করে। মঙ্গোল গোষ্ঠীর লোকেরা প্রধানতঃ উত্তর পূর্ব ভারতে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে। এরা আর্যদের আগে এসেছিল অথবা পরে এসেছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা এখনও সম্ভবপর নয়।

 খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের দিকে আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভারত আগমনই

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আর্যগণ সর্বপ্রথম সপ্তসিন্ধুর কূল থেকে অনার্য অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয় এবং গঙ্গা-যমুনার কূল ধরে ক্রমশঃ মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ উত্তর ভারতের পরবর্তী ইতিহাস প্রধানতঃ আর্য জাতির প্রাধান্য বিস্তারের ইতিহাস। দক্ষিণ ভারতেও দ্রাবিড়গণ ক্রমশঃ আর্য সভ্যতা গ্রহণ করেছিল। ভারতের প্রধান চারিটি জাতি-গোষ্ঠীর—অস্ট্রীক বা নিষাদ, দ্রাবিড়, মঙ্গোল বা কিরাত এবং আর্য—এদের মধ্যে প্রথম প্রথম সংঘর্ষ দেখা দিলেও পরবর্তীকালে যে অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তারই প্রত্যক্ষ ফল ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমিক মিশ্রণের কালেই উদ্ভূত হয়েছিল ; বাঙালী জাতিও অনুরূপ মিশ্রণ জাত।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালীর মিশ্র জাতিত্ব-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে প্রধান অভিমত এই যে—নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত ও সামান্য আর্যরক্তের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির সৃষ্টি। এ বিষয়ে অপর একটি মত—আল্পাইন গোষ্ঠী নামে আর্যদেরই একটি ধারা বৈদিক বা উদীচ্য আর্যদের পূর্বেই ভারতে এসেছিল। তারাই বৈদিক আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদেরই একটি শাখা থেকে বাঙালী জাতির উদ্ভব—এ তত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিলেও এর সঙ্গে ভিন্ন জাতির মিশ্রণকে অস্বীকার করা যায় না।

বাঙলার প্রাচীন ঐতিহ্য-বিষয়ে যা' কিছু জানা যায়, তা' থেকে নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস রচনা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে—পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বাণেশ্বর-ডাঙ্গা, চন্দ্রকেতুর গড়, মহিষাদল, পোখরনা প্রভৃতি উৎখননের ফলে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, তা' থেকে অনুমান করা হয় যে, খ্রী. পূ. দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে এ সমস্ত অঞ্চলে প্রায় তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা বর্তমান ছিল—এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন হওয়া অসম্ভব নয়। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ প্রাচ্য (Prasoi) এবং গঙ্গারিডই (Gangaridai) নামক যে রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা' বাঙ্‌লাতেই ছিল বলে অনুমান করা হয়। বাঙালী বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় ক'রে তার নাম রেখেছিলেন সিংহল—এ কাহিনী আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না—কিন্তু সিংহলীগণ মনে করে, তারা বাঙালীর বংশধর।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদে বঙ্গদেশের নাম পাওয়া গেলেও তথায় অসুরজাতি বাস করতো, দেশটি অনার্য-অধ্যুষিত, এখানকার লোকেরা পাখির ভাষায় কথা বলে—ইত্যাদি উক্তি থেকে মনে হয়, তখনো এদেশে আর্য সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করেনি। মহাভারতে অসুররাজ বলির এক পুত্রের নাম 'বঙ্গ' এবং তারই নামে বঙ্গরাজ্য। মহাভারতে সমুদ্রতীরবাসী বাঙালীদের বলা হয়েছে 'ম্লেচ্ছ' এবং ভাগবতে উত্তর রাঢ় অর্থাৎ সুহ্ম অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হ'য়েছে 'পাপজাতি'। এ থেকে অনুমান করা চলে যে বাঙ্‌লায় আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হ'তে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। তবে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, মহাস্থানগড়ের শিলালিপি এবং চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চুয়াং-এর

রচনা থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে মৌর্য বংশের রাজত্বকালেই অন্ততঃ উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত আর্য সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। শুঙ্গ রাজারাও বাঙলার কোন কোন অংশ অধিকার করেছিলেন। কুষাণ আমলের কিছু কিছু প্রত্নবস্তুও বাঙলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীঃ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলার অনেকটা অংশই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। খ্রীঃ সপ্তম শতকের গোড়াতেই গৌড়ভুজঙ্গ মহানায়ক নরেন্দ্র শশাঙ্ক গুপ্ত তাঁর গৌড় সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতের অনেকখানি জুড়ে প্রসারিত করেছিলেন। বস্তুতঃ বাঙালী জাতির ক্রমিক ইতিহাসের শুরু এখান থেকেই।

সাধারণভাবে বাঙ্‌লা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকেই 'বাঙালী' নামে অভিহিত করায় কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী 'বাঙালী' বা বাঙ্‌লা ভাষাভাষী, সেই সমস্ত অঞ্চলকে 'বাঙলাদেশ'-রূপে নির্দেশ করায় বিপত্তি ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ দেশের বিশেষতঃ বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলের সীমা ও আয়তন যেমন বারবার পরিবর্তিত হ'য়েছে, তেমনি তার নামকরণেও বহু বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতেই এক সময় 'বাঙলাদেশ' বা 'বঙ্গদেশ' বলতে বোঝাত—বর্তমান রাজনৈতিক বিভাগ-অনুযায়ী স্বীকৃত পশ্চিমবঙ্গ (উত্তর বঙ্গ-সহ), 'বাঙলাদেশ' (প্রাক্তন পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্থান), শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলার কতকাংশ এবং পশ্চিমে বর্তমান বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অংশ। তারপর লর্ড কার্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গের ফলে আসামসহ পূর্ববঙ্গ একটি প্রদেশে পরিণত হ'লো এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিহার উড়িষ্যা অপর একটি প্রদেশে পরিণত হয়। আবার যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হ'লো, তখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র যুক্ত হ'য়ে 'বঙ্গদেশ' বা 'বাঙালাদেশে' পরিণত হয়, কিন্তু পূর্বভাগে বঙ্গভাষাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া আসামের সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমভাগেও কিন্তু বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়। এরপর স্বাধীনতা লাভকালে আবার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘটে—পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রীহট্ট এবং তা' পরিণত হয় একটি ভিন্ন রাষ্ট্রে—প্রথমে এর নাম ছিল পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব পাকিস্থানে পরিণত হয় এবং তারও পরে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই অঞ্চলটি 'বাঙ্‌লাদেশ' নামে পরিচিত হয় ও স্বাধীন সত্তা লাভ করে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ বা রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। পরে সীমানা কিঞ্চিৎ রদবদল ক'রে এর সঙ্গে পুরুলিয়া যোগ করা হয়।

* আলোচনা ক্ষেত্রে যেখানে 'বাঙলাদেশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা সামগ্রিকভাবে বাঙলাভাষাভাষী-অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে, এটিকে কোনক্রমেই বর্তমান স্বাধীন 'বাঙলাদেশ' বা পূর্ববঙ্গ অর্থে নয়,—এ বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

যুগে যুগে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বা তার অংশ বিশেষের যে সকল নাম প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে 'বঙ্গ' নামটিই প্রাচীনতম। মহাভারতে অসুররাজ বলির পুত্র 'বঙ্গে'র নাম অনুযায়ী বঙ্গদেশের নামের কথা বলা হ'লেও কেউ কেউ অনুমান করেন যে শব্দটি নিষাদ বা অস্ট্রীক জাতির দেবতা 'বোঙা' থেকে এসেছে, আবার কারো মতে এটি কিরাত

বা মঙ্গোল জাতীয় 'ব্যুঅঙ' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর পরই এদেশের দু'টি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়, 'রাঢ়' (লাঢ়) ও 'সুহ্মদেশ' (সুরভ)—গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই অঞ্চল অবস্থিত। সুহ্মদেশ বল্‌তে উত্তর রাঢ় অঞ্চলকেই বোঝাত। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে এই অঞ্চলে চারটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—গৌড়, পুণ্ড্র, দক্ষিণবঙ্গকে সমতট এবং পূর্ববঙ্গকে হরিকেল বলা হয়েছে। গুপ্তসাম্রাজ্যকালে 'গৌড়' নামটির বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই নামে অভিহিত হ'তো। 'গৌড়' নামটি একালেও অনেকেই (রামমোহন, মধুসূদন) সমগ্র বঙ্গদেশ বোঝাতে ব্যবহার ক'রেছেন। পরবর্তীকালে পুণ্ড্র অঞ্চল 'বরেন্দ্র' নামেই অধিকতর পরিচিত হয়। পাঠান যুগে সমগ্র 'বাঙ্‌লা' গৌড় নামে এবং মঘুল যুগে 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গলা' নামে অভিহিত হ'য়ে এখনও পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য-রূপে প্রচলিত রয়েছে। নানাপ্রকার রাজনৈতিক কারণে 'বাঙ্‌লা' নামের অর্থবিভ্রাটের আশঙ্কা থাকায় সম্ভবতঃ 'গৌড়বঙ্গ' অভিধা দ্বারা সমগ্র বঙ্গদেশের পরিচয় সুস্পষ্ট হ'তে পারে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে অখণ্ড বাঙলার সীমা : 'উত্তরে হিমালয় ও হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্ব-দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী-বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।'

[দুই] বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ঃ

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের দিকে আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম সীমাঞ্চল দিয়ে ভারতে উপনীত হয় এবং ভারতের আদিবাসীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হ'য়ে প্রধানতঃ জয়লাভের মধ্য দিয়ে সপ্তসিন্ধুর তীরে বসতি বিস্তার করে। ক্রমশঃ ভারতের আদি অধিবাসীদের সহিত যেমন একদিকে তাদের মিশ্রণ ঘটে, তেমনি তারা ঐ আদি অধিবাসীদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, দেবতা-ধর্ম-ভাবনা এবং আচার-আচরণও অনেকাংশে গ্রহণ করে। উভয়ের সংমিশ্রণে কালে কালে ভারতের বুকে যে সভ্যতা-সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি।

এই আর্যভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী এবং তাদের উত্তরাধিকারীগণ সাধারণভাবে 'আর্য-জাতি' নামে পরিচিত হ'য়ে থাকেন। এঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, সেই ভাষার কিছুটা মার্জিত রূপের নিদর্শন আমরা পাই, তাঁদের রচিত সাহিত্যে—এদের মধ্যে সর্বপ্রধান বৈদিক সাহিত্য। ঋক্‌, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব—এই চারিটি বেদ এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকে নিয়েই বৈদিক সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। ঐ যুগের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রয়েছে ঋগ্‌বেদে। পরবর্তী সাহিত্যে ভাষায় বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে। বৈদিক ভাষার সমকালেই তৎসদৃশ কিন্তু সরলতর আর একটি ভাষা প্রচলিত ছিল, যে ভাষায় সম্ভবতঃ কিছু

লৌকিক সাহিত্যও রচিত হয়েছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐরূপ কোন সাহিত্য একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি, তবে ঐ ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পরবর্তী সাহিত্যে পেয়েছি। আর্যদের আগমনের প্রায় হাজার বছর পরে ঐ লৌকিক সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার সংস্কার সাধন করা হয়—ঐ ভাষাকেই বলা হয় 'সংস্কৃত ভাষা' তথা 'লৌকিক সংস্কৃত'। মহামুনি পাণিনি-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণটিই লৌকিক সংস্কৃতের নিয়ামক। রামায়ণ-মহাভারত-আদি মহাকাব্য ও পুরাণ এবং কালিদাসাদির গ্রন্থ এই সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত।

এই তিনটি ভাষা (দু'টি প্রচলিত ও একটি লুপ্ত)-ব্যতীত ঐ যুগে অন্ততঃ একটি কথ্য ভাষাও সমকালে প্রচলিত ছিল। এই সমুদয় ভাষাকেই একালের ভাষাবিজ্ঞানিগণ একটি সাধারণ অভিধায় অভিহিত করেন—এই নামটি 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'; সাধারণতঃ এটিকে আমরা 'সংস্কৃত ভাষা' নামে অভিহিত করলেও 'বৈদিক সংস্কৃত' এবং 'লৌকিক সংস্কৃতে'র স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই ভাষার স্থিতিকাল।

আনুমানিক বুদ্ধদেবের সমকালে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপটি যে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে, সাধারণভাবে এটি 'প্রাকৃত ভাষা' নামে পরিচিত হ'লেও ভাষা-বিজ্ঞানীরা এটিকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। আর খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ দশম শতক পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বৎসরের কাল-সীমায় বিধৃত এই মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা অন্ততঃ তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে পরিণতি লাভ করেছে। এর প্রাচীন রূপটি অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃতের কাল খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। পালিভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থ, অশোক এবং সমসাময়িক অপরদের গিরিগাত্রে ও স্তম্ভে রচিত অনুশাসন বা গিরিলিপি এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বিতীয় পর্যায় বা মধ্য প্রাকৃতের স্থায়িত্বকাল আঃ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক। বিভিন্ন সংস্কৃত নাটকে নারী ও অশিক্ষিত পুরুষদের ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রাকৃত—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগের এই প্রাকৃতকে সাধারণভাবে 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' নামে অভিহিত করা হয়। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে অনেক কাব্য-মহাকাব্যাদি রচিত হ'য়েছে আর অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত হয়েছে জৈনদের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। প্রাকৃতের অন্ত্যপর্বের স্থায়িত্বকাল খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ দশম শতক পর্যন্ত—সাধারণভাবে এই অন্ত্য প্রাকৃতকে বলা হয় 'অপভ্রংশ' এবং এরই অর্বাচীন রূপের নাম 'অবহট্‌ঠ' (অপভ্রষ্ট)। সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলিই কালে কালে বিভিন্ন অপভ্রংশ ও অবহট্টে রূপান্তরিত হয়। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে শৌরসেনী অপভ্রংশ/অবহট্ট ছাড়া অপর কোন অবহট্টের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে ভাষা-বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস—মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ এবং মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশেরও উদ্ভব ঘটেছিল। যাহোক্—একসময় শৌরসেনী অবহট্‌ঠ সমগ্র উত্তর ভারতের শিষ্ট-ভাষারূপে পরিগণিত হ'য়েছিল।

আ' খ্রীঃ দশম শতকের দিকেই প্রাকৃত তথা অবহট্‌ঠ ভাষা থেকে উদ্ভূত হ'য়েছিল ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা—'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে এর পরিচয়। বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি এই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, বাঙলা এবং অন্যান্য পূর্ব ভারতীয় আর্যভাষাগুলি মাগধী অবহট্‌ঠ থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছে। অশোকের সমকালীন 'শুতনুকা লিপি'তে যে পূর্বীপ্রাচ্যার নিদর্শন রয়েছে, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে মাগধী প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ ও মাগধী অবহট্‌ঠের ভিতর দিয়ে বাঙ্‌লা এবং এর সহোদরা ভাষাগুলির জন্মদান করেছে।

আ' খ্রীঃ দশম শতক থেকে খ্রীঃ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব কাল বলে মনে করা হয়। এই ভাষাগুলির সৃষ্টিকালে সমগ্র উত্তর ভারতে শৌরসেনী অবহট্‌ঠের ছিল একাধিপত্য। শিষ্ট সমাজে এই ভাষার ব্যবহারই সমধিক জনপ্রিয় ছিল বলেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা তথা নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত সাহিত্যকীর্তি একান্ত দুর্লভ। একই কালে অবহট্‌ঠ এবং আঞ্চলিক ভাষা যে সমান্তরাল-ভাবে প্রবাহিত হ'তো, সৌভাগ্যক্রমে তার প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। বাঙ্‌লা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাপদ' রচিত হ'য়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই এবং সম্ভবতঃ এটিই নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্য। যে সকল সিদ্ধাচার্য চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের একজন সরহপাদ। ইনি যে আবার অবহট্‌ঠ ভাষায়ও কিছু 'দোহা' রচনা করেছিলেন, তার সন্ধান পাওয়াতেই আঞ্চলিক ভাষা ও প্রাচীনতর অবহট্‌ঠ ভাষার যুগপৎ প্রচলনের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। অবহট্‌ঠ ভাষা আরো পরে, অন্ততঃ পঞ্চদশ শতকেও যে ব্যবহৃত হ'তো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাপতি-কর্তৃক অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত দু'খানি গ্রন্থ থেকে।

বাঙলা এবং এর নিকটতম সহোদরা-স্থানীয় ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা সম্ভবতঃ খ্রী. দ্বাদশ শতক পর্যন্তও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেনি। এর পরই ওড়িয়া এবং ষোড়শ শতাব্দীর দিকে অসমীয়া ভাষা পৃথক ভাষায় পরিণত হয়। এর পর এদের গতিপথ স্ব স্ব ধারায় চিহ্নিত হয়েছিল।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভাষা এবং সাহিত্যের রূপান্তর ঘট্‌লেও জীবজগতের মতই এখানেও বংশপ্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। পরিবেশ অবশ্যই ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে বিরাট প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুপ্রাচীন কাল থেকে ভাষা এবং সাহিত্যের যে ধারা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম-দান করেছে, তার প্রভাবও সামান্য নয়। বস্তুতঃ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় আর্য ভাষা এবং সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাঙলা কিংবা অপর কোন নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্ভবপর নয়। এই কারণেই বিস্তৃতভাবে না হ'লেও সংক্ষিপ্ততম আকারে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় আর্য ভাষার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হ'লো।

[তিন] বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগবিভাগ ঃ

আনুমানিক খ্রীঃ দশম শতকের দিকে অবহট্ট ভাষার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম শাখা বাঙলা যার স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সমকালেই রচিত 'চর্যাপদে'। তারপর প্রায় সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত। দীর্ঘকালের পথ পরিক্রমায় ভাষা-দেহে যেমন ক্রম-পরিণতির লক্ষণসমূহ ফুটে উঠেছে, তেমনি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে নানা বৈচিত্র্য এবং পরিপূর্ণতার লক্ষণ। জীবদেহে যেমন কাল-প্রভাবে বাল্য-কৈশোর-যৌবন-আদি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়, আমরা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাদৃশ লক্ষণের স্ফুরণ লক্ষ্য করেছি, তার সঙ্গে আরো লক্ষ্য করেছি সাহিত্যে সমসাময়িক যুগ-চেতনার চিহ্ন। এই কারণে কালকে ভিত্তি ক'রেই সাহিত্য-ইতিহাসের যুগ বিভাগ কল্পিত হ'য়েছে—যেমনটি অপর সকল দেশেও হ'য়ে থাকে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম বাঙলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ কল্পনা করেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে। তিনি কালানুক্রমিকভাবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলেও বিভিন্ন যুগকে চিহ্নিত ক'রেছিলেন নিম্নোক্ত ক্রমে ঃ

১. হিন্দু-বৌদ্ধযুগ ঃ (ক) শূন্যপুরাণ (খ) নাথগীতিকা ঃ গোরক্ষবিজয় ; (গ) কথা সাহিত্য ; (ঘ) ডাক ও খনার বচন।

২. গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য ঃ (ক) অনুবাদ শাখা ঃ কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁ, মালাধর বসু ; (খ) লৌকিক সাহিত্য ঃ কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, জনার্দন ; (গ) পদাবলী শাখা ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ; (ঘ) কুলজী সাহিত্য।

৩. শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপে প্রথম যুগ ঃ (ক) পদাবলী সাহিত্য ঃ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, মুসলমান কবিগণ ; (খ) চরিত শাখা ; (গ) অনুবাদ গ্রন্থ।

৪. সংস্কার যুগ ঃ (ক) লৌকিক শাখা ঃ চণ্ডী ; (খ) অনুবাদ শাখা।

৫. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপে দ্বিতীয় যুগ ঃ (ক) কাব্যশাখা ঃ বিদ্যাসুন্দর, আলাওল, কালীকীর্তন ; (খ) গীতিশাখা ঃ কবিওয়ালা প্রভৃতি।

শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু কালকে ভিত্তি ক'রে পরে বিষয়-ভিত্তিক উপবিভাগ কল্পনা করলেও একালে ঐতিহাসিকগণ এই যুগবিভাগ ও নামকরণকে মেনে নেন নি। এর প্রধান কারণ তিনটি। প্রথমতঃ, কোন আভ্যন্তর লক্ষণ বা যুগচেতনা এর ভিত্তিতে না থাকায় এ বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয় ; দ্বিতীয়তঃ, এখানে কখনো ধর্ম, কখনো ব্যক্তি এবং কখনো বা মনোভাবকেই যুগের নিরিখ বলে গ্রহণ করায় যুগ বিভাগের মানদণ্ড অস্থির ; এবং তৃতীয়তঃ, পরবর্তীকালে যুগলক্ষণ-চিহ্নিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু গ্রন্থের আবিষ্কারে পূর্বকৃত কাল-বিষয়ক ধারণার অনেক তথ্যই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হ'য়েছে। যেমন—দীনেশবাবু হিন্দু-বৌদ্ধযুগ তথা প্রাচীন যুগে রচিত বলে যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ

করেছেন, ওদের কোনটিই এত প্রাচীন নয় বলেই একালের ঐতিহাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানিগণ সুদৃঢ় অভিমিত ব্যক্ত করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের দিক্‌চিহ্ন-নির্দেশক 'চর্যাপদ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলে এদের প্রেক্ষাপটে অপর গ্রন্থের আলোচনা সম্ভবপর ছিল না—ফলে ঐ আলোচনা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলেই দীনেশবাবু-কৃত যুগবিভাগ পরিত্যক্ত হ'য়েছে।

পরবর্তীকালে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন-আদি মনীষিগণ প্রাপ্ত তথ্যাদির বিচার-বিবেচনায় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন :

১. **প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ :** আঃ ৯৫০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ অর্থাৎ তুর্কী আক্রমণ-পূর্ব যুগ। এই যুগটিকে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ বলা চলে।

১ ক. **যুগান্তর কাল :** আঃ ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্থাৎ তুর্কী শাসনের প্রথম ভাগ।

২. মধ্যযুগ : আঃ ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ পাঠান মুঘল শাসনকাল।

(ক) আদি মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্বযুগ : আ' ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫ ০ খ্রীঃ।

(খ) অন্ত্য মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ : আ' ১৫০০ খ্রীঃ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ।

২ ক. যুগান্তর কাল মোটামুটি ১৭৬০ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্থাৎ কোম্পানী শাসনকাল।

(৩) আধুনিক যুগ : ১৮০০ খ্রীঃ থেকে—।

প্রাচীন যুগ : খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতক বিস্তৃত প্রাচীন যুগে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে মাত্র একটিই—'চর্যাপদ'। এতে অন্ততঃ ২৩ জন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যের রচিত প্রায় ৫০টি পদ পাওয়া যায়। এর রচনা-বিশ্লেষণে মনে হয় যে ধর্মীয় আবেগের বশেই সহজ-সাধন-পদ্ধতি বিষয়ে সঙ্কেতে কবিরা কিছু বলে গেছেন—সজ্ঞানে সাহিত্যসৃষ্টি তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। তবে সাধারণ পাঠকের নিকটও এর মূল্য রয়েছে—লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শ, খণ্ড কবিতার পূর্বাভাষ এবং সমাজ সচেতনার লক্ষণ চর্যার পদগুলিতে ফুটে উঠেছে। এছাড়া ভাষাতাত্ত্বিক কারণে গ্রন্থটি গবেষকদের নিকট অমূল্য বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

১ ক. **যুগান্তর কাল :**—১১৯৮ খ্রীঃ থেকে ১২০৫ খ্রীঃ সময়কালের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রথম তুর্কী আক্রমণ ঘটে। স্বভাবতঃই রাজনৈতিক বিপর্যয় সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র দেশ জুড়ে এই অশান্তি চলছিল অন্ততঃ ১৩৫০ খ্রীঃ অবধি। এই কালে রচিত কোন বাঙলা সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, অনুমান করা হয় যে এই সময়-কালের মধ্যেই পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যের একটা সংক্ষিপ্ত পাঁচালী আকারের রূপ তৈরি হ'য়েছিল। হয়তো, কানা হরি দত্ত, মানিক দত্ত প্রভৃতি একালে বর্তমান ছিলেন।

(২) **মধ্যযুগ** ঃ আঃ ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যাপ্ত বাঙলায় মুসলিম-শাসনকালটিই সাধারণভাবে মধ্যযুগ নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। তুর্কী-আক্রমণ যুগে আত্মরক্ষার তাগিদে বাঙালী যে কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা আস্তে আস্তে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ইতোমধ্যে দেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কতকাংশে তাদের কূপমণ্ডূকতা ত্যাগ ক'রে দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসীদের সঙ্গে মিলনটাকে সহজতর ক'রে নিয়েছিল। ফলে বহু অনার্য দেব-দেবী, ধর্মীয় ভাবনা এবং আচার-আচরণ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও প্রবেশাধিকার লাভ করায় নবাগত দেব-দেবী বা আচার-আচরণকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার তাগিদে তারা এক নতুন জাতের সাহিত্য সৃষ্টি করলেন—এর নাম মঙ্গলকাব্য। এই যুগের সাহিত্যিকরা ছিলেন প্রধানতঃ জীবন-বিমুখ, পরপ্রত্যাশী ও বস্তুনিষ্ঠ, জীবনযাত্রায় জটিলতা কম থাকায় এঁদের মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধির চর্চা তেমন ছিল না, ফলে আবেগসর্বস্ব কাব্যই ছিল তাদের সাহিত্যের বাহন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের ভাবনা-কামনায় অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করায় চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সূচিত হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন—একটি চৈতন্য-পূর্বযুগ বা আদিমধ্যযুগ, অপরটি চৈতন্যোত্তর যুগ বা অন্ত্যমধ্যযুগ।

(ক) **আদিমধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্বযুগ** ঃ আদিমধ্যযুগের সাহিত্যকীর্তি ছিল অপ্রচুর। এযুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা—বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', যাতে সমসাময়িক ভাষার নিদর্শন প্রায় অক্ষত রয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের একটি নোতুন ধারার প্রবর্তনও ঘটে এই যুগে 'মনসামঙ্গল কাব্যে'। মনে হয়, বাঙলাদেশের তিন প্রান্তে তিনজন কবি একই বিষয় নিয়ে প্রায় সমকালেই লেখনী ধারণ করেছিলেন, এঁরা হ'লেন বরিশালের বিজয়গুপ্ত, ময়মনসিংহের নারায়ণদেব এবং ২৪ পরগণার বিপ্রদাস পিপলাই। এছাড়া এ যুগে অনুবাদ সাহিত্যেরও সূত্রপাত হয়েছিল। কৃত্তিবাস-রচিত 'রামায়ণ' এবং মালাধর বসু-রচিত 'ভাগবত'-এ যুগের দু'টি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। একালের সাহিত্যে ধর্মীয় চেতনাই প্রবল, ব্যক্তি-চেতনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কবিরা যে সজ্ঞানে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট।

(খ) **অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ** : চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমগ্র দেশের পক্ষেই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাঙালীর সমাজ-জীবনে তাঁর আবির্ভাব যেমন একটা বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি বাঙলা সাহিত্যেও এনেছিল একটা ভাব-বিপ্লব। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষও ক্রমশঃ সমাজে একটা মর্যাদার আসন লাভ করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধসন্তান কালকেতু পেলো নায়কের ভূমিকা। ধর্মমঙ্গল আদি কাব্যেও এই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল ; অনুবাদ শাখাও হ'ল বহুধা বিস্তৃত—অবশ্য তা প্রধানত সীমাবদ্ধ রইলো রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মধ্যেই। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন

ক'রে রচিত হ'লো কয়েকটি উৎকৃষ্ট জীবনী-সাহিত্য। অবশ্য এ যুগের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী-অবলম্বনে রচিত পদাবলী-সাহিত্য। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন সাহিত্যধারাকে যদি বিশ্বের দরবারে পরিবেশনের যোগ্য বলে বিচার করতে হয়, তবে সেখানে একমাত্র এই পদাবলী সাহিত্যই প্রথম দাবিদার হ'বে। কোন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর রচনা হওয়া সত্ত্বেও এই পদাবলী সাহিত্যের মানবিক এবং সার্বজনীন আবেদনকে অস্বীকার করা চলে না। এই অন্তমধ্যযুগেই সাহিত্যে জীবন-মুখিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। 'চৈতন্যোত্তর যুগের শেষভাগে যে কাব্যধারা পরিপূর্ণ-ভাবে জীবনমুখী হইয়া উঠিয়াছিল সেই লৌকিক কাব্যশাখার একদিকে গীতিকা-সাহিত্য অপরদিকে শাক্তপদাবলী। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত পল্লীকবিদের হাতে রচিত গীতিকাব্যগুলি পরিমার্জিত কিংবা সুসংস্কৃত নহে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এবং জীবন-রসে পুষ্ট। শাক্তপদাবলী বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রচিত হইলেও ইহাতে বাস্তব-জীবনের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর। এই লৌকিক সাহিত্যেরই আর একটি ধারা মুসলমানী সাহিত্য বা কিস্‌সা সাহিত্য। এই ধারায় উপকথা-রূপকথা জাতীয় কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিলেও যে এইগুলি জীবনরসে সমৃদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' (বাঙলা সাহিত্যের পরিচয়—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

(২ক) **যুগান্তর কাল :** ১৭৬০ খ্রীঃ মধ্যযুগের শেষ কবি রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্রের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধ প্রায় সমকালীন ঘটনা। এই সময় থেকে কার্যতঃ বাঙলার শাসনভার 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামক এক ইংরেজ বণিক কোম্পানীর হাতে চলে যায়। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহি বিদ্রোহের পর এই শাসনভার ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের হাতে ন্যস্ত হয়। এই সুদীর্ঘ শতাব্দী কাল ছিল বাঙালীর জীবনে আর এক যুগান্তর কাল। এই কালের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি না হ'লেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ এবং শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরবর্তী নোতুন যুগসৃষ্টির প্রস্তুতি দেখা দিয়েছিল। বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটে এই যুগে। আর কাব্যের আসরকে মাতিয়ে রেখেছিল কবিগান, যাত্রা, টপ্পা, পাঁচালি, তর্জা, খেউড় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও অমার্জিত সাহিত্য।

(৩) **আধুনিক যুগ :** ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরই মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে সাহিত্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ—উভয়দিকেই নবজীবনের আবির্ভাব সূচিত হয়। বাংলা গদ্যের বিভিন্ন দিক্—গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বাঙ্‌লা নাটক-প্রহসন, বাঙ্‌লা গীতিকাব্য ও মহাকাব্য—সবই এই নোতুন ধারার সৃষ্টি। সাহিত্যে জীবনচেতনা, সমাজচেতনা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, মন্ময়তা-আদি লক্ষণ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে আছেন—রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মহৎ শিল্পীবৃন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে আরো সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা যায়—এই যুগ এখনো সচল ধারায় প্রবাহিত।

[চার] দশম-দ্বাদশ শতকের সামাজিক পটভূমি ঃ

প্রশ্ন ১। 'দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কলসীমায় তথা প্রাচীন যুগে গৌড়বঙ্গের সামাজিক পটভূমি কিরূপ ছিল,' তার পরিচয় দাও।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষায় খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত কাল-সীমাকে প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ বলে অভিহিত করা হ'লেও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি প্রাচীন যুগের অন্ত্যপর্ব। বাঙলাদেশ ছিল মূলতঃ অনার্য-অধ্যুষিত অঞ্চল। তবে খ্রীঃ পূঃ মৌর্যযুগেই যে এখানে সর্বপ্রকারে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার পাথুরে প্রমাণ বর্তমান থাকলেও ঐ ধারায় নিরবচ্ছিন্নতা ছিল না। এরপর খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণ সম্ভবতঃ সমগ্র বাঙ্‌লাদেশকেই তাদের ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসবার পর বাঙলায় আর্যীকরণ পদ্ধতি আর কখনো বাধাপ্রাপ্ত হয়নি; কিন্তু তখনো বাঙলায় কোন স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। সপ্তম শতকের একেবারে গোড়াতেই শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত তখনই গৌড়বঙ্গ একটা রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল। গুপ্ত শাসনকাল থেকে তথা শশাঙ্কর আমল থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলায় প্রাচীন যুগ শুরু। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতাব্দীকাল গৌড়বঙ্গে চলছিল 'মাৎস্যন্যায়'। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে সম্রাট-পুত্র গোপালদেব প্রজাসাধারণ ও রাজকর্মচারিদের দ্বারা রাজা নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। পরবর্তী তিন শতাব্দীকালে এঁর বংশধররাই প্রকৃতপক্ষে গৌড়বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা-রূপে বর্তমান ছিলেন। দ্বাদশ শতকের তিন-চতুর্থাংশ কাল রাজদণ্ডের অধিকারী ছিলেন সেন বংশ। ১২০০ খ্রীঃ-র দু'তিন বছর আগে পরে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বিন্ বক্তিয়ার খিলজির নিকট পরাজিত হ'য়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। ফলতঃ এখানেই সেন বংশীয়দের সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হ'লো। প্রাচীন যুগের সমাপ্তিও এখানেই।

অতএব ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা-বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তিন শতাব্দীকাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে আসীন ছিলেন অধিকাংশ সময় পালরাজবংশ এবং অপরাংশে সেন রাজবংশ। অবশ্য এই শাসনকালের মধ্যেই স্থানীয়-ভাবে বৌদ্ধমতাবলম্বী খড়্গবংশ এবং ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী বর্মণবংশও কিছুকাল রাজত্ব করেছিল, তবে সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রভাব ছিল নগণ্য। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ, তবে তাদের পরধর্মসহিষ্ণুতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণাটদেশীয় সেনবংশীয় রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী, সম্ভবতঃ অপর ধর্মের প্রতি তাদের ততটা

সহিষ্ণুতা ছিল না। বৌদ্ধধর্মানুগত পালরাজাদের তিন শতাব্দীকাল-ব্যাপী রাজ্যশাসন-কালে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ঘটেছিল যতখানি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম সেই তুলনায় ছিল প্রায় নগণ্য। এটি শুধু গৌড়বঙ্গের অবস্থাই নয়, সমগ্র ভারত ভূমিতেই বৌদ্ধপ্রভাব ছিল অনুরূপভাবেই প্রসারিত। এই সময় শঙ্করাচার্য এবং কুমারিল ভট্টের আবির্ভাব বৌদ্ধ-প্রভাবকে যথেষ্ট মন্দীভূত করে এবং ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী সেনরাজাদের আনুকূল্যে হিন্দুধর্ম যে শুধু পুনরুজ্জীবিত হ'লো, তাই নয়, বৌদ্ধধর্মও ক্রমবিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে।

পালবংশের রাজারা শুধু পরমতসহিষ্ণুই ছিলেন না, তারা হিন্দু পুরাণের অনুশীলনেও আনন্দ লাভ করতেন। তাঁরা বাঙালীর সঙ্গে মিলে মিশে এক হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা সমকালীন বাঙালীর ধর্মবোধেই বিশ্বাসী ছিলেন, বিভিন্ন তাম্রপত্রে তাঁরা জনসাধারণের কথাই বিশেষভাবে বলে গেছেন। 'সেই তুলনায় সেনগণ বাঙলার সংস্কৃতিকে গণমানস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরোহিতের সাহায্যে একটা কৃত্রিম বৈদিক-স্মার্ত সংস্কৃতির দুর্বহ ভার সাধারণ বাঙালীর শিরে চাপাইয়া দিয়াছিলেন।' আশঙ্কা হয়, সমসাময়িক কালে সেনরাজাদের এই আচরণ দেশবাসীর সমর্থন লাভ করেনি এবং সম্ভবতঃ সেন রাজবংশের এত দ্রুত পতনের এটিও একটি মুখ্য কারণ ছিল। সেনরাজগণ বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনে ছিলেন সচেষ্ট। তার ফলে একদিকে বহু বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম গ্রহণে বাধ্য হ'লেও অনেকেই যে সেনরাজবংশের উচ্ছেদসাধনেও তৎপর ছিলেন, এরূপ মনে করবার কারণ রয়েছে। সেন রাজত্বকালে সামন্তরাজগণ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার ক'রে স্বাধীন হ'বার চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই; বৈদিক ব্রাহ্মণ্য মতবাদ নিম্নবর্গের জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি—তারা বজ্রযান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন; বিদেশী সেনরাজদের বাঙালী আপন জন ব'লে ভাবতে পারেনি বলেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। এমন কি লামা তারানাথের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করলে স্বীকার করতে হয় যে বৌদ্ধগণ নাকি বক্তিয়ার খিলজির গুপ্তচরের কাজ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্‌গণও ভবিষ্যদ্‌বাণীর দোহাই দিয়ে রাজাকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছিলেন যে রাষ্ট্রশক্তি শীঘ্রই তুর্কীদের করতলগত হ'বে—এইভাবেই গোড়াতেই রাজার মনোবল নষ্ট করে দেওয়া হ'য়েছিল।

পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য মতের প্রতিকূলতা না করলেও রাজধর্মের আশ্রয়পুষ্ট বৌদ্ধগণের প্রাধান্য বজায় থাকায় সমাজে জাতিভেদ প্রথা তখন চরম রূপ লাভ করতে পারেনি। বরং বৌদ্ধতান্ত্রিকতা, হিন্দুতান্ত্রিকতা, কৌলধর্ম, নাথধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলছিল। তৎকালীন অভিজাত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিই শুধু সংস্কৃত পুরাণ ও স্মৃতিসংহিতা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ সম্ভবতঃ অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ এবং দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে উৎসাহ বোধ করতেন। সেনবংশের শাসনকালে আবার সংস্কৃত-আলোচনার পুনরুজ্জীবন ঘটে। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় পঞ্চকবি—উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য এবং কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের নাম এ

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে, বুদ্ধোত্তর কালে বৌদ্ধগণ যেমন সংস্কৃতের একাধিপত্য অস্বীকার ক'রে দেশীয় ভাষা প্রাকৃত তথা পালিভাষায় তাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগেও তারা তেমনি সংস্কৃতকে উপেক্ষা ক'রে দেশীয় ভাষা তথা বাঙলায় তাদের গুহ্য সাধনপদ্ধতি 'চর্যাপদ' রচনা করেছিলেন।

সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদগুলিতে আমরা তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটা সুস্পষ্ট চিত্রের সন্ধান পাই। তবে এই চিত্র সমাজের উচ্চ অভিজাতদের নয়, সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মাচারী সমাজের নিম্নকোটির জনসাধারণের। এদের মধ্যে আছে তাঁতী, জেলে, শবর, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণী। সমাজে জাতি-বিন্যাস পদ্ধতির কড়াকড়ি দেখা দিয়েছিল সেন রাজত্ব কালে। সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেনই কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। এই আমলেই বহু বৌদ্ধ হিন্দু-সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করায় সমাজব্যবস্থায় নানা রূপান্তর ঘটে। এই সময়ই হিন্দুদের মধ্যে বহু জাতি-উপজাতির উদ্ভব ঘটে এবং সমাজে তাদের স্থান নির্দেশ ক'রে উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ্যমতের অনুগামী হ'লেও অপর সাধারণের মধ্যে দু'টি লোকায়ত অবৈদিক ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের একটি শাখা সহজিয়াগণ এবং শৈব নাথপন্থীগণ দেহধর্মকে অস্বীকার না ক'রে 'কায়াসাধনে'র মাধ্যমেই মুক্তির উপায় সন্ধান করেছেন। এই দুই শ্রেণীর কেউ ঈশ্বর-ভাবনায় কোন গুরুত্ব আরোপ না ক'রে গুরুবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চর্যাপদগুলিতে তৎকালীন যে সমাজ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ব্রাহ্মণদের পরশ্রমজীবী বলেই মনে হয়। তাঁরা নিষ্কর জমি ও নানাবিধ সুখসুবিধা ভোগ করতেন। চর্যায় অবশ্য বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয়ই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সে জীবন ছিল বড় কঠোর, জীবনযাত্রার মান ছিল অতিশয় নিম্ন এবং এদের সকলকেই কায়িক শ্রমের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হ'তো। যৌথ পরিবার প্রথাই তৎকালে প্রচলিত ছিল।

এই আদি যুগে অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত দোহা এবং কিছু কিছু প্রকীর্ণ শ্লোকে সমসাময়িক জীবনের কিছুটা পেলেও পরবর্তী সাহিত্যধারায় যে দু'টি গ্রন্থের প্রভাব অতিশয় উল্লেখযোগ্য,—তাদের একটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত 'চর্যাপদ'। গীতগোবিন্দের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় বিভিন্ন কাহিনী কাব্যের গঠনে এবং পদাবলী-সাহিত্যের সর্বস্তরে; চর্যাপদের প্রভাব পদাবলী সাহিত্যে (সহজিয়া পদে) এবং বিশেষতঃ বাউল গানে। বস্তুতঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এই আদিযুগই যে পরবর্তী যুগের ভিত্তি-স্থাপন করেছে, তা' অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

[পাঁচ] চর্যাপদ ঃ

প্রশ্ন ২। বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্য কোন্‌টি? এর সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

অথবা

প্রশ্ন ৩। 'চর্যাপদ' কোন্ কালের কাদের দ্বারা রচিত হয়েছিল? এর সঙ্গে ধর্মীয় কোন সম্পর্ক জড়িত আছে কি? এ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা সহ এ থেকে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা কর।

সমগ্র প্রাচীন যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য যে একটিমাত্র গ্রন্থের উপরই আমাদের একান্তভাবে নির্ভর ক'রে থাকতে হয়, সেটি 'চর্যাপদ'। ১৯০৭ খ্রীঃ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার ক'রে এগুলিকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মশাই গ্রন্থের যাবতীয় রচনার ভাষাকেই 'বাঙলা' বলে মনে করলেও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেন যে গ্রন্থস্থ বৌদ্ধগান-গুলির ভাষা প্রাচীন বাঙলা হ'লেও দোহাগুলির ভাষা প্রাচীনতর অবহট্‌ঠ।

বৌদ্ধগানগুলিকে সাধারণভাবে 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতি' নামে অভিহিত করা হয়। শাস্ত্রীমহাশয় গ্রন্থটির প্রকৃত নাম অনুমান করেছিলেন 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়', ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে এর নাম হওয়া উচিত ছিল—'চর্যাশ্চর্য-বিনিশ্চয়'। গ্রন্থের মধ্যে মুনিদত্ত-কর্তৃক টীকায় এটিকে 'আশ্চর্য চর্যাচয়' নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিচারে সিদ্ধান্ত হ'য়েছে যে মূল গ্রন্থটির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ' এবং 'চর্যাপদ'গুলি 'চর্যাগীতি' নামে পরিচিত ছিল।

'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থটি পাওয়া গেছে খণ্ডিত আকারে। এতে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ এবং তেইশ জন কবির নাম পাওয়া গেছে। এর যে তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গেছে, তাতে আরও সাড়ে তিনটি পদ ও একজন কবির নাম পাওয়া যায়। অতএব সমগ্র চর্যাগীতিকোষে ৫১টি পদ ও ২৪ জন কবির ভণিতা ছিল। বিভিন্ন সূত্রে অনুমান করা হয় যে, মোট ১১০টি গীতি দু'টি বিভিন্ন কোষে সঙ্কলন করা হ'য়েছিল। কিছুদিন পূর্বে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে আরো ৯৮টি চর্যাগীত ('চাচাগীত') সঙ্কলন করেন, এদের মধ্যে অন্ততঃ ১৯টি গীত চর্যাগীতির সমকালীন বলে অনুমিত হয়।

চর্যাগীতি-রচয়িতাগণ ছিলেন সহজিয়া-পন্থী বৌদ্ধ—সাধারণতঃ 'সিদ্ধাচার্য' নামে এদের অভিহিত করা হয়। চর্যাগীতিকার মধ্যে যে সকল সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় তাঁদের

অন্যতম কৃষ্ণপাদাচার্য বা কাহ্নপা—এঁর রচিত পদের সংখ্যা ১২। ভুসুকপা ছিলেন চিত্রধর্মী কবি, এঁর রচিত পদের সংখ্যা ৮। সরহপা ও কুক্কুরীপা—প্রত্যেকে ৪টি ক'রে পদ রচনা করেছেন। কাহ্নপা এবং সরহপা অবহট্‌ঠ ভাষায় কতকগুলি দোহাও রচনা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন নাথগুরু মীননাথ 'লুইপা' (রোহিত পাদাচার্য) নামে দু'টি পদ রচনা করেন। শান্তিপা এবং শবরীপা-রও দু'টি ক'রে পদ পাওয়া যায়। অপর সিদ্ধাচার্যদের প্রত্যেকের একটি ক'রে পদ পাওয়া যায়। এই সিদ্ধাচার্যগণ প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এঁরা কামরূপ, মিথিলা, উড়িষ্যা এবং গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কালের দিক থেকেও এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকা সম্ভব। চতুর্দশ শতকে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে এদের সকলের নাম পাওয়া যায়—অতএব এই তারিখের পূর্বে এঁরা অবশ্যই বর্তমান ছিলেন। কোন কোন মতে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর লোক। বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন স্থানে রচিত পদগুলিতে সম্ভবতঃ মূলে কিছু ভাষাগত বৈচিত্র্য ছিল—পরে কোন এক সময়, অবশ্যই চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে এদের সংস্কার সাধন ক'রে অভিন্ন ভাষায় রূপায়িত করা হয়—এই অনুমান যথার্থ হওয়াই সম্ভব।

চর্যাপদের ভাষা-বিষয়ে বিস্তর মতদ্বৈধ বর্তমান থাকলেও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছেন যে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙলা। অবশ্য ঐ সময় ওড়িয়া ভাষা এবং অসমীয়া ভাষা বাঙলা ভাষার সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত থাকায় এদের দাবিও নস্যাৎ করা যায় না। চর্যার ভাষাকে বলা হয় 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'আলো-আঁধারি ভাষা' অথবা 'সন্ধা ভাষা' বা 'সম্যক অনুধাবন ক'রে উপলব্ধি' করবার ভাষা। আসলে এই নাম দুটি ভাষার পরিচয় নয়, বিষয়বস্তুরই পরিচয় বহন করে। বজ্রযানপন্থী বৌদ্ধগণ কালে সহজিয়া-পন্থী হ'য়ে দাঁড়ায় এবং পদের সাধন-পদ্ধতিকে অতিশয় গুহ্য বিষয়রূপে গ্রহণ ক'রে এমনভাবে সঙ্কেতে তাকে প্রকাশ করে যে, অপর সাধারণের পক্ষে এর মর্মগ্রহণ সম্ভবপর নয়। এদের শেষ কথা 'গুরু পুচ্ছিত্য-জান' অর্থাৎ গুরুকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিতে হ'বে। এই কারণেই চর্যার ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'সন্ধা ভাষা' বলে অভিহিত করা হয়।

সহজিয়াগণ তাদের সাধনতত্ত্বকে বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন; হয়তো হিন্দুদের বিষয়ে তাদের প্রতিকূল মনোভাবের জন্যই তারা এই গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিল। চর্যার টীকাকার মুনিদত্ত চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে একে 'শূন্যবাদ' নামে অভিহিত ক'রেছেন। 'শূন্যতাই একমাত্র সত্য—শূন্যতার মধ্যেই সুখদুঃখাদির লোপ ঘটে এবং ইহাতেই মহাসুখের অস্তিত্ব নিহিত। ইহাই অদ্বয় ও সহজ অবস্থা। একমাত্র গুরুর উপদেশেই মহাসুখময় নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে, ইহার জন্য যোগসাধনাদির প্রয়োজন নাই। মোটামুটি ইহাই চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্ব।'

চর্যার সাহিত্যগুণ : বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন-রূপে চর্যাপদকে গ্রহণ করা হ'লেও একে খাঁটি সাহিত্য রূপে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বৌদ্ধ সহজিয়াগণ চর্যাপদ-

গুলিকে তাঁদের সাধনতত্ত্বের বাহনরূপেই সৃষ্টি ক'রেছিলেন। এই রচনার পিছনে সজ্ঞানে কোন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস বর্তমান ছিল না। তৎসত্ত্বেও চর্যাপদগুলিকে একান্তভাবে ধর্মীয় রচনা বলেও অভিহিত করা যায় না। কারণ এদের কোন কোনটির মধ্যে বাক্-নির্মিতির শিল্পকৌশল এবং স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন এমন স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে এদের সহজ কবিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। প্রকৃত কাব্যসাহিত্যে রসের আবেদনকেই মুখ্য বিষয় বলে গ্রহণ করা হ'লেও এর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, বক্রোক্তি, ধ্বনিকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। চর্যাপদের বিশ্লেষণে এদের উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার ক'রে নিতে হয়। তত্ত্বদর্শনের প্রতিই চর্যাকারদের আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল,—এ কথা মেনে নিলেও তাঁরা যে তত্ত্বকথাকে নানাপ্রকার রূপক-প্রতীকের সহায়তায় বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে অনির্বচনীয় ক'রে তুলেছিলেন, এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'এই চিত্র প্রতীকগুলি একদিকে যেমন উদ্দিষ্ট অর্থকে সংহত আকারে পরিবেশন করিয়াছে, তেমনি চিত্রধর্ম ও রূপ-কল্পকেও আবার অজ্ঞাতসারে একটা শিল্প মর্যাদা দিয়াছে।' এই রূপক-প্রতীক যে প্রায় সর্বত্রই বক্তব্যকে তুলে ধরেছে, তা' যে কোন সনিষ্ঠ পাঠকের নিকট সহজেই ধরা পড়ে। এই অলঙ্করণের মধ্য দিয়েই যে চর্যাকারদের কবিত্বশক্তি নিঃশেষিত হ'য়েছিল, তা' নয়। তাঁদের কবি-দৃষ্টিতে বাঙলার নদনদী-প্রান্তর, নর-নারীর আর্তি ও আকৃতি প্রভৃতি এক অপরূপ রোম্যান্টিক সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়েছে। শিকারের চিত্র, নৌকা বেয়ে যাবার চিত্র, মদ্য বিক্রয়শালার চিত্র প্রভৃতির অনেকগুলিতেই স্বভাবোক্তির মাধ্যমে বেশ কিছু পরিমাণে রসের উদ্বোধন ঘটেছে।—'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী' কিংবা 'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ' প্রভৃতি কবিতার চিত্রসৌন্দর্য যেমন উপভোগ্য, তেমনি ভাষার দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও এদের সার্বজনীন সাহিত্যিক মূল্যকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। চর্যার শেষ পদ 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী'-তে শবর-শবরীর বাসভূমির একটি উপভোগ্য লিপিচিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে 'আমার সেই তৃতীয় বাড়িকে গগনতুল্য দেখি; সুন্দর কার্পাস প্রস্ফুটিত। তৃতীয় বাড়ীর পাশে জ্যোৎস্না বাড়ি। অন্ধকার দূর হ'লো, আকাশে ফুল ফুটলো' প্রভৃতি। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী' পদে নিঃসঙ্গতা-জনিত বেদনাবোধ সুস্পষ্ট। 'উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই 'সবরীবালী' পদের কাব্যসৌন্দর্য এর তত্ত্বকথাকে অনেকখানি পিছনে ফেলে গেছে। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'চর্যাকারগণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় চেতনার বশে এই পদগুলি রচনা করিলেও তাঁহাদের অনেকেরই রীতিমতো কবিত্বশক্তি ছিল। প্রতীকরূপকের সাহায্যে চিত্রসৃষ্টি, আখ্যানের ইঙ্গিত, মানব চরিত্রের মধ্যে সুখদুঃখ-বিরহ মিলনের দৈনন্দিন জীবনচিত্র চর্যার দর্শন ও তত্ত্বের নিষ্প্রাণতাকে কাব্যরসের স্পর্শে সজীব করিয়াছে। প্রাচীন যুগের বাঙালী সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ মূলতঃ সাধক হইলেও কবিত্বশক্তিতেও যে ন্যূন নহেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।'

চর্যার সাহিত্যগুণ-বিষয়ে বিচার করতে গেলে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, চর্যার পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যে কবিদের যে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া

যায়, চর্যাপদগুলি ছিল তা' থেকে মুক্ত। চর্যাপদে কবিদের ব্যক্তি-সম্পর্ক সুনিবিড় এবং এই কারণেই এর পদগুলি শুধুমাত্র কবিতা নয়, একেবারে গীতিকবিতার পর্যায়ে স্থানলাভ করার যোগ্য বলে অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ এগুলিতে বাঙালীর স্বভাবধর্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের mystic বা রহস্যময় রূপকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক বলেন ঃ অনুভূতির অনির্বাচ্যতা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরীতিকে আশ্রয় ক'রে অপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।'

চর্যায় সমাজচিত্র ঃ ঐতিহাসিক বিচারে চর্যাপদগুলির রচনাকাল প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন পাল বংশের পতন এবং উল্কার মত সেন বংশের অভ্যুত্থান ও পতন সূচিত হ'য়েছিল। অতএব সময়টা যে বাঙালীর জীবনে আশাব্যঞ্জক ছিল না, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। চর্যাকারগণ ধর্মীয় সাধানতত্ত্বগুলিকেই চর্যাপদে ব্যবহার করতে চাইলেও এর জন্য তাঁরা যে সকল রূপক-প্রতীকের সহায়তা নিয়েছেন, তাতে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের বহু খণ্ডচিত্রই সুস্পষ্ট আকারে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। চর্যাকারগণ ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সাধক, কাজেই সমাজের অভিজাতবর্গ কিংবা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মধুর থাকবার কথা নয়, ফলে চর্যায় সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত অংশ প্রায় অনুপস্থিত। 'সামাজিক বৈষম্য ও পক্ষপাত, উচ্চবর্ণের মধ্যে নানা-প্রকার অন্যায় ও ব্যভিচার, নিম্নবর্ণ অন্তজদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়—ইহাই ছিল চর্যার রচনার যুগে সামাজিক অবস্থার স্বরূপ।…চর্যাপদগুলির মধ্যে যে সমাজচিত্র ও বাস্তব জীবনযাত্রার আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাতে একদিকে সমাজের এই ভেদবিভেদ এবং বৈষম্যের চিত্র, অন্যদিকে দুঃখপূর্ণ দরিদ্র জীবনযাত্রার কখনও পূর্ণাঙ্গ কখনও বা খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদান লক্ষ্য করা যায়' (ডঃ সত্যব্রত দে)।

চর্যার যুগে সমাজে শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ছিল অবজ্ঞাত এবং আর্থিক দিক্ থেকে বিপর্যস্ত। এদের বাসস্থান সম্ভবতঃ ছিল নগরের বাইরে—এদের চল্‌তে হ'তো উচ্চবর্ণের স্পর্শ বাঁচিয়ে। কিন্তু উচ্চবর্ণের সঙ্গে এদের যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তা' নয়, বরং উচ্চবর্ণের মনস্তুষ্টির জন্য ডোম্বীদের আতিশয্য কিছুটা সংশয়েরই সৃষ্টি করে। এই সকল অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সমাজ শ্রমিকদের বৃত্তি অর্থকরী কিংবা প্রশংসনীয় ছিল না। এদের কেউ ছিল তাঁত-বোনা তাঁতী, চাঙ্গড়ি-প্রস্তুতকরী ডোম্বী, নৌকাবাহক জেলে বা নেয়ে। এ ছাড়া ছিল শুঁড়ি যারা মদ চোয়াত, ছিল বৃক্ষছেদক, ছিল নট—সম্ভবতঃ এরা লেটোর দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে নেচে গেয়ে বেড়াত।

চর্যাগীতির বিভিন্ন পদে তৎকালীন সমাজ-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে প্রতিবেশীহীন জীবনের নিঃসঙ্গতা, অন্নাভাব, আর্থিক বিপর্যয় প্রভৃতির দুঃখ-বেদনাময় দিকটিই বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে। দেশে চুরি-ডাকাতি, অশান্তি ও অরাজকতা

সাধারণ গৃহস্থের জীবনেও নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। এ জাতীয় সামাজিক পরিবেশে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড যে বেশি উঁচুতে ছিল না, তা' সহজেই অনুভব করা চলে :

'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥'

দিনের বেলা যে বধূটি কাকের ভয়ে ভীত, রাত্রিবেলা সে-ই কামরূপ যায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও যে ডোম-শবর-আদি অন্ত্যজদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকতেন, তারও উল্লেখ রয়েছে চর্যার পদে। এত অব্যবস্থার মধ্যেও যে মানুষের মনে সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'উঁচা উঁচা পাবত' পদটির মধ্যে—শবর-শবরীর মিলিত জীবনযাত্রার একটি মাধুর্যময় চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় এটিতে।

এ জাতীয় সামগ্রিক পরিচয় ছাড়াও বহু বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের সহায়তায় চর্যাকারগণ তৎকালীন সমাজ-জীবনের অনেক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত ক'রে গেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-শালী প্রভৃতিকে নিয়ে এক একটি যৌথ পরিবার গড়ে উঠতো। একালের মতই সেকালের বিবাহও ছিল আড়ম্বরপূর্ণ—বাদ্য-ভাণ্ড-সহকারে বরযাত্রা, যৌতুকপ্রথা, রমণীদের বাসর জাগরণ এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে বিবাহের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় চর্যার কোন কোন পদে। সম্পন্ন গৃহস্থ-গৃহে গোরু-বলদ ছাড়া হাতিও পোষা হতো। দাবা খেলা বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল, মদ্যপানেরও বিশেষভাবে চিহ্নিত আখড়া ছিল। নাচ গান ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সামাজিক আনন্দ উৎসবের অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'তো। নাটকের অভিনয় হ'তো বলেও মনে হয়। গৃহস্থালির বিভিন্ন দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—হাঁড়ি, পিঁড়া, ঘড়ি, ঘড়ুলি প্রভৃতি; অলঙ্কারের মধ্যে আছে—কানেট, ঘণ্টানেউর, কাঙ্কান, কুণ্ডল, মুক্তিহার প্রভৃতি; বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে—পড়হ, মাদল, করণ্ড, কসাল, ডমরু, বীণা, বাঁশি প্রভৃতি।

চর্যার পদগুলির অন্ততঃ অধিকাংশই যে গৌড়বঙ্গে রচিত হ'য়েছিল, তা বিশেষভাবে অনুমান করা চলে এর নদীমাতৃক পটভূমি থেকে। বহু পদেই নদ-নদী, নৌযাত্রা, নৌকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারিভাষিক নাম, নৌবাণিজ্য, জলদস্যুদের হানা, পথেঘাটে বাটপারের ভয়, নৌকার খুঁটি, কাছি, কেড়ুয়াল-আদির উল্লেখ থেকে এ কথাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় যে সুজলা বঙ্গভূমিতেই এদের সৃষ্টি এবং চর্যাপদে বর্ণিত সমাজব্যবস্থায় সমকালীন গৌড়বঙ্গের সমাজ-জীবনেরই ছায়াপাত ঘটেছে।

[ছয়] তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালের সামাজিক অবস্থা :

প্রশ্ন ৪। তুর্কী-আক্রমণের পরবর্তীকালে গৌড়বঙ্গের সামাজিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা কর।

অথবা,

প্রশ্ন ৫। বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম 'ক্রান্তিকাল' বা 'যুগান্তর কাল' বলতে কোন্ কালটিকে কেন নির্দেশ করা হয় তার কারণ উল্লেখ সহ ঐ কালের পরিচয় দাও।

অথবা,

প্রশ্ন ৬। তুর্কী-আক্রমণ কাল 'বাঙালীর মানস প্রস্তুতির কাল' বলে কেউ কেউ অভিহিত করে থাকেন। এ-বিষয়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তোমার অভিমত জ্ঞাপন কর।

খ্রীঃ ১২০০ অব্দের সন্নিহিত কোন তারিখে ইখতিয়ারউদ্দিন বিন্ বক্তিয়ার খিলজি মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গবিজয় করেছিলেন—এই গল্পকথায় আস্থা স্থাপন না ক'রেও বিশ্বাস করা চলে যে এই তুর্কী-আক্রমণ গৌড়বঙ্গে একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর আগেও ভারতের বুকে বহু বিদেশী বিধর্মী শক্তি প্রবলভাবে আঘাত হেনেছে, ভারতে বহু রাজশক্তির উত্থান-পত্তন ঘটেছে, কিন্তু সাধারণ বাঙালীর জীবনে এর কোন প্রতিফলন ঘটেনি। কিন্তু তুর্কী-আক্রমণ বাঙালীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল—প্রত্যাঘাতের কথা কল্পনাই করতে পারেনি, এমনকি এরূপ কোন মানসিক প্রস্তুতিও তার ছিল না। আক্রমণের আকস্মিকতা ছাড়াও বাঙালীর এই বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ—বাঙালীর সংহতি-শক্তির অভাব।

গুপ্তযুগে গৌড়বঙ্গে আর্য-অভিবাসন প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করলেও তার পাশাপাশি প্রাগ্‌-আর্য জনগোষ্ঠীও সমান্তরাল ধারায় এই দেশে বসবাস করছিল। পাশাপাশি অবস্থিত এই দুটি জাতিগোষ্ঠীর রেষারেষীর ভাব প্রবল থাকায় তারা কখনো ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তিতে পরিণত হ'তে পারেনি। বরং বহু শাস্ত্রীয় বাধা-নিষেধ আর্যসমাজকে অনার্যদের থেকে পৃথক্ থাকতেই উৎসাহিত করেছিল। ফলতঃ দেশের সঙ্ঘশক্তির অভাবই বিদেশীয় তুর্কী আক্রমণকে অপ্রতিহত রাখতে সহায়ক হয়েছিল।

তুর্কী আক্রমণের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বাঙালী সমাজে। স্বভাবতঃই

প্রথম আকস্মিক আঘাত তাদের বিমূঢ় ক'রে দেওয়াতে অনেকেই আত্মরক্ষার তাগিদে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করলেন। অনেকেই একই প্রয়োজনে স্বদেশ ত্যাগ ক'রে পূর্ববঙ্গ, নেপাল বা সন্নিহিত অপর কোন হিন্দুরাজ্যে চলে গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে এই আক্রমণের পরও শতাব্দীকাল পূর্ববঙ্গে সেন বংশের রাজত্ব ছিল অব্যাহত। প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু এবং বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিল। আবার বৃহত্তর বাঙালী সমাজ হয়তোবা সঙ্ঘশক্তির উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়ে সমান্তরাল অনার্য ধারার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে অনার্যরাও পঞ্চমবর্ণের হিন্দু বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন। 'বাহিরের এই প্রবল আঘাত তাহাদের নিকট শাপে বর হইয়া দেখা দিল। দীর্ঘকাল প্রতিবেশিত্বের ফলে তাহাদের মিলন না ঘটিলেও একটা সমান অনুভূতির ভাব নিশ্চয়ই গড়িয়া উঠিয়াছিল, এইবার উভয়ের সম্মুখে একই শত্রু—বিদেশী বিধর্মী অপরিচিত একটা জাতি—অতএব আর্য-অনার্য জাতির মিলন ত্বরান্বিত হইয়া উঠিল। কালের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো কখনো এই মিলন ঘটিত, কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে তাহাদের অকালেই মোহমুক্তি ঘটিল—আর্য অনার্য জাতির সংমিশ্রণে বিরাট হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ঘটিল। তুর্কী আক্রমণ বাঙালীর জাড্য নাশ করিয়াছিল, তাহার সুপ্তি ভাঙাইয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিল, বাঙালাদেশে তুর্কী-আক্রমণের এই পরোক্ষ সুফলটিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।' ('বাঙলা সাহিত্যের পরিচয়' : পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

আর্য-অনার্য-সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফল দেখা দিল সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। অনার্যরা আর্য সমাজে গৃহীত হবার ফলে অসাধু দেব-দেবী, ধর্মীয় ভাবনা-কামনা এবং আচার-আচরণও কতকাংশে হিন্দু সমাজে অনুপ্রবেশ লাভ করেছিল। তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড অভিঘাতে সমাজে যখন মহতী বিনষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তখন আর্যরাও দৈবশক্তির অনুগ্রহ-কামনায় নবাগত অনার্য দেব-দেবীদেরও মেনে নিয়েছিলেন। নবাগত দেবতাগণ প্রথমতঃ সমাজের নিম্নস্তরে আশ্রয় পেলেও শীঘ্রই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও দেবতাদের জাতে তুলতে সচেষ্ট হ'লেন। এই সদ্য-উন্নীত দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করা হ'লো—এটি 'মঙ্গলকাব্য'। এগুলি সম্ভবতঃ প্রথমদিকে ক্ষুদ্র পাঁচালী আকারে রচিত হ'য়েছিল। পরবর্তীকালে গোটা সাহিত্যের ইতিহাসে এই শাখাটি বিশিষ্টতা অর্জন করে।

বক্তিয়ার খিলজি অতি সহজেই নদিয়া (নবদ্বীপ) জয় ক'রে সম্ভবতঃ চতুষ্পার্শ্বে তাঁর অধিকার বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু ১২০৬ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর কাল গোটা দেশের উপর দিয়ে যে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাঘাত প্রবাহিত হ'য়েছিল, তার ফলে এই যুগটাকে বলা হয় 'ক্রান্তিকাল'—অনেকেই এটিকে 'তামসযুগ' (Dark Age) বলেও অভিহিত করেছেন। তবে আমাদের মনে হয়, এই যুগটিকে 'ক্রান্তিকাল' বলাই সঙ্গত কারণ এই যুগে যেমন ভাঙার সমারোহ চলছিলো, তেমনি এই দুর্যোগের মধ্যেই যে বাঙালীর মনে গড়ার উদ্দীপনাও দেখা দিয়েছিল, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।

আঘাতে আঘাতে বাঙালী তখন বাঁচবার শক্তি অর্জন করেছে ; বাইরের আঘাত যত প্রবল হয়েছে, বাঙালীর বাঁচবার চেষ্টা হয়েছে তখন প্রবলতর। অনেক দুঃখ বেদনা সহ্য ক'রে, অনেক আঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা ক'রে বাঙালী অন্তর্মুখিতার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জগতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সামর্থ্য অর্জন করতো তাই এই যুগটাকে বলা চলে বাঙালীর মানস প্রস্তুতির কাল।

বক্তিয়ার খিলজির মৃত্যুর পর তার আমীর ওমরাহ্‌গণ ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে একমাত্র গিয়াসুদ্দিন খিলজিই তাঁর শাসনকালে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এরপর ১২২৭ খ্রীঃ-১৩৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানরাই দিল্লী থেকে বাঙলার শাসন চালিয়েছেন। কিন্তু যারা শাসক নিযুক্ত হয়ে এদেশে এসেছেন, তাঁরা যেমন কেউ স্বস্তিতে ছিলেন না, তেমনি দেশেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন নি। ১৩৪২ খ্রীঃ সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌ই দীর্ঘকাল পর বাঙলায় সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক করেন। বস্তুতঃ তাঁর শাসন আরম্ভ হ'বার পরই ক্রান্তিকালের সমাপ্তি ঘটে বলে মনে করা চলে। এর পরই সম্ভবতঃ বাঙলা সাহিত্যে নবসৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। পূর্ববর্তী দেড়শত বৎসরের মানসপ্রস্তুতি এবার সুফল প্রদান করতে আরম্ভ করে। দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কিন্তু আরও বিলম্বিত ছিল। ১৪১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইলিয়াস বংশীয়দের হাতেই রাজদণ্ড ছিল। এরপর হিন্দুরাজা গণেশ বাঙলার সিংহাসন অধিকার ক'রে ১৪৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত সেই অধিকার বজায় রাখেন। এরপর আবার ১৪৪২ খ্রীঃ—১৪৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন বর্তমান ছিল। ১৪৮৭ খ্রীঃ থেকে ১৪৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ছয় বৎসর কাল কয়েকজন হাবসী খোজা জোর করে সিংহাসন অধিকার ক'রে রাখলে ১৪৯৩ খ্রীঃ সুলতান হোসেন শাহ্‌ বাঙলার শাসনরজ্জু হস্তগত করেন। এই সঙ্গেই দেশে স্থায়ী সুশাসন আরম্ভ হয়।

ইলিয়াস শাহী শাসন প্রবর্তিত হইবার পরই সাধারণভাবে বাঙলার উপর থেকে দুর্যোগের মেঘ অপসারিত হওয়ায় ক্রান্তিকালের সমাপ্তি ঘটে। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বিদেশী এবং বিধর্মী হ'লেও সম্ভবতঃ বাঙলাকেই তাঁদের মাতৃরূপে গ্রহণ করে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সংবর্ধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের কোন কোন বাঙালী কবি সশ্রদ্ধভাবেই তাঁদের নাম উল্লেখ ক'রে গেছেন। ব্রাহ্মণ্য শাসনাধীন আর্যসমাজ দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা নিষিদ্ধ করলেও এই মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় যে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা প্রমাণিত সত্য। তাই এই তুর্কী আক্রমণ যে পরোক্ষভাবে বাঙলা সাহিত্যের উন্নয়নে যথার্থ সহায়তা দান করেছিল এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

[সাত] **মধ্যযুগের পরিচয় :**

প্রশ্ন ৭। বাঙ্‌লা সাহিত্যের 'মধ্যযুগ' বলতে কোন্ কালটিকে নির্দেশ করা হয়? মধ্যযুগের কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ-সহ ঐ কালের প্রধান সাহিত্যধারাগুলির পরিচয় দাও।

খ্রীঃ চতুর্দশ শতকের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীর সুলতানদের হাত থেকে বাঙলাকে উদ্ধার করে তার শাসন শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাম্‌সুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ্। বস্তুতঃ এই সঙ্গেই দেড় শতাব্দী-ব্যাপী অপশাসনের অবসান ঘটায় বাঙলার বুকে আবার শান্তি-স্বস্তি ফিরে এলো এবং বলা চলে যে বাঙলার ইতিহাসে ক্রান্তিকালেরও অবসান সূচিত হ'লো। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই শুরু হ'লো মধ্যযুগের।

আমরা অনেকটা য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাঙলা সাহিত্যের তিনটি যুগের কথা কল্পনা করেছি, কিন্তু বাস্তবে যুগ মাত্র দুটি—একটি প্রাচীন যুগ, অপরটি আধুনিক যুগ। বাঙলা সাহিত্যে যে মধ্যযুগের কথা বলা হয়, তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটা আছে সেটা শুধুই কালগত। কালধর্মে বাঙলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তাও গুণগত নয়, বড় জোর বলতে পারি রূপগত। বস্তুতঃ একটু শিথিল ভাবে আমরা প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগের সাহিত্যকে একযোগে প্রাচীন সাহিত্য বলেই অভিহিত ক'রে থাকি। প্রাচীন যুগের সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যের ভাষাগত এবং রূপগত পার্থক্য ছাড়া ভাবগত কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য কর' যায় না। পক্ষান্তরে এতদুভয়ের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের পার্থক্য আকাশচুম্বী। আধুনিক যুগের সাহিত্যকে যদি বলি ব্যক্তিসাহিত্য, তবে প্রাচীন সাহিত্যকে এক কথায় বলতে পারি নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য।

ভারতীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাঙলা সাহিত্য নবজাত সাহিত্য—এর বয়স এখনো হাজার পার হয়নি। বাঙলা সাহিত্যের জন্মের পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছর ধরে সাহিত্যের যে ধারাটি ছিল ক্রমবিকাশিত, তা রচিত হ'য়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিক ঐশ্বর্য ছিল অতুলনীয়। পক্ষান্তরে প্রাকৃতের যে ধারাটি অবলম্বন ক'রে মাগধী প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ এবং মাগধী অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লা ভাষার সৃষ্টি, সাহিত্য-সম্পদের দিক থেকে সেই ধারাটিকে একেবারে নিঃস্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য ছিল রাজসভার সাহিত্য, বাঙলা সাহিত্য সেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে একেবারেই পল্লীসাহিত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে

যখন সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার ক'রে শিল্পবিলাসকেই যখন তার একমাত্র উপজীব্য বলে গ্রহণ করেছে, বস্তুতঃ তখনই ঘটে বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভব। ফলে সন্ত-প্রসূত বাঙলা সাহিত্যের দৃষ্টি হ'য়ে উঠলো সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং ভাবালু। অবশ্য সমকালীন বাঙালীর জাতীয় জীবনই এর জন্য দায়ী।

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ মিশিয়ে যে প্রাচীন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তাতে তিনটি রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়—সভাসাহিত্য, গোষ্ঠীসাহিত্য এবং জনসাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যের অপর ধারা—ব্যক্তিসাহিত্য শুধু আধুনিক যুগেই আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, অপর তিনটি ধারা একালে অনুপস্থিত। প্রাচীন সাহিত্যিকে কোনক্রমেই স্বাধীন রচনা বলা চলে না, অপরের প্রয়োজনে বা নির্দেশেই এ জাতীয় সাহিত্য রচিত হ'য়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যগুলিকে নিম্নে শ্রেণীবিভাগ ক'রে দেখানো হ'লো।

১. সভাসাহিত্য : প্রধানতঃ ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নির্দেশেই যে এ জাতীয় সাহিত্য রচিত হ'য়েছিল, তার বহু সমর্থন পাওয়া যায় কবিদের উক্তি থেকেও। সভাসাহিত্যে পৌরাণিক দেবতা বা ভাবধারাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বিভিন্ন অনুবাদ এবং ভারতচন্দ্র-রচিত 'অন্নদামঙ্গল'। সভাসাহিত্য রচনার পাশ্চাতে রাজসভায় মনোরঞ্জনের ভাবটি পরিস্ফুট থাকায় এ জাতীয় সাহিত্য স্বভাবতই উদাত্ত গম্ভীর মহাকাব্য জাতীয় রচনা। ভাষা, ভঙ্গী, উপস্থাপনা ও অলঙ্কারাদির বিচারে সভাসাহিত্যগুলিকে সাধারণভাবে আমরা বাঙলার 'ক্ল্যাসিক সাহিত্য' বা 'ধ্রুপদী সাহিত্য' বলে অভিহিত করতে পারি।

২. গোষ্ঠীসাহিত্য : কোন- না কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর আনুকূল্য, প্রবর্তনা কিংবা প্রচার কামনাতেই গোষ্ঠী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। এক এক প্রকার ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এ জাতীয় সাহিত্য রচনা করলেও কখন কখন এগুলি গোষ্ঠীচেতনা থেকে মুক্ত হ'য়ে সার্বজনীন রস-স্বীকৃতিও লাভ করেছে। গোষ্ঠীসাহিত্য দ্বিবিধ : সাধন সঙ্গীত ও প্রচার সাহিত্য। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত এবং বাউল সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব যে সাধন সঙ্গীত রচনা ক'রে গেছেন, সেগুলিকে যথাক্রমে ধর্মগীতি, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী ও বাউলগান নামে অভিহিত করা হয়। 'গোষ্ঠীসাহিত্যের সাধন সঙ্গীতগুলিই প্রাচীন বঙ্গের গীতিকবিতা ; ভাষায়, কল্পনায় ও ভাবে এইগুলির অধিকাংশ রোমান্টিক এবং কিছু মিস্টিক। এগুলির অধিকাংশই কালজয়ী কবিতা ; আধুনিক যুগেও ইহাদের জনপ্রিয়তা অল্প নহে' (ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য)। গোষ্ঠিসাহিত্যের দ্বিতীয় ধারাটি প্রচারসাহিত্য। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের জীবনীগ্রন্থ এবং বৈষ্ণবতত্ত্বসাহিত্য এর অন্তর্ভুক্ত। মননশীলতা এবং ঐতিহাসিকতার দিক থেকে এদের উপযোগিতা ও মূল্য স্বীকার করতে হয়।

৩. জনসাহিত্য : জনসাহিত্যকে বলা হয় গোষ্ঠীসাহিত্যের বিপরীতধর্মী। একটা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের নিজেদের জন্যই গোষ্ঠীসাহিত্য রচনা ক'রে থাকে, যদিও তার

কিছু কিছু সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভে ধন্য হ'য়েছে, আবার কিছু কিছু এমন সাঙ্কেতিকধর্মী যে সম্প্রদায়ের বাইরে অপর সকলের নিকট তা' দুর্বোধ্য বিবেচিত হ'য়ে থাকে। পক্ষান্তরে জনসাহিত্য জনতার সাহিত্য তথা বারোয়ারি সাহিত্য—সংসারাসক্ত জনগণই এই সাহিত্যের রচয়িতা। এই জাতীয় সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন বিভিন্ন কালে রচিত এবং বহুধা শাখায় বিভক্ত 'মঙ্গলকাব্য'। মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান শাখা চারটি—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন বা শিবমঙ্গল। এই কাব্যগুলির অধিদেবতা যাঁরা, তাঁরা শক্তির দাপটে ভয় দেখিয়ে পূজা আদায় করতে চান। অতএব এই দেবতাদের পূজার মূলে রয়েছে—ভক্তি নয় ভয়; অতএব ভক্তরাও সেখানে মুক্তিকামী নন, ঐহিক সুখ-সুবিধাই ছিল তাদের কাম্য। মঙ্গলকাব্যগুলি সম্ভবতঃ ক্রান্তিকালে সংক্ষিপ্ত পাঁচালি আকারে রচিত হ'য়েছিল, পরে শক্তিশালী কবির হাতে প'ড়ে মঙ্গলকাব্যের রূপ ধারণ করে।

জনসাহিত্য আসলে লৌকিক সাহিত্য। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এতে গীতিকবিতার কোন স্থান নেই, আখ্যায়িকা কাব্যই এদের অবলম্বন। মঙ্গলকাব্যের বাইরে আরো কিছু জনসাহিত্য রচিত হ'য়েছিল, এদের মধ্যে একটি ধামালি-জাতীয় রচনা 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'। পল্লীর অর্ধশিক্ষিত কবিদের রচিত 'পল্লীগীতিকা'গুলিও (ময়মনসিংহ গীতিকা) লৌকিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এদের মধ্যেও কাহিনীই প্রধান—এতে যেমন রূপকথাও আছে, তেমনি সমসাময়িক ঘটনারও বর্ণনা আছে। এ ছাড়া রোসাঙ্ রাজ-সভায় মুসলমান কবিগণ ভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ ক'রে যে সকল কাহিনী রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে যার সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি লাভ করে, সেই 'কিস্‌সা সাহিত্য'ও জন-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যে কিছুটা গুণগত এবং অনেকটা পরিমাণগত পরিবর্তন সাধন করে। এই বিবেচনায় ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যকে দু'টি পর্বে বিভক্ত করে থাকেন। অবশ্য বাঙলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও প্রাগুক্ত পরিবর্তন-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ১৪৮৬ খ্রীঃ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং ১৪৯৩ খ্রীঃ সুলতান হোসেন শাহের বাঙলার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ—এই দুটি বিষয়ই বাঙলার সমাজ-জীবনে আশার আলো নিক্ষেপ করেছিল। তাই ঐতিহাসিকগণ শামসুদ্দিনের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ থেকে হোসেন শাহের শাসনকাল পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত কালকে 'আদিমধ্যযুগ' বা চৈতন্য-পূর্বযুগ' নামে অভিহিত করে থাকেন। পরবর্তী পর্বে চৈতন্য-প্রভাব ছিল প্রায় সর্বাতিশায়ী। তাই ১৫০০ খ্রীঃ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত কালসীমাকে 'অন্ত্যমধ্যযুগ' বা, 'চৈতন্যোত্তর যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

আদিমধ্যযুগে সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত সীমিত, তাই এই পর্বে রচিত সাহিত্যগ্রন্থের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তাছাড়া এই যুগের সাহিত্যেও তেমন বৈচিত্র্যও দেখা যায় না। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রথম শতকে অর্থাৎ ষোড়শ শতকে বাঙলা-

সাহিত্যে যেন প্লাবন দেখা দিয়েছিল। তারপরই দেখা দেয় ভাটা। শেষ পর্যন্ত অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যুগের সমাপ্তি ঘটে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে—বাঙলার রাজনৈতিক আকাশেও তখন পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত সিরাজের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয়। এর পর সুদীর্ঘ শতাব্দীকাল কোম্পানী শাসনের ঘনঘোর মেঘজালে বাঙলার সামাজিক আকাশ সমাচ্ছন্ন—সূর্য-চন্দ্র-তারা সবই অদৃশ্য; কিন্তু তারই আড়ালে চল্‌ছিল পরবর্তী পর্বের প্রস্তুতি। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহি বিদ্রোহের পর বাঙলার শাসনভার কোম্পানী থেকে হস্তান্তরিত হ'লো। সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা ছিল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে বাংলা তথা প্রায় গোটা ভারতেরই শাসনভার ন্যস্ত হ'লো সেই পার্লামেণ্টের হাতে। ১৭৫৮ খ্রীঃ সেই অন্তর্বর্তী কালের শেষ চিহ্ন কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার সঙ্গে পরিচিত কবি রঙ্গলালের সাহিত্যজগতে আবির্ভাব। ১৮৬১ খ্রীঃ আধুনিক মন্ত্রের উদ্‌গাতা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ম—বাঙলা সাহিত্যের আকাশে নবসূর্যের আবির্ভাবক্ষণ।

১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যাপ্ত আদিমধ্যযুগ তথা চৈতন্যপূর্ব যুগে রচিত সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। নবজাগরণের মুহূর্তে প্রাচীন আদর্শের দিকে তাকানোর একটা প্রবণতা সব দেশে সব কালেই দেখা যায়। বাঙলা সাহিত্যেও তাই রামায়ণ-ভাগবত এবং সম্ভবতঃ মহাভারতের অনুবাদ রচনা প্রচেষ্টা এ সময় দেখা দিয়েছিল। কৃত্তিবাস 'রামায়ণ', মালাধর বসু 'ভাগবৎ' এবং হয়তো কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী 'মহাভারত' অনুবাদ করেন। এই পর্বে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন সম্ভবতঃ তিনজন কবি—বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব এবং বিপ্রদাস পিপ্‌লাই। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'বিদ্যাপতি'—যিনি বাঙালী না হ'লেও বাঙলা সাহিত্যে এর অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য। পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'ও একালেই বর্তমান ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন।

১৫০০ খ্রীঃ থেকে ১৭০০ খ্রীঃ পর্যন্তই যথার্থ বিচারে অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর-যুগ রূপে অভিহিত হয়। এ যুগ বিষয় বৈচিত্র্যে এবং অজস্রতায় অনন্যসাধারণ হ'য়ে উঠেছিল। বিষয় অনুযায়ী এ যুগের শ্রেণীবিভাগই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হ'বে। কারণ কবিদের জীবৎ-কাল-বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ রয়েছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের মহত্তম কীর্তি চৈতন্য-জীবন-কাহিনী-অবলম্বনে রচিত চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থগুলি; এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ষোড়শ শতকে রচিত বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' এবং গোবিন্দদাসের 'কড়চা' (?)। চৈতন্য-পরিকর অদ্বৈতাচার্য এবং তৎপত্নী সীতাদেবীর জীবনকাহিনী-অবলম্বনে রচিত শ্যামদাস আচার্যের 'অদ্বৈতমঙ্গল', হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', ঈশান নাগরের

'অদ্বৈত-প্রকাশ', বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব' এবং লোকনাথদাসের 'সীতা-চরিত্র'।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যেও প্লাবন দেখা দিয়েছিল। এ পর্বের কবিদের মধ্যে ছিলেন,—ষোড়শ শতকের যশোরাজ খান, মুরারিগুপ্ত, নরহরিদাস সরকার, লোচনদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বংশীবদন, অনন্ত দাস, দেবকীনন্দন, শিবানন্দ সেন, নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, যদুনন্দন, রায়শেখর, কবিরঞ্জন এবং আরো অনেকে। সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে প্রধান—যদুনন্দন দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সৈয়দ মর্তুজা, তরুণীরমণ, চণ্ডীদাস এবং আরো অনেকে। অষ্টাদশ শতকের কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ঘনশ্যাম দাস, শশিশেখর, পীতাম্বর দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি।

বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটায় বাঙলায় বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর বৈষ্ণব-তত্ত্বসাহিত্যও রচিত হ'য়েছিল। কবিতাকারে রচিত হ'লেও এগুলি আসলে প্রবন্ধজাতীয় বস্তুনিষ্ঠ রচনা। প্রায় প্রত্যেক কবিদেরই নাম উল্লেখ করা হ'লো। ষোড়শ শতকে—লোচনদাস, জ্ঞানদাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, শঙ্করদেব, মাধবদেব, কবিবল্লভ, শ্যামানন্দ দাস, নরোত্তম দাস। সপ্তদশ শতকে—দেবনাথ দাস, বলরাম দাস, হৃদয়ানন্দ দাস, রসিক দাস, অভিরাম দাস প্রভৃতি। এ জাতীয় গ্রন্থে কিছু কিছু অনুবাদও রয়েছে।

অন্ত্যমধ্যযুগের অনুবাদ শাখায় রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতই প্রধান। ষোড়শ শতকে রামায়ণের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ নেই, তবে মহাভারতের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করেছেন—রামচন্দ্র খান, পীতাম্বর, দ্বিজ রঘুনাথ, অনিরুদ্ধরাম সরস্বতী ও তৎপুত্র গোপীনাথ। ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ-অবলম্বনে কৃষ্ণকাহিনী রচনা করেছেন—গোবিন্দ, মাধব আচার্য, পরমানন্দ, রঘুপণ্ডিত, কবিশেখর, দুঃখী শ্যামদাস, পীতাম্বর। সপ্তদশ শতকে রামায়ণ-অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অদ্ভুতাচার্য নিত্যানন্দকৃত 'অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ', রামশঙ্করের 'অদ্ভুত রামায়ণ' রামশঙ্কর দত্তের 'রামায়ণ', ভবানীনাথের 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং বাঙলার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ-পাঁচালি'।

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'ও এযুগের কীর্তি। মহাভারতের অপর বিশিষ্ট অনুবাদক নিত্যানন্দ ঘোষ। এ ছাড়া এ শতকের অনেকেই মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব অনুবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছে—দ্বিজ অভিরাম, রামেশ্বর নন্দী, রাম কবিরাজ, গোবিন্দ কবিশেখর এবং আরো অনেকে।

কৃষ্ণ কাহিনী-কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে—ভবানন্দের 'হরিবংশ', পরশুরাম, বংশীদাস ও জীবন চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণমঙ্গল', কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস, অভিরাম দাসের 'গোবিন্দবিজয়' প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতকে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রাচুর্য লক্ষণীয় হ'লেও উল্লেখযোগ্য শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন এমন লেখকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই পর্বের একজন ভূরিস্রষ্টা লেখক শঙ্কর কবিচন্দ্র। ইনি 'সংক্ষিপ্ত ভারত পাঁচালী', 'রামায়ণ পাঁচালি' এবং 'কৃষ্ণমঙ্গল'-

ছাড়াও একাধিক মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। অপর অনুবাদকগণ সকলেই রামায়ণ-মহাভারতাদির খণ্ডাংশ মাত্র অনুবাদ করেছেন।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি অতিশয় প্রধান শাখা—মঙ্গলকাব্য। বহুধারায় বিভক্ত এই মঙ্গলকাব্য ও তার গ্রন্থকারদের পরিচয় দান সহজ ব্যাপার নয়; তাই শুধু প্রধান কয়টি নাম উল্লেখ করা হ'লো।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের তিন শ্রেষ্ঠ লেখকই চৈতন্ত-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। ষোড়শ শতকে তন্ত্রবিভূতির 'মনসামঙ্গল', এবং সপ্তদশ শতকে দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'ই শুধু উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের মনসামঙ্গল-কাব্যে বিশেষ কৃতিত্বের পবিচয় দিয়েছেন—জগৎজীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, গঙ্গাদাস সেন, যষ্ঠীবর প্রভৃতি।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' ষোড়শ শতকে রচিত হ'য়েছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-রচনায় পববর্তীকালে আর কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। উল্লেখ করার মত নাম—সপ্তদশ শতকে—জনার্দন ও রামদেব এবং অষ্টাদশ শতকে মুক্তারাম সেন, ভবানীদাস, বলরাম কবিকঙ্কণ।

মঙ্গলকাব্যের অপর প্রধান শাখা 'ধর্মমঙ্গলে'র উদ্ভব ঘটে সপ্তদশ শতকে। এই পর্বে রয়েছেন—খেলারাম, শ্যামদাস, ধর্মদাস, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, এবং অষ্টাদশ শতকে—ঘনরাম চক্রবর্তী, শঙ্কর কবিচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি।

শিবায়নের কবিদেব মধ্যে সপ্তদশ শতকের দ্বিজ রতিদেব, রামকৃষ্ণ রায় এবং আষ্টদশ শতকের রামেশ্বর চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য।

এ সকল ধারার বাইরে সপ্তদশ শতকেব উল্লেখযোগ্য রচনা—দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী. আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'সতী ময়না', 'সপ্তপয়কর' প্রভৃতি এবং অষ্টাদশ শতকের রচনা—বামপ্রসাদ সেনের 'শাক্ত পদাবলী' ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর', 'অন্নদামঙ্গল' এবং বাঙলা গদ্যগ্রন্থ—দোম আন্তোনিও-রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'ও মনোএল-দা-আসাম্পসাঁও-রচিত 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ'।

'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও অন্যান্য পল্লীগীতিকা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত হ'য়ে থাকতে পারে।

[আট] বড়ু চণ্ডীদাস ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন':

প্রশ্ন ৮। বাঙলা ভাষায় রচিত কোন্ গ্রন্থে আদিমধ্যযুগেব লক্ষণ প্রায় অবিকৃতভাবে উপস্থিত? গ্রন্থটির বিষয় এবং গ্রন্থকর্তার পরিচয় উল্লেখ কর।

অথবা

প্রশ্ন ৯। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের আবিষ্কার-প্রসঙ্গের উল্লেখ সহ গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দাও এবং এর দোষ-গুণ বিচার কর।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ কোন এক গ্রামের এক গোশালা থেকে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একখানি পুথি উদ্ধার করেন, যার আদি ও অন্ত্য ছিল খণ্ডিত, মাঝেও কিছু পাতা কীটদষ্ট বা খণ্ডিত ছিল। তিনি 'সম্পাদনপূর্বক ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। গ্রন্থের ভনিতায় 'অনন্ত-বড়ু চণ্ডীদাসে'র উল্লেখ রয়েছে, অতএব তিনিই যে গ্রন্থকর্তা এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কিন্তু 'গ্রন্থনাম' এবং রচনাকাল-বিষয় গ্রন্থে কোন উল্লেখ না থাকায় এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে নানা সংশয়ের উদয় হ'য়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে চণ্ডীদাসের পরিচয় নিয়ে বিরাট সমস্যা। চণ্ডীদাস-সমস্যার কারণ—পরিচিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রায় সদা-প্রচলিত 'দীন' বা 'দ্বিজ' বলে যে পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তার কোনটিই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নি। এইবার এক এক ক'রে সমস্যাগুলি বিচার করা যাক্।

গ্রন্থনাম: প্রথমেই গ্রন্থনাম। সম্পাদক বসন্তবাবু স্বীকার ক'রেছেন যে গ্রন্থনামটি তাঁরই প্রস্তাবিত। স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, তিনি ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন যে চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন' নামে একখানি কাব্য-রচনা করেছিলেন। সম্পাদক অনুমান করেন যে আলোচ্য গ্রন্থখানিই চণ্ডীদাসের সেই 'কৃষ্ণকীর্তন'। কিন্তু এই জনশ্রুতি বিষয়ে অপর কেউ জ্ঞাত নন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থমধ্যে একখানি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি পাওয়া যায়। কোন এক ব্যক্তি 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে'র কয়েকটি পত্র ধার নিয়েছিলেন বলে চিরকুটে উল্লেখ থাকায় অনেকেই অনুমান করেন যে এই গ্রন্থটির নামই ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। আবার অনেকেই গ্রন্থটিকে 'কীর্তন' বলে স্বীকার করেন না, কারো মতে এটি 'সন্দর্ভ'-জাতীয় রচনা। অতএব গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' না হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' হওয়াই সঙ্গত ছিল। যাহোক্, এ সমস্ত আপত্তি উপেক্ষিত হ'য়ে সম্পাদক-প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামই গ্রন্থটি শিরোধার্য ক'রে নিয়েছে।

রচনাকাল: এবার গ্রন্থের রচনাকাল। গ্রন্থে রচনাকাল নিয়ে কোন পুষ্পিকা না থাকায় বহিঃপ্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে গ্রন্থটির রচনাকাল নির্ণয় করতে হ'বে। গ্রন্থকর্তা চণ্ডীদাসের পরিচয় নিয়েই বিস্তর গোলযোগ। এই নামে কয়জন কবি ছিলেন, এ-বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়। একটিমাত্র সূত্র—চৈতন্য-জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন যে চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদের রস আস্বাদন করতেন। অতএব চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে যে অন্ততঃ চণ্ডীদাস নামে একজন কবি বর্তমান ছিলেন, এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এখন প্রশ্ন—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা চণ্ডীদাসই কি এই চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস? এর সমর্থনেও অপর একটি সূত্র পাওয়া যায়। সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষিণী' গ্রন্থের টীকায় 'চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি' বলে উল্লেখ করা হ'য়েছে। আলোচ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে 'দানখণ্ড' এবং 'নৌকাখণ্ড' রয়েছে, অথচ প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 'দানখণ্ড' কিংবা 'নৌকাখণ্ড' নেই। অতএব প্রকারান্তরে স্বীকার করতেই হয় যে, এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রসঙ্গই 'বৈষ্ণবতোষিণী'তে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

অতএব গ্রন্থটি যে চৈতন্য-পূর্ব-কালে রচিত, এটি তার দ্বিতীয় প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে ঐশ্বর্যভাব এবং গ্রাম্যতা প্রকাশিত হ'য়েছে, তা' গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুমোদিত নয় বলেই এটি যে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের পূর্বেই লৌকিক কাহিনীরূপে রচিত হয়েছিল, এই পরোক্ষ প্রমাণটি স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এরপর আসা যাক্ পুথির কথায়। পুঁথিটি তুলট কাগজে লেখা। এতে তিনজনের হাতের লেখা রয়েছে। লিপি-বিশেষজ্ঞ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন যে পুঁথিটি চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে এবং ১৩৮০ খ্রীঃর পূর্বেই রচিত হ'য়েছিল। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন যে ১৪৫০ খ্রীঃ—১৫০০ খ্রীঃর মধ্যে গ্রন্থটি লিখিত হ'য়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে পুঁথিটি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কালে লিখিত হ'য়েছিল, তবে গ্রন্থটির সঙ্কলন-কাল তাঁর মতে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ; কিন্তু গ্রন্থটির রচনাকাল এটি নয়। অতএব পুঁথিটির লিপিকাল নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কিন্তু পুঁথিটি যে গ্রন্থকর্তারই হাতের লেখা, এমন কথা বলা যায় না। গ্রন্থের লিপিকাল থেকে আমরা লিপিকারের জীবৎকাল জানতে পারি, গ্রন্থকারের নয়। তবে পুঁথির লিপির প্রাচীনত্ব সকলেই স্বীকার করেন। অতএব পূর্ববর্তী প্রমাণগুলির সহায়তায় অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে মূল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি চৈতন্য পূর্ববর্তী-কালে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের কোন সময় রচিত হ'য়ে থাকবে।

গ্রন্থ-বিষয়বস্তু : বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাঙলা সাহিত্যে প্রথম কাহিনী-কাব্য। দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস-রচিত বিভিন্ন পদাবলীতে গোষ্ঠ, মান, মাথুর-আদি বিভিন্ন বিষয়াত্মক বহু বিচ্ছিন্ন পদ রয়েছে; কিন্তু আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যে ধারাবাহিকভাবে একটি কাহিনী রচিত হ'য়েছে। জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং বিরহখণ্ডে বিভক্ত কাহিনীটি স্বরূপেও পদাবলী সাহিত্য থেকে পৃথক্।

কংসের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য নারায়ণ কৃষ্ণ-বলরাম রূপে মর্ত্য-ভূমিতে অবতীর্ণ হ'লেন—পিতা বসুদেব, কৃষ্ণের মাতা দেবকী, বলরামের মাতা রোহিণী। দেবী লক্ষ্মীও রাধারূপে সাগরের ঘরে মাতা পদুমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আইহনের সঙ্গে রাধা বিবাহিতা হন। গোয়ালা ঘরের বৌ রাধা—কেনা-বেচার জন্য তাকে বাইরে বেরুতেই হয়, তাই তার চারিত্রিক বিশুদ্ধিতা-রক্ষার জন্য পদুমার পিসি বড়াই বুড়িকে তার রক্ষক নিযুক্ত করা হ'লো। একদিন রাধার সন্ধানে বেরিয়ে বড়াই বুড়ি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করে। বুড়ির মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে দেবার জন্য বড়াইকেই দূতী নিযুক্ত করলেন। অতএব রক্ষকই হ'লো ভক্ষক। বড়াই বুড়ির সহায়তাতে মাঝে মাঝেই রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটতে লাগলো। রাধার সাক্ষাৎ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কখনো সাজেন 'দানী', কখনো নৌকার 'পারানী', আবার কখনো বা ভারী সেজে রাধার দধি-দুধের পশরা মথুরার হাটে নিয়ে যান। রাধাকে রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ কখন কখন তার মাথায় ছাতাও ধরেন। পুষ্প-

কুঞ্জ রচনা ক'রে কৃষ্ণ কখন কখন শ্রীমতী রাধার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করেন ; তিনিই আবার 'কালীয়া দমন' ও 'বস্ত্রহরণাদি' লীলায় মত্ত হন। রাধা কৃষ্ণের ছল-চাতুরীতে ধরা পড়েই কখন কখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার কোন আসক্তি জন্মে নি, কিংবা তাঁর কাণ্ডকারখানায় রাধার সায়ও নেই। বরং রাধা কৃষ্ণের পাঠানো পান ছুঁড়ে ফেলেছেন, অন্যায় প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য বড়াইকে প্রহার করেছেন, কৃষ্ণকে কটু-কাটব্য করেছেন, এমন কি কৃষ্ণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে তিনি কৃষ্ণ-জননী যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন। পরের দিকে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। বাণখণ্ডে রাধিকা উন্মাদিনীর মতো কৃষ্ণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বংশীখণ্ডেই দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রীমতীকে উতলা ক'রে তুলেছে ; কিন্তু কৃষ্ণকে না পেয়ে রাধা তার বাঁশী চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখলেন। পরিণামে অবশ্য তাদের মিলন ঘটলো। এরপর থেকেই রাধা কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা—কিন্তু এ অবস্থাতেই নিদ্রিতা রাধাকে ফেলে রেখে কৃষ্ণ পালিয়ে গেলেন। 'রাধাবিরহ' খণ্ডে রাধা পদাবলীর রাধার মতই বিরহাতুরা—কৃষ্ণ বিনে জগৎ-সংসার তার নিকট মিথ্যা বলে মনে হয়। কৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা রাধা কৃষ্ণের নিকট বড়াইকে পাঠালে কৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন, তিনি আর ফিরবেন না, কংসকে ধ্বংস করবার জন্য তিনি মথুরা যাচ্ছেন। গ্রন্থখানি এখানেই খণ্ডিত।

আলোচনা : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনাকালে বড়ু চণ্ডীদাসের আদর্শ ছিল জয়দেব গোস্বামী-রচিত 'গীতগোবিন্দ'। চণ্ডীদাস সচেতনভাবেই গীতগোবিন্দের আঙ্গিক অনুসরণ ক'রে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা এবং অপর এক (গীতগোবিন্দে এক সখী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াই বুড়ি)—এই তিনজনের কথোপকথনচ্ছলে কাহিনীটি পরিবেশিত হ'য়েছে। দু'টিই নাটগীতি—দুটিতেই রাগ-রাগিণী এবং তালের উল্লেখ রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা গীতগোবিন্দের বিষয়, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিষয়ের অনেকটা ব্যাপ্তি ঘটেছে। চণ্ডীদাস জয়দেবের গ্রন্থ থেকে অনেক শব্দই শুধু গ্রহণ করেন নি, গীতগোবিন্দের বহু পদই তিনি আক্ষরিক অনুবাদ ক'রে স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে উভয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য এই—জয়দেব ছিলেন রাজসভার কবি এবং কাব্যটি তদুপযোগী করেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস ছিলেন গ্রাম্য কবি, তাই তাঁর কাব্যে রাজসভার অলঙ্কৃতি নেই; যা' আছে তা' গ্রাম্যতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্লীলতাও বটে। কৃষ্ণ কাহিনীর আবরণে সমকালীন গ্রাম্য-জীবনই এর বর্ণনীয় বিষয়। দেশে তখন একটা অরাজক অবস্থা চলছিল, তারই পটভূমিকায় অসহায়ের উপর প্রবলের নির্যাতন কাহিনীই এতে পরিবেষিত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডির মর্যাদা দিতে চান।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী-ভিত্তিক এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে অনেকেই পৌরাণিক এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়-অনুমোদিত সাহিত্যরূপে বিবেচনা করেন এবং কবি চণ্ডীদাস এর

বিকৃতি সাধন করেছেন বলে কবির উপর দোষারোপ ক'রে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে অভিযোগটি সত্য বলে মনে হ'লেও এই আপাতদৃষ্টিটি সত্য দৃষ্টি নয়। কারণ, এই কাহিনী মাত্র অংশতঃই পৌরাণিক। এতে কৃষ্ণের জন্ম, কালীয় দমন, বস্ত্রহরণ এবং রাসলীলাই শুধু পুরাণ-সম্মত। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ, যাকে কাহিনীর মুখ্য অংশ বলা চলে, যথা—তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, হারখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ খণ্ডে বর্ণিত বিষয়সমূহ জনমনোরঞ্জনার্থে স্বয়ং কবি দ্বারা কল্পিত অথবা অপর কোন লৌকিক সূত্র থেকে সমাহৃত। রাধা-কৃষ্ণের মিলনে বড়াই বুড়ির ভূমিকাও কবিকল্পিত। অতএব কবির বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। শুধু কাহিনীর দিক্ থেকেই নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ থেকেও কবি যে পুরাণমুখী ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূ-ভার হরণের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা বলা হ'লেও কবি যে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, কৃষ্ণ-চরিত্র বিশ্লেষণে তা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কবির কৃষ্ণভক্তি থাকলে তিনি কখনই তাঁকে এমন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, পরদারলোলুপ, ক্রোধী, মিথ্যাচারী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ-রূপে চিত্রিত করতেন না। তাই যে সমস্ত সমালোচক মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে 'আদিরসাত্মক পুরাণকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্য হিসাবে গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন।'—তাঁদের এই মতবাদকে গ্রহণ করা চলে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে লৌকিক প্রেমকাহিনীর আধারে পরিবেষ্টিত সমসাময়িক যুগের সমাজ জীবনের একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্রায়ণ বলে গ্রহণ করলেই সম্ভবতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হ'বে। কবির সত্যসন্ধানী দৃষ্টির আলো সমাজের বহিরাবরণ ভেদ ক'রে অনাবৃত বীভৎস রূপটিকেই এখানে স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। এই রূপ দেখে আমরা নাসিকা কুঞ্চন করতে পারি, এমন কি আতঙ্কগ্রস্ত হ'তে পারি, কিন্তু সমকালীনতার প্রেক্ষাপটে কবির এই অতি বাস্তবতাবোধকে অস্বীকার করতে পরিনে। রূঢ় বাস্তবের ভিত্তিভূমিতে কি আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ?

অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'আসলে বড়ু চণ্ডীদাস সৌন্দর্যরসিক গীতিকবি নহেন, সত্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। চরিত্র-চিত্রণই তাঁহার মুখ্য কাজ। তিনি সাহিত্যধর্মে আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকদের পূর্বপুরুষ। তাঁহার দৃষ্টি বাস্তবপন্থী ও মিস্টিসিজমের বিরোধী। তিনি নারীচরিত্রের রহস্যবেত্তা ও লম্পট চরিত্রাঙ্কনে সুনিপুণ। তিনি দরদীও বটেন, অসহায় ধর্ষিতা নারীর মর্মভেদী হাহাকার-প্রকাশ ও তদ্দ্বারা পাঠকচিত্তে করুণা-উৎপাদন তাঁহার হৃদয়বেত্তার পরিচায়ক। এই হৃদয়বেত্তার জন্যই গ্রন্থমধ্যে তিনি জনতার দাবি কতকটা অগ্রাহ্য করিয়া কামায়ন-বিরোধী রাধাবিরহ না লিখিয়া পারেন নাই। হৃদয়বত্তার জন্যই তিনি তৎকালিক নারীধর্ষণের চিত্রকে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জনতার কবি হইয়া জনতার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল এবং বারংবার কাহিনীকে লালসার সুরায় সিক্ত করিতে হইয়াছিল—ইহা তাঁহার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন

বলিয়াই তিনি পৌরাণিকতার তুলসীপত্রে কামায়নের কদর্যতাকে কথঞ্চিৎ ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।'

কাহিনীর বিষয়বস্তু ছাড়াও অন্য বিভিন্ন দিক্ থেকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃতিত্ব বিশেষভাবেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়। তিনটি মাত্র চরিত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার মাঝে মাঝেই উৎকৃষ্ট নাটকীয়তা-সৃষ্টিতে সক্ষম হ'য়েছেন। বিশেষতঃ রাধা-চরিত্র সৃষ্টিতে কবির দক্ষতা ও চাতুর্য অনস্বীকার্য। সংসারানভিজ্ঞা, অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকা কীভাবে স্তরে স্তরে বিবর্তিত হ'য়ে প্রৌঢ়পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হ'য়েছেন, তা' যথার্থই উপভোগের বিষয়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'চণ্ডীদাস এই নাম অথবা বড়ু চণ্ডীদাস এই উপাধির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রকাশিত এই নাটগীতি কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন তিনি মহা কবি, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য লক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্য।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেই বস্তুতঃ পরবর্তী কালের বাঙলা কাব্যসাহিত্যের আদল গড়ে উঠেছিল। এই কাব্যে যে পয়ার ও ত্রিপদীর ভিত্তিতে পদ্যচ্ছন্দের ও পংক্তিবিন্যাস গড়ে ওঠে, আধুনিক যুগ পর্যন্তই এই আদর্শটি অক্ষুণ্ণভাবে চলে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অপর বিশিষ্ট মূল্য এর ভাষা। বস্তুতঃ আদিমধ্যযুগের বাঙলা ভাষার অক্ষত নিদর্শন শুধু এই গ্রন্থেই লভ্য—তাই ভাষাবিজ্ঞানীর নিকট এর মূল্য অপরিসীম।

চণ্ডীদাস-সমস্যা :

প্রশ্ন ১০। চণ্ডীদাস সমস্যার পরিচয় দাও। এর একটি সম্ভাব্য সমাধান-সূত্র উল্লেখ কর।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব-খ্যাতি যে চৈতন্যদেবের কালেও বর্তমান ছিল, চৈতন্য জীবনীকারগণ তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণব-তোষিণী'তেও চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে। বর্তমান শতকের গোড়ার দিক্ পর্যন্ত চণ্ডীদাস একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তা-রূপেই পরিচিত ছিলেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'চণ্ডীদাস পদাবলী' প্রকাশিত হ'বার পরই গ্রন্থধৃত পদগুলির বিষয়বস্তু এবং রচনারীতির মধ্যে বিরাট বৈষম্য লক্ষ্য ক'রে কোন কোন সনিষ্ঠ পাঠক চণ্ডীদাসের একত্ব বিষয়ে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলেন। এরপর বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ-কর্তৃক বড়ুচণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হবার পরই অনেকের মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধে এবং 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' যেন মীমাংসাতীত হ'য়ে দাঁড়ায়। চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন, কোন্ কালে কে বর্তমান ছিলেন এবং কে কী রচনা করেছিলেন—এ সমস্ত বিষয় নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর বাদানুবাদ দেখা দেয়। ডঃ দীনেশ সেন একজন চণ্ডীদাসে বিশ্বাসী; তিনি মনে করেন যে, একজন চণ্ডীদাসই প্রথম জীবনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন এবং

পরিণত বয়সে পদাবলী রচনা করেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে সঙ্কলিত পদাবলী গ্রন্থ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোন পদ উদ্ধৃত না হওয়াতে বড়ু চণ্ডীদাস ব্যতীত অপর কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বই সংশয়জনক। তান্ত্রিক নিবন্ধক এবং কীর্তনীয়াদের দৌলতেই 'চণ্ডীদাস' নামটি ব্যাপক প্রচার লাভ করে বলে তিনি মনে করেন। সতীশচন্দ্র রায়ও মনে করেন যে অপর সকল লেখকের রচনাই চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচার লাভ করে। বিমানবিহারী মজুমদার আবার বহু চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। মনীন্দ্রমোহন বসু এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ুচণ্ডীদাস ব্যতীত অপর একজন মাত্র চণ্ডীদাসের স্বীকার করেছেন। এই মতারণ্যের মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অভিমত এবং যুক্তিপরম্পরা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন এবং পদাবলীর তুলনা করে দেখিয়েছেন—"(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন স্থানে (পদাবলীতে উক্ত) দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস নাই। (২) [শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে] সর্বত্র 'গাত্র' বা 'গাইল' আছে, কোথাও 'ভণে' 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (৩) ভনিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (৪) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। (৫) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শাশুড়ী-ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বড়াই ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধন করেন নাই। (৬) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা নহেন। (৭) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোন সখার নাম উল্লেখ করেন নাই [পদাবলীতে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি রয়েছে]। (৮) বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম-অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কেবল চারিস্থলে পিরীতি শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৯) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (১১) অধিকন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নিকটে ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলির কষ্টি পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" ডঃ শহীদুল্লাহ্-প্রদর্শিত এই পার্থক্যগুলি ছাড়াও একাধিক চণ্ডীদাসের পক্ষে কতকগুলি সূত্র রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে এবং এটি ঐশ্বর্যরসের কাব্য, পক্ষান্তরে পদাবলীর প্রেমে আছে আধ্যাত্মিকতা এবং এর রস একান্তভাবেই মধুর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীমতী রাধিকার অবতাররূপে দেখানো হ'য়েছে, কিন্তু পদকর্তাগণ শ্রীমতীকে লক্ষ্মীর মতই শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা এবং প্রিয়তমা প্রণয়িনী বলে মনে করেন। সর্বোপরি পদাবলীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ-স্বীকৃত রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কটিই রূপায়িত হ'য়েছে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে তার কোন পরিচয় নেই। অতএব সব মিলিয়ে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এবার প্রশ্ন—চণ্ডীদাস যদি একাধিক হ'য়ে থাকেন, তবে সেই সংখ্যা কত এবং কে কী রচনা করেছেন? এ বিষয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা'

শিরোধার্য ক'রে নিলে অনেক অসঙ্গতির হাত এড়ানো যায়। তিনি বলেন, "দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিয়াছেন, যেমন বড়ু চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই রচনা করেন নাই।" ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের মতানুযায়ী তিনজন চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন—(১) একজন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথির লিপি এবং ভাষার প্রাচীনত্ব, এতে 'দান-খণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ, চৈতন্যপ্রভাব-বর্জিত বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির বিচারে এটিকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালেই স্থাপন করতে হয়। (২) অপর একজন চণ্ডীদাস 'দ্বিজ' উপাধিধারী—বিচ্ছিন্ন পদাবলীর লেখক। এঁর পদগুলিই চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভবতঃ চৈতন্যদেব এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদেরই রস আস্বাদন করতেন। তাহ'লে দ্বিজ চণ্ডীদাসও চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে অথবা চৈতন্যদেবের সমকালেই বর্তমান ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও যে অপর একজন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্বকালে বর্তমান ছিলেন, তার প্রমাণ—চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পদের বিশ্লেষণে পাওয়া সম্ভব। চৈতন্যদেব এই পদটির রস আস্বাদন করতেন—

হায় হায় প্রাণসখি কিনা হৈল মোরে।
কাহ্নু প্রেম বিষে মোর তনু মন জারে॥
রাত্রিদিন পোড়ে প্রাণ সোয়াস্থ্য না পাঙ্‌।
যাঁহা গেলে কাহ্নু পাঙ্‌ তাহা উড়ি যাঙ্‌॥

পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই; এ ছাড়া উক্ত গ্রন্থে 'প্রাণসখি' শব্দের প্রয়োগ সম্ভব নয়—অতএব পদটি বড়ু চণ্ডীদাস-ব্যতীত অপর কোন চণ্ডীদাসের রচনা এবং তিনি অবশ্যই চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে বর্তমান ছিলেন। (৩) তৃতীয় চণ্ডীদাস 'দীন'-পদবীযুক্ত, যিনি পালাগান রচনা ক'রেছেন। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে এঁর পদগুলিই নিকৃষ্ট বিবেচিত হ'য়ে থাকে। ইনি অবশ্যই চৈতন্যোত্তর যুগে বর্তমান ছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌-র মতানুযায়ী তিনজন চণ্ডীদাসকে মেনে নিলে অনেক সমস্যারই সহজ সমাধান হ'য়ে থাকে, কিন্তু সব সমস্যা মেটে না। এই তিন জাতীয় পদের বাইরেও অন্ততঃ একজাতীয় পদকে অবশ্যই পৃথক করা চলে—এগুলি অধিকাংশই রূপকাশ্রিত সহজিয়াদের পারিভাষিক ভাষাসমন্বিত পদ। (৪) অতএব 'তরুণীরমণ চণ্ডীদাস'-নামাঙ্কিত সহজিয়াপন্থী একজন চতুর্থ চণ্ডীদাসকে কল্পনা ক'রে নিলে সমস্যার আরো কিছুটা সমাধান হয়। অতএব অন্ততঃ এই চারজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিলে উপর্যুক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও আরো কিছু সমস্যার নিরসন ঘটে। যেমন—চণ্ডীদাসের জন্মভূমির দাবিদার নান্নুর এবং ছাতনা—এক চণ্ডীদাসের দুই জন্মস্থান হ'তে পারে না; চণ্ডীদাস তাই একজন নন। লোকশ্রুতি এই,—বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার হ'য়েছিল। চৈতন্যোত্তর কালে 'ছোট বিদ্যাপতি'র সঙ্গে 'দীন' বা 'সহজিয়া' চণ্ডীদাসেরই এই সাক্ষাৎকার ঘটতে পারে।

চারজন চণ্ডীদাসের কল্পনাতেই যে চণ্ডীদাস-সমস্যার পূর্ণ সমাধান ঘটে, এমন বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত নয়। হয়তো বা আরো অনেক চণ্ডীদাস থেকে থাকতে পারেন, হয়তো অনেক কবি 'চণ্ডীদাস' নামও গ্রহণ করে থাকতে পারেন। আবার এর বিপরীত ক্রমটিও অসম্ভব নয়। অপর কোন কোন কবির রচনাও যে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রয়েছে, তা' তো প্রমাণিত সত্য। এমন ঘটনা আরো অনেক হ'য়ে থাকতে পারে যেগুলি এখনো ধরা পড়েনি। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান এ বিষয়ে যথার্থ হওয়াই সম্ভব। তিনি বলেন, "চণ্ডীদাস-ফ্যাশান প্রবর্তিত হওয়ায় শুধু যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় নূতন পদ রচিত হইতে লাগিত এমন নহে, পুরাতন কবিদের উৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাস ভণিতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য কীর্তনীয়ারাই বেশী। এই কারণেই নরহরি সরকার, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নিত্যানন্দ দাস, রামগোপাল ইত্যাদি কবির ভাল ভাল পদ পরবর্তীকালে পুঁথিতে ও কীর্তনীয়াদের মুখে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।"

শেষ কথা—চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে আরো তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর নয়।

[নয়] পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের সামাজিক পটভূমি :

প্রশ্ন ১১। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দাও।

সাহিত্য সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ আর সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে। তাই রাষ্ট্র-বিপর্যয়ে সমাজের তথা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন বিপর্যয় ঘটে থাকে, তেমনি রাষ্ট্রীয় সুশাসন সমাজ তথা শিল্পসাহিত্যেরও সমৃদ্ধি সাধন ক'রে থাকে। মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে রাজশক্তির ক্রমিক উত্থান-পতন যে এইভাবে বাঙলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত ক'রেছে, সাহিত্যের ইতিহাস-বিশ্লেষণে তার সহজ প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাঙ্‌লার রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায় রাষ্ট্রযন্ত্র ঘন ঘন হস্তান্তরিত হ'য়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও বার বার গতিপথ পরিবর্তিত হ'য়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্‌লার বুকে অরাজকতা ও দুঃশাসনের যে স্রোত ব'য়ে গিয়েছিল, তার ফলে এ কালে যে কোন সাহিত্য রচিত হ'য়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খ্রীঃ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বাঙ্‌লায় ইলিয়াস শাহী শাসন প্রবর্তিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলার সম্ভাবনা দেখা দিল, তেমনি দেখা গেল বাঙ্‌লা-ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিরও কয়েকটি ক্ষীণ স্রোতোধারা। ইলিয়াস্ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও যে কয়েকজন সক্রিয়ভাবেই বাঙ্‌লা সাহিত্য-রচনায় সহায়তা করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইলিয়াস্ শাহী বংশের রাজত্বের মাঝখানে বেশ কয়েক বছর

(১৪১৪ খ্রীঃ—১৪৩৬ খ্রীঃ) হিন্দুরাজা গণেশ এবং তাঁর বংশধরগণ গৌড়-সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে এই গণেশ বা কংসের রাজত্ব-কালেই কৃত্তিবাস রাজানুগ্রহ লাভ ক'রে 'রামায়ণ' অনুবাদ কাব্য রচনা করেন। গণেশের পুত্র যদু 'জালালুদ্দিন' নাম নিয়ে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁর রাজসভায় যে হিন্দু পণ্ডিতদের শ্রদ্ধার আসন দান করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই সম্ভবতঃ মহাপণ্ডিত বৃহস্পতিকে 'আচার্য, কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপণ্ডিত চূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত এবং রায়মুকুটমণি' উপাধি দান করেছিলেন।

গণেশ-বংশের পরই আবার গৌড়ের শাসনভার ইলিয়াস শাহী বংশেই হস্তান্তরিত হয়। এই বংশের রুকনুউদ্দিন বারবাক্ শাহ্ (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা মালাধর বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধি দান করেছিলেন। হাবসী ক্রীতদাসদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ১৪৮৭ খ্রীঃ ইলিয়াস শাহী বংশের সমাপ্তি ঘটে এবং এরপর অন্ততঃ তিনজন হাব্‌সী ৬ বৎসর কাল গৌড়ের সিংহাসন নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন।

১৪৯৩ খ্রীঃ হোসেন্ শাহ্ নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে সুলতান হোসেন শাহই সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর রাজত্বকালেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে এবং বাঙ্‌লা সাহিত্য আদিমধ্যযুগ থেকে অন্ত্যমধ্যযুগে উত্তীর্ণ হয়। হোসেন শাহের রাজদরবারে অনেক জ্ঞানীগুণী হিন্দু শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে 'দবীর খাস' সনাতন গোস্বামী এবং তদ্‌ভ্রাতা 'সাকর মল্লিক' রূপ গোস্বামী অন্যতম। কবি যশোরাজ খান-ও রাজদরবারের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি একটি ব্রজবুলির পদে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। মনসামঙ্গল-রচয়িতা বরিশালের বিজয়গুপ্ত এবং ২৪ পরগণার বিপ্রদাস পিপ্‌লাই-ও হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। 'ছোট বিদ্যাপতি' কবিরঞ্জন হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের এবং কবি শ্রীধর তাঁর কাব্যে নসির শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখ ক'রে গেছেন। ১৫৩৮ খ্রীঃ মামুদ শাহ-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গৌড়বঙ্গে হোসেন শাহী রাজত্বের অবসান ঘটে। এরপর পনেরো বছর শেরশাহ্ এবং তার পুত্র শুধু বাঙ্‌লার নয়, দিল্লীর সিংহাসনও নিজের অধিকারে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবর জয়লাভ ক'রে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন, আর এই সময় আফগান সর্দাররা বাঙ্‌লার শাসনভার করায়ত্ত করে, ১৫৭৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁদের হাতেই ছিল বাঙ্‌লার শাসনরজ্জু। এরপরই শুরু হয় মুঘল শাসন। মুঘল-সম্রাট্‌গণ সরাসরি বাঙ্‌লার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তাঁরা রাজধানী থেকে সুবেদারের মাধ্যমে বাঙ্‌লায় নিজেদের শাসন কায়েম রেখেছিলেন।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকে পাঠান শাসন অতিশয় চণ্ডরূপে বিদ্যমান থাকায় বাঙালী হিন্দুদের মনে যে ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হ'য়েছিল, ইলিয়াস শাহী শাসনে তার কিছু নিরসন ঘটে। কোন কোন সুলতান অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন, কেউ কেউ তাদের

রাজসভায় হিন্দুদের উচ্চপদেও নিয়োগ করেছিলেন। মনে হয়, কোন সুলতান হয়তো বাঙ্‌লা ভাষা বোঝতেন কিংবা ব্যবহার করতেন। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের পুনরালোচনা শুরু হয়,—বিভিন্ন মহাকাব্য ও পুরাণাদির বাঙ্‌লা অনুবাদও শুরু হ'য়েছিল। তখন পর্যন্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হওয়া-সত্বেও বাঙ্‌লায় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হ'তে আরম্ভ করেছিল।

ষোড়শ শতকে পাঠান-শাসনের যেমন চূড়ান্ত বিকাশ সাধিত হ'য়েছিল, তেমনি তার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লায় মুঘল শাসনেরও সূত্রপাত ঘটে। এখানকার রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একদিকে বাঙ্‌লার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম-বিষয়ে যেমন প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল, তেমনি আবার শতাব্দীর শেষদিকে দেশ প্রচণ্ড শাসন-শোষণেরও মুখে পড়েছিল। পাঠান-শাসকদের নির্বুদ্ধিতা এবং আফগান সর্দারদের হঠকারিতায় দেশে তখন অরাজকতা দেখা দিলেও পাঠানগণ দেশের অর্থ অন্যত্র পাঠাতেন না ব'লে দেশবাসী মোটামুটি সুখেই বসবাস করতো, কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন বাঙালীর মনোভূমিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

ষোড়শ শতক বাঙালীর জীবনে প্রথম বিরাট্‌ উন্মাদনার সৃষ্টি করলো চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে উপলক্ষ্য করে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব সমকালীন বাঙালী-জীবনকে যে নবজীবনরসে সিক্ত করেছিল, তার স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার। তিনি চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্পর্কে বলেছেন,—"The Renaissance which we owe to English rule in the nineteenth century had a precursor—a faint glimmer of dawn no doubt two hundred and fifty years earlier.'

এই শতকের শেষদিকে দেশের শাসনভার মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হওয়াতেই কোন কোন দিক থেকে তার সুফল দেখা গেল। শাসনগত ঐক্যের ফলে দেশবাসীর মনে কিঞ্চিৎ শান্তি-শৃঙ্খলাবোধ ফিরে এলো। বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙলার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো। অবশ্য এর আগেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং নিজের ভ্রমণ মাধ্যমে এবং প্রচারক পাঠিয়ে মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালী হিন্দুদের বসবাসের ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালী-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলো এবং কতকাংশে প্রভাবান্বিতও হ'লো। আবার কিছুটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আগ্রহবশতঃ এবং কিছুটা মুঘল শাসন-ব্যবস্থার সহায়তার জন্য ভিন্ন প্রদেশবাসীরাও প্রচুর সংখ্যায় বাঙলায় এসে বসবাস করতে লাগলেন। ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসায় কূপমণ্ডূক বাঙালীর দৃষ্টিও অনেকটা প্রসারিত হ'লো। "...বাঙ্‌লাদেশ মুঘল সম্রাটের অধীনে আসিবার ফলে যে বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহা যে বাঙালীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বাঙালীর নাগরিক জীবনের সম্মুখে এক

নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। সমৃদ্ধির এই বৈচিত্র্য যে বাঙালীর সাহিত্যজীবনেও পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আনিয়াছিল, তাহাও অনুমান করা চলে। আবার এই মুঘল-প্রভাব যখন জাতির দৃষ্টিকে অনেকটা বহির্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল, তখন বাঙ্‌লাদেশে চৈতন্য-প্রভাবই তাহাকে সংযত ও সংহত রাখিয়াছে। ফলত আমরা দেখিতেছি, একদিকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, অন্যদিকে মুঘল-শাসন—এতদুভয়ের সামগ্রিক প্রভাবেই বাঙ্‌লা-সাহিত্যের মোড় ঘুরিল, আদি মধ্যযুগের অন্তে অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগের সৃষ্টি হইল।"

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতক 'সুবর্ণযুগ' নামে আখ্যায়িত হ'য়ে থাকে। বৃন্দাবন দাস-কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদি চৈতন্যজীবনীকার, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস আদি বৈষ্ণবপদকর্তা এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও দ্বিজ মাধবের মত 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা এই যুগে আবির্ভূত হয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যে সেরা সম্ভার সাজিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ১২। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের কোন সামাজিক প্রয়োজন ছিল কি? এ যুগে রচিত অনুবাদ সাহিত্যের একটা সামাজিক পরিচয় দাও।

ভূমিকা: খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত কালকে আমরা বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভবকাল ব'লে চিহ্নিত ক'রে থাকি। এই সময়সীমার প্রথম অর্ধাংশেরও অধিক কাল গৌড়বঙ্গে পাল বংশীয় নরপতিগণ এবং অবশিষ্ট অংশে সেন বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব ক'রে গেছেন। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হ'লেও পৌরাণিক ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন না, আর সেনরাজগণ ছিলেন একান্তভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। পূর্বোক্ত সময়সীমায় রচিত বাঙ্‌লা ভাষায় একটিমাত্র গ্রন্থই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে—গ্রন্থটি বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন পদের সঙ্কলন 'চর্যাগীতি'। দ্বাদশ শতকের একেবারে অন্তিম লগ্নে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর উদ্বোধন কালেই বাঙ্‌লায় প্রথম তুর্কী আক্রমণ ঘটে। এরপর চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্‌লার বুকে চলে রাজনীতির জুয়াখেলা। বিধর্মী, বিভাষী, বিজাতীয় তুর্ক-তাতারদের আক্রমণ ও অত্যাচারে বাঙালীর জীবনে নেমে এসেছিল অমারজনীর অন্ধকার। এই দেড় শতাব্দীর বন্ধ্যাকালকে আমরা বড় জোর বাঙালীর মানস-প্রস্তুতির কাল বলে স্বীকার করতে পারি—এর বেশি কিছু নয়। বাঙ্‌লার রাজনৈতিক আকাশে ইলিয়াস শাহী বংশের আবির্ভাবেই অমাবস্যার আঁধার ফিকে হ'য়ে এলো—বাঙালী ধীরে ধীরে আত্মরক্ষার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সুযোগ এবং সাহস পেলো। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্রান্তিকাল তথা অন্ধকার যুগের অবসান হ'লো, দেখা দিল 'মধ্যযুগ'।

জাগরণ-মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের যে তাগিদ বাঙালী অনুভব করেছিল, তার কিছুটা রূপায়ণ ঘটেছিল সাহিত্য-সৃষ্টিতে। সদ্যজাগরিত জাতির তখন নতুন উদ্যম,, সম্মুখে নতুন আশা। একটা কিছু করবার আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছে, অথচ সামনে কোন উচ্চ আদর্শ নেই,—এছাড়া ভাবার আড়ষ্টতাও উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা করে। নতুন সৃষ্টির নেশায় তাই জাতিকে কিছুটা পিছন ফিরে তাকাতে হ'লো। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সংস্কৃত ভাষায় যে অপূর্ব সম্পদ রেখে গেছেন, সেখান থেকে সহজেই পাওয়া যেতে পারে ভাব এবং ভাষা। আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে যে আদর্শ পুরুষ, জীবনযাত্রাপ্রণালী ও ভাবধারা বর্তমান রয়েছে, আমাদের নতুন জীবনের যাত্রাপথে ঐগুলিই আলোকবর্তিকা-রূপে দিক্‌নির্দেশ করতে পারে। অতএব

রামায়ণ-মহাভারত এবং ভাগবতপুরাণকে মাতৃভাষায় অনুবাদ ক'রে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে কবিদের উদ্যোগী হ'য়ে ওঠা ছিল একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অবশ্য এ ব্যাপারে বাধাও ছিল দুস্তর।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শুধু ধর্মসাহিত্যকেই নয়, কাব্যসাহিত্যকেও সংস্কৃত ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ করে তাদের জনগণের নাগালের বাইরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, অনুবাদের মাধ্যমেও যাতে কেউ এদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে না পারে, সেই জন্য নিষেধবাণী উচ্চারণ করে গেছেন সেকালের শাস্ত্রকারগণ—

'অষ্টাদশ পুরাণাদি রামস্য চরিতাণি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥'

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণাদি কাহিনী মাতৃভাষায় কেউ শুনলেও তাকে রৌরব নরকে যেতে হয়। কাজেই শাস্ত্রকারদের এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে তার বাইরে যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। যারা এই দুষ্প্রচেষ্টায় ব্রতী হ'য়েছিলেন, এক সময় যে তাদেরও 'সর্বনেশে' আখ্যা পেতে হ'য়েছিল, একটা বাঙ্‌লা প্রবাদেই তার প্রমাণ রয়েছে—'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেসে—এই তিন সর্বনেশে।' 'বামুন ঘেসের পরিচয় জানা না গেলেও অপর দুজন যে সংস্কৃতে আবদ্ধ রামায়ণ-মহাভারত বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করার অপরাধেই নিন্দিত হ'য়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এবং আরও অসংখ্য লেখক যে নিষেধবাণী অমান্য ক'রে বিভিন্ন মহাকাব্য এবং পুরাণ-অনুবাদে অগ্রসর হ'য়েছিলেন, তার বহুতর কারণের মধ্যে প্রধান দুটি হ'লো—যুগধর্মের পরিবর্তন এবং মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা।

বাঙলায় তুর্কী আক্রমণের ফলে কিছুটা ইস্‌লাম ধর্মের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বাঙলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব অংশতঃ বিসর্জন দিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং অনার্যদের সম্বন্ধে কিছুটা সহনশীল হ'য়েছিল বলে মনে হয়। সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্মীয় অনুশাসনে অনেকটাই শৈথিল্য এসেছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও কিছুটা আত্মসচেতনতা দেখা দেওয়ায় তাদের মনোরঞ্জন এবং প্রয়োজন-সাধনের উপযোগিতা দেখা দিয়েছিল। কাজেই শাস্ত্রের নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণে সম্ভবতঃ আর তেমন বাধ্য-বাধকতা না থাকায় অনেকেই সংস্কৃতে গ্রন্থাদি অনুবাদে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। দ্বিতীয় আর একটা প্রধান কারণ—মুসলমান সুলতানগণ কার্যতঃ এদেশবাসী হ'য়েই গিয়েছিলেন ব'লে তাঁরা দেশীয় কাহিনী-আদি-বিষয়ে উৎসুক হ'য়ে সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ মহাকাব্যাদি ভাবান্তরের জন্য কবিদের উৎসাহিত করেছিলেন। এ ছাড়াও "হিন্দুসমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে পৌরাণিক সাহিত্য, বিশেষতঃ রামায়ণ-মহাভারতের প্রচার অত্যাবশ্যক। তাই তাঁরা জনসমাজে অনুবাদের মারফতে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য

পৌরাণিক সাহিত্যের মূল নির্ধাস প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।” (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

এই অনুবাদসমূহ বাঙ্‌লা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এ বিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত অতিশয় মূল্যবান্ বিবেচিত হ'তে পারে। তিনি বলেন, "এইভাবে বাংলায় আর্য সংস্কারের প্রভাব না পড়লে বাঙ্‌লা সাহিত্য কোনদিনই লোকসাহিত্যের সীমা ছাড়াতে পারত না। বাংলা সাহিত্য যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালের মধ্যে একটি সুগঠিত সাহিত্যকর্মরূপে সম্মানিত হয়েছে, তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ছাপ না পড়লে এ সাহিত্যের এই ধরনের বিকাশ হতে পারত না অনুমান করি। তাই বাঙালী-সমাজের পুনর্গঠনের জন্য, বাঙালী, ঐতিহ্যের সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদাশ্রয়ী প্রভাবের এত প্রয়োজন ছিল।"

অনুবাদ সাহিত্যের তিনটিমাত্র ধারাই উল্লেখযোগ্যভাবে বাঙ্‌লা সাহিত্যের কলেবর-বৃদ্ধিতে ও উৎকর্ষ-সাধনে সহায়তা করেছে। এই তিনটি ধারা :—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত।

[দশ] রামায়ণ :

প্রশ্ন ১৩। মহাকবি কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখসহ তদ্‌রচিত 'রামায়ণে'র পরিচয় দাও।

অথবা,

প্রশ্ন ১৪। বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ রামায়ণ কাব্য কোন্‌টি? এটিকে কি অনুবাদ বলা সঙ্গত? এর জনপ্রিয়তার কারণ কি? আলোচনা কর।

ভূমিকা : বাঙলা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল 'রামায়ণ'। মহাভারতের অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্বেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলেই যে বিপরীতক্রমে বলা চলে যে রামায়ণের নিজস্ব গুরুত্ব এবং বাঙালী-জীবনের সঙ্গে এর সহজ আত্মীয়তার জন্যই অনুবাদ সাহিত্য রচনা কালে বাঙালী সম্ভবতঃ সর্বাগ্রে রামায়ণের প্রতিই আকৃষ্ট হ'য়েছিল। রামচন্দ্রের বনবাস এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত হ'লেও রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্য জীবনের কাব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।...আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্য তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।...গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।' রামায়ণে গার্হস্থ্য-জীবনেরই পরিচয় বিধৃত রয়েছে বলেই মৌশুমি বায়ু ও পলিমাটির দেশ বাঙ্‌লায় এর এত আদর। 'ইহাতে যে সৌভ্রাত্র,

সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে,' তা সহজেই বাঙালীর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'য়েছিল। হয়তো এই কারণেই বাঙালীর মানস-জাগৃতির উষালগ্নেই রামায়ণ অনুবাদক মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব ঘটেছিল।

কবি কৃত্তিবাস : কৃত্তিবাস বাঙলা ভাষায় আদিকবি না হলেও অনুবাদকদের মধ্যে আদি হ'তে পারেন। অসুবিধে এই—তাঁর আবির্ভাব-কাল-বিষয়ে নিশ্চিন্ত-ভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। চৈতন্যদেবের জীবনীকার জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্য-মঙ্গল' গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করলেও চৈতন্যদেব জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস এবং মালাধর বসুর কথা বললেও তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী ফুলিয়া-নিবাসী কৃত্তিবাসের উল্লেখ না করায় পণ্ডিতমহলে কৃত্তিবাসের প্রাচীনত্ব নিয়ে যে সংশয় দেখা দিয়েছে, তার নিরসন আজও হয়নি।

জীবনী : কৃত্তিবাসের রচনার অজস্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও মাত্র একটিতেই কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীমূলক কিছুটা অংশ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত সমালোচক কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীকে জাল বলে উল্লেখ করলেও অপর প্রায় সকলেই এটিকে মেনে নিয়েছেন এবং এটিকে ভিত্তি করেই কৃত্তিবাসের কালনিরূপণ ক'রে থাকেন। এই আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবাস তাঁর পূর্বপুরুষের বিবরণ, তাঁর পঠন-পাঠনের বিবরণ এবং গ্রন্থ উৎপত্তির সূত্রও নির্দেশ করেছেন। বিবরণটি সংক্ষেপে এই : কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের বেদানুজ বা দনুজ নামক রাজার পাত্র ছিলেন। পূর্ববঙ্গে এক সময় বিপর্যয় দেখা দিলে তিনি গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী, মাতা মালিনী। কৃত্তিবাসের আরো দুটি ভাই এবং একটি বোন ছিল। বার বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস বড়গঙ্গা (পদ্মা) পার হ'য়ে তিনি উত্তর দেশে পড়তে গেলেন। ব্রহ্মাতুল্য গুরুর নিকট পাঠ সমাপন ক'রে কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হবার আশায় গৌড়ের রাজসভায় উপনীত হ'য়ে 'সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।' পাত্রমিত্র-বেষ্টিত গৌড়েশ্বরের ইঙ্গিতে তিনি নানা ছন্দে নানা রসাল শ্লোক পাঠ করলে রাজা তুষ্ট হ'য়ে পট্ট উত্তরীয় উপহার দিলেন। পরে তাঁরই আদেশে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। সরস্বতীর বরে তিনি লোক বুঝানোর জন্য দেশীয় ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন।

কাল : কৃত্তিবাসের এই বিবরণীতে তাঁর জন্মমাস, তিথি, বার সবই উল্লেখ করেছেন, শুধু উল্লেখ করেন নি শকাব্দটি। আবার গৌড়েশ্বরের রাজসভার পাত্র-মিত্র সভাসদ্‌দের বিস্তৃত পরিচয় দিলেও কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। তারি ফলে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—

> 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস,
> তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥'

এখানে শকাব্দের কোন উল্লেখ না থাকাতেই বিপত্তি ঘটেছে। মাঘ মাসের সংক্রান্তি

শ্রীপঞ্চমী তিথি ও রবিবার—এ রকম যোগাযোগ প্রতি শতাব্দীতেই কয়েকবার ঘটতে পারে। আর 'পূর্ণ'-স্থলে 'পুণ্য' ধরলে মাঘমাসের যে কোন তারিখ হ'তে পারে—এতে মাস-বার ও তিথির যোগাযোগ অনেক বেশী হয়। এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, যদি গৌড়েশ্বরের নামটি পাওয়া যায়। এখানেও বিপত্তি—নামের উল্লেখ নেই। সভাসদদের সকলেরই হিন্দুনাম থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে এই গৌড়েশ্বর অবশ্যই কোন হিন্দু নরপতি হ'বেন। ১৪১৫ খ্রী—১৪১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজা গণেশই একমাত্র হিন্দু রাজা, যিনি সুদীর্ঘকালের মধ্যে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ গণেশ-পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন এবং অপর কেউ তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকেই কৃত্তিবাস-কথিত গৌড়াধিকারী বলে মনে করেন। গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ যখন দারোগা ছিলেন তখন তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারী শহর কোতোয়াল ছিলেন সুবুদ্ধি রায়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে কৃত্তিবাসের তালিকায় যে সব সভাসদের নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে, এদের অনেকেই প্রথম জীবনে সুবুদ্ধি রায়ের সভায় বর্তমান ছিলেন, পরে তারা হোসেন শাহ নবাব হ'লে তাঁরা সেই নবাবের গৌড় দরবারে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই মতারণ্য থেকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা সহজ নয়। কৃত্তিবাস প্রদত্ত সঙ্কেত-অনুসরণে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি যে সকল তারিখে বার-মাস-তিথির যোগাযোগ সাধন করতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে ১৩২০ শকাব্দের (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) ১৬ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিটিকেই কৃত্তিবাসের জন্মদিন ব'লে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে ক'রে থাকেন। এই তারিখ গ্রহণ করলে রাজা গণেশের (১৪১৮ খ্রীঃ) দরবারে কৃত্তিবাসের উপস্থিতিকে মেনে নিতেও কোন অসুবিধে হয় না। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ ভট্টশালী-আদি ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণও এই তারিখের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অপর কোন প্রবলতর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ১৩৯৯ খ্রীঃ-কেই কবি কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ বলে গ্রহণ করবো।

মূল রচনা : কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অভাবে কৃত্তিবাসের নিজস্ব রচনার সঙ্গে আমরা পরিচয় সাধন ক'রে উঠতে পারি নি। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের রচনায় এত বেশি প্রক্ষিপ্ত অংশ অনুপ্রবিষ্ট হ'য়েছে এবং সম্পাদকগণও এত বেশি সংস্কার সাধন করেছেন যে এ সমস্ত গ্রন্থে আর কৃত্তিবাসের নিজস্ব রচনা কিছুই নেই বলেই সকলে আশঙ্কা করেন। এমন কি ডঃ ভট্টশালীও অতিশয় সতর্কভাবে যে সংস্করণ অংশতঃ প্রকাশ করেছিলেন সে-বিষয়েও ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ভট্টশালী মহাশয় যে প্রাচীনতর আদর্শ ঠিক করিয়াছেন, তাহাকে 'কাব্যের মূল রূপ বলা চলে না, তাহা composite text মাত্র।" অতএব, আমরা 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নামে যে গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত, তাতে কৃত্তিবাসের রচনার নিদর্শন নেই। তাই, সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, যে, প্রচলিত গ্রন্থের প্রামাণিকতা যখন সন্দেহাতীত নয়, তখন এর আলোচনার সার্থকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, প্রাচীন যে কোন রচনাতেই প্রচুর প্রক্ষেপ রয়েছে; তা' ছাড়া এ জাতীয় জনসাহিত্যে

প্রকৃতিতে নৈর্ব্যক্তিক বলেই ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা এতে খুব বেশি ছায়াপাত করতে পারে না। তাই প্রক্ষেপ-বাহুল্য সত্ত্বেও অন্যান্য সকল প্রাচীন গ্রন্থের মতই কৃত্তিবাসী রামায়ণকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রাখা সঙ্গত।

পাঁচালী: আমরা সাধারণভাবে মনে ক'রে থাকি যে, কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণকে বাংলা মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ এর 'মহাকাব্য' অভিধা এবং 'অনুবাদ' পরিচয়—দু'টিই আপত্তিজনক। কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁর গ্রন্থকে 'মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেন নি, তিনি একে 'রামায়ণ পাঁচালী' নামেই বারবার উল্লেখ করেছেন। কৃত্তিবাস সচেতনভাবেই রামায়ণ রচনা করতে গিয়ে বাল্মীকির অনুসরণ করেছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য-রূপেই পরিচিত, কাজেই কৃত্তিবাস ইচ্ছা করলেই যে এটিকে মহাকাব্যরূপে গড়ে তুলতে পারতেন, একথা বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু তিনি ইচ্ছা ক'রেই একে মহাকাব্যের রূপ না দিয়ে পাঁচালীর আকার দান করেছিলেন—এরূপ মনে করাই সঙ্গত। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কাহিনীকাব্য রচনার দু'টি ধারা প্রচলিত ছিল। একটি 'ধামালি,' অপরটি 'পাঁচালি'। ধামালিতেও কাহিনী থাক্‌তো—তবে তা উক্তি প্রত্যুক্তি-মাধ্যমে নৃত্যগীতাদিসহ অভিনীত হতো বলেই মনে হয়। ধামালির রচনা ছিল অপেক্ষাকৃত স্থূল, গ্রাম্য ও কুরুচিকর। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এরূপ ধামালি-জাতীয় রচনা। ধামালি-ছাড়া অপর কাহিনী কাব্যগুলি ছিল 'পাঁচালি'-জাতীয়। পাঁচালিও ছিল দ্বিবিধ—'লৌকিক পাঁচালি' ও 'পৌরাণিক পাঁচালি'। মঙ্গলকাব্য-নাথসাহিত্য আদি ছিল জনমনোরঞ্জক লৌকিক পাঁচালি। আর রামায়ণ-মহাভারতাদি মহাকাব্য ও বিভিন্ন পুরাণের অনুবাদ এবং চৈতন্যজীবনী-আদি গম্ভীর গ্রন্থগুলি 'পৌরাণিক পাঁচালি'-রূপেই পরিচিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণও এ জাতীয় এক পৌরাণিক পাঁচালি।

মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য: এবার অনুবাদের প্রসঙ্গ। সোজা কথায় বলা চলে, কৃত্তিবাস মহাকবি ছিলেন, তিনি অনুবাদক মাত্র নন। বাল্মীকি রামায়ণকে তিনি অনুসরণ করেছেন, রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। প্রয়োজনমতো তিনি গ্রহণ-বর্জন, সংযোজন ও সংস্কার সাধন ক'রে অতি প্রাচীন কালের আর্ষ-রামায়ণকে সমসাময়িক কালের উপযোগী বাঙ্‌লা রামায়ণে পরিণত করেছেন। কাহিনী-পরিকল্পনাতেও তিনি একান্তভাবে বাল্মীকির অনুসরণেই নিরত ছিলেন না, প্রয়োজনমতো তিনি 'মহাভারত', জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণেরও দ্বারস্থ হ'য়েছেন। কবিমাত্রই সমাজ-জীবনের রূপকার—কবি কৃত্তিবাসও সমাজের সৃষ্টি এবং সমাজের তথা যুগমানসের দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি রামায়ণের পুনর্গঠন কল্পনা করেছিলেন। বাঙলাদেশের সমাজ-জীবন কৃত্তিবাসের জীবৎকালে ছিল অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন,—শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য কোনদিক্ থেকেই আলোর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়নি। স্বভাবই প্রাচীন যুগের মহান্ আদর্শের প্রতি সমকালীন বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণই ছিল কবির অভিপ্রেত। অথচ সমকালে তিনি কোথাও ক্ষত্রিয় বীর্য,

ব্রাহ্মণ্য তেজ, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা বা অন্তর্গূঢ় ভক্তির সন্ধান তিনি পান নি, তাই জাতিগত-ভাবে যা' বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, তারি মধ্যে তিনি সেই আদর্শকে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন। রামায়ণের গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি, রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র, পিতৃভক্তি, পত্নী-প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ-আদি মনের কোমলবৃত্তিগুলিরই আদর্শরূপ ফুটিয়ে তুলে তিনি বাঙালীকে আত্মজাগরণে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন। রামায়ণের দার্শনিক তত্ত্ব কিম্বা তাত্ত্বিক বাদ-বিতণ্ডাকে এড়িয়ে তিনি জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে তাদের পক্ষে সহজবোধগম্য সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় রামায়ণ-কাহিনী পরিবেশন করেছেন। অথচ তিনি যে রামায়ণের মূল সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখেই কাহিনীকে মূলানুগভাবে পরিবেষণ করতে সক্ষম ছিলেন তার প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, "কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ দেখিবার দর্পণ-সদৃশ। ইহা যে যুগজয়ী হইয়াছে এবং রাজসভা ও চতুষ্পাঠী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র পল্লীর মুদীর দোকানে পর্যন্ত স্থান পাইয়াছে, তাহার আসল কারণ এই বঙ্গীয়ত্ব। এইরূপ বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য বা সঙ্কীর্ণতার জন্যই কবি ইহাকে মহাকাব্য বলিতে সাহস করেন নাই, পাঁচালী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।"

কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণ কাহিনী থেকে বর্জন করেছেন, এমন বিষয়বস্তু অসংখ্য। আমরা তার বিচারে যাবো না। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন সূত্র থেকে কৃত্তিবাস তাঁর নিজস্ব রামায়ণ-পাঁচালীতে যে সকল বিষয় সংযোজন করেছেন, তাদের প্রধান ক'টি বিষয়ের নির্দেশ প্রয়োজন। এদের মধ্যে আছে—দস্যু রত্নাকরের কাহিনী, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয়, তরণীসেনের কাহিনী, অহি-রাবণ-মহীরাবণ কাহিনী, রাবণের চণ্ডীপাঠ, রামচন্দ্রের অকালবোধন ও দুর্গাপূজা, লবকুশের কাহিনী প্রভৃতি। বস্তুতঃ বাঙালী-চরিত্রের সাধারণ দোষ-গুণ, তাদের আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যসমুদয় ফুটিয়ে তোলবার জন্য কবি যে সকল উপাদান প্রয়োজনীয় বোধ করেছেন সে সমস্ত কিছুরই সমাহার ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়: "মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।"

কৃত্তিবাসের কাব্যে পাণ্ডিত্য, সরসতা, অলঙ্কারাদির সার্থক-ব্যবহার, স্থানকালোপযোগী ভাষা-ব্যবহার, বক্রগর্ভ উক্তি, ভাবগর্ভ ভাষা প্রভৃতির সমাহার তাঁর রামায়ণকে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সাহিত্যে রূপায়িত করেছে।

প্রশ্ন ১৫। বাঙলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন প্রকার রামায়ণের পরিচয় দাও।

রামায়ণের অন্যান্য কবি ও কাব্য: আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগে কৃত্তিবাস

ছাড়া অপর কোন রামায়ণ-রচয়িতার সন্ধান পাওয়া না গেলেও চৈতন্যোত্তর কালে যে রামায়ণ-রচনার জোয়ার দেখা দিয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এ তাবৎ যত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তাতে কবির সংখ্যা পঞ্চাশের কম নয়—কালে এই সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনাই রয়ে গেছে। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করতে গিয়ে কৃত্তিবাস বাল্মীকি ছাড়াও জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও উপাদান সংগ্রহ ক'রেছিলেন, পরবর্তীকালেও এই রীতি অব্যাহত ছিল দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর ধারার কথা। বহু কবিই 'অদ্ভুত রামায়ণ' রচনা ক'রে সার্থকতার পরিচয় রেখে গেছেন। নিম্নে বিভিন্ন ধারার কিছু পরিচয় দেওয়া হ'লো।

১। **বাল্মীকি রামায়ণ :**—বাঙলার প্রথম মহিলা কবি **চন্দ্রাবতী** ছিলেন 'মনসামঙ্গল কাব্য'-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। দ্বিজ বংশীদাস ১৫৭৬ খ্রীঃ তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেন বলে উল্লেখ ক'রে গেছেন—চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ ঐ কালেই জীবিত ছিলেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, গায়েনের মুখ থেকে শুনে তা' সঙ্কলন করা হ'য়েছে। চন্দ্রাবতী মূলতঃ বাল্মীকির অনুসারী হ'লেও তাতে নোতুন তথ্য অনেক সংযোজিত হ'য়েছে। সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে রাম সীতার জন্মকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ডে সীতা-কর্তৃক বনবাস-কাহিনী বর্ণনা এবং তৃতীয় খণ্ডে বহু নোতুন বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। এই গ্রন্থে সীতাকে রাবণের কন্যারূপে দেখানো হ'য়েছে। কৈকেয়ীর কন্যা কুকুয়ার ভূমিকাও এই কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতী-রচিত 'দস্যু কেনারামের কাহিনী' এবং সম্ভবত 'মলুয়া সুন্দরী' 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় সঙ্কলিত হ'য়েছে।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বংশধর **রঘুনন্দন গোস্বামী** সম্ভবতঃ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত 'রামরসায়ন' কাব্য রচনা করেন। এর উত্তরকাণ্ডে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব রয়েছে এবং এতে সীতার পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হয়নি।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ অথবা অষ্টাদশ শতকের গোড়াতেই ভূরিশ্রেষ্ঠা কবি **কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী** অন্যান্য বহু গ্রন্থ-সহ রামায়ণও রচনা করেছিলেন। বহুল প্রচলিত এই কাব্যটি সাধারণতঃ 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামেই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম 'তরণীসেন বধ', 'অঙ্গদের রায়বার' প্রভৃতি অংশ রচনা করেন এবং পরে এগুলি কৃত্তিবাসের রামায়ণেও প্রক্ষিপ্ত হয়।

'বুদ্ধাবতার'রূপে আপনার পরিচয় দিয়ে **রামানন্দ ঘোষ** যে রামায়ণ রচনা করেন, তার লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া **গঙ্গারাম দত্ত** একখানি সু-বৃহৎ রামায়ণ-পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কুচবিহার-রাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে রামায়ণ রচনা করেন, তা' অনেকখানি মূলানুগ ছিল।

২। **অদ্ভুত রামায়ণ :**—বিষয়গত অভিনবত্বের জন্যই সম্ভবতঃ 'অদ্ভুত রামায়ণ' এককালে খুবই উপাদেয় বিবেচিত হ'তো এবং এই কারণেই চৈতন্যোত্তর কালে বহু কবিই এই রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। অদ্ভুত রামায়ণও বাল্মীকি-রচিত ব'লে প্রচারিত

হলেও এটি বহু পরবর্তীকালের রচনা। এতে ২৭টি সর্গ এবং ১৩৬০টি শ্লোক রয়েছে। রাবণের কন্যা সীতা এবং সীতার হস্তেই সহস্রস্কন্ধ রাবণের মৃত্যু—এটিই গ্রন্থের মূল বিষয়। রামচন্দ্রকে এই রামায়ণে ব্রহ্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে।

নিত্যানন্দ আচার্য অদ্ভুত রামায়ণের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কবি। তাঁর রামায়ণ 'অদ্ভুতাচার্য রামায়ণ' এবং তিনি অদ্ভুতাচার্য নামেই বিশেষ পরিচিত। তিনি আত্মবিবরণীতে রঘুপতির স্বপ্নাদেশে এই কাব্য রচনা করেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'অধ্যাত্মরামায়ণ' এবং অন্যান্য সূত্র থেকেও তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। বাঙালী চেতনার সার্বিক আদর্শের মহিমাঙ্কনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

জগদ্রাম এবং রামপ্রসাদ রায় নামক পিতাপুত্র একযোগে 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ' রচনা করেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে 'পুষ্করকাণ্ড' নামে একটি অতিরিক্ত কাণ্ড এবং 'রামরাস' সংযোজিত হ'য়েছে। 'অধ্যাত্মরামায়ণ' থেকেও কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন বলে তাঁরা স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

মাণিকগঞ্জের রামশঙ্কর দত্ত রায় 'অদ্ভুত আচার্য' উপাধি গ্রহণ করলেও স্বীকার করেছেন যে তিনি বাল্মীকি রামায়ণ, যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ক'রে তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

৩। **অধ্যাত্ম রামায়ণ :**—বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হ'লেও এটি বহু পরবর্তীকালের রচনা। এতে মূল কাহিনীই সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। মহাদেব পার্বতীর নিকট এতে রাম কাহিনী এবং রামতত্ত্ব বিবৃত করেছেন। শাক্তধর্মের প্রভাব এখানে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায় যে গ্রন্থটি তত্ত্বপ্রধান।

৪। **যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ :**—এটিও বাল্মীকির নামে প্রচারিত, কিন্তু বস্তুতঃ বহু পরবর্তীকালের রচনা। বাল্মীকি রামায়ণকে মূল গ্রন্থের পূর্বখণ্ড রূপে পরিচয় দিয়ে এটিকে তার অপর খণ্ড বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের মনে বৈরাগ্যোদয় হ'লে বশিষ্ঠ তাঁকে নানা তত্ত্ব উপদেশের সাহায্যে সংসার ধর্মে আগ্রহী ক'রে তোলেন—বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার সাহায্যে এ বিষয়টিকেই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য ক'রে তোলা হ'য়েছে।

বিভিন্ন রামায়ণেই প্রয়োজনমতো শেষোক্ত গ্রন্থ দু'টি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করা হ'য়েছে।

[এগার] মহাভারত :

প্রশ্ন ১৫। বাঙলা ভাষায় রচিত 'মহাভারত' কাব্যধারার একটি সাধারণ পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ১৬। বাঙলা ভাষায় রচিত কোন্ মহাভারতটি তোমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ কারণ উল্লেখপূর্বক এর পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ১৭। কবি কাশীরাম দাস এবং তদ্রচিত 'মহাভারত' কাব্যের পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ১৮। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরিচয় রহস্য উদ্ঘাটন কর এবং তার 'মহাভারত' কাব্যের পরিচয় দাও।

রামায়ণ এবং মহাভারত—উভয়েই মহাকাব্য হওয়া সত্ত্বেও যে রামায়ণের তুলনায় বাঙলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ যে বিলম্বিত হ'য়েছিল, তার সঙ্গেও জাতীয় জীবনের উপযোগিতার সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে নিতে হয়। জাতীয় জীবনে উভয় কাব্যই সমান শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত—তবে পরিবেশ এবং দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এদের মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। বাঙালীর মনোভূমি উভয়কেই সমভাবে গ্রহণে উপযোগী বা প্রস্তুত না থাকাতেই রামায়ণের অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পর মহাভারতের অনুবাদ-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বাঙালী জীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের মৌলিক পার্থক্যের জন্যই মূল্যমানের পার্থক্য অনুভূত হ'য়েছিল

রামায়ণে যে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত বা কাহিনী বিবৃত হ'য়েছে, বাঙালী জীবনের সঙ্গে তা' অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই বাঙালীর নবজাগরণ-মুহূর্তে প্রথমেই এর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।······আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।···গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।"

মহাভারতেও গৃহধর্মের চিত্র আছে, কিন্তু তাতে ক্ষাত্রধর্ম তথা বীরধর্মই প্রাধান্য লাভ করায় তা' বাঙালীর প্রাণে তত সাড়া জাগাতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের অবতারণা করা চলে। সমসাময়িক হিন্দু এবং মুসলমান রাজন্যবর্গ মহাভারতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে এর অনুবাদের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। ফলতঃ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতাই কবিদের মহাভারত অনুবাদে আগ্রহী ক'রে তুলেছে। রামায়ণেও যুদ্ধকাহিনী রয়েছে, কিন্তু তা' অপেক্ষাকৃত বর্বর যুগের। পক্ষান্তরে মহাভারতের যুদ্ধ যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি এতে কূটনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে। সমসাময়িক রাজন্যবর্গ তাই মহাভারতের যুদ্ধে স্ব-কালের চিত্রই দেখতে পেতেন। অতএব, সাধারণ বাঙালী অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহী হ'লেও রাজপুরুষদের তাগিদে মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয় এবং প্রচারও স্বভাবতঃই কিছুটা বিলম্বিত হ'য়েছিল। বাঙলা ভাষায় এই সমস্ত কারণেই মহাভারতের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে অবশ্য অনুবাদের সংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

বৈশিষ্ট্য : বাঙলার রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক অন্ধকার যুগের অবসানে জাতীয় জীবনে যখন জাগরণ-লক্ষণসমূহ প্রকট হ'য়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল, তখনই বাঙালী মহৎ

আদর্শের অনুসন্ধানে তাকিয়েছিল প্রাচীন সাহিত্যের দিকে। এই প্রয়োজনেই বাঙলা ভাষায় রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্য এবং ভাগবতাদি পুরাণের অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রামায়ণ-অনুবাদ কালে কবিরা যেমন সমসাময়িক যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুবাদে অনেকখানি স্বাধীনতা গ্রহণ ক'রেছিলেন, মহাভারত অনুবাদ কালেও তাঁরা একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। মহাভারত মূলতঃ যুদ্ধপ্রধান কাব্য, যুদ্ধের প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক অনীহা, অতএব বাঙালী মহাভারতকে আপন স্বভাবধর্মের অনুকূল করে নিয়েছিল এবং ভক্তিধর্মের স্রোতে তাকে চালিত করেছিল। ভক্তিবাদের দেশ বাঙলায় বীররস অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভক্তিরসে পরিণত হ'য়েছে। বেদব্যাস যেখানে বিস্তৃতভাবে যুদ্ধোদ্যোগ এবং তার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন, বাঙালী কবি সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়ে এসেছেন। আবার কৃষ্ণপ্রসঙ্গ পেলেই বাঙালী কবি উচ্ছ্বসিত। যখনই বাঙালী কবি সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন; সুযোগ না পেলে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

লক্ষ শ্লোকাত্মক ব্যাস-মহাভারতকে কোন কবিই আক্ষরিকভাবে অনুবাদের চেষ্টা করেন নি। বাঙলার যুগধর্ম ও বাঙালীর স্বভাবধর্ম-অনুসরণে বাঙালী কবি গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ব্যাস-মহাভারতকে বাঙলা মহাভারতে পরিণত করেছেন। যুদ্ধ ও তথ্যপ্রধান 'রাজধর্মানুশাসন পর্ব, আপদ্ধর্ম পর্ব এবং অনুশাসন পর্ব' বাঙলা মহাভারতে বর্জিত হ'য়েছে। বহু কাহিনী উপকাহিনীযুক্ত মহাভারতের অনেক কাহিনীই বাঙলা মহাভারতে বর্জিত হ'য়েছে। আবার নোতুন কাহিনীও অনেক যুক্ত হ'য়েছে। রুরু-প্রমদ্বরার প্রেম, বিদুলার তেজস্বিতা, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুযজ্ঞ-আদি কাহিনীর বর্জন ঘটিয়ে নোতুন যোগ করা হয়েছে - অকাল আম্র-বিবরণ, শ্রীবৎস-চিন্তা উপাখ্যান, জনা-প্রবীর কাহিনী, ভানুমতীর স্বয়ম্বর, লক্ষণার স্বয়ম্বর প্রভৃতি। অনুমান করা হয়, অধুনা-লুপ্ত জৈমিনি-সংহিতা থেকে এই সমস্ত কাহিনী আহরণ করা হ'য়েছে। বাঙলা মহাভারতে 'গীতা'র বৃহত্তম অংশ এবং 'অনুগীতা'র সমগ্র অংশই বাদ পড়েছে।

বাঙলা মহাভারতে এ ছাড়াও বহু মহাভারতীয় কাহিনীর বিকৃতি সাধন ক'রে দেশকালোপযোগী ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। ব্যাসোক্ত বিভিন্ন দেশ-নামের পরিবর্তে বহু নোতুন দেশের নাম যুক্ত হ'য়েছে, বহু নোতুন রাজার নামও এখানে পাওয়া যায়। বাঙলা মহাভারতেও পর্ব সংখ্যা অষ্টাদশ, কিন্তু নাম ও বিন্যাসের দিক থেকে মূলের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। এই সমস্ত কারণে বাঙলা মহাভারতকে মূল মহাভারতের অনুবাদরূপে গ্রহণ করা যায় না, বস্তুতঃ এতে মৌলিক কাব্যের স্বাদই বর্তমান।

(ক) **কবীন্দ্র পরমেশ্বর:** বাঙলা ভাষায় মহাভারত-অনুবাদকের সংখ্যা অপরিমিত। ডঃ সুকুমার সেন ৭৬ জন অনুবাদকের সন্ধান পেয়েছেন। এর বাইরে যে আর কেউ নেই, এমন কথা বলা যায় না। এ ছাড়াও এমন কিছু কিছু কবির কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যাদের অস্তিত্ব-বিষয়েই অপরেরা সন্দিহান। যাহোক, যে-সব কবির সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া চলে, তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ কবীন্দ্র অথবা কবীন্দ্র পরমেশ্বরই

প্রাচীনতম। কবির বিবরণী থেকে জানা যায় যে তিনি লস্কর পরাগল খানের নির্দেশেই মহাভারত অনুবাদ করেন। লস্কর পরাগল ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সেনাপতি। তিনি সুলতানের আদেশে যুদ্ধার্থ চট্টগ্রাম গমন করেন এবং স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করতেন। পরাগল খান 'দিনেকের' মধ্যেই শুনতে পারেন, এমন মহাভারত রচনার জন্যই কবীন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতকে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে শুধু প্রধান প্রধান কাহিনী-সমন্বয়ে গড়ে তুলেছিলেন। আকার অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলেই এটি বর্ণনামূলক কাহিনীর আকার ধারণ করে।

কবীন্দ্র সেনাপতি পরাগলের নির্দেশে মহাভারত রচনা করেন বলে সাধারণভাবে এটি 'পরাগলী মহাভারত' নামেই পরিচিত হ'য়ে থাকে, তবে গ্রন্থটির কবি-প্রদত্ত নাম 'পাণ্ডব-বিজয় পাঞ্চালিকা'। এই 'পাণ্ডববিজয়' নামটি অপর একটি ভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে পণ্ডিত মহলে এককালে বেশ শোরগোল সৃষ্টি করেছিল। লিপিবিভ্রাটেই সম্ভবতঃ 'পাণ্ডববিজয়' তথা 'বিজয়পাণ্ডব' কোথাও কোথাও 'বিজয় পণ্ডিত' হ'য়ে দাঁড়ায়; ফলে কোন ঐতিহাসিক এটিকে 'বিজয় পণ্ডিত' নামক কবির রচিত এক মহাভারত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। যাহোক্, এক্ষণে এই ভ্রান্তির নিরসন হ'লেও 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নামটি নিয়ে অপর একটি সমস্যা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন যে, কবির নাম 'পরমেশ্বর' এবং 'কবীন্দ্র' তাঁর উপাধি। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে কবির নাম 'কবীন্দ্র'। ভণিতায় আছে—'কবীন্দ্র পরমযত্নে পাঁচালী রচিয়া।' এটিই লিপিবিভ্রাটে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক, কবির ব্যক্তিগত পরিচয়-বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা না গেলেও গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবীন্দ্র ছিলেন কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ দেবের মন্ত্রী। এঁর নাম ছিল 'বাণীনাথ', রাজমন্ত্রী হ'য়ে ইনি 'কবীন্দ্রপাত্র' উপাধি প্রাপ্ত হন। আসাম গৌরীপুরের রাজবংশ এই কবীন্দ্রপাত্রের বংশধর বলে দাবি ক'রে থাকেন। কবির জীবৎকাল-বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা না গেলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে অনুমান করা চলে যে সম্ভবতঃ তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫০০-১৫১৫ খ্রীঃ।

কবীন্দ্র একদিনে শোনবার উপযোগী ক'রে অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে মহাভারত রচনা করলেও তাঁর নামে প্রচলিত মহাভারতে মোট শ্লোক-সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজার। অতএব অতি সঙ্গত কারণেই অনুমান করা হয় যে, কালে কালে পরাগলী মহাভারতে প্রচুর পরিমাণ প্রক্ষিপ্ত রচনা অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। বিশেষতঃ কবীন্দ্রের গ্রন্থে বিভিন্ন কবির ভণিতা এই অনুমানকেই সুদৃঢ় করে। মূল মহাভারতের অনুকরণে কবীন্দ্রের মহাভারতেও অষ্টাদশ পর্বই রয়েছে। তবে 'অশ্বমেধ পর্ব'টির ভণিতা সর্বত্র 'শ্রীকরনন্দী'র। কেউ কেউ অনুমান করেন যে কবীন্দ্রের গ্রন্থ সমাপ্ত হ'বার পূর্বেই পরাগল খান পরলোক-গমন করায় কবীন্দ্র আর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নি। পরে পরাগল খানের পুত্র 'ছোটি খাঁ'র আদেশে শ্রীকর নন্দী ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই অনুমান ভ্রান্ত; কারণ

কবীন্দ্র এবং শ্রীকরনন্দী—উভয়ের ভণিতায়ই পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং তাদের বিষয়গত পার্থক্যও বর্তমান। অতএব কবীন্দ্র সমগ্র গ্রন্থই রচনা ক'রেছিলেন বলে মেনে নিতে হয়; শুধু কোন কারণে তিনি 'অশ্বমেধ পর্ব' রচনা করেন নি অথবা তা' বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়াতে শ্রীকরনন্দী জৈমিনী-ভারত-অনুযায়ী 'অশ্বমেধ পর্ব' রচনা ক'রে তা কবীন্দ্রের গ্রন্থে সংযোজিত করেন। কবীন্দ্রও মূলতঃ জৈমিনি-ভারত-অনুসরণেই হয়তো তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়, কারণ একমাত্র 'অশ্বমেধ পর্ব'-ভিন্ন জৈমিনী-ভারতের অপর কোন পর্ব আর এক্ষণে পাওয়া যায় না ব'লে তা মিলিয়ে দেখা আর সম্ভবপর মনে হয় না।

(খ) **কাশীরাম দাস :** বাঙ্‌লা রামায়ণ বলতেই যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণকেই বুঝিয়ে থাকে, তেমনি বাঙ্‌লা মহাভারত বলতে শতকরা একশ জন বাঙালীই বোধ হয় 'কাশীদাসী মহাভারত' বুঝে থাকেন। অথচ বাঙ্‌লা ভাষায় যাঁরা মহাভারত বা তার অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন, তাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৭০-এর অধিক। এ ছাড়া-কাশীরাম কৃত্তিবাসের মত আদি অনুবাদক নন, এমন কি তিনি সমগ্র মহাভারতেরও অনুবাদ ক'রে উঠতে পারেন নি। তৎসত্ত্বেও তাঁর রচনার সম্পূর্ণতা এবং পরিণতির জন্যই তিনি এই অসাধারণ স্বীকৃতি লাভে ধন্য হ'য়েছেন।

কবির পূর্ণ নাম কাশীরামদেব, বিনয়বশতঃ নিজেকে 'দাস' বলে অভিহিত করেছেন। কবির পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রাম। কবির পিতা কমলাকান্ত। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরও কবি ছিলেন। কবির জীবৎকাল-বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ না পেলেও নানা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে অনুমান করা হয় যে কাশীরাম সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই সম্ভবতঃ ১৬০২-১৬০৫ খ্রীঃ-র দিকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পৃথ্বীচন্দ্র নামক জনৈক কবি 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করেছেন—'অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।'—কাশীরামের সমগ্র মহাভারত রচনার কথা লোকশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত। কিন্তু কাশীরামের কাব্যে বিভিন্ন কবির ভণিতা এবং একটি উক্তি সন্দেহ সৃষ্টি করে। উক্তিটি—

'আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
এত রচি কাশীরাম গেল স্বর্গপুর॥'

কাশীরাম যে মহাভারত রচনার কাজ শেষ করতে পারেন নি, এ তথ্য এখন সর্বজন সমর্থিত। কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্র নন্দরামের একটি উক্তি থেকে জানা যায় যে পরলোকগমনকালে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত কাশীরাম তাঁকে গ্রন্থ সমাপ্ত করতে আদেশ দিয়ে যান। কাশীদাসী মহাভারতে নন্দরামের ভণিতাও পাওয়া যায়। তিনিই গ্রন্থ সমাপ্তির দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সম্ভবতঃ 'উদ্যোগ পর্ব' এবং দ্রোণপর্ব পর্যন্তই অনুবাদ করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ বসু-ভণিতায় 'শান্তিপর্ব,' জয়ন্তদাস-ভণিতায় 'স্বর্গারোহণ পর্ব' এবং নিত্যানন্দ ঘোষ ভণিতায় 'স্ত্রীপর্ব' পাওয়া যাওয়াতে উক্ত কবিগণ-কর্তৃক যথোক্ত

পর্বসমূহ রচিত হ'য়েছিল বলেই মেনে নিতে হয়। 'বনপর্ব', 'গদাপর্ব' এবং 'সভাপর্ব' রচনার ভণিতায় পাওয়া যায় দ্বৈপায়ন দাসের নাম। ডঃ সুকুমার সেন 'দ্বৈপায়ন দাস'-নামক কোন পৃথক্ কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু একটি ভণিতায় দ্বৈপায়ন দাস নিজেকে কাশীরামের পুত্র বলে পরিচয় দেওয়াতে তার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ সহজ সত্যটি স্বীকার ক'রে নেওয়াই সঙ্গত যে নন্দরাম কৃষ্ণানন্দ, জয়ন্তদাস, নিত্যানন্দ ঘোষ ও দ্বৈপায়ন দাস এবং সম্ভবতঃ আরো কোন কোন কবির সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফলেই কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। অতএব কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত হ'লেও এই মহাভারতের ভালোমন্দের দায়-দায়িত্বও এককভাবে কাশীরামে বর্তায় না। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থকর্তারূপে কাশীরাম দাসের নামটিই এতাবৎকাল গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'য়ে আসছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতই কাশীরাম দাসের মহাভারতও বাঙালীর ঘরে ঘরে সমভাবে আদৃত হ'য়ে থাকে,—এ থেকেই তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা অনুমিত হ'তে পারে। কাশীরাম সাধারণভাবে ব্যাস-মহাভারতের অনুসরণ করলেও তদতিরিক্ত কিছু কিছু বিষয়ও গ্রন্থভুক্ত হ'য়েছে। এর অনেকাংশ জৈমিনি-ভারত থেকে গৃহীত হ'য়ে থাকতে পারে এবং অন্য সূত্র থেকেও যে কাশীরাম কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন—এমন অনুমানের পক্ষেও যুক্তি রয়েছে। জৈমিনি সমগ্র মহাভারতই রচনা করেছিলেন—এমন একটা মতবাদ প্রচলিত থাকলেও এর সত্যতা স্বীকার করা কষ্টকর। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের কোথাও 'অশ্বমেধপর্বে'র অতিরিক্ত অপর কোন পর্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতএব, অশ্বমেধ পূর্বোক্ত কিছু কিছু কাহিনী কাশীরাম জৈমিনি ভারত থেকে গ্রহণ করলেও অপর সকল কাহিনীর জন্য তিনি অপর গ্রন্থকারদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন—এমন অনুমানই বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূল মহাভারতের মতই কাশীদাসী মহাভারতও অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত হ'লেও পর্বনাম বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাস-ভারতে শল্য পর্বেই ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ বর্ণিত হ'লেও কাশীরামের কাব্যে পৃথক্ 'গদাপর্ব' রচিত হ'য়েছে। কাশীরামের কাব্যে 'অনুশাসন পর্ব' একেবারে বর্জিত হ'য়েছে এবং ব্যাসের 'মহাপ্রস্থান পর্ব'কে 'স্বর্গারোহণ পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। বিন্যাসের দিক্ থেকেও উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়।

কাশীরাম দাস যুদ্ধ-বিষয়ক বিস্তৃত বর্ণনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনা প্রায় বর্জন ক'রেছেন। ফলে বহু তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ শান্তিপর্ব ও তদন্তর্গত রাজধর্মানুশাসন, অপদ্ধর্ম এবং অনুশাসন পর্ব কাশীরামে অনুপস্থিত। বনপর্বের প্রধান অঙ্গ তীর্থযাত্রা পর্ব এবং মার্কণ্ডেয় পর্বও কাশীরাম বাদ দিয়েছেন। গীতার কাহিনী অংশমাত্র গ্রহণ ক'রে তার সমুদয় তাত্ত্বিক অংশ এবং অনুগীতা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। রুরু-প্রমদ্বরার প্রেমকাহিনী, বিদুলার তেজস্বিতা, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তু-যজ্ঞ-আদি কাহিনী কাশীরামে নেই। একদিকে কাশীরাম যেমন মূল মহাভারতের এ সমস্ত কিছু বর্জন ক'রেছেন,

তেমনি ভিন্ন সূত্র থেকে নতুন নতুন কাহিনী গ্রহণও করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান, জনা-প্রবীর উপাখ্যান, অকালে আম্র-উৎপত্তির বিবরণ, ভানুমতীর স্বয়ম্বর প্রভৃতি। এই সকল গ্রহণ বর্জন ছাড়াও কাশীরাম বহু স্থলেই মূল কাহিনী থেকে সরে গিয়ে কাহিনীর রূপান্তর সাধন করেছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় শিখণ্ডী-দর্শনে ভীষ্মের ধনুত্যাগ কিংবা সুদর্শনচক্রে দ্রোণ ও কর্ণের বাণ প্রতিহত হ'বার কাহিনী ব্যাস-ভারতে নেই, সেখানে দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তির বশে কাশীরাম দাস পারিজাত হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত ইত্যাদি যোগ করেছেন। কাশীরাম দাস চৈতন্যোত্তর-কালে বর্তমান ছিলেন ব'লে তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব ভাব তথা কৃষ্ণভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কাশীরাম-সম্বন্ধে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে তিনি সংস্কৃত জানতেন না. কিন্তু কাব্যের বহুস্থলেই ভাষা, শব্দপ্রয়োগ ও অলঙ্কারাদির ব্যবহার থেকে তাঁকে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলেই মনে হয়। কোথাও কোথাও তিনি সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদও করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর গ্রন্থকে মূলের ভাবানুবাদ বলেই গ্রহণ করা কর্তব্য। বহুস্থলেই তাঁর মৌলিক রচনারও প'রিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রচনায় যে গ্রামীণ সরলতা বর্তমান, কাশীরামে তা' অনুপস্থিত। কৃত্তিবাসের রচনার মতো বাঙালীয়ানার পরিচয়ও কাশীরামে পাওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও যুগধর্মকে অস্বীকার করতে না পেরে কাশীরাম যে বাঙলা মহাভারত রচনা করেছেন, তা' ব্যাস-মহাভারতের অনুগামী না হ'য়ে যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে, এটিকেই কাশীদাসের কৃতিত্বের পরিচয় বলে মনে করি।

(গ) **অন্যান্য কবি :**—মহাভারতের অনুবাদকরূপে বাঙলায় কমপক্ষে ৭৫ জন কবির নাম পাওয়া যায়। দু'চারজন বাদে এদের প্রায় সকলেই মহাভারতের অংশ-বিশেষ মাত্রই অনুবাদ করেছেন এবং এদের মধ্যে প্রায় সকলের চেষ্টাই ছিল গতানুগতিক এবং অনুল্লেখ্য। যাঁদের রচনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

১. **'শ্রীকর নন্দী' :**—কবি শ্রীকর নন্দী লস্কর পরাগল খানের পুত্র ছোটি খানের (নসরৎ খান ?) নির্দেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। তিনি সম্ভবতঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর-রচিত 'পরাগলী মহাভারতে'র 'অশ্বমেধ পর্ব'টি রচনা করেছিলেন জৈমিনি-ভারত অনুসরণে। ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য অনুমান করেন যে শ্রীকর নন্দী সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ ক'রেছিলেন। তাঁর মহাভারতে অনুশাল্ব, চন্দ্রহাস, নীলধ্বজ-জনা, প্রমীলা-অর্জুন, বভ্রুবাহন, হংসধ্বজ প্রভৃতির কাহিনী মনোরম ভাষায় বর্ণিত হ'য়েছে। এক সময় শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্র একই ব্যক্তি বলে মনে করা হ'তো, অবশ্য বর্তমান কালে এদের পৃথক অস্তিত্বই স্বীকৃত। সম্ভবতঃ ১৫১২-১৫১৯ খ্রীঃ-এ মধ্যে শ্রীকর নন্দীর মহাভারত রচিত হয়।

২. 'সঞ্জয়' :—বাঙলা মহাভারতের ইতিহাসে 'সঞ্জয়' এখনও এক সমস্যা হ'য়ে রয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে ইনি পৌরাণিক সঞ্জয়, যিনি ব্যাসদেবের বরে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু যারা সঞ্জয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের যুক্তিও দুর্বল নয়। কোন কোন স্থলে ভণিতায় পাওয়া যায়—'সঞ্জয়ে কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।'—এখানে পৌরাণিক সঞ্জয় ছাড়াও গ্রন্থকার সঞ্জয়ের কথা রয়েছে। অন্যত্র ভণিতায় আত্মপরিচয়-রূপে সঞ্জয় নিজেকে বলেছেন 'ব্রাহ্মণকুমার' এবং 'ভরদ্বাজ বংশে জন্ম।' আর একটি ভণিতায় রয়েছে যে হরিনারায়ণদেব 'সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী।' অর্থাৎ গ্রন্থকার হরিনারায়ণদেব এবং তার উপনাম 'সঞ্জয়'। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং মনীন্দ্রমোহন বসু সঞ্জয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী; তাঁরা মনে করেন, পরাগলী মহাভারতেরও পূর্বে এই মহাভারত রচিত হয়। পক্ষান্তরে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, 'পূর্ববঙ্গের ভারত পাঁচালী-রচয়িতাদের কাব্যপ্রবাহ মিলিত হইয়া গিয়া তথাকথিত সঞ্জয় মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছে।' একথা অবশ্য সত্য যে, সঞ্জয়ের নামে পরিচিত মহাভারতে বহু কবিরই ভণিতা রয়েছে। এতে ব্যাসোক্ত মহাভারতের বিরোধী এবং জৈমিনি-ভারতের অনুগামী বহু বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে।

৩. 'রামচন্দ্র খান' :—সম্ভবতঃ ১৫৩০-১৫৫৪ খ্রীঃ-এর মধ্যে জনৈক রামচন্দ্র খান জৈমিনির মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' বাঙলায় অনুবাদ করেন। এই কবির ভণিতাযুক্ত যে দু'খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তাতে আত্মপরিচয়ে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একটিতে কবি নিজেকে জাতিতে কায়স্থ এবং কাশীনাথ-সুত বলে পরিচয় দিয়েছেন, অপরটিতে কবি ব্রাহ্মণসন্তান এবং পিতার নাম মধুসূদন। এই একটি সমস্যা, আর একটি সমস্যা—এই সময়েই নিত্যানন্দ প্রভুর অপমানকারী এক রামচন্দ্র খান এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর সহায়ক অপর এক রামচন্দ্র খানের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের কারো সঙ্গে কবি রামচন্দ্র খানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাও জানা যায় না। রামচন্দ্র খানের মহাভারতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

৪. 'অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতী' :—কোচবিহার-রাজ বিশ্বসিংহ বা বিশু কোঁচের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমে কবি পীতাম্বর ১৫৪৫ খ্রীঃ 'নলদময়ন্তী' অনুবাদ ক'রে মহাভারত-রচনার সূত্রপাত করেন এবং রাজার পুত্র শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রখ্যাত পণ্ডিত অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী মহাভারতের বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব এবং ভীষ্মপর্ব অনুবাদ করেন এবং তৎ-পুত্র দ্রোণপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন। এই রাজবংশের প্রবর্তনায় উনিশ শতক নাগাদ সমগ্র মহাভারতই বহু কবির সহায়তায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'য়েছিল।

৫. 'দ্বিজ রঘুনাথ' :—উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিজ রঘুনাথ সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খ্রীঃ-এর পূর্বেই জৈমিনীয় ভারতের 'অশ্বমেধ পর্বে'র অনুবাদ করেন। কাশীরাম দাসের রচনার সঙ্গে এঁর রচনার সাদৃশ্য এত বেশি যে, মনে হয়, একের রচনা অপরের গ্রন্থেও অনুপ্রবিষ্ট হ'য়েছে।

৬. 'কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী' :—ভূরিস্রষ্টা এই কবি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটি ধারাতেই কিছু না কিছু কাব্য রচনা ক'রে গেছেন। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান থেকে ইনি একাধিক মল্লরাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। তিনি মল্লরাজা গোপাল সিংহদেবের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ ক'রেছিলেন বলে জানা যায়।

৭. 'নিত্যানন্দ ঘোষ' :—পাকুড়-রাজ পৃথ্বীরাজ তাঁর 'গৌরীমঙ্গল কাব্যে' উল্লেখ করেছেন যে কাশীরাম দাসের পূর্বেই নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত রচনা করেন। তবে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন—কবি নিত্যানন্দ আরও পরে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। নিত্যানন্দ-কৃত মহাভারতের সাতটি মাত্র পর্বের সন্ধান পাওয়াতে অনুমিত হয় তিনি হয়তো সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন নি।

৮. 'ষষ্ঠীবর সেন' :—ঢাকা জেলার অধিবাসী ষষ্ঠীবর সেন এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন বলেই উল্লেখ করেছেন। এঁদের কে কতটা রচনা করেছিলেন অথবা কোন একজন বা দু'জনই সমগ্র মহাভারত রচনা ক'রেছিলেন,—এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না।

এঁরা ছাড়াও বহু কবিই মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব, বিশেষতঃ এঁদের অনেকেই 'অশ্বমেধ পর্ব' অনুবাদ করেন।

[বারো] ভাগবতপুরাণ :

প্রশ্ন ১৯। মালাধর বসু-কৃত ভাগবতের অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা কর।

(ক) **মালাধর বসু :** চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে গৌড়বঙ্গে ইলিয়াস শাহী শাসন প্রবর্তিত হবার পরই দেশে কিছুটা শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে এবং ফলতঃ বাঙালীর সাময়িক অন্তর্মুখীনতার অবসান ঘটে। বস্তুতঃ একটা ক্রান্তিকালের পর এই সময় বাঙালী-জীবনে জাগরণের চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে এবং তারি বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের অনুবাদের মধ্য দিয়ে। এইকালে অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান দুই রূপকার কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসু। কৃত্তিবাস অনুবাদ করেছিলেন বাল্মীকির 'রামায়ণ' এবং মালাধর অনুবাদ করেন 'ভাগবতপুরাণ'।

মালাধর বসু ছিলেন বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতা ভগীরথ বসু এবং মাতা ইন্দুমতী মালাধর বসু যে চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে বর্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মহাপ্রভু মালাধর বসুর পুত্র অথবা পৌত্র রামানন্দ বসুকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং মালাধর বসুর জন্মস্থান বলে কুলীন গ্রামের প্রতি বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন ক'রেছিলেন। চৈতন্যজীবনীকার জয়ানন্দও মালাধর বসুর উল্লেখ করেছেন। তিনি যে চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে বর্তমান ছিলেন, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থে :

'তেরশ' পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥'

অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয় ১৪৭৩ খ্রীঃ এবং রচনা সমাপ্ত হয় ১৪৮০ খ্রীঃ। মালাধর বসুর কোন পুথিতে কালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায় না এবং এ ধরনের তারিখের উল্লেখও প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না। তাই কেহ কেহ শ্লোকটির প্রামাণিকতায় সন্দেহ করেন। গ্রন্থোক্ত তারিখটি প্রামাণিক হ'লে মনে হয় সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ্-এর রাজত্বকালে গ্রন্থের আরম্ভ এবং শাম্‌সুউদ্দিন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়। মালাধর উল্লেখ করেছেন 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।'—এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত দুই সুলতানের কোন একজন হ'তে পারেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক এই সমাধানে আপত্তি উত্থাপন ক'রে বলেন যে তৎকালিক কোন মুসলমান সুলতানের পক্ষে এমন একটি ধর্মীয় গ্রন্থের জন্য উৎসাহ দান বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তাঁদের ধারণা—কোন হিন্দু ভূস্বামীই সম্ভবতঃ কবিকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন, কবি গৌরবে তাঁকে 'গৌড়েশ্বর' বলে অভিহিত করেছেন।

গুণরাজ খান মালাধর বসুর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অথবা 'গোবিন্দবিজয়' তথা 'গোবিন্দমঙ্গল'। গ্রন্থটি ভাগবতপুরাণের অনুবাদ, তবে সমগ্র ভাগবতের নয়। দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত ভাগবত পুরাণের দশম এবং একাদশ খণ্ডে যে কৃষ্ণকাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে, কবি সেই কৃষ্ণকাহিনী-রচনায় উৎসুক হয়েই শুধু এই দু'টি স্কন্ধের অনুবাদ ক'রেছিলেন। কিন্তু সেই অনুবাদও আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ এবং কোথাও সারানুবাদ মাত্র।

বাঙলা রামায়ণের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের যে ভূমিকা কিংবা বাঙলা মহাভারতের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের যে ভূমিকা, ভাগবত পুরাণের অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর বসুও অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন। সহজ কথায় বলতে পারি, সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সকলেই যুগোপযোগী ক'রে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণকে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত ক'রেছিলেন। তার ফলে গ্রন্থগুলির সঙ্গে বাঙালী-জীবনের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হবার অবকাশ পেয়েছিল। মালাধর বসু প্রধানতঃ ভাগবতপুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন ক'রেছিলেন কৃষ্ণকাহিনী রচনার জন্যই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি শুধুমাত্র উক্ত দু'টি স্কন্ধেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি অপর স্কন্ধ থেকেও তথ্যাদি আহরণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন পুরাণেরও সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশে শ্রীমতী রাধার নামও উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বাঙালী কবি জয়দেব গোস্বামী তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী রচনা ক'রে বাঙলাদেশে যে রাধাকৃষ্ণ-ধারার পত্তন করেন, পরবর্তীকালে তার আর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব একদেহে রাধাকৃষ্ণের যুগল-অবতার-রূপে পূজিত হ'বার ফলে পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধারই সর্বাধিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের

পূর্বেই বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে এবং বিদ্যাপতি ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাই নায়িকা। মালাধর বসুও কিন্তু এখানে ভাগবত থেকে সরে গিয়ে বাঙালী-ঐতিহ্য-অনুযায়ী তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যগ্রন্থে শ্রীমতী রাধাকে সমুচিত মর্যাদা দান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের স্বল্প পরেই মায়া কংসের নিধন-বিষয়ে যে দৈববাণী করেছিলেন ('তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'), তা' ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশে না থাকলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে স্থানলাভ করেছে। ভাগবতাদিতে অনুপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা-নৌকালীলা-আদি কাহিনী শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে মাত্র পাওয়া যাওয়াতে অনুমিত হয় যে এগুলি পরবর্তীকালের কোন কবি-কর্তৃক রচিত এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রক্ষেপ রূপে অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

মালাধর বসু ভাগবত অনুবাদ করতে গিয়ে একদিকে যেমন দশম ও একাদশ স্কন্ধ-বহির্ভূত অপর স্কন্ধেরও শরণ নিয়েছেন, এবং ভিন্ন পুরাণ থেকেও বিভিন্ন উপাদান আহরণ করেছেন, তেমনি আবার ভাগবতের অনেক কাহিনী বর্জনও করেছেন। মূল কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক বিধায় তিনি অনেক উপকাহিনী বাদ দিয়েছেন এবং দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা কখনো সংক্ষেপ করেছেন, কখনো বা বর্জন ক'রেছেন। এইভাবে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে মালাধর বসু বাঙলা ভাষায় ভাগবতের যে অনুবাদ রচনা করেছেন, তা বাঙলা 'রামায়ণ পাঁচালী', এবং 'ভারত-পাঁচালী'-র মতোই 'শ্রীকৃষ্ণ পাঁচালী' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে একে আর অনুবাদ বলবার বিশেষ সার্থকতা নেই।

মালাধর বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "...শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইয়া উঠিয়াছে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র কাব্য। সমুদ্রোপম বিশাল ভাগবতের সমগ্র অনুবাদ করিয়া কবি যে তাৎকালিক অশিক্ষিত জনতাকে শুনাইতে বসেন নাই, অথবা মূল ভাগবতের আড়ম্বর-পূর্ণ ও অলঙ্কার-বহুল পণ্ডিতী বাক্‌চাতুর্য ক্ষীণপ্রাণ সাধারণ বাঙ্গালীর উপর চাপাইয়া দেন নাই, এ জন্য রসিক-সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।...বিষয়ের বর্ণনে নহে, বর্জনে ও নির্বাচনে দক্ষতা, পরিমিতিবোধ ও শ্রোতৃ-অনুযায়ী বাক্-সংযমও উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। মূল ভাগবতের ক্লাসিক্যাল আলঙ্কারিকতা যে বাঙ্গালীর রোম্যান্টিক মনোধর্মের অনুকূল নহে এবং উহার ভার-মন্থর ভাষার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিত্ব যে বাঙ্গালী প্রাণোচ্ছলতার পক্ষে অসঙ্গত, তাহা রসিক কবি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি বর্ণনার আক্ষরিক অনুবাদ নহে, প্রধানতঃ কাহিনী-প্রবাহ অব্যাহত রাখিতেই শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।"

অতএব 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সাধারণভাবে অনুবাদ গ্রন্থরূপে পরিচিত হ'লেও আসলে এটিকে মৌলিক গ্রন্থেরই মর্যাদা দান করতে হয়। ফলতঃ গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষের দায়ও তাঁরই। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে তিনি মূল থেকে সে সরে গিয়েছিলেন, তার জন্য দায়ী সম্ভবতঃ যুগ-প্রবৃত্তি। মূল গ্রন্থের যে সকল অংশ কবির উদ্দেশ্য-পূরণের সহায়ক, তিনি সেগুলিই নির্বাচন করেছেন এবং প্রয়োজনে অপর গ্রন্থেরও সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি অনুবাদ করেছেন, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আক্ষরিক নয়, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মকও বটে। কিন্তু তাই বলে যাঁরা মনে করেন, কবি কবিত্ব-প্রকাশে সক্ষম ছিলেন না অথবা আগ্রহী ছিলেন না, এমন কথা বলা চলে না। প্রয়োজনে তিনি যথোচিত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তবে কোথাও অযথা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি—সংযম ছিল তাঁর কাব্যের বিশেষ গুণ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-প্রকাশেই কবি অধিকতর সচেতন ছিলেন বলেই কৃষ্ণলীলার মধুর কোমল কবিত্বময় অংশ কখন কখন হয়তো উপেক্ষিত হ'য়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কবির মনে ভক্তির অভাব ছিল। বরং তাঁর ভক্তি ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই ভক্তি অহৈতুকী এবং নিষ্কাম। কৃষ্ণে অসাধারণ ভক্তি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কবির পরধর্ম-বিষয়ে সহিষ্ণুতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শুধু গোপীরাই যে কাত্যায়নী পূজা করেছেন তা' নয়,—স্বয়ং কৃষ্ণজননী দেবকীও চণ্ডীপূজায় নিরত দেখা যায়। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ধর্মকে গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে যে বৃহত্তর সমাজের পটভূমিকায় স্থাপনের আদর্শ মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু গ্রহণ করেছিলেন, মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে তারই ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুগাতিশয়ী পুরুষ হইলেও তাঁহার লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে বাঙলী কবি মালাধর বসু তাঁহাকে 'বাঙালী'-রূপেই অঙ্কন করিয়াছেন।' কবি এখানেও যেন চৈতন্য-আবির্ভাবের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছেন।

(খ) **অন্যান্য কবি:** মালাধর বসু ভাগবত-পুরাণের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ কবি। ভাগবত-অনুবাদ কালে তিনি যে ধারা ও নীতি অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যোত্তর-কালে অন্ততঃ ৩৪ জন ভাগবত-অনুবাদকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের প্রায় সকলেই মালাধর বসুর মতই ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধেরই অনুবাদ করেন এবং অনুবাদকালে যুগধর্মের কথা স্মরণ রেখে প্রায় বাঙালী-জীবনের পটভূমিকাতেই শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করেন। এ বিষয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'ভাগবতের তত্ত্ব ও কাহিনী বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া এই লেখক-গোষ্ঠী...কাহিনীর সূক্ষ্ম ও বাঙালী রুচিসম্মত রূপান্তরের দ্বারা বাঙলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসানুভূতির দৃঢ়ীকরণও সাধন করিয়াছিলেন।' ভাগবতের অনুবাদের নামকরণের ব্যাপারে কবিরা আত্মবুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। সাধারণভাবে এগুলিকে 'কৃষ্ণায়ন কাব্য' বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামেই অভিহিত করলে সামঞ্জস্য বিহিত হ'তো বলে মনে করা চলে।

১. **'রঘুনাথ পণ্ডিত'**:—ভাগবত-অনুবাদকদের মধ্যে একমাত্র রঘুনাথ পণ্ডিতই সমগ্র ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন—অতএব ভাগবত-অনুবাদক-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁকে ব্যতিক্রম বলেই গ্রহণ করা চলে। রঘুনাথ পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক—তাঁর ভাগবত পাঠ শুনে চৈতন্যদেব তাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৫১৪ খ্রীঃ-এর অল্প পরেই ভাগবত রচনা করেছিলেন। তাঁর

রচিত কাব্যের নাম 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। রঘুনাথ সমগ্র ভাগবত অনুবাদ করলেও প্রথম নয়টি স্কন্ধের বেশ সংক্ষেপ সাধন করেছিলেন। অনুবাদের ভাষা গম্ভীর ও ওজস্বী। ডঃ সুকুমার সেন বলেন: 'শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভক্তিকে জাগরিত করে না, বুদ্ধিকেও উদ্বুদ্ধ করে—ইহা তাহারই অনুবাদ।'

২. 'দ্বিজ মাধব' বা 'মাধবাচার্য' :—মাধব কবির সংখ্যা এবং পরিচয়-বিষয়ে এত পরস্পরবিরোধী মতবাদ বর্তমান যে এ বিষয়ে কোন সুস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে একজন মাধবাচার্য যে চৈতন্য সমসাময়িক ছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা ছিলেন এক মাধবাচার্য। আবার দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য এক মাধবাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন—এখন এই উভয় মাধব একই ব্যক্তি কিনা, জানা আর সম্ভবপর নয়। এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলও মালাধর বসুর অনুকরণে রচিত এবং এতেও কিছু কিছু উপাদান ভিন্ন সূত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। এতেও 'দানলীলা' ও 'নৌকালীলা' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩. 'কৃষ্ণদাস' :—মাধব-চরিত্র' বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস ছিলেন মাধবাচার্যের শিষ্য। গুরুও যে একখানি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেছিলেন, তার উল্লেখ কৃষ্ণদাসের কাব্যে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনিও ভাগবতপুরাণ থেকে শুধু কৃষ্ণ কাহিনীই গ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণকথাকে সম্পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলবার জন্য তিনি ভিন্ন গ্রন্থেরও শরণ নিয়েছেন, এমন কি, মহাভারত থেকে 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ'ও বর্ণনা করেছেন। কাব্য হিসেবে কৃষ্ণদাসের রচনা সার্থক। ছন্দ-বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতে কথ্য বাঙলার বাগ্‌রীতি ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪. 'কবিশেখর দৈবকীনন্দন' :—'গোপালবিজয়' নামক ভাগবতের অনুবাদক এবং বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতা কবিশেখরকে ডঃ সুকুমার সেন অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে করেন। আত্মপরিচয়ে কবি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর নাম 'দৈবকীনন্দন', কিন্তু 'শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন।' 'গোপালবিজয়' বর্ণনাত্মক কাব্য, এতেও ভাগবতের কাহিনী বিস্তৃতভাবেই পরিবেষিত হ'য়েছে। ভাষা, ছন্দ এবং অলঙ্কার-ব্যবহারে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'গোপালবিজয়' ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় 'গোপালচরিত' নামে মহাকাব্য এবং 'গোপীনাথবিজয়' নামক নাটকও রচনা করেন। তাঁর পদাবলীগুলিকেই সম্ভবতঃ তিনি 'গোপালের কীর্তনামৃত' নামে অভিহিত করেছেন।

৫. 'কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস' কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর উপাধি-প্রাপ্ত কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ভাগবতের যথাসম্ভব মূলানুগ রচনা করেন এবং অ-ভাগবতীয় কোন কাহিনী গ্রহণ করেন নি। এই ধারার কবিকুল থেকে এ বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর রচনা বর্ণনাত্মক—পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ এতে কম।

৬. 'ভবানন্দ' :—ভবানন্দের রচিত গ্রন্থের নাম 'হরিবংশ' হলেও সংস্কৃত 'হরিবংশে'র সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইনি ভাগবতেরই অনুবাদ করেছেন, তবে দানখণ্ডাদিও যোগ করেছেন। এই গ্রন্থের রাধার মাতা এবং সখীদের যে নাম উল্লেখ করেছেন, অন্য কোন গ্রন্থে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। রচনায় সহজ কবিত্বশক্তি থাকলেও গ্রাম্যতার প্রভাব যথেষ্ট। গ্রন্থমধ্যে বাঙলা ও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত কিছু পদ রয়েছে।

৭. 'কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী' :—বহু গ্রন্থ-রচয়িতা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রচিত ভাগবতের অনুবাদের নাম ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য। কবি সমগ্র ভাগবতেরই অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে কৃষ্ণকাহিনী তিনি যত বিস্তৃত-ভাবে পরিবেষণ করেছেন, অপরাংশে তিনি তত গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি হরিবংশ এবং ভবিষ্যপুরাণ থেকেও কিছু কাহিনী গ্রহণ করেছেন। 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি বর্জন করলেও তিনি অনেক নূতন ও অর্বাচীন কাহিনী গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৮. 'জয়নারায়ণ ঘোষাল' : ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৩ খ্রীঃ 'শ্রীকরুণানিধান বিলাস' নামে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণকাহিনীর বাইরেও এতে রয়েছে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়ালীলা, কোজাগরীলীলা, মনসাপূজালীলা, কার্ত্তিকপূজালীলা' প্রভৃতি। ডঃ সুকুমার সেন এর মূল্য সম্বন্ধে লিখেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই কাব্যটি মূল্যবান-উপকরণ যোগাইবে।'

[তেরো] মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, রূপ ও বিবর্তন ঃ

প্রশ্ন ২০। বাঙলার যে সামাজিক পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল. তার পরিচয় দাও এবং মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২১। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন রূপ রূপান্তর এবং বিবর্তন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(ক) **মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব** ঃ—আদিমধ্যযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারায় মূলতঃ কিছু কিছু অনার্য দেব-দেবীর এবং পরে কোন কোন পৌরাণিক দেব-দেবীর, এমন কি দেবোপম মানুষেরও গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য প্রচার করা হ'য়েছিল—এই ধারাটিরই সাধারণ প্রচলিত নাম 'মঙ্গলকাব্য সাহিত্য'। এই ধারাটির উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবতঃ ক্রান্তিকালেই অর্থাৎ তুর্কী আক্রমণ যুগেই। তুর্কী আক্রমণের আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা না থাকায় তৎকালীন বাঙালী আত্মরক্ষার তাগিদে প্রথম দিকটায় কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এরই মধ্যে তারা অনুভব করেছিল যে, তাদের প্রতিবেশী যে সকল অনার্য আদিবাসীকে তারা দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের সহযোগিতা ছাড়া আত্মরক্ষা সম্ভবপর নয়। এই কারণেই ধীরে ধীরে তারা আদিবাসীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করায় অনার্য আদিবাসীদের একটা বড় অংশ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু এরা নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ করেনি—তারা তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো তাদের অনার্য জীবনের বিভিন্ন দেবদেবী, আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা প্রভৃতি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ক্রমশঃ তাদের স্বাঙ্গীকরণ ক'রে নিয়ে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আদির সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করেছিল। এই নবাগত দেবদেবীদের মাহাত্ম্য-প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হ'য়েছিল বাঙলা ভাষায় নব-পুরাণ এই 'মঙ্গলকাব্য' গুলি।

১. **বাঙলা পুরাণ ঃ**—অতি প্রাচীনকালে আর্য-অনার্য-সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের যুগ যে সামাজিক পরিবেশে সংস্কৃত ভাষায় বহুতর পুরাণ রচিত হ'য়েছিল, অনুরূপ অবস্থা ও পরিবেশেই বাঙলাদেশেও পরবর্তীকালে পুরাণেরই নব সংস্করণ বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হ'য়েছিল। বৈদিক যুগের অন্তে আর্য-অনার্য-সমন্বয়ের ফলে প্রভূত পরিমাণ অনার্য

দেব-দেবী ও ধর্মভাবনা আর্যসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়েছিল। নবাগত দেব-দেবী ও ধর্মভাবনাকে আর্যগণ আত্মস্থ ক'রে নিয়ে তাকে যথোপযুক্তভাবে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার জন্যই তারা প্রচুর পুরাণ-উপপুরাণ রচনা করেছিলেন। কালে এই পুরাণগুলির বিভিন্ন লক্ষণও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে—'সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও চরিত'—এগুলিই পুরাণের প্রধান লক্ষণ, যদিও প্রায় কোন পুরাণেই এ সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত নেই। প্রাচীনকালে আর্য-অনার্য-সমন্বয়ের মতই মধ্যযুগেও বাঙলাদেশে তুর্কী আক্রমণ-কালে আবার আর্য-অনার্য সমীকরণ ঘটেছিল। এখানেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। অতএব অনার্য সমাজ থেকে নবাগত দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই পুরাণ জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তন ঘটায় সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া এই নবজাত সাহিত্যের পাঠক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল সাধারণ নাগরিকবৃন্দ। জনসাধারণের পংক্তিভোজে উপস্থিত রসভোক্তাদের সংস্কৃত ভাষায় রসাস্বাদনের ক্ষমতা না থাকায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল বাঙলা ভাষায়। আবার এ জাতীয় গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা কেউ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের ধীরোদাত্ত-প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। এঁরা এসেছেন সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে, বড় জোর এঁরা ছিলেন বণিক জাতীয়। কাজেই সংস্কৃত ভাষায় এঁদের কাহিনী রচনা করলে বাস্তবের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য থাকতো না। এই কারণেই পুরাণ জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও নবপুরাণ মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলা ভাষায় রচিত হ'য়েছিল।

২. **নামকরণ :**—মঙ্গল-কাব্যের মঙ্গল শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এ বিষয়ে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'মঙ্গলকাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাঙলা 'যাত্রা' মানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দিতে তেমনি মঙ্গল মানে মেলা, যাত্রা বা গমন।...যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গলগান বলে।' এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেন : 'ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনাকে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া যে গান রচিত হয় তাহাকেই 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গলগান' বলে। সাহিত্যে 'মঙ্গল' শব্দের খুব প্রাচীন প্রয়োগ পাওয়া যায় জয়দেবের রচনায়। তিনি তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যকে 'উজ্জ্বলমঙ্গলগীতি' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ 'কাহিনী প্রধান রচনা' বলেই অনুমিত হয়। 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত থাকার জন্যই সম্ভবত: এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হ'য়ে পরবর্তী মঙ্গলবারে আটদিনে ষোল পালায় এর পাঠ সমাপ্ত হ'তো।

(খ) রূপ :—মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবত: তুর্কী-আক্রমণ-কালে তথা ক্রান্তিকালে। তখন তার আকার বা রূপ কেমন ছিল, তা জানা না থাকলেও অনুমান, করা হয় যে, তখন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি সংক্ষিপ্ত পাঁচালীর আকারেই বর্তমান

ছিল। তারপর আদিমধ্যযুগেই আমরা প্রচলিত আকারে পাচ্ছি অন্ততঃ মঙ্গলকাব্যের একটি ধারা—'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ'কে। অন্ত্যমধ্যযুগে সবচেয়ে উৎকৃষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল'। মঙ্গলকাব্য শাখার তৃতীয় প্রধান শাখা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত না হ'লেও এই গোষ্ঠীরই অপর শাখা 'শিবায়ন' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও বস্তুতঃ এই ধারাটি ভাগবতের অনুবাদরূপেই গৃহীত হ'য়ে থাকে। পরে আরো অনেক অনার্য সমাজ থেকে আগত দেব-দেবী-বিষয়ক, পৌরাণিক কাহিনী এবং কাব্যও 'মঙ্গলকাব্যে'র পরিচয় লাভ করেছে, এমন কি দেবোপম নর-নারীর কাহিনীর নামেও 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হয়েছে।

প্রাচীনত্ব, সংখ্যা ও উৎকর্ষের বিচারে মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রধান দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। (১) প্রধান মঙ্গলকাব্য ও (২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য।

১. **প্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ**—প্রধান মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে পড়ে 'মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন'। আপাতত যে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের পুঁথি আমাদের হস্তগত হ'য়েছে, তার বিচার-বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয় যে 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ'-ই প্রাচীনতম। এর অন্ততঃ তিনজন গ্রন্থকারকে চৈতন্য-পূর্ব কালে স্থাপন করা হয়। এঁরা—নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই। মনসামঙ্গল কাব্যের এ ছাড়াও অর্ধশতাধিক কবির নাম পাওয়া গেলেও এঁদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বণিক্ প্রধান চাঁদসদাগর বা সাধু চন্দ্রধরের পূজা লাভের জন্য দেবী মনসার নিষ্ঠুরতার কাহিনীই এর প্রধান উপজীব্য।

'চণ্ডীমঙ্গল'ও প্রাচীন কাব্য, তবে চৈতন্য-পূর্বযুগের কোন কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই ধারার কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ ক'রে থাকেন। অপর কবি দ্বিজ মাধব। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দু'টি পরস্পর নিরপেক্ষ কাহিনী—একটি ব্যাধসন্তান কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী, অপরটি বণিক্ ধনপতি সদাগরের কাহিনী। এই কাব্যে দেবী চণ্ডীর মধ্যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় নেই।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিস্তৃতি রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কাহিনী লাউসেনকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠলেও পার্শ্বকাহিনী রয়েছে অনেকগুলি। এতে কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনীও যুক্ত হ'য়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

'শিবায়ন' কাব্যের প্রধান দেবতা পৌরাণিক শিব—অতএব পূর্বোক্ত মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে এর একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি লৌকিক কাহিনীও যুক্ত রয়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২. **অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ**—অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের অনেকগুলিই পৌরাণিক দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার-উপলক্ষ্যে রচিত। অতএব এ দিক থেকে এগুলিকে মূল

ধারার বহির্গত বলাই উচিত। এই অপ্রধান মঙ্গল কাব্যধারায় কোন উল্লেখযোগ্য কবির পরিচয় পাওয়া যায় না—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং তাঁর কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'ই এই ব্যতিক্রম। অপ্রধান ধারায় রয়েছে 'গঙ্গামঙ্গল'—এই ধারার কবিদের মধ্যে আছেন মাধব, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ। 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা পাকুড়ের ভূস্বামী পৃথ্বীরাজ। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের কবিদের মধ্যে আছেন—নিত্যানন্দ ও বল্লভ। 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের কাহিনীকার ভবানীপ্রসাদ, রূপনারায়ণ ও রামচন্দ্র। 'বাসুলীমঙ্গল' কাব্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিচন্দ্র মুকুন্দ। 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যের কবি কৃষ্ণরাম, রুদ্ররায় ও শঙ্কর। 'রায়মঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দরের' অনেক কবিদের মধ্যে আছেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কবি কঙ্ক, সাবিরিদ খাঁ। এগুলি ছাড়াও রয়েছে—'সূর্যমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, বরদামঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল' প্রভৃতি।

এ ছাড়া 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল'-আদি গ্রন্থের সঙ্গে 'মঙ্গল'-শব্দ যুক্ত থাকলেও এগুলি বস্তুতঃ জীবনী-গ্রন্থ—নাম ছাড়া মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

৩. **রূপগত বৈশিষ্ট্য :** পুরাণগুলির কিছু আঙ্গিক লক্ষণ আলঙ্কারিকগণ নির্দেশ করলেও মঙ্গলকাব্যের এরূপ রূপগত বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে আলঙ্কারিকগণ কিছু বলেন নি। অবশ্য পুরাণগুলিতে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে উল্লেখ থাকা-সত্ত্বেও অধিকাংশ পুরাণকার তা' মান্য করেন নি। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তাদের মধ্যে আমরা যে সকল সাধারণ লক্ষণ খুঁজে পাই, সেগুলিকেই রূপগত বৈশিষ্ট্য বা আঙ্গিক লক্ষণ-রূপে নির্দেশ করা হয়। প্রতি মঙ্গলকাব্যের সাধারণতঃ দু'টি ভাগ থাকে: একটিতে দেবখণ্ড—এখানে গ্রন্থের উদ্দিষ্ট দেবতাকে সাধারণ মহাদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। অপরটি নরখণ্ড—এখানে মর্ত্যলোকে দেবতা স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যে মানব-মানবীকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ক'রে থাকেন, তারই কাহিনী বর্ণিত হয়। মঙ্গলকাব্যের প্রথমেই বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রশস্তি বন্দনা ও গ্রাম-দেবতাদের বন্দনা। এরপর থাকে 'গ্রন্থোৎপত্তি'র কারণ। সাধারণতঃ কারণ হিসেবে দৈবাদেশ বা স্বপ্নাদেশের কথাই বর্ণিত হয়। কোথাও কোথাও কবির পৃষ্ঠপোষক ভূস্বামীর নামও উল্লেখ করা হয়। এরপরই দেবখণ্ড। এতে সৃষ্টিপত্তন, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে নবজন্ম লাভ এবং হরগৌরীর সংসার প্রভৃতি বর্ণিত হ'য়ে থাকে। এখানেই কোন দেবতা বা গন্ধর্বকে শাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে পাঠানো হয়—উদ্দেশ্য, এর সাহায্যে উদ্দিষ্ট দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচার। দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটি এর দ্বারাই সম্পর্কিত হ'য়ে থাকে। এরপর নরখণ্ড—শাপভ্রষ্ট নররূপী দেবতার কার্যকলাপ অন্তে আবার স্বর্গারোহণ—তার জীবন-যাত্রার কাহিনীই এখানে বর্ণিত হ'য়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার অতি বাস্তব রূপায়ণ অধিকাংশ গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতে বিশ্বকর্মা-কর্তৃক কাঁচুলি, দেউল ও নগর-নির্মাণ, বারমাস্যা, নারীদের পতিনিন্দা, বাঙলার রন্ধনপ্রণালী ও ভোজ্যতালিকা, বাঙলার ফল-ফুল-গাছ-মাছ-পশু-পাখির নাম উল্লেখ, চৌতিশা স্তব,

লোক-ঠকানো ধাঁধা ও তার উত্তর প্রভৃতি প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই আঙ্গিক লক্ষণরূপে গৃহীত হ'য়ে থাকে।

(গ) **বিবর্তন**:—মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবতঃ তুর্কী-আক্রমণ কালের ক্রান্তিলগ্নে, অন্ততঃ পরবর্তীকালের কবিদের সাক্ষ্য থেকে এই অনুমানটিকে যথার্থ বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয় গুপ্ত উল্লেখ করেছেন—

'প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।'

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী বলেছেন—

'মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ-পরিচয়॥'

অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বলেন—'হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে' তিনি গীত রচনা করেন। এই কানা হরিদত্ত, মাণিক দত্ত কিংবা ময়ূরভট্টের কোন প্রামাণিক পুথি পাওয়া যায় না। এই তিন জনকে তিন মঙ্গলকাব্যের পূর্বসূরীরূপে পরবর্তীকালের তিন শ্রেষ্ঠ কাব্যকার নির্দেশ ক'রে গেছেন। অনুমান করা হয়, ওঁরা ওই ক্রান্তিকালে বর্তমান থেকে যে কাব্য রচনা করেছিলেন, হয়তো বা রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এরা কালের হাত এড়িয়ে একাল পর্যন্ত এসে পৌছুতে পারেননি। অনেকে অনুমান করেন, এঁরা সম্ভবতঃ পাঁচালী-আকারে কাহিনীর কাঠামোটুকুই গড়ে তুলেছিলেন, পরবর্তীকালের শক্তিমান কবিরা ওই দেহে রক্ত-মাংসাদি যোজনা ক'রে ওদের প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের রূপ দান করেছেন।

প্রকৃত মঙ্গলকাব্যকে আমরা প্রথম পাচ্ছি আদি-মধ্যযুগে, তখন একমাত্র মনসামঙ্গল কাব্যধারারই সৃষ্টি হ'য়েছিল ব'লে এখন পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চাঁদসদাগরকে আশ্রয় করতে চান—কিন্তু শিব-ভক্ত চাঁদসদাগর কিছুতেই মনসার পূজা করতে স্বীকৃত হ'চ্ছেন না। তিনি বলেন:

'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে না পূজিব চ্যাংমুড়ি কানি॥'

ফলে সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্য জু'ড়ে মনসা ও চাঁদসদাগরের দ্বন্দ্ব চলছে। দেবতা-মানুষের এই অসম যুদ্ধেও চাঁদসদাগর কিন্তু প্রবল প্রতাপে মাথা উঁচু ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনসার নিগ্রহ এবং নিষ্ঠুরতাও চাঁদসদাগরকে টলাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চাঁদসদাগর মনসার পূজা করলেন, কিন্তু ভয়ে বা ভক্তিতে নয়—পুত্রবধূ বেহুলার প্রতি স্নেহের আতিশয্যই চাঁদকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে, সমাজে তখন বণিকসম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। তাই বণিক সমাজে পূজা প্রচারের জন্যই দেবী মনসার আগ্রহাতিশয্য। সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য মনসাকে প্রচুর ছলনা, বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার সাহায্য নিতে হ'য়েছিল।

পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি সবই রচিত হ'য়েছিল চৈতন্যোত্তর যুগে। ফলে চৈতন্য-পূর্ব মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এদের গুণগত পার্থক্যও যথেষ্ট দেখা দিয়েছিল। চৈতন্যের আবির্ভাবে যে সমাজ-পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্বতন গোঁড়ামি ছিল অনুপস্থিত, বর্ণাশ্রম প্রথাও অনেকটা শিথিল হ'য়ে পড়ে, আর এই অবসরে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীও মঙ্গলকাব্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনার্য ব্যাধসন্তান কালকেতু কাব্যের নায়কত্ব লাভ করে। অনার্য দেব-দেবীরাও সমাজে অনেকটা স্থান করেছিলেন বলেই চণ্ডীকে মনসার মত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে হয়নি। বস্তুতঃ দেবী চণ্ডীর মধ্যে মমত্ববোধই বেশী ফুটে উঠেছে। আর্য-অনার্য সমীকরণ-প্রক্রিয়াটি যে এইযুগে অনেকটা ত্বরান্বিত হ'য়েছিল, তা সহজেই উপলব্ধি করা চলে। তার ফলে সমাজে যে একটি সহনশীলতার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা'ও বোঝা যায়, যখন দেখি সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য চণ্ডীকে আর মনসার মতো নিষ্ঠুর হ'তে হয়নি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-কাহিনীতে সমসাময়িক যুগের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। প্রাচীন বর্ণগত কৌলীন্যপ্রথা কীভাবে ক্রমশঃ কাঞ্চন-কৌলীন্যকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, তার এক উপাদেয় কাহিনী এই চণ্ডীমঙ্গল। বিত্তবান্ অনার্য ব্যাধসন্তানকে দমিয়ে রাখবার জন্য ব্রাহ্মণ্য সমাজাশ্রিত কলিঙ্গরাজ বিধিমত চেষ্টা করেছিলেন। প্রজাসাধারণও প্রথমত অনার্য রাজার রাজ্যে বসবাসে অনিচ্ছুকই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনকৌলীন্যেরই জয় হ'লো, কলিঙ্গরাজ অনার্য ব্যাধসন্তান কালকেতুর সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'লেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দু'টি কাহিনী—একটিতে দেবী বনের পশুদের ও ব্যাধের পূজা গ্রহণ করলেন। অপরটি পরপর রাখাল, নারী ও বণিক্ পুরুষের পূজা গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে চণ্ডীপূজার ক্রমিক উত্তরণও লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল আরও পরবর্তীকালে। মনসা এবং চণ্ডীর মতই ধর্মঠাকুরেরও উদ্ভব ঘটেছিল অনার্য-সমাজ থেকেই। ধর্মপূজার ইতিহাসে একটা অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যায়। মনসা এবং চণ্ডী যেমন ক্রমশঃ সমাজের উচ্চস্তরে পূজা পাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগৃহে পূজা পাবার অধিকার অর্জন করেছেন, ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে কিন্তু সে রকমটি হয় নি। মনে হয়, ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব অনেকটা বিলম্বিত হ'য়েছিল বলেই তেমন মাজাঘষার অবকাশ ঘটেনি, ফলতঃ উচ্চ-সমাজে তাঁর আর আরোহণের সুযোগ হয় নি। তবে অন্যদিক দিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মঠাকুরের পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, ডোম জাতীয় পুরোহিতরাই ধর্মপূজা ক'রে থাকেন এবং সমাজও তা' স্বীকার ক'রে নিয়েছে। অতএব এই পর্যায়ে ডোমরাও বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার অর্জন করেছে বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া চলে। তবে ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচনায় কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সকল মঙ্গলকাব্যেই শিবের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে প্রসঙ্গক্রমেই মাত্র, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে কিন্তু শিবই প্রধান দেবতা। এর এক ভাগে অপরাপর মঙ্গলকাব্যের মতই পৌরাণিক শিবের কাহিনী, অপর অংশে আছে লৌকিক শিবের কাহিনী—যে শিব কোচপট্টিতে ঘুরে বেড়ান এবং কৃষিকার্যে ব্যস্ত থাকেন। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিবায়ন কাব্যে কাব্যের অধিদেবতা শিব নিজেই নায়ক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

[চৌদ্দ] **মনসামঙ্গল :**

প্রশ্ন ২২। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের নামকরণ, উদ্ভব ও বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে প্রধান কবিদের নামোল্লেখ কর।

প্রশ্ন ২৩। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কবিদের তোমার বিবেচনায় কার কৃতিত্ব সর্বাধিক? তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২৪। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সাধারণ পরিচয় দিয়ে বিজয়গুপ্তের কৃতিত্বের উপর আলোকপাত কর।

প্রশ্ন ২৫। নারায়ণদেবের পরিচয় সমস্যার উপর আলোকপাত করে মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতারূপে তাঁর কৃতিত্ব বিচার কর।

প্রশ্ন ২৬। 'কেতকাদাস' ও 'ক্ষেমানন্দ' কি একই কবির নামান্তর অথবা তাঁরা দুজন কবি? মনসামঙ্গল কাব্যকর্তারূপে কবির কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

ভূমিকা :—বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্য-পূর্ব যুগেই যে মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবনদাস। তিনি 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে চৈতন্য-আবির্ভাব কালের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে নবদ্বীপের তৎকালিক অবস্থা-সম্বন্ধে লিখেছেন :

'দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।'
এবং 'দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।'

—এই দেবী বিষহরীই দেবী মনসা—যাঁর মাহাত্ম্য-প্রচার উপলক্ষ্যে রচিত হ'য়েছিল অসংখ্য 'মনসামঙ্গল কাব্য' বা 'পদ্মাপুরাণ'। চৈতন্য-পূর্বযুগেই অন্ততঃ তিন চারজন মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দীকালে এই সংখ্যা বহুগুণিত হ'য়েছিল। তা ছাড়া এই কাব্যের সমগ্র বঙ্গে তো ব্যাপ্তি ছিলই, এমন কি বহির্বঙ্গে আসামে এবং বিহারেও মনসামঙ্গলের প্রচার-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায়। দেবী মনসা সর্পদেবতা—আর হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জল-জঙ্গলময় এই অঞ্চলে সর্পের প্রাচুর্য হেতু তার হাত থেকে পরিত্রাণের নিমিত্ত মনসা বা বিষহরীর শরণ

গ্রহণ অতিশয় স্বাভাবিক বলেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা এই মনসামঙ্গলের প্রচার ও প্রসার ছিল অনেক বেশি।

কিছু কিছু অর্বাচীন পুরাণে মনসার কাহিনী বিবৃত হলেও বস্তুতঃ মনসা যে কোন এক অনার্য সমাজে গৃহীত হ'য়েছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রায় অভিন্ন মত। বেদে এবং মহাভারতে সর্প এবং নাগজাতির বিবরণ থাকলেও দেবী মনসার পূজা ও মনসামঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে এদের দূরতম সম্পর্কও কল্পনা করা যায় না। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে 'মনে মঞ্চাম্মা' নামে এক সর্পদেবী পূজিতা হন, এ থেকেই 'মন্‌চা মা' বা 'মনসা মা'-এর বঙ্গীয় সমাজে আবির্ভাব ঘটাই স্বাভাবিক। অবশ্য এই নামের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত বিভিন্ন দেবীর গুণগত সম্পর্ক যুক্ত হ'য়ে থাকতে পারে। বৈদিক সরস্বতী ছিলেন সর্পবিষমোচয়িত্রী এবং শবরকন্যা; বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলীও জঙ্গলবাসিনী, সর্পবিষমোচয়িত্রী এবং বীণাবাদিনী। হয়তো মনসার আর্যীকরণের কালে দেবী সরস্বতী এবং জাঙ্গুলীদেবীর কিছু কিছু গুণাগুণ তাঁর উপর আরোপিত হ'য়ে থাকতে পারে। দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেনবংশীয় রাজাদের সঙ্গে সঙ্গেই মনসাপূজাও বাঙ্‌লায় এসেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। বিজয় সেন-নামাঙ্কিত মনসামূর্তিই বাঙলার প্রাচীনতম মনসার নিদর্শন—এ থেকেও পূর্বোক্ত অনুমানটি সমর্থিত হয়। অতএব একাদশ শতাব্দীর পরই কোন এক সময় কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে মনসা-পূজা এবং মনসামঙ্গল-কাহিনী সূত্রাকারে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকতে পারে বলেই অনুমান করা হয়।

মনসামঙ্গল কাহিনীর উদ্ভব কীভাবে ঘটেছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে প্রথমাংশের দেবখণ্ড মূলতঃ পুরাণ থেকে এবং মহাভারতের আস্তীক মুনির কাহিনী থেকে নাগজাতির কিছু উপাদান গৃহীত হ'য়ে থাকতে পারে। অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ মূলকাহিনীটি সম্ভবতঃ কোন লৌকিক কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রেই রচিত। লখাই, বেহুলা, সায়বেনে প্রভৃতি নাম থেকে কাহিনীটির অনার্য-সম্পর্ক মনে জাগে। বাঙলাদেশ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে মনসামঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে জড়িত কোন কোন স্থানের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়। এ থেকে কাহিনীটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা চলে না।

প্রচলিত মনসামঙ্গল কাহিনীর তিনটি অংশ; প্রথম অংশটি পৌরাণিক কাহিনী; ইহাতে শিবের সঙ্গে মনসার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে চাঁদসদাগর ও দেবী মনসার সংঘর্ষের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছে। তৃতীয় অংশের প্রধান কাহিনীটি বেহুলা-লখিন্দরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। মনসাকে শিবকন্যা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু সৎমা চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর কলহ। মর্ত্যলোকে তাঁর পূজা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা এমন উগ্রতা লাভ করে যে তাঁর পক্ষে কিছুই অকরণীয় ছিল না। তাঁর ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা সীমাতীত। চাঁদসদাগরের পূজালাভের জন্য মনসা যথেষ্ট চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হ'লেন না, তখন প্রতিহিংসাবশে তিনি চাঁদের বাগানবাড়ি ধ্বংস করলেন, তার

মহাজ্ঞান মন্ত্র অপহরণ করলেন, সপ্তডিঙ্গা মধুকরকে ডুবিয়ে দিলেন এবং চাঁদের সাত পুত্রকে সর্পদংশনে হত্যা করলেন। চাঁদ তবু ছিল অচল-প্রতিষ্ঠ। শেষ পর্যন্ত কনিষ্ঠপুত্র লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলা ইন্দ্রসভায় উপস্থিত হ'য়ে নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'লো—তিনি চাঁদসদাগরকে দিয়ে মনসার পায়ে অঞ্জলি দেওয়াবেন। বেহুলার কথা রক্ষার জন্যই চাঁদসদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা করলেন এবং মনসার বরে সকল পুত্রের প্রাণ, সপ্তডিঙ্গা মধুকর-আদি যাবতীয় ঐশ্বর্যই ফিরে পেলেন।

সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে চাঁদের মতো এমন দৃপ্ত পৌরুষময় চরিত্র আর একটিও নেই। কাহিনীর প্রয়োজনেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হ'য়েছিল। যে যুগে এই কাহিনী কল্পিত হ'য়েছিল, সম্ভবতঃ তখন বঙ্গদেশের বাণিজ্যতরী বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো। ফলতঃ সমাজে বণিক সম্প্রদায়েরই ছিল প্রবল প্রাধান্য। তাই মনসা বণিকদের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে ছলে-বলে কৌশলে যেভাবেই হোক্ কিছুটা স্থান ক'রে নিতে পেরেছিলেন। কোন এক অনার্য দেবীর আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনীর প্রয়োজনেই যে মনসামঙ্গল কাহিনী গড়ে উঠেছিল, এ সত্য বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা চলে।

(ক) বিজয়গুপ্ত :—'মনসামঙ্গল কাব্য'-রচয়িতাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তি। তাঁর কাব্যকে তিনি 'পদ্মাপুরাণ' নামে অভিহিত করেছেন। কবি কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তিনি বর্তমান বাখরগঞ্জ জিলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী। কবি ছিলেন বৈদ্যবংশজাত এবং মনসার উপাসক। স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত 'মনসার স্থান' বঙ্গবিভাগকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পদ্মাপুরাণ-রচনার কাল-জ্ঞাপক তিনি যে শ্লোক রচনা করেন, তার অন্ততঃ তিনটি পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটিতে আছে—'ঋতুশূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ'—এতে পাওয়া যায় ১৪০৬ খ্রীঃ। অপর একটি পাঠ—'ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমাণ'—এর অর্থ ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীঃ। আর একটি পাঠে আছে—'ছায়াশূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ'—এটির অর্থ উদ্ধার করা যায় নি। অপর একটি চরণে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

'সুলতান হোসেন শাহ্ নৃপতি তিলক'

অর্থাৎ তাঁর কাব্য-রচনাকালে সুলতান হোসেন শাহ্ ছিলেন গৌড়াধিপতি। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৩ খ্রীঃ থেকে ১৫১৮ খ্রীঃ-কেই বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনাকাল বলে গ্রহণ করা চলে। তবে ১৪৮৫ খ্রীঃ-র দাবিকেও অস্বীকার করা চলে না। ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেন যে জালালুদ্দিন ফতে শাহ্-ও 'সুলতান হোসেন শাহ্' নামে ১৪৮১ খ্রীঃ-১৪৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙ্লার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই হিসেবে ১৪৮৪ খ্রীঃ-ও কাব্যের রচনাকাল হাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বিজয়গুপ্ত-রচিত গ্রন্থের খুব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না বলে ডঃ সুকুমার সেন বিজয়গুপ্তের

এত প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁর মতে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা না হ'য়ে এর গায়েনও হ'য়ে থাকতে পারেন।

বিজয়গুপ্ত মনসার উপাসক ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ সমগ্র কাব্যে তিনি মনসাকেই প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেছেন। তার ফলে, কাব্যের নায়ক চন্দ্রধর বা চাঁদসদাগর অনেকটাই উপেক্ষিত হ'য়ে রয়েছেন। চাঁদসদাগরের যে পৌরুষদৃপ্ত চরিত্র অপর সকল মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে, বিজয়গুপ্তে তার বেদনাদায়ক অভাব পরিলক্ষিত হয়। শেষ পর্যন্ত কবি চাঁদসদাগরকে এমনভাবে মনসা-ভক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন যে চাঁদচরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গতিবিধান কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর প্রয়োজনে কবি মনসাকেও অতিশয় নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ক'রে তুলতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু মনসার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি আরোপ করতেও চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মনসা জন্মাবধি এমন কিছু কিছু প্রতিকূল শক্তির দ্বারা নির্যাতিত হ'য়েছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁর নিরুদ্ধ চিত্তবেদনাই তাঁকে এমন নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ক'রে তুলেছিল।

বিজয়গুপ্ত শুধু কবি ছিলেন না, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যেরও অধিকারী ছিলেন বলেই রচনায় কোনপ্রকার শিথিলতা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি পূর্বসূরী কবি হরিদত্ত সম্বন্ধে বলেছেন :

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥'

বিজয়গুপ্তের এই উক্তিতে পূর্বসূরী-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিনয় রয়েছে সত্য, কিন্তু কাব্য-গুণ-বিবর্ধক অলঙ্কারাদি-বিষয়ে যে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন তার পরিচয় এখানে বিধৃত। বস্তুতঃ বিজয়গুপ্তের রচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান অক্ষুণ্ণ রয়েছে,—ছন্দ, মিল, অলঙ্কারাদি-বিষয়ে তিনি যথার্থ নিপুণতারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কোন কোন উক্তি প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পয়ার-ত্রিপদী ছাড়াও তিনি 'লাচাড়ি' নামে লৌকিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দেরও সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিজয়গুপ্ত সমসাময়িক কবিদের চেয়ে যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রকে অনেকেই বিজয়গুপ্তের সার্থক উত্তরসূরী বলে বিবেচনা করেন। 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বিজয়গুপ্তের কৃতিত্ব-বিষয়ে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "সমসাময়িক যুগ ও জীবন হইতে কবি যে অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, কাব্যে তাহার পরিচয় বর্তমান। তাহার অঙ্কিত সামাজিক চিত্রগুলিও অংশবিশেষ রুচিবিগর্হিত বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের বাস্তবতা নিঃসংশয়িত। এই প্রসঙ্গে তিনি যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্থূল হইলেও যে সমসাময়িক যুগের পক্ষে বেমানান হয় নাই তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ছিল বৈচিত্র্যের প্রতি। তাই সমগ্র কাহিনীটি যেন অনেকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রায় পালায় বিভক্ত হইয়া আছে। কাহিনী-পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই কবির বৈচিত্র্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।”

বিজয়গুপ্তের কাব্যের দোষ-ত্রুটি-সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে ব্যাপকতায় ও জনপ্রিয়তায় বিজয়গুপ্তই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকেন।

(খ) **নারায়ণদেব** :—কবি নারায়ণদেব ছিলেন বাঙ্‌লার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। তিনি তাঁর গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন, তা' থেকে জানা যায় যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ রাঢ়দেশে বসবাস করলেও পরে বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বোরগ্রাম বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। কবির পিতার নাম নরসিংহদেব এবং মাতা রুক্মিণীদেবী। কবি কায়স্থবংশোদ্ভূত। তাঁর কাব্যে কোন কালবাচক ভণিতা না থাকায় এ বিষয়ে নিশ্চিন্তভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তবে বিভিন্ন বহিঃপ্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে এ বিষয়ে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

কবির বংশধরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বংশতালিকা-অনুযায়ী কবি সাম্প্রতিক কাল থেকে অন্ততঃ পাঁচশ' বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ কিংবা কোন প্রভাবচিহ্ন না থাকায় তাঁকে চৈতন্য-পূর্ব যুগে সংস্থাপন করা চলে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে যেমন পূর্ববর্তী কবি হরিদত্তের উল্লেখ রয়েছে, নারায়ণ-দেবের কাব্যে তেমন কোন পূর্ববর্তী কোন কবির উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা চলে যে তিনি হয়তো বা বিজয়গুপ্তেরও পূর্ববর্তী ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর কাব্যে এমন কিছু অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা রয়েছে, যা' থেকে অনুমান করা চলে যে মনসামঙ্গল কাব্যের কোন ধারা সৃষ্টি হ'বার পূর্বেই তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্যটি যে শ্লথবদ্ধ, তা থেকেও অনুমান করা চলে যে কাব্যক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ রূপের সাক্ষাৎ তিনি পান নি। এই সমস্ত বহিঃপ্রমাণ থেকে এ কথাই মনে করা চলে যে নারায়ণদেব চৈতন্য-পূর্ব যুগে সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন কবিকে ষোড়শ শতকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—কিন্তু তিনি এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপিত করেন নি, কিংবা কাল বিচারও করেননি।

কবি নারায়ণদেবকে নিয়ে আরো ক'টি সমস্যা দেখা দিয়েছে। অসমীয়া ভাষায়ও নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়—তাই অসমীয়াগণ কবিকে অসমীয়া বলে দাবি ক'রে থাকেন। নারায়ণদেব বাঙ্‌লাদেশের যে অঞ্চলে বসবাস করতেন, তা' আসামের অতি সন্নিহিত অঞ্চল। কবি যে কালে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়, সেকালে পূর্ব-ময়মনসিংহের ভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পার্থক্য অতি সামান্যই ছিল। কবির জনপ্রিয়তার কারণে অতি সহজেই তাঁর কাব্যের ভাষাকে অসমীয়া ভাষায়

রূপান্তরিত করা সম্ভবপর ছিল। সম্ভবতঃ অসমীয়া ভাষায় এইরূপ রূপান্তরিত গ্রন্থের আধিক্যহেতুই আসামবাসীগণ কবিকে অসমীয়া বলে দাবি ক'রে থাকেন। কিন্তু কবি যে বঙ্গদেশীয়, তা' আত্মপরিচয়-সূত্রে তিনি নিজেই বলে গেছেন।

কবি নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত কোন সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাঁর বহু গ্রন্থে 'সুকবিবল্লভ' ভণিতা থেকে অনুমিত হয় যে এটি ছিল কবিরই প্রাপ্ত উপাধি। এমন বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হ'য়েছে, যার বেশির ভাগ ভণিতা কবি নারায়ণদেবের হ'লেও তাতে আরো বহু কবির ভণিতাই যুক্ত রয়েছে—এ জাতীয় মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়। এর মূল ভিত্তিতে রয়েছেন কবি নারায়ণদেব। নারায়ণদেবের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণেই যে অপর কবিরাও তাদের রচনা নারায়ণদেবের কাব্যে প্রক্ষিপ্ত ক'রে কালজয়ী হবার স্বপ্ন দেখতেন, এ ধারণা সম্ভবতঃ অবাস্তব নয়। নারায়ণদেবের এই জনপ্রিয়তা তাঁর সার্থকতারই পরিচয় বহন করে।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি কে প্রথম কোথা থেকে গ্রহণ ক'রেছিলেন, তা' জানা যায় না। তবে নারায়ণদেব একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি সংস্কৃত পুরাণ থেকে তাঁর কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান কালে প্রচলিত কোন সংস্কৃত পুরাণেই এ জাতীয় কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না। কবির উক্তি যদি যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, কবি যে সংস্কৃত পুরাণ বা উপ-পুরাণ থেকে কাহিনীটি গ্রহণ ক'রেছিলেন, তার সম্ভবতঃ বিলুপ্তি ঘটেছে অপর অনেক পুরাণ বা উপপুরাণের মতোই। তবে নারায়ণদেব-বর্ণিত মনসামঙ্গলের সঙ্গে অপর সকল মনসামঙ্গলেরই মোটামুটি কাহিনীগত ঐক্য থাকায় অনুমিত হয়, মনসামঙ্গলকারদের মধ্যে কোন একজন যে কোন সূত্রে কাহিনীটি পেয়েছিলেন, অপরেরা তাঁর অনুসরণ করেছেন। অথবা, এঁরা প্রায় সকলেই কোন একটি সাধারণ উৎসমূল থেকেই কাহিনীটি গ্রহণ ক'রে নিজেদের রুচি ও সামর্থ্য-অনুযায়ী তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ধকার ঘরে কালো বিড়াল খুঁজে বার করার মতোই এ বিষয়ে যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

নারায়ণদেব শুধু কবি ছিলেন না, তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এই পাণ্ডিত্য কাব্যের উপর কখনো দুর্ভার হ'য়ে বসে নি। কবি সহজ কবিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সহজ কবিত্ব এবং করুণ রসের যথাযথ প্রয়োগ তাঁর কাব্যটিকে স্নিগ্ধতায় খণ্ডিত ক'রে রেখেছে। কাহিনী, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ছন্দ বা অলঙ্কার-বিষয়ে তিনি খুব বেশি সচেতনতার পরিচয় দেন নি। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থের নায়ক চাঁদসদাগরের চরিত্র সৃষ্টিতে। বস্তুতঃ সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে একমাত্র নারায়ণদেবের সৃষ্ট চাঁদসদাগর চরিত্রটিই আপন দৃপ্ত পৌরুষে এবং সমুন্নত মহিমায় মানব-মাহাত্ম্য-প্রকাশে সমর্থ হ'য়েছে। কাহিনীর প্রয়োজনে নারায়ণদেবের চাঁদসদাগরও মনসার চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন, কিন্তু আপনার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধাভরে তাঁর মাথা-

নত করেন নি! দেব-মানুষের অসম দ্বন্দ্বে দেবতার নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার দাপটে তিনি পরাজয় স্বীকার করেছেন, কিন্তু আত্মিক জয় ছিল তাঁরই। বস্তুতঃ মনসা-মঙ্গলকাব্যকারদের মধ্যে একমাত্র নারায়ণদেবই চাঁদসদাগর-চরিত্রে আগাগোড়া সঙ্গতি বজায় রাখতে পেরেছেন।

(গ) **কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ**:—মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত গ্রন্থই সর্বপ্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ ক'রে বলে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে এঁরই প্রচার এবং খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশকদের বিভ্রান্তির কারণে একসময় 'কেতকাদাস' এবং 'ক্ষেমানন্দ' নামক দু'জন কবির অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হ'তো। কিন্তু কবির নাম 'ক্ষেমানন্দ' এবং কেতকার অর্থাৎ মনসার দাস বলে তিনি 'কেতকাদাস' নামে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। মনসাই যে কেতকা, এ কথার উল্লেখ কবি নিজেই করেছেন—

'কিয়াপাতে জন্ম হৈল কেতুকাসুন্দরী।'

অবশ্য এই কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ছাড়াও 'ক্ষেমানন্দ' নাম বা ছদ্মনামধারী অপর একজন কবিও মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

কবি ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি দামোদর নদের তীরবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম শঙ্কর। সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বারাখাঁর অধীনে তিনি চাকরি করতেন। এক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বারাখাঁ নিহত হ'লে কবির পরিবার রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিশোর ক্ষেমানন্দ একদিন এক নির্জন জলার ধারে এক মুচিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। মুহূর্তকাল পরেই মুচিনী আবার দেবী মনসারূপে আবির্ভূত হ'য়ে কবিকে কাব্য রচনার আদেশ দিয়ে বলেন—

'ওরে পুত্র ক্ষমানন্দ কবিত্বে কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গাইয়া বুল।'

কবির এই আত্মপরিচয় অংশে কবিকঙ্কণের অনুসরণ থাকলেও বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক এবং মনোজ্ঞ। এতে তৎকালীন রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অঞ্চলটির একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

কবি কাব্যে যে বারাখাঁর উল্লেখ ক'রেছেন, তিনি ১৬৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাব্যে উক্ত ভারামল্লও ১৬৭৫-৮০ খ্রীঃ যুবা অবস্থায় ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

অনেকে অনুমান করেন যে পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলকাব্যকারদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দই সর্বাধিক শক্তিশালী কবি ছিলেন। কিন্তু ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে বলেন: 'তার কবি-প্রতিভা নিতান্তই সাধারণ স্তরের, কিন্তু স্বল্প প্রতিভাসত্বেও বাংলা

সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছেন।' মনসামঙ্গল কাব্যের তিনটি স্তর,—প্রথম স্তরে দেবী মনসাই প্রধান, বিজয়গুপ্তের রচনায় মনসাই সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন; দ্বিতীয় স্তরে প্রাধান্য চাঁদ সদাগরের—এঁর চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন নারায়ণদেব; তৃতীয় স্তরে প্রধান চরিত্র বেহুলা—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সমস্ত ক্ষমতা যেন কেন্দ্রীভূত হ'য়েছিল এই চরিত্রটির সৃষ্টিতেই। কবির কৃতিত্ব বিষয়ে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য্য বলেন, 'ইনি সম্পূর্ণ রোমান্স-পাগল কবি। কেতকাদাস প্রজাপতির মতই সৌন্দর্য-লোভী। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব বর্ণনা তাঁহার স্বভাবের অনুকূল নহে, তাঁহার সৌন্দর্য-সন্ধানী সমগ্র দৃষ্টি পড়িয়াছে বেহুলা-চরিত্রে। তাঁহার বেহুলা শুধু 'বেহুলা' নহে, 'বেহুলা-নাচনী'—একটি অপূর্ব লাস্যময়ী প্রাণচঞ্চলা কিশোরী। তাহাকে দেখিলে বসন্তবায়ু-হিল্লোলিত পুষ্প লতিকাকে মনে পড়ে। মনসামঙ্গলের ন্যায় ভয়ঙ্কর কাহিনীর রুক্ষতাকে এই বেহুলা নিজের কিশোরী জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও মাধুর্য দিয়া মসৃণ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে।'

মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লখিন্দরকে পুরাণের উষা-অনিরুদ্ধের অবতাররূপে দেখানো হয়েছে, কেতকাদাস উষার অনিরুদ্ধের কাহিনী আরও অতি বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করেছেন। সমালোচকের ভাষায়—'রোমান্সপ্রিয় কেতকাদাস উষারূপিণী বেহুলার গোপনপ্রেমকে বিস্তৃতভাবে রসাইয়া বর্ণনা করিয়া মনসামঙ্গলের অন্তর্গত উষাহরণ পালাকে একেবারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পর্যবসিত করেছেন।'

কবি কাব্যে তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের লোকাচারের একটি প্রামাণিক চিত্রও গ্রন্থে উপস্থিত। দেবসভায় বেহুলার নৃত্য বর্ণনায় কবি সেকালে নটীনৃত্যের একটি দুর্লভচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। কবির ভাষা তৎসমবহুল এবং মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

মানভূম অঞ্চলের জনৈক ক্ষেমানন্দও অতিশয় সংক্ষিপ্ত, নয়টি মাত্র পদের সাহায্যে তিনি এক মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এতে 'কেতকাদাস' ভণিতা নেই এবং কেতকাদাসের রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যও নেই। ডঃ সুকুমার সেন এঁর চাঁদ চরিত্রটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন, 'এই ক্ষুদ্র পাঁচালিটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে।'

(ঘ) **অন্যান্য :** ১. 'বিপ্রদাস পিপ্‌লাই' :—চব্বিশ পরগণার বাদুড্যা (নাদুড্যা) বটগ্রামবাসী বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খ্রীঃ হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। এই উক্তির স্বীকৃতিতে ডঃ সুকুমার সেন তাঁকে মনসামঙ্গল কাব্যের 'আদি কবি' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে হুগলি, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর প্রভৃতির উল্লেখ থেকে তাঁর প্রাচীনত্ব সন্দেহের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। অনেকে অনুমান করেন যে বিপ্রদাস নিজে গ্রন্থের সাতটি পালা মাত্র রচনা করেছিলেন, অবশিষ্ট ছয়টি পালা অনেক পরবর্তীকালে সংযোজিত হ'য়েছে। কবির কবিত্বশক্তি সাধারণ মাপের। বেহুলা-

সনকা ও চাঁদসদাগরের চরিত্র চলনসই, মনসা-চরিত্রের রুক্ষতা তিনি বর্জন করেছেন। হাসান-হোসেন পালায় মুসলমান-সমাজের চিত্রাঙ্কনে তিনি বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

২. 'তন্ত্রবিভূতি' :—সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত 'তন্ত্রবিভূতি'র মনসামঙ্গল কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থকর্তার নাম বিভূতি, সম্ভবতঃ তিনি তাঁতী ছিলেন বলেই নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' শব্দটি যোগ করেছেন। কবি ছিলেন উত্তরবঙ্গবাসী—এই উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত ছিল। কাহিনীতে এবং চরিত্র সৃষ্টিতেও কিছুটা নোতুনত্ব দেখা যায়। তন্ত্রবিভূতির কাহিনী এবং রচনারীতি প্রশংসনীয় হ'লেও এতে আদিরসের বাড়াবাড়ি নিন্দনীয়। কবি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

৩. 'জগজ্জীবন ঘোষাল' :—জগজ্জীবন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর আত্ম-পরিচয়ে জানা যায় যে তিনি দিনাজপুরের কুচিয়ামোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রূপ, মাতা রেবতী। তিনি সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন ব'লে অনুমান করা হয়। কবি চরিত্র সৃষ্টিতে এবং স্বাভাবিক বর্ণনায় মোটামুটি প্রতিভার পরিচয় দিলেও গ্রন্থের বহু অংশ তন্ত্রবিভূতির সঙ্গে হুবহু এক—শুধু ভণিতায়ই পার্থক্য। আদিরসের আধিক্য কবির রুচি-বিকৃতিরই পরিচয় দেয়।

৪. 'দ্বিজ বংশীদাস :—ময়মনসিংহ জেলায় পাতুয়ার গ্রামের অধিবাসী দ্বিজ বংশীদাস একজন শক্তিমান্ কবি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি যে কাল-পরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক সন্নিবেশ করেছেন, তা' প্রামাণিক হ'লে স্বীকার করতে হয় যে তিনি ১৫৭৫ খ্রীঃ কাব্যটি রচনা করেন। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ; কবির কন্যা চন্দ্রাবতী বাঙলার প্রথম মহিলা কবি। কবি মোটামুটিভাবে প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণ করলেও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যে সংঘাত যেন দেবতা আর মানবে নয়—এই সংঘাত একেবারেই যেন পারিবারিক। কাব্যের ভাষার সরলতা ও অনাড়ম্বর বর্ণনা ভঙ্গীই তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. 'হরিদত্ত' :—আদিমধ্যযুগের কবি বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে হরিদত্তই প্রথম মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং বিজয়গুপ্তের কালেই তার রচনা লোপ পেয়েছিল। কিন্তু হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। তবে এই সামান্য অংশ থেকে তাঁর প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপিই ময়মনসিংহ অঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে অনুমান করা হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

৬. 'ষষ্ঠীবর' :—কবি ষষ্ঠীবর দত্ত সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর উপাধি ছিল 'গুণরাজখান'। এঁর কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ব'লে অনুমান করা চলে যে ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্য বর্ণনাত্মক—গল্প জমিয়ে তোলার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য

ছিল। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য এবং কিছু অভিনবত্ব পাওয়া গেলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

৭. 'জীবন মৈত্র' ঃ—করতোয়া তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামের অধিবাসী জীবন মৈত্র ১৭৪৪ খ্রীঃ তাঁর কাব্য রচনা করেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতার নাম অনন্ত রাম, মাতা স্বর্ণমালা। কবি রাজা রঘুনাথের রাজ্যে বাস করতেন। কবির কাব্যে বিহার অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—কাব্যে সেই পাণ্ডিত্যের ভারও কিছু লক্ষ্য করা যায়।

[পনেরো] চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঃ

প্রশ্ন ২৭। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের নামকরণ, উদ্ভব ও বিষয়বস্তুর পরিচয় সহ এই কাব্যের প্রধান কবিদের নাম উল্লেখ কর।

প্রশ্ন ২৮। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে তুমি কাহাকে চিহ্নিত কর,—কারণ উল্লেখসহ তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ২৯। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকর্তারূপে দ্বিজ মাধবের কৃতিত্ব বিচার কর।

প্রশ্ন ৩০। সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিবেচিত হয়ে থাকেন।—উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।

অথবা

প্রশ্ন ৩১। 'এ কালে জন্মগ্রহণ করিলে কবিকঙ্কণ যে কবি না হয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হ'তেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।'—কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্তিটির যাথার্থ্যের বিচার কর।

ভূমিকা ঃ দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু কে এই চণ্ডী?—এই প্রশ্ন দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষকদের বিব্রত ক'রে রেখেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'সপ্তশতী চণ্ডী'-তে দেবী চণ্ডীর বহু যুদ্ধ বিজয় কাহিনী ও মাহাত্ম্য প্রচলিত রয়েছে। এই চণ্ডী এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী উভয়ই শিবশক্তি, অতএব মনে হ'তে পারে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও স্থান পেয়েছেন। কিন্তু কাহিনী বিশ্লেষণে দেখা যায়, একমাত্র নাম-সাদৃশ্য ছাড়া এই উভয় চণ্ডীর মধ্যে আর কোন ঐক্য নেই। পুরাণের চণ্ডী অতিশয় উগ্র, ইনি অনেক অসুর বধ করেছেন—

মানবসমাজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক করা হয়নি। পক্ষান্তরে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দু'টি কাহিনী রয়েছে, তাতে দেবীদ্বয়ের একই 'চণ্ডী' নাম থাকলেও কার্যত দু'জন পৃথক দেবী। কালকেতু কাহিনীর দেবী চণ্ডী কখনো গোধারূপিণী, কখনো বা মহিষাসুরমর্দিনী রূপ-ধারিণী, তিনি অরণ্যের পশুকুলের পূজা গ্রহণ করেন এবং ব্যাধসন্তান কালকেতুকে তাঁর পূজার জন্য নির্দেশ দান করেন। আবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী—ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে যে চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তিনি রাখালদের পূজা গ্রহণ করেন, হারানো জিনিষ পাইয়ে দেন, আবার কখনো বা কমলে-কামিনী রূপ পরিগ্রহ করেন। বস্তুতঃ ইনি বাঙালী ঘরে মেয়েদের দ্বারা পূজিতা দেবী মঙ্গলচণ্ডী। কাজেই চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর দুই চণ্ডী যেমন পৃথক, নাম সাদৃশ্য ছাড়া অপর কোন সাদৃশ্য নেই, তেমনি পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গেও তাঁদের একমাত্র নামেই সাদৃশ্য রয়েছে, অপর কোনদিকেই একের সঙ্গে অপরের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য আর একটি ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এঁরা তিনজনই কিন্তু শিবপত্নী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে দেবী কখনো সতী, কখনো বা পার্বতী উমারূপে বিরাজিতা। উভয় ক্ষেত্রেই শিবের সঙ্গে তাঁর সংসারধর্মের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও 'চণ্ডী' নামটি ব্যবহৃত হয়নি।

অতএব অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডী কে? গবেষকগণ এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেও ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলেও সকলেই স্বীকার করেছেন যে এই চণ্ডী কোন অনার্য সমাজ থেকে আগতা দেবী—এই-অনার্য সমাজ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা নিষাদ এবং মঙ্গোল বা কিরাত—যে কোনটি হ'তে পারে। তবে এর উপর পরে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ এবং জৈন দেবীদের প্রভাব পড়ে থাকা সম্ভব। এ বিষয়ে মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে ওঁরাও জাতি 'চণ্ডী' নামে যে এক অরণ্যদেবীকে পূজা ক'রে থাকে, মূল চণ্ডীকে আমরা সেখান থেকেই নিয়েছি এবং পরে যথোচিত মাজা-ঘষা ক'রে তাঁকে শিবপত্নীতে উন্নীত ক'রে তাঁর একটা আর্যরূপ দিয়েছি। তৎসত্ত্বেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁর আদি রূপটি চাপা পড়েনি। তাই দেখি বনের পশুরা তাঁর কাছে দরবার করে, তাঁরা আশ্রয় ভিক্ষা করে এবং দেবীও পশুহন্তারক ও অরণ্যজীবী ব্যাধ-সন্তানদের নিকট পূজা গ্রহণের আকুলতা প্রকাশ করেন।

চণ্ডীর মূল অন্বেষণের পরই পণ্ডিতগণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উৎস সন্ধানে তৎপর হন, কিন্তু এখানেও সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাব্যের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে এভাবে—দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনে শিবপত্নী সতী দেহত্যাগ ক'রে আবার উমা-পার্বতীরূপে হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তিনি শিবকেই পতিরূপে লাভ করেন। পার্বতীকে বিবাহের পর শিব শ্বশুরগৃহে ঘরজামাইরূপে অবস্থান করেন। এখানে মা মেনকার সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে কন্যা পার্বতী স্বামীসহ কৈলাসে চলে যান। শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অভাব

নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'লে দু'জনেই যার যার মতে সংসার ত্যাগ করতে চান। তখন পার্বতীর সখী পদ্মাবতী দেবীকে মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার করতে উপদেশ দেন। তদনুযায়ী পার্বতী মহাদেবকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন শাপ দিয়ে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্যলোকে পাঠিয়ে দেন—তিনিই মর্ত্যলোকে দেবীর পূজা প্রচার করবেন। মহাদেবও কূটকৌশলে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন।—এই পর্যন্ত 'দেবখণ্ড'।

নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধসন্তান কালকেতুরূপে এবং নীলাম্বরপত্নী ছায়া ব্যাধকন্যা ফুল্লরা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাদের বিয়ে হয়। এদিকে দেবী চণ্ডী মর্ত্যে প্রথম পূজা গ্রহণ করেন কলিঙ্গ রাজের। তারপর বনের পশুদের পূজা গ্রহণ করে সিংহকে পশুদের রাজা ক'রে দিয়ে তাদের অভয় দান করেন। এদিকে কালকেতু শিকার করতে গেলে বনের পশুদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার করে। পশুরা আবার দেবীর শরণ গ্রহণ করে। দেবী স্বর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ ক'রে কালকেতুকে ছলনা করেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে নিয়ে এলে দেবী প্রথমে ষোড়শীরূপে এবং মহিষমর্দিনীরূপে দেখা দিয়ে কালকেতুকে প্রচুর ধন পাইয়ে দিয়ে তাকে গুজরাট বন কেটে রাজা হ'তে নির্দেশ দান করেন। সেখানে দেবীর দেউল নির্মিত হ'লো এবং মর্ত্যলোকে দেবীর পূজা প্রচারিত হ'লো। এই পর্যন্ত 'আখেটিক পর্ব'।

এরপর দেবীর ইচ্ছা হ'লো—তিনি নারীর এবং বণিক সমাজের পূজা গ্রহণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে গন্ধর্বকে শাপগ্রস্ত ক'রে ধনপতি সদাগর ও তৎপত্নী ফুল্লরা রূপে মর্ত্যলোকে প্রেরণা করেন। এটি 'বণিক পর্ব'। দেবী এখানে প্রথমে মঙ্গলচণ্ডীরূপে এবং শেষ পর্যায়ে 'কমলে-কামিনী'-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই কাহিনীটি কালকেতু কাহিনী অপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে। কালকেতু কাহিনী এবং ধনপতি কাহিনীর মধ্যে কোন সংযোগ-সূত্র নেই—একমাত্র চণ্ডীর নামটি ছাড়া। উভয় কাহিনীতে চণ্ডীর প্রকৃতিও ভিন্ন তবে তাঁর উপকার করবার ইচ্ছা উভয়ত্র বর্তমান।

আলোচিত কাহিনীটির প্রথমাংশ অর্থাৎ দেবখণ্ড পুরাণভিত্তিক হ'লেও হরগৌরীর সংসার যাত্রার কাহিনী কবি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আহরণ করেছেন। অপর দুটি মূল কাহিনী অর্থাৎ কালকেতু-কাহিনী এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনী সম্ভবতঃ লৌকিক উৎস থেকেই সংগৃহীত হ'য়েছে এবং চণ্ডীর নাম-সাদৃশ্য-হেতু দুটিকে একই পৃষ্ঠপটে আবদ্ধ করা হ'য়েছে। কেহ কেহ অবশ্য বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের একটি শ্লোককেই উক্ত কাহিনীদ্বয়ের উৎসরূপে নির্দেশ ক'রে থাকেন। শ্লোকটি এরূপ—'ত্বং কালকেতু বরদাচ্ছলগোধিকাসি যা ত্বাং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্য। শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনাঃ রক্ষেঽম্বুজে করি চয়ং গ্রসতী বমন্তী।' অর্থাৎ—'আপনি স্বর্ণ গোধিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গভোজন ও উদ্গীরণ করতঃ কমলে-কামিনী-রূপে শ্রীমন্তসদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।'—এখানে দু'টি

কাহিনীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হ'লেও অর্বাচীন বৃহদ্ধর্মপুরাণে পরবর্তীকালে সন্নিবিষ্ট করা হ'য়েছিল বলেই অনুমান করা হয়। অতএব কাহিনীর উৎসরূপে বৃহদ্ধর্মপুরাণকে গ্রহণ করা চলে না।

বাঙলাদেশে চৈতন্যপূর্ব যুগে কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া না গেলেও যে তৎকালে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' প্রচলিত ছিল, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন চৈতন্যজীবনীকার কবি বৃন্দাবন দাস। তিনি চৈতন্যসমকালীন সমাজ-জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন:

'ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥'

এ ছাড়াও তৎ-পূর্ব কালেও যে বাঙলায় মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল, তারও পাথুরে প্রমাণ বর্তমান। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত গোধিকা-সহ যে দেবীমূর্তিটি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গেছে, তা' নিশ্চিতই দেবী চণ্ডীর মূর্তি। বিভিন্ন পুরাণে যে চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়, তিনি এই চণ্ডী নন; তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—

'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।'

অর্থাৎ যিনি ভক্তের মঙ্গলসাধনে দক্ষ, তিনিই দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অর্বাচীনকালে রচিত হ'লেও সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের পরে নয়। বাঙলাদেশে সেন রাজত্বকালেই সম্ভবতঃ মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তিত হ'য়েছিল।

অপরাপর মঙ্গলকাব্যের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, এ বিষয়ে মনীষী সমালোচক বলেন: 'বালকোচিত কথা-সাহিত্যের যুগে চণ্ডীমঙ্গলই প্রথম পরিণত যুবমনের পরিচয় দিয়াছে—উত্তেজনাময় প্রাণধর্মের ঊর্ধ্বে প্রশান্ত মনোধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। দেব-দানবের যুদ্ধ নহে, দেব-মানবের প্রতিযোগিতা নহে, অতি সাধারণ বর্ণহীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় সম্প্রসারিত মানবজীবনই ইহাতে প্রধানভাবে বর্ণনীয়। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, সামাজিক দলাদলি, কুসংস্কার, বারমাস্যা, রন্ধনপ্রণালী, ভোজ্যতালিকা, বেশভূষা, বিবাহ-বিধি, পরনিন্দা প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপারকেও চণ্ডীমঙ্গলে আস্বাদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে।' মনসামঙ্গলের মত প্রত্যক্ষভাবে চণ্ডীমঙ্গলে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়নি। দেবী চণ্ডী পূজা প্রার্থনা করেন, কিন্তু কখনো উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরালেই থাকেন। কাহিনী চলে আপন গতিতে, চণ্ডীর ভূমিকা তাতে অনুল্লেখ্য। ফলতঃ কাহিনীতে স্বাভাবিকতা, মানবিকতা ও বাস্তবতা যথেষ্ট প্রকটভাবেই আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন উপকাহিনী এবং ঘটনার সর্বত্রই কবিদের বাস্তব, মানবমুখী ও সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী দেবী চণ্ডীর মধ্যেও লৌকিক জীবনের পরিচয়ই অধিকতর পরিস্ফুট—মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে সমসাময়িক যুগের

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের সন্ধান পেয়েছেন। এখানে পাওয়া যাচ্ছে, কীভাবে প্রাচীন বর্ণগত কৌলীন্য প্রথা ক্রমশঃ কাঞ্চনকৌলীন্যের কাছে হৃতমান হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তাকে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হ'লো। দৈবধনের অধিকারী বিত্তমান অনার্য ব্যাধ সন্তান কালকেতুকে দমিয়ে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও ব্রাহ্মণ্যসমাজাশ্রিত কলিঙ্গরাজ শেষ পর্যন্ত তাকে স্বীকার ক'রে নিলেন। প্রজারাও প্রথমে অনার্যরাজ্যে বসতি স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিল।

অতএব নানাভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকাহিনীর বিশ্লেষণান্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে একমাত্র এই মঙ্গলকাব্যেই উপন্যাসের ধর্ম অনেকটা পরিমাণে বর্তমান। ফলতঃ এই দিক্ থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকেই সর্বাধিক আধুনিক এবং প্রাগ্রসর বলে অভিহিত করা চলে।

(ক) **দ্বিজ মাধব ঃ** চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ মাধবের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তির কারণ রয়েছে। মধ্যযুগে মাধব নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন—কেউ 'দ্বিজ মাধব', কেউ বা 'মাধবাচার্য', আবার একই ব্যক্তি উভয় নাম ব্যবহার করতেন কিনা, তা-ও নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নেই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ মাধব আত্মপরিচয় সূত্রে বলেছেন : 'পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নাম।'—আবার 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল'-রচয়িতা মাধবাচার্যও পরিচয় দিয়েছেন :

'পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥'

জন্মস্থানরূপে কবি নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন, কোন গ্রন্থে নবদ্বীপ-স্থলে সপ্তগ্রামের নাম পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের বংশধরদের নিকট 'মাধববংতত্ত্ব' নামক যে কুলপঞ্জিকা আছে, তাতে উল্লেখ করা হ'য়েছে যে কবি মাধব গঙ্গাতীর থেকে বাস উঠিয়ে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলায় মেঘনা তীরে বাসভূমি স্থাপন করেছিলেন। 'গঙ্গামঙ্গল'-রচয়িতারূপেও এক মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধব-রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যাবতীয় পুঁথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে—নবদ্বীপ সপ্তগ্রাম বা ময়মন সিংহ অঞ্চলে কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। অতএব কোন্ মাধব চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন এবং তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিল, তা' নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

দ্বিজ মাধব কোন্ কালে বর্তমান ছিলেন তা' নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে আছে—

'ইন্দুবিন্দুবাণধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গাত্র সারদাচরিত ॥'

এ থেকে তারিখ পাওয়া যায় ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রীঃ। গ্রন্থের অন্যত্র আছে—

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুনাবতার ॥'

উক্ত সালে আকবর সিংহাসনাসীন থাকলেও পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়নি—অতএব কোথাও একটা গোঁজামিল থাকা সম্ভব। ডঃ সুকুমার সেন পূর্বোক্ত 'ইন্দুবিন্দু-বাণধাতা'-স্থলে 'ইন্দুবিন্দুবাণদাতা' পাঠ গ্রহণ করে কবির কাব্য রচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৬৪৪-১৬৪৭ খ্রীঃ। কিন্তু এতে আকবরের সঙ্গতি থাকে না এবং কাব্যের কতকগুলি আভ্যন্তর লক্ষণের জন্য একে এত অর্বাচীন বলেও মনে হয় না। অতএব অধিকতর প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীঃ বলেই গ্রহণ করা সঙ্গত।

কবি দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যের নাম বলেছেন 'শারদাচরিত' বা 'সারদামঙ্গল'। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটি 'সুকবি মাধবাচার্যবিরচিত জাগরণ' নামক ব্রতকথা বা পাঁচালি-জাতীয় গ্রন্থরূপে বহুল প্রচলিত। মাধবের কাব্য পাঠে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে কবিকঙ্কণের কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না—কাজেই তিনি যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রাক্‌বর্তী—এই অনুমান যথার্থ হওয়াই সম্ভব। সাধারণভাবে কাহিনীর দিক্ থেকে কবিকঙ্কণের কাব্যের সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। এতেও তিনটি খণ্ড—দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিক্‌খণ্ড। তবে এতে একটি অতিরিক্ত কাহিনী যুক্ত হয়েছে—দেবী চণ্ডী কর্তৃক মঙ্গলাসুরবধ এবং এই কারণে 'মঙ্গলচণ্ডী' নাম লাভ। এতে কালকেতু কাহিনী এবং ধনপতি কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে, আর কাব্যের শেষাংশে তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা অহেতুক বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনী নির্মাণে কবি উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারলেও বাস্তব পরিবেশ-সৃষ্টিতে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তবচিত্র যে কবিকঙ্কণ-অপেক্ষাও বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, তার দু' একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে—কালকেতু-ফুল্লরাকে সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে বৃদ্ধবয়সে কালকেতুর পিতামাতা ধর্মকেতু নিদয়া কাশীবাসী হ'লেন এবং তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য কালকেতু মাসে মাসে টাকা পাঠাতো। একজন ব্যাধের পক্ষে এ জাতীয় জীবনযাপন কি বিশ্বাস্য? পক্ষান্তরে দ্বিজ মাধব দেখিয়েছেন—কালকেতুর বিবাহের পর সংসার বৃদ্ধি পাওয়াতে পিতা ধর্মকেতু জীবিকা সংগ্রহের জন্য অরণ্যে গিয়ে সিংহের হাতে মৃত্যু বরণ করেন। ব্যাধজীবনের সঙ্গে এই পরিণামই তো অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

কবি দ্বিজ মাধব তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টিতেই কাব্য-খানি রচনা করেছেন বলেই এর বাস্তবতা এত প্রখর হ'য়ে উঠেছে। সাধারণভাবে চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ কোন নৈপুণ্য দেখাতে না পারলেও তাঁর অঙ্কিত ভাঁড়ুদত্ত অতিশয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তার কূটবুদ্ধি, চাতুরী এবং বঞ্চনার চিত্রের মতই তার অপরাধ এবং শাস্তিবিধানের কাহিনীও সমভাবেই কৌতুকোদ্দীপক। দেবী চণ্ডী অনার্য সমাজ থেকে আগত হ'লেও কবিকঙ্কণ তাঁকে আর্য-কল্পনার পৌরাণিক ছদ্মবেশে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেবী যথাযথভাবে অনার্যোচিত ভয়ঙ্করী দানবী-

ধর্মের সঙ্গেও কাব্যোক্ত ধর্ম-ঠাকুরের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধর্ম-ঠাকুর একান্তভাবেই অনার্য দেবতা। মনসা, চণ্ডী-আদি অনার্য-দেবদেবীগণ শেষ পর্যন্ত একটা আর্য-আচরণের দৌলতে অর্বাচীন পুরাণে আশ্রয় পেলেও ধর্মঠাকুর ক'খনো জাতে ওঠবার সুযোগ পান নি। নামটিই শুধু বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দেবতার সমনামে উত্তীর্ণ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুনিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছেন যে অস্ট্রীক তথা নিষাদ জাতির 'দড়ম' শব্দটিই আর্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে 'ধর্ম শব্দে রূপান্তরিত হ'য়েছে। 'দড়ম্' শব্দের অর্থ 'কূর্ম'—একটি কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডকেই ধর্মঠাকুর রূপে সর্বত্র পূজা করা হয়।

অনার্য সমাজ থেকে আগত মনসা-চণ্ডী-আদি দেবদেবীগণ আর্য সমাজে গৃহীত হ'য়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পূজা গ্রহণেরও অধিকার অর্জন করেছেন। ধর্ম ঠাকুরকেও কখন কখন বিষ্ণু, শিব বা সূর্যের অবতার রূপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী', কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি দেবসমাজে মর্যাদার আসন লাভের অধিকারী হ'তে পারেন নি। এখনও ধর্মঠাকুরের পূজায় অধিকার রয়েছে ডোমজাতীয় পুরোহিতের হাতে—তাঁর পূজার উপকরণ—শূকর, ছাগ, সাদা মোরগ, পায়রা, মদ প্রভৃতি। অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি বলেই তিনি এখনও অনার্য পরিমণ্ডলেই বর্তমান রয়েছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রচার এবং ধর্মঠাকুরের পূজা রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কূর্মাকৃতি একখণ্ড প্রস্তরই ধর্মঠাকুর, তাঁর জন্য মন্দিরের প্রয়োজন নেই। যে কোন গাছের নীচে কিংবা খোলা মাঠের মধ্যেও তাঁর আসন থাকতে পারে। গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুর স্থান ভেদে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে থাকেন, যথা—বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালু রায়, বুড়া রায়, দলু রায়, জগৎ রায় প্রভৃতি। ধর্মঠাকুরের দ্বিবিধ পূজা—নিত্যপূজা ও মানত পূজা। মানত পূজা দীর্ঘকাল বহুজনের চেষ্টায় সম্পন্ন হ'য়ে থাকে—এই বিশেষ আড়ম্বর পূর্ণ পূজার নাম 'গৃহভরণ' বা 'ঘর ভরা'। বার দিন বারটি শিলাকে একসঙ্গে যুক্ত করে এই পূজা করতে হয়। ধর্মপূজায় কতকগুলি পারিভাষিক নাম বিশেষভাবে লক্ষণীয়—নিরাকার ব্রহ্মের স্ত্রী রূপে কল্পিত শিলাখণ্ডকে বলা হয় 'কামিন্যা', ধর্মের সেবায়েতের নাম 'দেয়াসী' (দেবদাসী), দেয়াসীর প্রধান সহায়ক ধামাৎকর্নী (ধর্মাধিকারিণী ?), বলির পশুর নাম 'লুয়ে', আর বার দিন গাহিবার উপযোগী পালাগানকে বলা হয় 'বারমতি'।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্ম-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মসাহিত্যের দু'টি ধারা—(১) ধর্ম পূজা পদ্ধতি বা ধর্ম পুরাণ এবং (২) ধর্মমঙ্গল কাব্য। এক সময় রামাই পণ্ডিত-বিরচিত যে 'শূন্য পুরাণ'কে বাঙলার প্রাচীন যুগের কাব্য বলে মনে করা হ'তো, তা' এই ধর্ম-পূজা পদ্ধতি বা ধর্মপুরাণ-জাতীয় গ্রন্থ। এতে বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের পরিচয় পেয়েই সম্পাদক এর 'শূন্যপুরাণ' নামকরণ করেছিলেন। রামাই পণ্ডিতকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে ক'রে অনেকেই এই বিষয়ে গবেষণা করেন—কিন্তু তাঁর জীবৎকাল অনুমিত হয়েছে নবম শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে যে কোন সময়—অনেকেই আবার তাঁর

অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নন। শূন্যপুরাণের কোন কোন অংশ চতুর্দশ শতকের রচনাও হ'তে পারে, তবে অনেকটাই যে অষ্টাদশ শতকের রচনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শূন্য পুরাণের মোট একান্নটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হ'য়েছে। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন পূজা পদ্ধতির কথা বলা হ'য়েছে। মহাযানপন্থী বৌদ্ধ এবং নাথপন্থীদের প্রভাব বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায় শূন্যপুরাণের এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বে। কীভাবে নিরঞ্জন ধর্ম, আদ্যাশক্তি, কাম এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির উদ্ভব ঘটলো তা' এই সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণিত হ'য়েছে। দেবতা আদিত্য ধর্মের পূজা প্রচার করবার জন্য রামাই পণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিশ্চন্দ্রের পালা এবং সদাডোমের পালায় রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হ'লেও বহুধাবিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনীই এর প্রধান আকর্ষণ। দেবী পার্বতীর প্রসাদে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের সামন্তরাজ কর্ণসেনকে পরাজিত ক'রে সিংহাসন অধিকার করলে গৌড়েশ্বর সহানুভূতি-বশতঃ কর্ণ সেনের সঙ্গে আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিয়ে দিলেন। ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে এঁদের দুটি পুত্র হয়—লাউসেন ও কর্পূরসেন। এই লাউসেনের বিচিত্র কাহিনীই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান উপজীব্য। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হ'য়ে বহু অসাধ্য সাধন করেছেন। এই প্রধান কাহিনীটি ব্যতীতও ধর্মমঙ্গল কাব্যে সদাডোম এবং হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্বের (লুইধর) দুইটি উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের গৌড়েশ্বর কর্ণসেন, সোম ঘোষ, ইছাই ঘোষ, লাউসেন প্রভৃতির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে অনেকেই বিস্তর মাথা ঘামালেও এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন : "ধর্মমঙ্গল কাহিনীকে ইংরাজীতে Adventure অথবা Exploits of Lausen বলা যাইতে পারে। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃত-পক্ষে মধ্যযুগের বাঙলার folk-tale বা উপকথা মাত্র ; ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব। Adventure বা কেরামতি কাহিনী বলিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসা-মঙ্গল কাব্যের অপেক্ষা অনেক অংশে সুখপাঠ্য।" তা সত্ত্বেও অনেকেই ঢেক্করীর রাজা ঈশ্বর ঘোষের সঙ্গে গ্রন্থে বর্ণিত ইছাই ঘোষকে এবং সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিশ্চন্দ্রকে একীকৃত ক'রে দেখাতে চেষ্টা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উৎস নির্দেশ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অনেকেই এর মধ্যে ইতিহাসের গন্ধ আবিষ্কার করাতেই ব্যাপারটি জটিলতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এর মধ্যে যে ঐতিহাসিক কাহিনীর কোন ইঙ্গিত নেই, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়তো বা কোন কোন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক কাহিনীর অংশবিশেষ যোজনা ক'রে এবং তার উপর একটা পুরাণের আবরণ চাপিয়েই এই বহুধাবিস্তৃত ও পল্লবিত কাহিনীটির রূপ দেওয়া হ'য়েছে। কারণ এতে কংস-কৃষ্ণ কাহিনী এবং রামায়ণের যুদ্ধ ও মায়ামুণ্ডের কাহিনী স্পষ্টতঃই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। লাউসেনের ভ্রাতা

কর্পূরসেনের চরিত্রে লক্ষ্মণ ও কুশের প্রভাব এবং কালুডোমের পত্নী লখাই-চরিত্রে মহাভারতের বিদুলা-চরিত্রের প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের দোষগুণ-বিষয়ে গুণিজনের মতামত বহু ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। ফলতঃ এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান খুবই কষ্টকর। ডঃ সুকুমার সেন যেখানে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে মনসামঙ্গল কাব্য অপেক্ষা অনেক সুখপাঠ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেখানে ডঃ দীনেশ সেন বলেন, "ধর্মমঙ্গলের সমস্ত যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন তাঁহার ধৈর্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।" অন্যত্র ডঃ সুকুমার সেন একে 'উপকথা' এবং 'কেরামতি কাহিনী' বলে অভিহিত করেও আবার মন্তব্য করেছেন: 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল।' শুধুমাত্র রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত এই ধর্মমঙ্গল কাব্যকে মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে 'জাতীয় কাব্যের' মর্যাদা দিতে চান। পক্ষান্তরে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য ধর্মমঙ্গল কাব্যকে প্রাচীন বঙ্গের কিশোরধর্মী সাহিত্য বলা যাইতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ কাহিনীতে অলৌকিকতা এবং অসম-সাহসিকতার আতিশয্য একে রূপকথা জাতীয় গ্রন্থে পরিণত করেছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে অনেক উপকাহিনী যুক্ত হওয়াতে এতে রয়েছে ঐক্যবোধের অভাব। একমাত্র 'কানাড়' উপকাহিনী ব্যতীত অপর কোন উপকাহিনীতে কাব্যরস জমে উঠতে পারেনি। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্য কাহিনীতে তাঁর পাশাপাশি চণ্ডীকেও স্থাপন করার ফল কিন্তু হয়েছে বিপরীত। মানবিকতা ও সহানুভূতির গুণে চণ্ডী-চরিত্রটি অধিকতর আকর্ষণযোগ্য হ'য়ে ওঠায় ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'য়েছে। প্রচুর যুদ্ধোদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও এখানে বীররস জমে উঠতে পারেনি। 'সর্বোপরি, ধর্মমঙ্গলে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেব-দেবীর লড়াই এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে মানবিকতার আবেদন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।' ফলে ভক্ত ভিন্ন অপর পাঠকের নিকট ধর্মমঙ্গল কাব্য তাদৃশ আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

(ক) **রূপরাম**: ঐতিহাসিকগণ রূপরাম চক্রবর্তীকেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি বলে মনে করেন। তিনি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে জানা যায় তাঁর পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতা দময়ন্তী বা দৈবন্তী—নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রাম। কবি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন যে একদা এক বাঘ দেখে তিনি পুকুরপাড়ে গেলে সেখানে স্বয়ং ধর্মঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন:

'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বার দিনের গীত গাও শোন রূপরাম।।'

রূপরাম গোয়ালাভূমির রাজা গণেশের আশ্রয় লাভ ক'রে সেখানেই গীত রচনা করেন। ধর্মঠাকুরের পূজা করবার অপরাধে. রূপরাম বোধ হয় সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। কেউ

কেউ মনে করেন যে, তাঁর সমাজচ্যুতির কারণ—কোন এক হাড়ি জাতীয়া কন্যার প্রতি আসক্তি।

রূপরামের এই গ্রন্থের রচনাকালরূপে একটি শ্লোক রচনা করা হ'য়েছে—

'শাকে সীমে জড় হৈলে যত শাক হয়।
চারিবাণ তিন যুগে ভেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শাকে গীত হৈল লেখা করা্যা লহ॥

এর আবার পাঠান্তরও আছে। যা হোক, সহজ বুদ্ধিতে এ থেকে সন তারিখ বের করা দুষ্কর হ'লেও উদ্যোগী পুরুষগণ এ থেকে একাধিক তারিখ উদ্ধার করেছেন, সেটি ১৫৯০ খ্রীঃ, ১৬৪৯ খ্রীঃ কিংবা ১৭২৬ খ্রীঃ অথবা অপর কোন তারিখ হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে কাব্যে শাহ্জাদা সুজার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হওয়াতে মনে হয় কবি ১৬৪৯ খ্রীঃ কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

কবি রূপরাম কাব্যটির নাম 'অনাদ্য-মঙ্গল'-রূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের অংশমাত্র প্রকাশিত হওয়াতে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থবিচার সম্ভবপর নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে, তা' থেকে মনে হয়, সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রূপরামের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। যে লাউসেনের কাহিনী ছড়া-পাঁচাল ও ব্রতকথার সীমায় আবদ্ধ ছিল, রূপরামই সম্ভবতঃ তাকে সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের জগতে উন্নীত করেন। চরিত্রসৃষ্টি, বর্ণনাভঙ্গী এবং আত্মকথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'কোন কোন সময়ে তাঁকে প্রায় মুকুন্দরামের মতো প্রতিভাশালী মনে হয়, বিশেষতঃ করুণরস ও হাস্য-পরিহাসে তিনি মুকুন্দরামের সমকক্ষ। তাঁর প্রতিভা ছিল বলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবিরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন।' রূপরামের আত্মকাহিনীমূলক অংশ-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত বিশেষ মূল্যবান: 'পুরানো বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোটগল্পের মত কোন জীবন-রস-নিটোল রচনা থাকে, তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনী।'

(খ) **ঘনরাম:** ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্রের আনুকূল্য লাভ করাতে অবশ্যই তাঁর প্রচার ও জনপ্রিয়তা কিছুটা সহজ পথ পেয়েছিল, কিন্তু তার জন্য তাঁর কবিপ্রতিভাকে খাটো ক'রে দেখা কোনক্রমেই সঙ্গত হ'বে না। কবির কাব্যে অপর কবিদের মতো 'আত্মপরিচয়' না থাকায় শুধুমাত্র কবিতার ওপর নির্ভর ক'রে জানা যায় যে কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা সীতা এবং কবির বাসস্থান বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রাম। কবি হয়তো বর্ধমান-নরপতি কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে থাকতে পারেন। কোন পুঁথিতে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক যে শ্লোক পাওয়া যায়, তার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়। তবে এতে উল্লেখ করা হ'য়েছে যে কবি প্রভু রামচন্দ্রের অনুগ্রহেই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। আত্মপরিচয়জ্ঞাপক

শ্লোকটি প্রামাণিক না হ'লেও কবি যে রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ রামায়ণ গানও করতেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কবির কাব্য রচনাকাল-বিষয়ে একটি পুষ্পিকা পাওয়া যায়—

'শক লিখি রামগুণ রস সুধাকর।'

অর্থাৎ কবি ১৬৩৩ শকাব্দে বা ১৭১১ খ্রীঃ তাঁর কাব্যরচনা সমাপ্ত করেছিলেন। অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতোই তিনি তাঁর কাব্যকে বারো দিন গাইবার উপযোগী ২৪টি পালায় বিভক্ত করেন। বিষয়বস্তুতে কবির মৌলিকত্ব-প্রদর্শনের অথবা নোতুন ভাব যোজনার সুযোগ কম ছিল, তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ নিয়েছেন পরিবেষণের দিক্ থেকে। 'কবি-রত্ন'—উপাধিপ্রাপ্ত কবি ঘনরাম কবিত্বশক্তির সঙ্গে পাণ্ডিত্যেরও সহজ সংমিশ্রণ সাধনে সক্ষম হ'য়েছিলেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে তাঁর পাণ্ডিত্য উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাও অস্বীকার করা যায় না—যেমন, 'বিরাট-তনয় মুখ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন 'উত্তর দিক্' বোঝাতে গিয়ে। তাঁর পাণ্ডিত্যের আর একটি পরিচয় রেখেছেন তিনি বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ কিংবা সার রচনা ক'রে। যেমন—

'সুবৃক্ষ চন্দনগন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥
কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে॥

বিভিন্ন পুরাণ থেকে নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ ছাড়াও কবি অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার ব্যবহার দ্বারাও স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন : 'চকোর-চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।' ঘনরাম ভাব-ভূয়িষ্ঠ পদ-রচনায় উৎকৃষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই উত্তরকালে তাঁর রচিত বহু পদ প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন—

'সুব্যঞ্জন ঝালে ঝোলে কুটুম্বিতা হালাহোলে
পরকালে কেহ নহে কার।'
'না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক।'
কিংবা 'হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি।'

কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যরচনায় কৃতিত্ব-বিষয়ে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এ কাব্যের বাইরের আকার প্রায় মহাকাব্যের মতো, কিন্তু মনোভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীতে কবি পাঁচালীর মূল আদর্শকে ছাড়াতে পারেন নি।...এর মধ্যে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও নারী ধর্মের যে উচ্চ আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকারের যোগ্য। বিশেষতঃ তিনি বীরশ্রেষ্ঠ লাউসেনের অনমনীয় পৌরুষ, অদম্য বীরত্বের সঙ্গে সুপবিত্র নৈতিক আচরণকে মিলিয়ে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী সাহিত্যাদর্শের মূলে একটা বলিষ্ঠ, প্রাণবান্ ও শুদ্ধ জীবনকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন এবং আংশিকভাবে সফলও

হয়েছেন। তাঁর রচনাভঙ্গিমা সংস্কৃতপ্রধান ও মার্জিত, বক্তব্য বিষয়ে স্থূল রুচির স্পর্শ দু' এক জায়গায় থাকলেও গ্রাম্য ইতরতা নেই, তির্যক বাণীভঙ্গিমাও বেশ চিত্তাকর্ষী হ'য়েছে—সমাজ ও ইতিহাসের দিক্ থেকে এ গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান্। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের মতো তাঁর কাব্যও কৃত্রিমতার বাঁধন ছিঁড়তে পারেনি, এবং তিনি মহৎ বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি।'

ঘনরামই ধর্মমঙ্গল কাব্যে রসসঞ্চার ও সংস্কার সাধন ক'রে তাকে সর্বসাধারণের গ্রহণোপযোগী ক'রে তুলেছিলেন। 'তা নইলে ধর্মমঙ্গল কাব্য একান্তভাবেই একটা স্থান ও গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকতো। ঘনরাম যে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে সমুন্নীত করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার সার্থক স্বীকৃতি মিলেছে বিগত যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতচন্দ্র যে বহুল পরিমাণে ঘনরাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন, তা' থেকেই ঘনরামের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

(গ) **অন্যান্য :**

১. ময়ূরভট্ট :—ঘনরাম উল্লেখ করেছেন—

'হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।'

ময়ূরভট্টই 'হাকন্দ পুরাণ' রচনা ক'রে মঙ্গলকাব্যধারার প্রবর্তন করেন বলে যে প্রসিদ্ধি আছে, তা' সত্য হ'লেও আজ পর্যন্ত 'হাকন্দ পুরাণ'-এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত না হওয়াতে ময়ূরভট্ট বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ ময়ূরভট্টকে 'সূর্যশতক'-নামক শতককাব্য-রচয়িতা ময়ূরভট্টের সঙ্গে একীকৃত ক'রে থাকেন—কিন্তু এ বিষয়েও নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নয়। ময়ূরভট্ট-রচিত বলে 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামে যে গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তা' জাল বলে প্রমাণিত হওয়ায় এর সাহায্যে ময়ূরভট্টের প্রতিভা বিচার অসম্ভব।

২. মাণিক গাঙ্গুলি :—ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি মাণিক গাঙ্গুলি কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি রচনা করেন, তার অর্থ উদ্ধার করা কষ্টকর। বহু চেষ্টায় যে অর্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে তাঁর গ্রন্থ-রচনাকাল যেমন ১৫৪৭ খ্রী: হতে পারে, তেমনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দও হ'তে পারে। মাণিক দত্ত-রচিত যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাতে প্রাচীনত্বের লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের খেলারাম, ঘনরাম-আদি কবির নামও পাওয়া যায়। যাহোক, কবির পিতার নাম গদাধর, মা কাত্যায়নী—কবির জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। ধর্মঠাকুরের আদেশেই তিনি কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যও অপর কাব্যের মতো ২৪ পালায় বিভক্ত। কবি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং কখন কখন সেই পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যে দুর্ভার হ'য়ে দেখা দিয়েছে, যেমন—'অম্ভোরুহ অঙ্ঘ্রি যুগে আমার প্রণাম।'

৩. সীতারাম দাস :—সীতারাম দাস সম্ভবতঃ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ অথবা ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি উল্লেখ ক'রেছেন যে 'হাজার চারি সাল'-এ গ্রন্থটি

রচনা করেন, এই সালটি বঙ্গাব্দ বা মল্লাব্দ—যে কোনটি হ'তে পারে—এই কারণেই একশ বছরের ঐ পার্থক্য। সীতারাম দাস যে উচ্চবর্ণের হিন্দু হ'য়েও দায়ে পড়েই ঐ কাব্য রচনা করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, তা' তাঁর স্বীকৃতি থেকেই জানা যায়। সমকালে জনৈক সীতারাম দাস একটি 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন—উভয় কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তিও হ'য়ে থাকতে পারেন। যাহোক, সীতারাম গ্রন্থোৎপত্তির কারণরূপে যে কাহিনী পরিবেষণ করেছেন, তা' প্রায় একটি ছোটগল্পের মতোই উপাদেয়। তবে মূলকথা, ধর্ম-ঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়ে তাঁকে মঙ্গলগীত রচনার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি চল্লিশ দিনে ২৪ পালার কাব্য রচনা করেন।

৪. খেলারাম :—খেলারামের গ্রন্থের সামান্য অংশই মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থ সাঙ্গ হ'লে তিনি আত্মপরিচয় দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অংশ আর পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী মনে হয়, ১৫২৭ খ্রীঃ তিনি গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেছিলেন।

৫. শ্যামপণ্ডিত :—শ্যামপণ্ডিতের যে প্রাচীনতম পুঁথি পাওয়া গেছে, তার রচনা-কাল ১৭০৩ খ্রীঃ। অতএব তিনি অন্ততঃ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা চলে। তাঁর উপাধি থেকেই বোঝা যায়, তিনি ধর্মের সেবক ছিলেন। তাঁর কাব্যে 'ধর্মদাস' ভণিতাও পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে কিছু স্থানীয় বিশেষত্বও আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে।

৬. সহদেব চক্রবর্তী :—সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থ 'অনিলপুরাণ' সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হ'য়েছিল। সাধারণভাবে গ্রন্থটি 'ধর্মমঙ্গল' নামে পরিচিত হ'লেও কোন কোন দিক্ থেকে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। যেমন—ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান ঘটনা 'লাউসেন কাহিনী' এতে বর্জিত হয়েছে। আবার ধর্ম পুরাণের মত ধর্ম-মাহাত্ম্য, শিবায়নের মত হর-গৌরী-কাহিনী এবং গোর্খ-বিজয়ের মত মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী এতে বর্ণিত হ'য়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিশ্চন্দ্র-কাহিনীও এতে বিস্তৃত-ভাবে পরিবেষিত হ'য়েছে। বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশহেতু গ্রন্থটি কোন সামগ্রিক পরিণতি লাভ করতে পারেনি।

[সতেরো] শিবায়ন কাব্য :

প্রশ্ন ৩৪। 'শিবায়ণ'-কে কি মঙ্গলকাব্যরূপে অভিহিত করা চলে? এর বিশিষ্টতা উল্লেখ করে এই কাব্যের একজন প্রধান কবির কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ৩৫। "শিবায়ণ কাব্যের বিষয় প্রধানতঃ পৌরাণিক হওয়া সত্ত্বেও লৌকিক জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্কই সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ।"—উক্তিটির যাথার্থ্য বিষয়ে আলোচনা কর।

ভূমিকা :—'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হ'য়েছিল। আবার তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের উদ্দিষ্ট দেবতা মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর মূলতঃ অনার্য সমাজ থেকে আগত, কিন্তু শিব পৌরাণিক দেবতা—এইদিক্ থেকে শিবায়নের বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্বীকার্য। আবার এ কথাও সত্য—আদিতে শিবও ছিলেন প্রাগার্য দেবতা, তবে সুদীর্ঘকাল পূর্বেই তাঁর আর্যীকরণ সম্পন্ন হ'য়ে যাওয়াতে তিনি অনেক কাল আগেই পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হ'য়েছিলেন। দেবসমাজে শিব নিকষ কুলীন জন বলেই সম্ভবতঃ অনার্য সমাজ থেকে নবাগত দেবদেবীদেরও তিনি সহজেই আপন ক'রে নিতে পেরেছিলেন। তাই দেখি, অপরাপর মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে শিবই প্রধান দেবতা এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীগণ তাঁর সঙ্গেই সহজ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে দেবসমাজে কিছুটা অভিজাত্য লাভ ক'রে নিজেদের আসন পাকা ক'রে নিয়েছেন। কাজেই প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেরই দেবখণ্ডে শিবকাহিনী বর্ণিত হওয়াতে প্রকারান্তরে সব মঙ্গলকাব্যকেই শিবমঙ্গল-যুক্ত কাব্য ব'লে অভিহিত করলে নিতান্ত মিথ্যা বলা হয় না।

শিব বৈদিক দেবতা না হ'লেও কোন অর্বাচীন দেবতা নন, বরং বৈদিক দেবতাদের চেয়েও তিনি প্রাচীনতর। সিন্ধু সভ্যতায় যে সকল সীলমোহর পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে ধ্যানাসীন শিবমূর্তির পশুপতি মূর্তিকে এখন পণ্ডিতজন প্রায় সর্বাবাদিসম্মতভাবেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, বলা চলে। অতএব শিব যে প্রাগার্য দেবতা—একথা স্বীকৃত। দ্রাবিড়-সমাজের 'শিবন' এবং 'শেম্ব' নামক দেবতাদ্বয় যে আর্য 'শিবশম্ভু'তে পরিণত হ'য়েছেন, শুধু শব্দসাদৃশ্য থেকেই তা' মেনে নেওয়া চলে। হিমালয়ের কৈলাসবাসী 'রজতগিরিসন্নিভ' দেবতা যিনি হিমালয়-কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করেছেন এবং মহাভারতে 'কিরাত'-বেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, পশুপতিরূপে যিনি ব্যাধ বা কিরাত জাতির বধ্য পশুকুলের সঙ্গে জড়িত, সেই মহাদেব যে মূলতঃ কিরাত-জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা' কি অস্বীকার করা যায়? পুরাণে রুদ্র ও শিব অভিন্ন। রুদ্র বৈদিক দেবতা—পুরাণে তিনি সংহারকর্তা, কিন্তু নামটি 'শিব' অর্থাৎ 'মঙ্গলময়'। অতএব পৌরাণিক শিব-কল্পনায় প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার পশুপতি মূর্তি, দ্রাবিড় জাতির 'শিবন-শেম্ব', কিরাত, জনগোষ্ঠীর মহাদেব এবং বৈদিক 'রুদ্র'—এ সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। শঙ্কর সঙ্কর জাতীয় দেবতা ব'লেই বৈদিক দেবতার উন্নাসিকতা তাঁর মধ্যে থাকবার কথা নয়, তাই তিনি আশুতোষ—অল্পে তুষ্ট এবং সব অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে পারেন। পুরাণে এবং মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে আমরা এই শিবকেই দেখতে পাই।

পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্য-বর্ণনাই যদি শিবায়ন কাব্যের বিষয়বস্তু হ'তো, তবে এটিকে আর মঙ্গলকাব্য বলা সঙ্গত হ'তো না। এটি হ'তো তবে বাংলা পুরাণ অথবা পুরাণের অনুবাদ কিংবা সারসঙ্কলন। কিন্তু শিবায়ন কাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে আমরা কিন্তু পৌরাণিক শিব ছাড়াও অপর এক লৌকিক শিবের সন্ধান পেয়ে থাকি। মঙ্গলকাব্যের লক্ষণযুক্ত এই কাহিনীটির জন্যই শিবায়ন কাব্য মঙ্গলকাব্য বলে অভিহিত হ'বার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

যাবতীয় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে 'শিবায়ন' কাব্যকেই সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন বলে মনে হ'লেও, সম্ভবতঃ শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল চৈতন্য-পূর্ব যুগেই। চৈতন্য-জীবনীকার বৃন্দাবন দাস তৎকাল-প্রচলিত 'শিবের গায়ন'-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং শিবের গান শুনে স্বয়ং মহাপ্রভু যে শঙ্কর মূর্তি ধারণ করতেন, এই দুর্লভ সংবাদটিও বৃন্দাবন দাস আমাদের জানিয়ে গেছেন। এ থেকে পরোক্ষভাবে আমরা শিবের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রেরও একটি পরিচয় পেয়ে থাকি। বস্তুতঃ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এবং বৈষ্ণবোত্তম চৈতন্যদেবের মনে শিবের এই মর্যাদাবোধহেতু শিবকে আমরা 'জাতীয় দেবতা'র আসনে স্থান দিতে পারি।

পূর্বে শিবের উদ্ভব-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে যে প্রাগার্য, অনার্য ও আর্য ভাবার সংমিশ্রণের কথা বলা হ'য়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব। এ-বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন: 'গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেইজন্য বাংলার বৌদ্ধমত পৌরাণিক শৈব ধর্মমতের মধ্যে নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জিন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না, সেইজন্য এই বিরাট জৈন সম্প্রদায়ও ক্রমে নব-প্রতিষ্ঠিত শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।' বাংলার সর্বসম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য এই 'জাতীয় শিব'ই বাংলার যাবতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল-কাব্যসমূহের দেবখণ্ডে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। কবে শিবায়ন কাব্যে শিবের এক স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলেই এত সব মঙ্গলকাব্যে শিবকাহিনী বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথক্ শিবায়ন কাব্যের সার্থকতা রয়েছে।

শিবায়ন কাব্যের দু'টি ধারা—(১) একটি 'মৃগলুব্ধ' বা শিব চতুর্দশীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য, (২) অপরটিই প্রকৃত 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল কাব্য'। বিভিন্ন পুরাণ থেকে শিব-কাহিনী সংগ্রহ করে এই মৃগলুব্ধ কাহিনী রচিত হ'য়েছে। এটি একান্তভাবেই পৌরাণিক কাহিনীর সারসঙ্কলন—মঙ্গলকাব্যের কোন লক্ষণই এতে উপস্থিত নেই। নতুবা মঙ্গল-কাব্যরূপে এর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধারার কাব্য 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যটিই প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে। অতএব শিবায়ন কাব্য বলতে আমরা শুধু এই ধারাটিকেই গ্রহণ করবো।

অপর সকল মঙ্গলকাব্যের মতোই শিবায়ন কাব্যেও রয়েছে দু'টি অংশ—একটি দেবখণ্ড এবং অপরটি নরখণ্ড বা মূল কাহিনী। এই দেবখণ্ডও হরপার্বতীর কাহিনী-অবলম্বন রচিত। কিন্তু খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত শিব একান্তভাবেই পৌরাণিক শিব—এই কাহিনীও অপরাপর মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবখণ্ডেরই অনুরূপ। এতে শিবায়ন কাব্যকারগণ কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। এর দ্বিতীয় খণ্ড বা নরখণ্ডের নায়কও শিব, কিন্তু এই শিব একান্তভাবেই লৌকিক শিব। কোন পুরাণে এই শিবের সন্ধান পাওয়া যাবে না। লৌকিক বাংলার নিম্নবিত্ত সমাজে এই লৌকিক শিবের উদ্ভব—ইনি

স্বয়ং কৃষিজীবী এবং কৃষিজীবী বাঙালী জীবনের প্রতীক। অপর সকল মঙ্গলকাব্যে উদ্দিষ্ট দেবতা নরসমাজে দেব-মানবে কিংবা মানবে-মানবে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হ'য়ে থাকেন, এখানে সেই দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এখানে শিব স্বয়ং কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত এবং তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা বা মাহাত্ম্য প্রচারের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো তিনি এখানে কোন ভক্ত বা মানুষকে আশ্রয় করেন নি, তিনিই কাব্যের নায়ক। অতএব শিবায়ন কাব্যকে শিবের মাহাত্ম্য প্রচার কাহিনী না ব'লে শিবকাহিনী বলে অভিহিত করাই সঙ্গত।

শিবায়ন কাহিনীর দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, সতীর পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ, মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ, হরগৌরীর সংসার যাত্রা এবং দারিদ্র্যের জন্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপ এবং সর্বশেষে সমস্যা সমাধানের উপায় স্বরূপ দেবী পার্বতীর পরামর্শে মহাদেবের চাষবাস-আদির উদ্দেশ্যে মর্ত্যভূমিতে আগমন বর্ণিত হ'য়েছে। এরপরই মর্ত্যখণ্ড বা নরখণ্ড—যেখানে মহাদেব ইন্দ্রের নিকট থেকে জমি পাট্টা নিয়ে মনুষ্যোচিত জীবন যাপন আরম্ভ করেন। ভীমের সহায়তায় জমি চাষ ক'রে মহাদেব প্রচুর শস্য লাভ ক'রে কৈলাসের কথা ভুলে গেলেন। এরপর বিভিন্ন লৌকিক ঘটনা—কোচপট্টিতে মহাদেবের যাতায়াতের কুচনীর কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ, দেবী পার্বতী কর্তৃক স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে মশা, মাছি, ডাঁশ প্রভৃতি প্রেরণ, বাগ্দিনী রূপে দেবীর মর্ত্যলোকে আগমন ও মহাদেবকে ছলনা, শাঁখারি বেশে মহাদেব কর্তৃক দেবীকে ছলনা প্রভৃতি ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে হরপার্বতীর পুনর্মিলন বর্ণিত হ'য়েছে। শিবায়ন কাব্যে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত না থাকায় এর গতি অনেকটা মন্থর। মহাদেব এখানে বাঙালী কৃষকের প্রতিনিধি। পল্লী বাঙলার প্রকৃত জনজীবনের কাহিনীই এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। এইদিক থেকে 'শিবায়ন' কাব্যকেই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বাধিক বাস্তবধর্মী বা রিয়ালিস্টিক ব'লে অভিহিত করা চলে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের লাউসেন, রঞ্জাবতী, মনসামঙ্গলের চাঁদ বা লখিন্দর অথবা চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি খুল্লনা বাঙালী দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতিনিধি নয়, এমনকি ব্যাধসন্তান কালকেতুকেও কৃষিজীবী বাঙালীর প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা যায় না। শিবায়ন কাব্যের শিবই বাঙালী চাষী জীবনের প্রতীক—তাঁরই জীবনযাপন পদ্ধতি, তাঁর পরিজন ও অন্তঃপুরের চিত্র শিবায়নে যথাযথভাবে রূপায়িত হ'য়েছে বলেই এর আকর্ষণযোগ্যতা অনেক বেশি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ পরিপূর্ণভাবে মানবিক গুণসম্পন্ন নন—এঁদের কেউ দেবতা, কেউ-বা অপদেবতা—শুধু শিবায়ন কাব্যের হরপার্বতীর চরিত্রই একান্তভাবে বাস্তব ও মানবধর্মী হ'য়ে উঠেছে। জনৈক ঐতিহাসিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'এ দেবাদিদেব মহাদেব ও জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতীঠাকুরাণীর জীবনকাহিনী।'

গ্রন্থে শিবচরিত্রের যে বিকৃতি সাধন করেছেন কবি, তার জন্য দায়ী সমসাময়িক যুগ-মানস। এ কথা ভুললে চলবে না যে কাব্যটি রচিত হ'য়েছিল সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে। গ্রন্থের অপর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র নারদ। গ্রন্থে বর্ণিত বহু অকাণ্ড-কুকাণ্ডের

অন্ত নারদ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হ'লেও নারদ কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের মত খলচরিত্র নন—বরং তাঁর চরিত্রে রয়েছে বিদূষকের ভূমিকা। তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণে তাঁকে সত্যকার বাঙালীর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত বলেই মেনে নিতে হয়।

শিবায়নে সুসঙ্গত ও কল্যাণবোধসঞ্জাত কৌতুকরসাশ্রিত মধুর রসের যে সন্ধান পাওয়া যায়, মধ্যযুগের পক্ষে তা' ঈর্ষণীয় বলেই মনে হয়।

(ক) রামেশ্বর ভট্টাচার্য : কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন অষ্টাদশ শতকের শক্তিমান কবি এবং শিবায়ন কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মণ এবং মাতা রূপবতী। তিনি মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও জনৈক ব্যক্তির অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে গৃহত্যাগ করেন এবং কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয় লাভ করেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের আদেশেই কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্য রচনা করেন। রামেশ্বর তাঁর কাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন 'শিবসঙ্কীর্তন'-রূপে, তবে সাধারণভাবে তাঁর কাব্যটি 'রামেশ্বরের শিবায়ন' নামেই সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছে।

কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্যরচনাকাল বলে যে শ্লোকটি রচনা করেছেন, তার অর্থ উদ্ধার করা দুষ্কর। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাদান বিচার ক'রে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে রামেশ্বর সম্ভবতঃ ১৭১২ খ্রীঃ তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্যের উভয় খণ্ডেই শিবের চরিত্র অঙ্কনে কবির দৃষ্টি ছিল সমান সজাগ। পৌরাণিক শিব-কাহিনী রচনায় তিনি শুধু বিভিন্ন পুরানের সহায়তাই গ্রহণ করেন নি, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যকেও যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছেন। তবে পৌরাণিক শিবকাহিনী রচনা করতে গিয়ে তিনি যেমন কতকগুলি বাঁধাবাঁধি ধারণার মধ্যে পড়ে গিয়ে স্বচ্ছন্দ হ'বার সুযোগ পাননি, তেমনি তিনি মনের সুখে আপনাকে ছড়িয়ে দেবার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন লৌকিক শিবের কাহিনী রচনায়। এই অংশে একদিকে হরগৌরীর সংসার এবং অপরদিকে মর্ত্যলোকে শিবের স্বাধীন, কিন্তু উন্মার্গ জীবনযাত্রা—উভয় ক্ষেত্রেই কবির সার্থকতা অপরিসীম। কৈলাসে হরগৌরীর সংসারের একটি পারিবারিক চিত্র—পরিবারের পরিজনবর্গ মধ্যাহ্নভোজনে ব্যস্ত :

> 'তিন ব্যক্তি ভোক্তা, একা অন্ন দেন সতী।
> দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি ॥…
> তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
> এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায় ॥…
> সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
> অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে ॥
> কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
> হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরে খা ॥'

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কথা স্মরণে রেখেও বলা যেতে পারে যে এমন বাস্তব চিত্রের নিদর্শন সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যেই দুর্লভ। হরগৌরীর সংসারে নিত্য অভাব—

আর এই অভাবের জ্বালা পুড়িয়ে খাক ক'রে দিয়েছে প্রতিটি চরিত্রকে। এমন অভাবের চিত্র এমন সর্বব্যাপ্ত দুঃখের চিত্র আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। পার্বতীর হাতে শাখা নেই, বড় দুঃখেই তিনি বলেন :

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥'

দেবী হাত নাড়া দিয়ে কথা বলবার সুখ পান না বলে দুঃখ করলেও মহাদেব মুখ নাড়া দিতে ছাড়েন না—তিনি বলেন :

'বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥'

খুব উচ্চতর মহত্তর আদর্শ সৃষ্টি করতে না পারলেও রামেশ্বর শিবদুর্গার চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—যদিও তাঁদের দেবীমহিমা মানবসত্তাকে অতিক্রম করতে পারেননি। রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যপাঠেই বোঝা যায় যে যুগপ্রভাবে মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীগণ স্বর্গত্যাগ করে মর্ত্যভূমিকেই যেন তাঁদের স্বাভাবিক আবাসভূমি বলে গ্রহণ করেছিলেন। গতানুগতিক কাহিনী রচনার বাইরে ছন্দসৃষ্টিতে, ভাবভূয়িষ্ঠ বাক্য গঠনে, অলাঙ্কার-নির্মিতিতে কিংবা হাস্যকৌতুক-সৃষ্টিতে রামেশ্বর যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা, কেবলমাত্র রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই তুলিত হ'তে পারে। অনুপ্রাস-সৃষ্টিতে কবির স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা ছিল,—'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর' কিংবা 'মটরের মর্দনে মুসুর গেল উড়্যা' প্রভৃতিতে অবশ্য অনুপ্রাসের একটু বাড়া-বাড়িই লক্ষ্য করা যায়। রামেশ্বরেরর কিছু কিছু ভাবগর্ভ উক্তি বহু প্রচলিত প্রবাদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। যেমন—'দিনে হও ব্রহ্মচারী, রাত্রে গলাকাটা' কিংবা 'পুত্রী, আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল' প্রভৃতি। রামেশ্বরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রামেশ্বর অন্যতম। ইঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের মত ভাষার চটক নাই সত্য কিন্তু সহানুভূতি এবং মানবিকতা রামেশ্বরের শিবায়নে যেমন আছে এমন অষ্টাদশ শতাব্দীর অপর কোন কবির কাব্যে পাই না।'

(খ) অন্যান্য :

১. 'রামকৃষ্ণ রায়'—'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী রামকৃষ্ণ রায় শিবায়ন কাব্যের একজন শক্তিমান্ কবি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণ রায়, মাতা রাধাদাসী। তিনি জাতিতে কায়স্থ, নিবাস ছিল হাওড়া জেলার রসপুর গ্রাম। কবি সম্ভবতঃ প্রথম জীবনেই আঃ ১৬২৫ খ্রীঃ কাব্যটি রচনা করেন। তাঁর কাব্যের নাম 'শিবায়ন' বা 'শিবের মঙ্গল'। ২৬ পালায় বিভক্ত তাঁর কাব্য যাবতীয় শিবায়নের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এতে তিনি 'হরিবংশ, কালীখণ্ড, স্কন্দপুরাণ কালিকাপুরাণ' প্রভৃতি বহু পুরাণ থেকে শিবকাহিনী সংগ্রহ ক'রে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। ফলতঃ কাহিনীগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন, কোন ঐক্যসূত্রে

সামগ্রিকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্করহিত বহু কাহিনীও তিনি রচনা করেছেন যার সার্থকতা সংশয়াতীত নয়। এদের মধ্যে আছে—মনসাকাহিনী, সমুদ্র মন্থন, বলিরাজ ও সাগর রাজার গল্প, অন্ধকবধ, পরশুরাম-রাবণের গল্প, ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী প্রভৃতি। কবি ছন্দ-রচনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা' একমাত্র ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গেই তুলিত হ'তে পারে। রামকৃষ্ণ-রচিত শিবায়নে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এর কিছু গদ্যপংক্তি। যেমন—'অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের করে প্রহলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করিয়া হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন, অবধান করহ।'—এ প্রায় আধুনিক গদ্যের ধার ঘেঁষে যায়। রামকৃষ্ণের কৃতিত্ব বিষয়ে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'বাংলা দেশের যদি কোন কবি গ্রাম্য মঙ্গলকাব্যকে পুরাণের সীমানায় তুলে ধরতে প্রয়াস ক'রে থাকেন, তবে তিনি হ'লেন শিবমঙ্গলের কবি-পণ্ডিত রামকৃষ্ণ রায়। কাহিনীর ঘনপিনদ্ধ গ্রন্থন-নৈপুণ্য চরিত্রগুলির পৌরাণিক মহিমা ও সংযম, সর্বোপরি কবির মার্জিত ভাষা ও পরিমিত অলঙ্করণ প্রশংসনীয় গৌরব লাভ করেছে। তাঁর কাব্যের একমাত্র ত্রুটি, তিনি জীবনের লঘু তরল দিকটিকে উপেক্ষা করেছিলেন।'

২. 'কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী' :—কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ মহাভারত এবং যাবতীয় মঙ্গলকাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর 'শিবমঙ্গল' কাব্যেই তিনি বোধ হয় সর্বপ্রথম 'মৎস্যধরা পালা, শঙ্খপরা পালা' প্রভৃতি লৌকিক পালা যোগ করেন। লৌকিক শিবের পরিচয় এই কাব্যেই প্রথম যথাযথভাবে ধরা পড়েছে বলে অনুমান করা হয়।

[আঠারো] শ্রীচৈতন্যদেব :

প্রশ্ন ৩৬। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগের সার্থকতা বিচার কর।

প্রশ্ন ৩৭। বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাব বিষয়ে আলোচনা কর।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব গৌড়বঙ্গে এক যুগান্তকারী ঘটনা। অনার্য-অধ্যুষিত বঙ্গভূমিতে একদা বৌদ্ধধর্মের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। এর পর জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব এবং গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনবংশীয় রাজাদের আধিপত্যে বৌদ্ধধর্মে ভাটা এবং হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান সূচিত হয়। ত্রয়োদশ শতকের উষালগ্নেই বাঙলায় তুর্কী আক্রমণ আবার এক ক্রান্তিকালের আবাহন জানায়। এই ক্রান্তিকাল প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনে এক মেঘের আবরণ বিছিয়ে দেয়। বিদেশী, বিধর্মী এবং বিভাষী শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচার এবং প্রভাব প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়ে দিলো। স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু বৌদ্ধ, অনার্য আদিবাসী এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করবার ফলে সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয়, সেই সময় আবির্ভাব ঘটে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে যে নব বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেন তা' একটা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এটা একটা সামান্য কথা ; এর একটা বৃহত্তর তাৎপর্য এই—তাঁর মহান্ উদার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। বাঙলার সমাজে ও সাহিত্যে, বাঙালীর জীবনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যে এক নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের সৃষ্টি করেছিল—নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এই সহজ সত্যকে স্বীকৃতি দান করেছেন। এইজন্যই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে গৌড়বঙ্গের জীবনে একটা যুগান্তকারী ঘটনা বলেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। পাঠান শাসকদের অনুকূলতায় বাঙলা সাহিত্য-তরী ইতঃপূর্বেই গতিলাভ করেছিল, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সেই তরীর পালে হাওয়া লাগলো। সমকালের রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিচয়ে দেখা যায়, বাঙলাদেশ মুঘল অধিকারে আসবার ফলে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হলেও দেশ একটা বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের সান্নিধ্য লাভ ক'রেছিল। এই বৃহত্তর পরিবেশের প্রভাব বাঙালীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্টই পরিবর্তন এনেছিল। এই পরিবর্তনই সমকালীন বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়।

১. **'শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী'** : ১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুন পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচী দেবী। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করায় বাল্যে চৈতন্যদেবের শিক্ষার প্রতি কোন যত্ন নেওয়া হয়নি। চৈতন্যদেবের বাল্য-নাম ছিল নিমাই ও গৌর বা গৌরাঙ্গ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নিমাই কিন্তু অল্প বয়সেই বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গমত্ব লাভ ক'রে 'নিমাই পণ্ডিত' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। অল্প বয়সেই নিমাই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন এবং বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করেন।

এর পর কিছুদিনের জন্য নিমাই পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে আসেন। ইতঃমধ্যে স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। নিমাই মায়ের আগ্রহাতিশয্যে রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। এই সময় নিমাই সঙ্গীদল নিয়ে নামকীর্তনে মত্ত হ'লে কোন কোন নগরবাসীর অনুরোধে কাজী কীর্তন নিষিদ্ধ ক'রে দিলে নিমাই আইন অমান্য ক'রে বিরাট দল নিয়ে নগর সংকীর্তনে বের হন। ভয় পেয়ে কাজী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

এরপর পিতৃকৃত্যের উদ্দেশ্যে নিমাই গয়ায় গিয়ে ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর নিকট দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। ঘরে ফিরে এলে তাঁর মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর নোতুন নামকরণ হয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। অতঃপর গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে তিনি পুরীধামে উপনীত হন এবং তথায় রাজগুরু কাশী মিশ্র ও পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্বভৌমকে ভক্তরূপে লাভ করেন।

পুরী থেকে চৈতন্য দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারত পরিভ্রমণে বের হন। এই সময় রায় রামানন্দ এবং পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। এরপর একবার তিনি বৃন্দাবনধামে গমন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে বিভিন্ন জনকে এই কাজের ভার অর্পণ করেন। তিনি পুরীধামে ফিরে আসবার পর অবশিষ্ট আঠারো বছর এখানেই অতিবাহিত করেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড় থেকে ভক্তদের সম্মেলন হ'তো পুরীধামে। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর চৈতন্যদেব প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত হ'য়ে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি লীলা সংবরণ করেন। তাঁর লীলাবসানের কারণ এখনও জানা যায়নি।

চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ কীর্তি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বিশেষ মতবাদের পিছনে রয়েছে এক বিরাট যুগসত্য—যুগের এবং জাতির প্রয়োজনেই তিনি এই বিশেষ সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে, তাকে রোধ করতে হ'লে এমন এক মতবাদ প্রচার করতে হ'বে, যা সর্বজনের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য ও আচরণীয় হ'য়ে উঠতে পারে। তাই হৃদয়ধর্ম থেকে উদ্ভূত এক প্রেমধর্মের প্রচারই ছিল চৈতন্যদেবের জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়ামি, মানুষে-মানুষে ভেদজ্ঞান-আদি প্রেমধর্মে

স্পষ্টতঃ না হ'লেও বাস্তবতঃ অস্বীকৃত ছিল। চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ', তিনি 'আচণ্ডালে ধরে দেয় কোল'। তাঁর সাদর আহ্বানে নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের নিকট মুক্তির মন্ত্র ধ্বনিত হ'য়েছিল। শুধু চণ্ডাল নয়, যবনও চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে আপনার অধিকার অর্জন করলো। ফলে সমগ্র দেশেই দেখা দিল এক অপূর্ব ভাববিপ্লব, যার মহানায়ক হ'লেন যুগন্ধর পুরুষ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

২. **চৈতন্যপ্রভাব : সমাজে :** সাধারণ দৃষ্টিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে একজন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক এবং বড় জোর, সমাজ-সংস্কারক বলে অনেকেই মনে ক'রে থাকেন। কিন্তু দেশের একটা ক্রান্তিকালে তিনি গোটা সমাজকে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা ক'রে জাতির জীবনে যে প্রবাহ সঞ্চার ক'রেছিলেন, পরবর্তীকালে জাতি তার ফল ভোগ করলেও যথাযথ বিশ্লেষণের অভাবে সমাজ-জীবনে চৈতন্যপ্রভাবের প্রকৃত মূল্যায়ন বড় একটা হয়নি বল্লেই চলে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালীর সমাজজীবনে যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার পরিচয় বাইরের দিকে যতটা দৃশ্যমান্ ততোধিক বর্তমান ছিল বাঙালীর অন্তর্জীবনে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এই প্রভাব ভিতরে ভিতরে কাজ ক'রে গেছে, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ততোটা ঘটেনি।

বাহ্যতঃ মনে হয়, চৈতন্যদেব ছিলেন বৈষ্ণবধর্মের একজন রূপকার। কিন্তু তৎ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ছিল স্বরূপে পৃথক্—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' নামে এর একটা বিশিষ্ট সত্তা ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-সমন্বিত কর্মবাদ এবং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত মায়াবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে ভক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হ'য়েছে। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—চৈতন্যদেব নিজের জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা এই সত্যই প্রচার ক'রে গেছেন। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত এই মতবাদের পশ্চাতে নিহিত আছে এক বিরাট যুগসত্য—যুগের প্রয়োজনে এবং জাতির প্রয়োজনেই এই সত্যদৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল—এই সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে যে কঠোর নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন হ'তো, তা সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই মাত্র সাধ্য ছিল। বস্তুতঃ পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিলেন যজ্ঞাদি কর্মবাদের একমাত্র অধিকারী। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত জ্ঞানবাদও সমাজের উচ্চ কোটিতে সীমাবদ্ধ। শিক্ষা-শাস্ত্র-আদির চর্চায় সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের কোনই অধিকার ছিল না—অতএব কর্ম আর জ্ঞানের ধারা থেকে সমাজের বৃহত্তর অংশই ছিল বঞ্চিত।

চৈতন্যদেব যুগসত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল, তাকে রোধ করতে হ'লে এমন এক মতবাদ প্রচার করতে হ'বে, যা সর্বজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও আচরণীয় হ'য়ে উঠতে পারে। অতএব নিছক হৃদয়বৃত্তি থেকে উদ্ভূত প্রেমধর্মের প্রচারই চৈতন্য-জীবনের লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো। ভক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রেমধর্মে সর্ব জীব আশ্রয় লাভ করতে পারে। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়ামি, মানুষে-মানুষে ভেদজ্ঞান-আদি প্রেমধর্মে স্পষ্টতঃ না হ'লেও কার্যতঃ অস্বীকৃত হ'লো। চৈতন্যদেব স্বয়ং যখন 'আচণ্ডালে ধরে দেয়

কোল', তখন সমাজের সর্বনাশা ভাঙনের পথ আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে এলো। যখন চৈতন্যদেবের মতে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ', তখন চিরকালের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষ মুক্তির আহ্বান শুনতে পেলো। বস্তুতঃ এর আগে আর বাঙলা দেশে এমনভাবে মানবমুক্তির উদার আহ্বান কখনও ধ্বনিত হয়নি। এই আহ্বান অনতিবিলম্বেই সাড়া জাগালো সমস্ত ভারতে, সমস্ত জাতির মধ্যে—শুধু চণ্ডালই নয়, যবনও পেল প্রেমধর্মে আপনার অধিকার। ফলে সমগ্র দেশেই দেখা দিল এক অপূর্ব ভাববিপ্লব, যার মহানায়ক হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। এই ভাববিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল সমাজ-জীবনে অনুভূত হলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতেঃ ব্যাপকহারে নিম্নবর্ণের হিন্দুর মুসলিম ধর্ম গ্রহণ বন্ধ হ'লো, নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও বহু ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করায় হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতা অনেকাংশে দূরীভূত হ'লো ; সঙ্কীর্তনে উচ্চনীচ কোন ভেদাভেদ ছিল না ; নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমানও বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করলে সমান অধিকার ভোগ করতো ; গুরুগিরিতে ব্রাহ্মণের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তা' অপরদের মধ্যেও সম্প্রসারিত হ'লো।

অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ-জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,"…এখন আমরা চৈতন্যের জীবনে নব্য মানবতা (neo-humanism), সমাজ সংস্কার নীচ জাতিকে উচ্চ শ্রেণীতে গ্রহণ করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পতিত-পতিতাকে পংক্তিতে স্থানদান ইত্যাদি আধুনিক সমাজ-মানসিকতার প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি।" চৈতন্যদেব মানবিক সম্পর্কের যে নব মূল্যায়ন ঘটালেন তার ফলে মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবতার স্থানে মানুষের অধিকার লাভ কতকাংশে সম্ভব হ'য়েছে। অন্ত্যমধ্যযুগের সাহিত্যে এই মানবতাবোধ তথা নয়া মানবতাবাদ স্পষ্টতঃই চৈতন্যের প্রভাবজাত।

আমাদের বাঙালীসমাজের বাইরেও চৈতন্যপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙলা দেশ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল, বাইরের সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। চৈতন্যদেবই প্রথম সমগ্র দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ ক'রে তথাকার সাধকদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করে ভাবধারার বিনিময় ঘটান। এরি প্রত্যক্ষ ফল, আজও পর্যন্ত পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা-আদি অঞ্চলের সঙ্গে বাঙালীদের হৃদয়ের যোগ বর্তমান রয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টাতেই মথুরা-বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থসমূহ উদ্ধার পেলো। এক সময় বৃন্দাবনই হ'য়ে উঠেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলকেন্দ্র।

চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টাতে এই যে বাইরের দরজা খুলে গেল, তার ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো। এর পরই বাঙলা দেশে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব বাঙালীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনেকটা পরিবর্তন এনেছিল। আবার মুঘল প্রভাব যখন জাতির

দৃষ্টিকে অনেকটা বহির্মুখী ক'রে তুলেছিল, তখন বাঙলাদেশে চৈতন্যপ্রভাবই তাকে সংযত ও সংহত রেখেছিল।

এ সকল প্রবল প্রভাব ছাড়াও চৈতন্যদেবের জীবন যে কতদিকে তৎকালিক জনজীবনে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল, তার কিছু কিছু কাহিনী তাঁর চরিতকারগণ লিখে রেখে গেছেন। চৈতন্যদেব নামধর্ম প্রচারের জন্য প্রতি সন্ধ্যায় সমবেতভাবে নামকীর্তন করতেন। অল্পকালের মধ্যেই এই নামকীর্তন ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হ'তে লাগলো। কিছু উদ্দেশ্যপরায়ণ লোক এর বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে নালিশ জানালে কাজী নামকীর্তন নিষিদ্ধ করেন। ধর্মাচরণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়াতে কাজীর আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। যে সঙ্কীর্তন ঘরে আবদ্ধ ছিল, তাকে তিনি নগর সঙ্কীর্তনে রূপায়িত করলেন। চৈতন্যদেবের নায়কত্বে সঙ্কীর্তন দল কাজীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হ'লে ভয় পেয়ে কাজী নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "চৈতন্যের এই উদ্যম ভারতবর্ষে বিরুদ্ধ শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জও।" চৈতন্যদেবের এই আইন অমান্য আন্দোলন নিপীড়িতের মুখে প্রথম বাধা যোগালো।

৩. **'চৈতন্য প্রভাব : সাহিত্যে'** : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের দান কী? প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর—কিছুই নয়, চৈতন্যদেব বাঙলা ভাষায় একটি পংক্তিও রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে যা দান করে গেছেন, তা স্বর্ণমূল্যে তুলিত হ'বার যোগ্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলা সাহিত্যে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, তাতে বাঙলা সাহিত্যের গতিপথ সুনিশ্চিতভাবেই একটা পরম পরিণতির দিকে চিহ্নিত হয়েছিল। চৈতন্যপূর্বযুগের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যের পার্থক্য থেকেই সদ্য-কথিত উক্তিটির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হতে পারে। চৈতন্য-প্রচারিত মতবাদ তৎকালীন বাঙালীর জীবনে যে ভাবগত পরিবর্তন সাধন করেছিল, তার ফলে বাঙালীর নিকট মানব-জীবনের মূল্য নোতুনভাবে নির্ণীত হয়েছিল। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে কাহিনীর কাঠামোতে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা না দিলেও অন্তরে যে অনেক উলটপালট হয়ে গেছে, তার পরিচয় তৎকালীন সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এখনও বর্তমান।

চৈতন্য-পূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে যে ভেদবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যে তা অনেকটা দূরীভূত ; চৈতন্যপ্রভাবের ফলে পরবর্তী মঙ্গলকাব্যও অনেকটা অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "এই দেশে এই সকল সঙ্কীর্ণতমূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের কূলপ্লাবিনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।" চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর নায়ক ব্যাধসন্তান কালকেতু। অনার্য ব্যাধসন্তানকে নায়কের পদে অভিষিক্ত করবার মানসিকতা চৈতন্য-পূর্ব যুগে ছিল অপ্রত্যাশিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব আমাদের সমাজের অনেক নিম্নস্তরের মানুষকেও

যে উপরে উঠতে সাহায্য করেছে, তা' ঐতিহাসিক সত্য। আমাদের এই সৃজনশীলতা, যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা পেয়েছি চৈতন্যদেবের কাছ থেকেই। আর এরি ফলে আমাদের পক্ষে কালকেতুকে কাব্যের নায়করূপে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধে হয়নি।

মঙ্গলকাব্যের মতোই অনুবাদ সাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব প্রত্যক্ষগোচর। চৈতন্যদেবের ব্যক্তির জীবনের উচ্চ আদর্শই বাঙালী কবিকে অনুরূপ আদর্শ চরিত্রের সন্ধানে নিয়োজিত করেছিল। এরি ফলে প্রাচীন মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালার চোখের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আদর্শ থেকেই বাঙালী কবিরা এঁদের নোতুনভাবে গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যের সাহায্যে ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারের চেষ্টাও চৈতন্যপ্রভাবজাত।

ভগবানের মাধুর্যময় রূপের অভিব্যক্তি কৃষ্ণমূর্তিতে আর শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। পরব্রহ্মের এই মানবীয় লীলারসকে চৈতন্যদেব আস্বাদ করেছিলেন স্বদেহে যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার অস্তিত্ব অনুভবের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব কবিতাগুলিতে চৈতন্য-আস্বাদিত রসেরই পরিবেষণ ঘটেছে। চৈতন্যোত্তর কবিগণ চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়িয়েই রাধাকৃষ্ণ-লীলার আস্বাদন করেছেন। অতএব চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই যে বাঙলা দেশে বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা' সন্দেহাতীতভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত। চৈতন্যদেবের প্রেমসাধনার সঙ্গে ঐক্য অনুভব ক'রে ইসলাম-পন্থী সুফী সাধকরাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্র রচনা করেছেন তার প্রভূত নিদর্শন রয়েছে পদাবলী সাহিত্যে। বাঙলার লোকসাহিত্যে, বাউলগানেও চৈতন্যপ্রভাব সুস্পষ্ট।

চৈতন্যপ্রভাবের প্রত্যক্ষ ও সুপরিণত রূপ—জীবনীসাহিত্যের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বাঙলা দেশে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন ক'রেই সর্বপ্রথম জীবনীসাহিত্য রচিত হয়। উক্ত সাহিত্যে চৈতন্যদেবের উপর অলৌকিক দেব-মহিমা আরোপ করা হ'লেও ঐ সাহিত্যেই যে সর্বপ্রথম মানবজীবনাভিমুখী বাস্তব রূপের প্রতিফলন ঘটেছিল, তার সাক্ষী ইতিহাস। অবশ্য আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা 'প্রিয়েরে দেবতা' করতে গিয়ে খাঁটি মানবিক জীবনী-সাহিত্য সর্বপ্রথম বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছি। যাহোক, পরবর্তী কালের বৈষ্ণবসাধকগণ আরও কিছুটা অগ্রসর হ'য়ে চৈতন্যপার্ষদদেরও জীবনী রচনা করেছেন। বস্তুতঃ মধ্য-যুগের বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে সর্বতোমুখী রূপ লাভ ক'রে বাঙলা সাহিত্যকেও ঐশ্বর্যপুষ্ট ক'রে তুলেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছিল, তাদের প্রধানগুলি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি ছাড়া আরও কিছু লক্ষণের উল্লেখ চলে। চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক যুগে। চৈতন্যদেবের ধর্মমত ছিল সামন্ততন্ত্রের অনুদার মনোভাবের বিরোধী—তাই চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের বিরোধিতাই লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্য-

দেবের প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের আবেগপ্রবণতা একদিকে যেমন গীতিকবিতাকে সার্থকতর করে তুলেছে, তেমনি আখ্যায়িকামূলক কাব্যেও গীতিকবিতার স্পন্দন এবং সঙ্গীত-ধর্মিতার উৎসার ঘটিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে 'গৌরচন্দ্রিকা'র প্রবর্তন এবং 'বাল্য ও গোষ্ঠলীলা'র পদগুলি চৈতন্য আবির্ভাবের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করায় সাধারণ বৈষ্ণব কবিরাও বাঙলা পদগুলিতে সংস্কৃত শব্দের সার্থক ব্যবহার দ্বারা ভাষার সৌকুমার্য সাধন করেন। চৈতন্য-দেবের সমুন্নত ও রুচিসম্পন্ন জীবন-যাপনের আদর্শে বৈষ্ণব কবিগণ সাহিত্যেও মার্জিত রুচির পরিচয় দান করেছেন। মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি ছাড়াও পরবর্তী কালে চৈতন্যজীবন-অবলম্বনে নাটক, যাত্রা, কবিগানাদি রচিত হয়েছে ও সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেই চৈতন্য জীবনাদর্শ ও ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

[উনিশ] চৈতন্যজীবনী সাহিত্য :

প্রশ্ন ৩৮। চৈতন্য-জীবন অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলিকে কি চরিত সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা চলে? চৈতন্য-জীবনীগুলির উপযোগিতা-বিষয়ে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩৯। চৈতন্য জীবনীগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি শ্রেষ্ঠ বিবেচনা কর? কারণ উল্লেখপূর্বক গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ৪০। 'চৈতন্যভাগবত' এবং তার গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৪১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং তদ্‌রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থটির গুণাগুণ বিচার করে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

'ভূমিকা' :—চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার অতি প্রত্যক্ষ এবং প্রধান ফল—চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্য-দেবের পূর্ববর্তী গোর্খনাথ, গোপীচাঁদ বা ময়নামতীর জীবনকাহিনী-অবলম্বনে কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও তাঁদের কারো ঐতিহাসিকতা যেমন নিঃসংশয়িত নয়, তেমনি কাহিনী-গুলিও জীবনধর্মী নয়, এগুলিকে বড় জোর কল্পকাহিনীরূপেই গ্রহণ করা চলে। ফলতঃ বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনীগুলিকেই আদি জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা দান করা চলে।

অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে থাকেন—আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থগুলিকে কি 'জীবনীগ্রন্থ' বলে গ্রহণ করা চলে? বিষয়টি একটু বিচার ক'রে দেখা আবশ্যক। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারবুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। চৈতন্যদেব যে কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে কোন মানদণ্ডেই ওটাকে

'মধ্যযুগ' বলেই অভিহিত করতে হয়। মধ্যযুগ বলতেই আমরা মোটামুটি অজ্ঞতা-কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা তমসাবৃত পরিবেশকেই বুঝে থাকি। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই সভ্যতার রথে চড়ে বড় দ্রুত অনেক পথ এগিয়ে এসেছি। ফলে কালের দিক্ থেকে খুব বেশি দূরে না এলেও বিজ্ঞান-বুদ্ধির দৌলতে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ থেকে আমরা সেকাল থেকে অনেক দূরে। কাজেই পরিপূর্ণ এ কালের দৃষ্টি নিয়ে সেকালের বিচারে সেকালের প্রতি অবিচারই করা হ'বে। কাজেই যেকালে এই চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি রচিত হ'য়েছিল, সেকালের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এর বিচার আবশ্যক।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে বাঙলা দেশ সবেমাত্র একটা অরাজক অবস্থার হাত থেকে কোনক্রমে অব্যাহতি পেয়েছে। দেশবাসীর মনে শান্তিস্বস্তি যে তখনো সংস্থাপিত হয়নি, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন চৈতন্যজীবনীকারগণ। অন্ধকারের অবসানে সদ্যজাগরিত জাতি কোনক্রমে আপনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী থেকে কিছু কিছু চরিত্রকে তুলে এনে জাতির সম্মুখে আদর্শ রূপে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন। জাতির মনে বিশ্বাস ও শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত চরিত্রে অলৌকিক গুণও আরোপ করা হ'য়েছে। তৎকালীন মানসিকতা ও বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত অলৌকিক কাহিনীর সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করবার অবকাশ ছিল না। যে কোন মহৎ ও বৃহৎ চরিত্রই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন—জনগণের মনে এই বিশ্বাসই ছিল দৃঢ়মূল। দেশের মানসপটভূমি যখন এরূপ, তখনই সেখানে আবির্ভূত হ'লেন প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে স্বভূমি ত্যাগ করেন। এরি মধ্যে তিনি ঈশ্বরমহিমায় ভূষিত। অতিশয় অহিংস তাঁর আচরণ—অথচ তাঁর ভয়ে রাজসরকারও সন্ত্রস্ত। তাঁর নামে 'শান্তিপুর হাবুডুবু, নদে ভেসে যায়'। এ কালের দৃষ্টিভঙ্গীতেও কি এই চরিত্রকে আমরা সাধারণ বলে মেনে নিতে পারি? যাঁর চরিত্রে ছিল এত অসাধারণত্ব, তাঁর উপর একটু অলৌকিক মহিমার আলোকেই তো চরিত্র স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠবার অবকাশ পায়!

এই বোধে অনুপ্রাণিত হ'য়ে চৈতন্যজীবনীকারগণ যে সকল চৈতন্যজীবনকাহিনী রচনা করেছেন, তৎকালোচিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাদের বিচার-বিবেচনা আবশ্যক। বিশেষতঃ চৈতন্যদেব একটি নব ধর্মমতের প্রবর্তন এবং জীবনীকারগণ ঐ ধর্মেই দীক্ষিত। কোন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁদের পক্ষে চৈতন্যজীবনী রচনা সম্ভবপর ছিল না। শাস্ত্রবিশ্বাসী এই ভক্তগণ এই শাস্ত্রবাক্যে আস্থাশীল ছিলেন যে 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা'—এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমেই নরলীলার স্বাদ গ্রহণ ক'রেছিলেন। যে সকল ভক্ত বৈষ্ণব চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ বা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার নিকট থেকেই তাঁর সম্বন্ধে জানতে পেয়েছেন। অতএব তাঁদের রচনায় চৈতন্য-জীবনের উপাদান-সংগ্রহ-বিষয়ে বিভ্রান্তি ঘটবার কোন কারণ নেই।

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলিকে আধুনিক জীবনীগ্রন্থ বলে মেনে নেবার পক্ষে প্রধান বাধা এই—ভক্তের দৃষ্টিতে দেখবার ফলে তাঁরা কখন কখন চৈতন্যের জীবনে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এটি অবশ্য তাঁদেরই দোষ নয়—এ আমাদের বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রায়শঃ 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। কোন মহামানবকে দেবচরিত্রে উন্নীত ক'রে আমরা আত্মানন্দ লাভ করে থাকি। ভগবত-পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার কাঠামোয় চৈতন্যলীলা পরিবেষণ করতে গিয়ে ভক্তকবিও নিছক বাস্তবতার মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন নি। ভক্তির প্রবলতা ও উচ্ছলতায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁদের দৃষ্টিতে আপনি দেববিগ্রহ পরিগ্রহ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়—কবিরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোথাও সত্যের অপলাপ করেন নি, বরং তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবার জন্য তাঁরা যথাসম্ভব উৎস নির্দেশও করেছেন। যে সূত্রে যে তথ্যের সন্ধান লাভ করেছেন, তাদের উল্লেখে কবিদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি এবং সত্যপ্রচারস্পৃহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি একালের দৃষ্টিতে 'জীবনীগ্রন্থ'-রূপে স্বীকৃত না হ'লেও সাধারণভাবে 'মহাপুরুষ-জীবনী'রূপে গৃহীত হ'তে পারে। সাধারণের জীবনের সঙ্গে মহাপুরুষ-জীবনের পার্থক্য সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত। তাঁদের জীবনে ঐহিক বাস্তবতা কখনই চরম এবং একমাত্র সত্যরূপে গৃহীত হয় না। অধ্যাত্মলোকের অলৌকিক ঘটনার বর্জনে তাঁদের জীবনের কোন মাহাত্ম্য আর অবশিষ্ট থাকে না। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেন: 'চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলি Hagiography বা সন্ত-সাধক জীবনীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এতে নিছক বাস্তবকাহিনী কখনই একমাত্র উপাদান বলে স্বীকৃত হয় না—অলৌকিক, অধ্যাত্মলোকের রহস্যময় ব্যঞ্জনা মহাপুরুষ-জীবনীর প্রধান উপাদান বলে সর্বযুগেই গৃহীত হ'য়েছে। এই কথাগুলি মনে রাখলে, চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলি যথার্থ জীবনী হয়েছে, কি হয়নি—এই নিয়ে অর্থহীন বাগ্‌বিতণ্ডায় মত্ত হবার প্রয়োজন হবে না।"

'সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনী' :—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁর সহচর অনুচরদের মধ্যে কেউ কেউ জীবন কাহিনী-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকারদের কেউ কেউ চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন বলেই তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। পরবর্তী জীবনীকারগণ এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে চৈতন্যজীবনের বহু উপাদানই সংগ্রহ করেছেন। সেইদিক্ থেকে বাঙলা ভাষায় রচিত না হ'লেও এই জীবনীগ্রন্থগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনচরিত রচনা করেন চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী মুরারি গুপ্ত। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—প্রচলিত ভাষায় এটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই পরিচিত। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে ১৫১৬ খ্রীঃ—১৫৪২ খ্রীঃ-র মধ্যেই রচিত হয়েছিল—অনেকে অনুমান করেন, এটি চৈতন্যদেবের জীবনকালেই

প্রণীত হয়েছিল। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের অতিশয় অন্তরঙ্গ ছিলেন বলেই এই গ্রন্থটির প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয়।

চৈতন্যদেবের সহচর শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন চৈতন্য-প্রদত্ত 'কবিকর্ণপূর' নামে চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী-অবলম্বনে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় দুই হাজার শ্লোকে গ্রথিত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' নামে চৈতন্যজীবনী মহাকাব্যে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হ'লেও তাদৃশ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিকর্ণপূর-এর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক দশ অঙ্ক-বিশিষ্ট নাটক। নাটকে ভক্তিতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করাতে এর নাট্যগুণ কিছুটা খর্ব হ'য়েছে। কবি এই নাটকটিই প্রথম রচনা করেছিলেন। কবিকর্ণপূর-এর তৃতীয় গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' সম্ভবতঃ ১৫৭৬-৭৭ খ্রীঃ রচিত হ'য়েছিল। বৈষ্ণবদর্শন, সমাজ ও ইতিহাস-বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া গৌড়মণ্ডলের চৈতন্যভক্তদেরও কিছু পরিচয় এ থেকে লাভ করা যায়। এগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হ'লেও তুলনা-মূলকভাবে এদের পরিচিতি অনেক কম। সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীগুলিই বহির্বঙ্গে চৈতন্যমহিমা-প্রচারে সর্বাধিক সহায়ক হ'য়েছিল—এ দিক থেকে এদের মূলবত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

(ক) **বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত :** বৃন্দাবন দাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবত'ই সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষায় রচিত চৈতন্যচরিতগ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। চৈতন্য-ভাগবতের প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। তারপর বৃন্দাবনের মোহান্তদের অনুরোধে অথবা মা নারায়ণীর নির্দেশে এর নাম পরিবর্তন ক'রে রাখা হয় 'চৈতন্যভাগবত'। গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাসের ব্যক্তি-জীবন-সম্বন্ধে কিছু জনশ্রুতি ছাড়া প্রামাণিক তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী এবং তিনি চৈতন্য-পার্ষদ্ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। বৃন্দাবনদাসের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, তবে গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর গুণকীর্তনে কবি ছিলেন পঞ্চমুখ। চৈতন্য ভগবতের উপাদান সংগ্রহের মূল উৎস নিত্যানন্দ এবং চৈতন্যদেবের অপরাপর ভক্তগণ—এ তথ্য গ্রন্থকার প্রয়োজনীয় স্থলে সর্বত্র উল্লেখ করেছেন।

বৃন্দাবনদাসের জীবৎকাল বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তিনি সক্ষোভে স্বীকার করেছেন :

'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥'

এ থেকে অনুমান করা হয় যে, চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই কবি জন্মগ্রহণ করলেও হয়তো মহাপ্রভুর দর্শন থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ এবং উপদেশও লাভ করেছিলেন। এ সব বিচারে বৃন্দাবন দাস ১৫১০ খ্রীঃ থেকে ১৫২০ খ্রীঃ-র মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই অর্থাৎ ১৫৫০ খ্রীঃ-এর মধ্যেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেছিলেন—এই অনুমান অসঙ্গত নয়।

চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী-বিষয়ে যে সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের প্রামাণিকতায় সন্দেহের কোন কারণ নেই—তবে কবির স্ব-কৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে অপরের মতের গরমিল হওয়া অসম্ভব নয়, তবে এই দায়িত্ব কবির নয়।

'চৈতন্যভাগবত' তিন খণ্ডে বিভক্ত এক সুবৃহৎ গ্রন্থ। এর আদি খণ্ডে পনেরোটি অধ্যায়—এতে সমসাময়িক যুগের পরিচয় এবং চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডে সাতাশটি অধ্যায়—এতে প্রধানতঃ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণই বিবৃত হয়েছে। অন্ত্যখণ্ডের দশটি অধ্যায়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর গুণ্ডিচাযাত্রা কাহিনী পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কাহিনী অনুপস্থিত থাকায় গ্রন্থটি যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় সমাপ্ত হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এই অসম্পূর্ণতার কারণ-সম্বন্ধে কেউ কেউ মনে করেন যে বৃন্দাবনদাস বৃদ্ধবয়সে কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন এবং আকস্মিক মৃত্যুহেতু গ্রন্থ রচনা ক'রে যেতে পারেন নি। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের প্রায় সমকালীন কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি থেকে ভিন্ন কারণ অনুমিত হয়। তিনি বলেন :

> 'নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
> চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥'

নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস যে গুরুর গুণখ্যাপনে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, এ সত্য অনস্বীকার্য, তাই কৃষ্ণদাসের অনুমান সত্য হওয়াই সম্ভব।

বৃন্দাবনদাসের কাব্য বিচার করতে গিয়ে তাঁর কাব্য-রচনার মূল উদ্দেশ্যটির বিষয়ে পূর্বেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় কবির প্রতি অবিচার হবার আশঙ্কা বর্তমান থেকে যেতে পারে। কাব্য-রচনার কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন নি। তিনি চৈতন্য-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পরিবেশে এবং চৈতন্যদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত একটি বৈষ্ণব-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বপ্রধান প্রচারক নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনদাস দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুটি তথ্য সর্বদা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ কাব্যালোচনা নয়, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারই যে ছিল কবির অভিপ্রেত এবং সেই উদ্দেশ্যেই যে কবি এই মহাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এ কথা মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ একটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যেই কবি কাব্য রচনা করেছিলেন, অতএব এতে সর্বজনীন উদার পরিপূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা সঙ্গত নয়। বস্তুতঃ কবির মনে সাম্প্রদায়িকতাবোধ ছিল প্রখর, তাই 'চৈতন্যমঙ্গল'-রূপেই কাব্যটি রচনা করলেও মঙ্গল-কাব্যানুযায়ী বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা তিনি করেন নি। ভিন্ন সম্প্রদায়-সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা-বশতঃ কবি তাদের উপর যথেষ্ট কটাক্ষপাত ক'রে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছেন এবং তুলনামূলকভাবে অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা আপন আপন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়েও তিনি সোচ্চার ছিলেন। কবির এই অনুদারতা, উদ্দেশ্যময়তা এবং প্রচার-ধর্মিতা

চৈতন্যভাগবতের কাব্যধর্মকে যেমন ক্ষুণ্ণ করেছে, তেমনি এটিকে খাঁটি জীবনীকাব্য-রূপেও গড়ে উঠতে দেয়নি।

কবির দৃষ্টিভঙ্গীর এই সঙ্কীর্ণতা এবং অনুদারতা ছাড়াও তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যধর্মিতা কীভাবে চৈতন্যজীবনেও অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে গ্রন্থের সর্বত্র। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ছিলেন একজন যুগন্ধর পুরুষ। তিনি যে শুধু গৌড়ীয় ধর্মপ্রচারেই জীবনপাত করেন নি, তাঁর আবির্ভাব যে সমগ্র গৌড়বঙ্গের সমাজে ও সাহিত্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই পরিচয়টি কিন্তু গ্রন্থে অনুদ্‌ঘাটিত। চৈতন্যদেবের জীবন ছিল কর্মবহুল। ধর্মচিন্তা তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিক্ হ'লেও তাঁর জীবনের একমাত্র দিক্ নয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের এমন সকল উপাদানই শুধু গ্রহণ করেছেন যাতে তাঁর ধর্মভাবটি প্রকাশিত হ'য়েছে। কবির দৃষ্টিতে ধর্মপ্রচারের অনুকূল বিষয়গুলিই শুধু গৃহীত হওয়াতে চৈতন্য-জীবনী সর্বাঙ্গীণরূপে প্রকাশলাভের সুযোগ পায়নি। তাঁর কর্মময় জীবনের ঘটনাসমূহ যদি গ্রন্থে রূপায়িত হ'য়ে উঠতো, তবে শুধু জীবনী গ্রন্থটিই সর্বাঙ্গসুন্দর হ'তো না—আমরাও সর্বাতিশায়ী গুণের অধিকারী এই যুগন্ধর পুরুষের প্রকৃত পরিচয় জানবার সুযোগ পেতাম। চৈতন্যজীবনের কর্মময় দিকের প্রতি কবি কিরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন, নিম্নে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হ'লো। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমকালীন সমাজ যে একটা প্রবল ভাঙনের মুখ থেকে ফিরে এসেছিল, গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই। চৈতন্যদেবের কর্মপ্রণালী এবং ভাবধারার মধ্যে যে ভারতব্যাপী একটা সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপনের প্রচেষ্টা সক্রিয়ভাবেই বর্তমান ছিল, তদ্বিষয়েও কবির নীরবতা বিস্ময়কর।

বৈষ্ণব ভক্তগণ চৈতন্যদেবকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলেই বিশ্বাস করেন। এই কারণেই কৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্য-প্রদর্শন ও সামঞ্জস্য-বিধান ক'রেই বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-ভাগবত রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। মহামুনি ব্যাসদেব-রচিত ভাগবতপুরাণে যেমন কৃষ্ণকাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে, বৃন্দাবনদাস অনেকটা সচেতনভাবেই তার অনুকরণ করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী এই কারণেই সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন:

'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।'

চৈতন্যজীবনীকে কৃষ্ণজীবনের অনুরূপ ক'রে গড়ে তুলতে গিয়েই কবি কিছু কিছু অলৌকিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। ভক্তের দৃষ্টিতে এতে চৈতন্য-মহাত্ম্য বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ পাঠক ও ঐতিহাসিকের নিকটই এই সমস্ত কাহিনী বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অন্যথায় কবি চৈতন্যজীবনের বাল্যলীলার চিত্র-অঙ্কনে আপন সামর্থ্যের যথোপযুক্ত পরিচয় দান করেছেন। চৈতন্য-চিত্র অঙ্কনে একটা সসম্ভ্রম ভক্তির ভাব বজায় রাখতেন বলেই তাঁকে দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যে কখনো স্থাপন করতে চাননি। এই কারণেই চৈতন্য-চরিত্রের বাস্তবতা সর্বত্র সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে কবি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এবং অদ্বৈত প্রভুর চরিত্র-চিত্রণে অতিশয় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে কবি

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন,—চৈতন্যভাগবতে এই চরিত্রটিই সর্বাধিক স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও বাস্তব হ'য়ে উঠেছে। নিত্যানন্দ-জীবনের তুচ্ছতাও এতে বর্ধিত হয়নি। ধর্মান্ধতায় কবির দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল বলেই তৎকালীন ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের পক্ষে চৈতন্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্রীচৈতন্যের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কর্মকৌশল, তাঁহার জাতীয়তাবোধ, তাঁহার সংগঠনশক্তি, উদ্ভাবনী-প্রতিভা, সংঘ-পরিচালনা-দক্ষতা, এখন কি দূরদর্শিতা, বৈপ্লবিক চিন্তা প্রভৃতি ব্যবহারিক গুণপনায় বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই।…ধর্মজীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক্ দিয়া চৈতন্যদেবের কার্যকলাপে যে যে অসঙ্গতি দেখা যায়, কর্মজীবনের ব্যবহারিক দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায়—তিনি সংঘ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই সেগুলি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা—চৈতন্যচরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যের কর্মজীবনই উপেক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসীরূপেই পরিচিত হইয়া আছেন, তাঁহার কর্মময় জীবন অন্ধকারেই থাকিয়া গিয়েছে। ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য।'

সচেতনভাবে বৃন্দাবনদাস ধর্মীয় প্রচারমূলক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে সমকালীন নবদ্বীপের অবৈষ্ণব সমাজের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর ইতিহাস-চেতনার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে সমগ্র দেশের রুচি কোন্‌দিকে প্রবাহিত হয়েছিল, ধর্মকর্মের অবস্থা কেমন ছিল, তাঁর একটা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত চিত্র আমরা চৈতন্য ভাগবতে পাই। সমসাময়িক নবদ্বীপের জনসংখ্যা, নবদ্বীপবাসীদের সম্পদ-সমৃদ্ধি এবং শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

'নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥'

যে কোন অল্পবয়সী বালকও যে মহাপণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা রাখতো, তার স্বীকৃতি জানিয়েছেন বৃন্দাবন দাস মনসা-চণ্ডী-আদি অনার্য দেব-দেবীগণ যে সমাজে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং চৈতন্য-পূর্ব যুগেই যে এঁদের মাহাত্ম্যসূচক বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল, এ সংবাদটি আমরা চৈতন্য ভাগবত থেকেই জানবার সুযোগ পেয়েছি।

'ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলী পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥…
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥'

চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে বিষ্ণুভক্তের সংখ্যা ছিল নগণ্য, বৈষ্ণবরা ছিল উপহাসের পাত্র।—

'অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥...
জগৎ প্রমত্ত ধন পুত্র বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে॥'

বৃন্দাবনদাসের কবিপ্রতিভা অতি উচ্চশ্রেণীর না হ'লেও তাঁর রচনাপ্রবাহ যে সচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হয়েছে, তা' অনস্বীকার্য। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, "কাব্যটির মধ্যে কবিত্ব ফলাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না, তথাপি চৈতন্য-চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য এবং কবির অন্তর হইতে স্বত-উৎসারিত অজস্র ভক্তিরস চৈতন্য ভাগবতকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দান করিয়াছে। চৈতন্য ভাগবতের যে কোন স্থান পড়িলেই ভক্ত কবির আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।...এইরূপ human interest হিসাবে চৈতন্য ভাগবত পুরাতন বাংলা সাহিত্যে একক এবং অদ্বিতীয়।"

(খ) লোচনদাস : চৈতন্যমঙ্গল :

বৈষ্ণবপদকর্তারূপে বিশেষভাবে পরিচিত লোচনদাস চৈতন্য-জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য। তাঁর রচনায় বৃন্দাবনদাসের নামের উল্লেখ থেকে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে তাঁর কাব্য বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'র পরে রচিত হ'য়েছিল। কবি লোচনদাস তাঁর কাব্যে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকর এবং মাতা সদানন্দী। কবি লোচনদাসের গুরু তৎকালীন বিশিষ্ট চৈতন্যপরিকর নরহরি সরকার ঠাকুর। কবি তাঁর কাব্যে শিক্ষাদীক্ষা-আদি বিষয়ে উল্লেখ করলেও তাঁর জন্ম তারিখ বা কাব্য রচনার তারিখ উল্লেখ করেন নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা হয় যে কবির কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৫৬০ খ্রীঃ থেকে ১৫৭৫ খ্রীঃ-র মধ্যবর্তী কোন এক সময় রচিত হ'য়ে থাকবে।

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে বহুবিধ রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া কবিরও যে স্বীকৃতি রয়েছে, তা' থেকে একথা অবশ্যই অনুমান করা চলে যে, আসরে গীত হবার জন্যই তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন। এ দিক্ থেকে এর 'মঙ্গল' নামকরণ সার্থক। অবশ্য কবি যে অপর সকল মঙ্গলকাব্যের অনুকরণেই এটিকেও মঙ্গলকাব্য রূপেই রচনা করেছিলেন, তার আরও কিছু প্রমাণ বর্তমান। কবি নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থারম্ভে অপর সকল মঙ্গলকাব্যের মতোই বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনাগীতি রচনা করেছেন। এ থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে কবি লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের মতো সাম্প্রদায়িকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ব্রতী হননি, তিনি সচেতন ভাবে কাব্য রচনাতেই প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন।

লোচনদাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' চারি খণ্ডে বিভক্ত। সূত্র খণ্ডে অপরাপর মঙ্গলকাব্যের

যতোই বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যায়িকা স্থান লাভ করেছে। মহাভারত, জৈমিনি ভারত, ব্রহ্মসংহিতা এবং বিভিন্ন পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে কবি এই খণ্ডটিকে সাজিয়ে তুলেছেন। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর জন্মলীলা থেকে গয়া গমন ও প্রত্যাবর্তন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মধ্য খণ্ডে পুরী যাত্রার ও সার্বভৌম-উদ্ধার পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়। মহাপ্রভুর লীলাবসান-বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন অন্য কোথাও নেই। তিনি লিখেছেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথদেহে বিলীন হ'য়ে গিয়েছিলেন।

লোচনদাসের কাব্য যেমন উদ্দেশ্যমূলক বা প্রচারধর্মী নয়, তেমনি এ থেকে ঐতিহাসিক উপাদান-আহরণও বিপজ্জনক। যদিও তিনি বহু ক্ষেত্রেই 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র সহায়তা নিয়েছেন এবং কোথাও কোথাও তাঁর রচনায় বৃন্দাবনদাসের প্রভাবও সুস্পষ্ট তবু এ কথা সত্য যে তিনি সচেতনভাবে কাব্য রচনায় ব্রতী ছিলেন বলেই ঐতিহাসিক তথ্যের কিংবা বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন নি। তিনি কবি, বৈষ্ণবপদকর্তাও বটেন, তাঁর দৃষ্টি ছিল জনসাধারণের দিকে। তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই তিনি কাব্য রচনা করেন। কাব্যিক উৎকর্ষের দিক্ থেকে লোচনদাসের কৃতিত্বকে অবশ্যই মর্যাদা সহকারে স্বীকৃতি দান করতে হয়। লোচনদাসের কাব্য-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত : 'চৈতন্য ভাগবতের তুলনায় চৈতন্যমঙ্গল বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কিছু ঊন বটে, তবে পল্লবিত কবিতাংশে লোচনের কাব্য বৃন্দাবনদাসের কাব্য অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের রচনা মুখ্যতঃ বর্ণনাত্মক আর লোচনের রচনা প্রধানতঃ রসাত্মক।' লোচনের কাব্যে রয়েছে ইতিহাস-বিমুখতা এবং পূর্বাপর সঙ্গতির অভাব। এ সকল অপূর্ণতা স্বীকার করেও অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী তাঁর রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন নিম্নোক্ত বক্তব্য মাধ্যমে : কিন্তু খণ্ডবিচ্ছিন্ন এমনি বহু মনোরম চিত্র রচনা করেছেন লোচন,—স্বতন্ত্রভাবে যাদের মধ্যে গল্প ও জীবনরস সুনিবিড় হ'য়ে আছে, জীবনীকাব্যকার হিসেবে লোচন ব্যর্থ, কিন্তু মর্মস্পর্শী গল্পরসিক হিসেবে অবশ্য সমুল্লেখ্য।'

লোচনদাস ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ্ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য, কাজেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ঐ বিশেষ শাখায় চৈতন্যমঙ্গলের বিশেষ সমাদর ছিল। নরহরি সরকার যে 'গৌরপারম্যবাদ' বা 'নদীয়ানাগর'বাদের প্রবক্তা ছিলেন, কবি লোচনদাসের কাব্যে গৌরাঙ্গসুন্দরের সেই নদীয়ানাগর-রূপটিই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠায় ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট কাব্যটি আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। গৌরনাগর-বাদের স্বরূপ এবং লোচনের কাব্যে এই ভাবের আত্মপ্রকাশ-বিষয়ে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন : 'গৌরপারম্যবাদে বলা হইয়াছে স্বয়ং কৃষ্ণও উপাস্য নহেন, গৌরাঙ্গই একমাত্র উপাস্য, এই গৌরাঙ্গ আবার সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নহেন, গৃহী গৌরাঙ্গ। সন্ন্যাসী চৈতন্য পূর্ণ হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণতম হইতেছেন গৃহী ও শৃঙ্গারবেশী গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ 'নদীয়ানাগর' এবং ভক্তেরা 'নদীয়া-নাগরী'। ভক্তের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হইতেছে ব্রজগোপীর সহিত

শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের রমণীমোহন রূপ, কটাক্ষ, হাস্য, হাবভাব বর্ণনা করিয়া লোচনদাস অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। লোচনের কাব্যে নদীয়ার কুলবধূগণ গৌরাঙ্গদর্শনে নিজের সতীধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন।—"রসালসে আবেশে লোলি পড়ে গোরাপাশে গরগর কামে উনমতা।" লোচনের চৈতন্যমঙ্গল আদ্যন্ত দেবলীলা মাত্র, তাহাতে ঐতিহাসিকতার চিহ্ন নাই—তাহা আগাগোড়া চমৎকার রোম্যান্টিক কাব্য।'

(গ) জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল :

লোচনদাসের মতোই আরো একজন বৈষ্ণব কবি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচনা করলেন আর একটি মঙ্গলকাব্য—এরও নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। জয়ানন্দ আত্মপরিচয় দান-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতা রোদণী দেবী। তাঁদের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রাম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই সুবুদ্ধি মিশ্রের এক বৎসর-বয়স্ক পুত্রের নাম রেখেছিলেন 'জয়ানন্দ'—অতএব কবি জয়ানন্দ যে মহাপ্রভুর জীবৎকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঐতিহাসিকদের অনুমান জয়ানন্দ আঃ ১৫৬০ খ্রীঃ নাগাদ 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন।

জয়ানন্দ সচেতনভাবেই কাব্যের নামকরণ করেছিলেন 'চৈতন্যমঙ্গল'—কারণ তিনি মঙ্গলকাব্যের ধারারই অনুসরণ করেছিলেন। অপরাপর মঙ্গলকাব্যের মতোই তিনিও গ্রন্থারম্ভে বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতিবন্দনা করেন এবং নানা পুরাণ থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করেন। অনেকে মনে করেন, জয়ানন্দের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীই যেন সমধিক গুরুত্ব লাভ ক'রে। কবি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও মনোভাবের দিক্ থেকে যে অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তার পরিচয় যেমন এখানে বিধৃত, তেমনি অন্যত্র অনেক স্থলেই তাঁর অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ একসময় কবির কাব্যটি এই কারণেই জনসাধারণের মধ্যে বেশ আদরের সঙ্গেই গৃহীত হ'য়েছিল।

জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' পরিকল্পনায় যথেষ্ট নোতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যটি নয় খণ্ডে বিভক্ত :—আদি খণ্ড, নদীয়া খণ্ড, বৈরাগ্য খণ্ড, সন্ন্যাস খণ্ড, উৎকল খণ্ড, প্রকাশ খণ্ড, তীর্থ খণ্ড, বিজয় খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। মূলতঃ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-কাহিনীই গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হ'লেও বিভিন্ন খণ্ডগুলি খুব সুগ্রথিত নয়। কবি ছিলেন মূলতঃ গায়েন, অতএব আসরে গীত হবার উপযোগী ক'রেই তিনি গোটা বিষয়কে পালার আকারে সাজিয়েছিলেন। এই গ্রন্থেও আছে, বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ। এটি যে আসরে গীত হ'তো, এ বিষয়ে কবির স্বীকৃতি রয়েছে :—

'ইবে শঙ্খ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাত্র শেষে॥'

জয়ানন্দের কাব্যে শুধু পরিকল্পনার অভিনবত্ব নয়, বিষয়ের দিক্ থেকেও তিনি প্রচলিত

কাহিনীর বাইরে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই এক সময় অনেকের ধারণা ছিল যে কবি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চৈতন্যদেবের একটি প্রামাণিক জীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর স্ববিরোধিতা এবং কল্পনার আতিশয্য প্রমাণিত হবার পরই ধরা পড়ে যে আসর জমানোর জন্যই তিনি প্রচুর গালগল্পের অবতারণা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে জয়ানন্দ-বর্ণিত অনেক বিষয়ই অভিনব বলেই দৃষ্টি-আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এদের বাস্তব ভিত্তি নেই। তৎসত্ত্বেও জয়ানন্দ লিখিত কোন কোন বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা সম্ভব বলেও ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। যেমন—চৈতন্যদেবের লীলা অবসানের ব্যাপারে প্রায় সকল গ্রন্থকারই নীরব, কিংবা অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ-বর্ণিত কাহিনীটিই বাস্তব এবং বিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন, আষাঢ় পঞ্চমীতে রথযাত্রায় মহাপ্রভু যখন নেচে নেচে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর পায়ে ইঁটের আঘাত লাগে—এরই পরিণতিতে তাঁর ইহলীলার অবসান ঘটে।—মহাপ্রভুর লীলাবসান-বিষয়ে এই লৌকিক কাহিনী ভক্তজনের মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এরূপ রচনার অপরাধেই তিনি বৈষ্ণবসমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থটি প্রায় বিলুপ্তির পথে চলেছিল। কবি গঙ্গাধরসম্প্রদায়ভুক্ত অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তাঁর গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল।

জয়ানন্দের মধ্যে প্রাচীনতর কবি ও গ্রন্থের উল্লেখ ঐতিহাসিকদের সমাদর লাভ করেছে। তবে তাঁর রচনার কাব্যমূল্য কিংবা ঐতিহাসিক মূল্য—কোনটাই স্বীকৃতি লাভ করেনি। তাঁর কাব্যকে 'গায়েনসুলভ, চিত্ত 'চমৎকারসৃষ্টির চেষ্টা' এবং 'অপরিণত পাঁচালী' বলেও এখনও অনেকে মনে করে থাকেন।

(ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

প্রশ্ন ৪১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং তদ্‌রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থটির গুণাগুণ বিচার করে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা-রূপে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা রূপেই বিশেষ খ্যাতিমান্। তিনি একালে জন্ম-গ্রহণ করলে কাব্য না লিখে যে প্রবন্ধসাহিত্য রচনায়ই প্রবৃত্ত হতেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বস্তুতঃ তাঁর রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' যতখানি চৈতন্যের জীবনী, তার চেয়েও অনেক বেশি বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ।

কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তাতে জানা যায়, তিনি ঝামট-পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্নে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ লাভ করে তিনি বৃন্দা-বনধামে গমন করে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেন ও ষড়

গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভিন্নসূত্রে জানা যায় যে কৃষ্ণদাসের পিতার নাম ছিল ভগীরথ ও মাতা সনন্দ, জাতিতে বৈদ্য। পরবর্তী কালে রচিত কোন কোন গ্রন্থে কথিত হয়েছে যে, বৃন্দাবন থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ যখন গৌড়ে প্রেরণ করা হয়, তখন তা দস্যুদল-কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়—এই গ্রন্থরাজির মধ্যে কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও ছিল। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে কবিরাজ গোস্বামীর মৃত্যু হবে। এ ঘটনার সত্যতা অবশ্য সংশয়িত।

গ্রন্থরচনার কাল-বিষয়ে কৃষ্ণদাসের রচনা থেকে অনুমিত হয় যে ১৬১৫ খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু প্রৌঢ় কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে সনাতনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন—১৫৫৪খ্রীঃ সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব ঘটে। কাজেই এই তারিখের পরও অন্ততঃ ৬০ বৎসর জীবিত থাকা সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না। যদিও গ্রন্থ রচনাকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, তবু তাঁর পক্ষে এত দীর্ঘজীবী হয়ে থাকা সংশয়-জনক বলে মনে হয়। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন :

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি॥'

যা হোক, সব দিক্ বিবেচনা করে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে কৃষ্ণদাস সম্ভবতঃ ১৫৬০-১৫৮০ খ্রীঃ মধ্যে তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

চৈতন্যজীবনীর প্রথম কবি বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' মহাপ্রভু শেষ জীবনের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত না হওয়াতে বৈষ্ণব ভক্তদের নির্বন্ধাতিশয্যেই নিজের অক্ষমতা-সত্ত্বেও চৈতন্যজীবন-কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন বলে কৃষ্ণদাস উল্লেখ করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিলীলায় সতেরোটি পরিচ্ছেদ—তার প্রথম বারোটি বস্তুতঃ মুখবন্ধরূপেই রচিত হয়েছে। এতে বৈষ্ণবতত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ আলোচিত হ'য়েছে। পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে নবদ্বীপ বাসকাল পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যলীলার পঁচিশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরিব্রাজক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং তৎপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচিত হ'য়েছে। অন্ত্যলীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ—এতে নীলাচলবাসী চৈতন্যজীবনের ভাবোন্মাদ অবস্থার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেষণ করলেও কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর লীলাসংবরণ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর এই নীরবতা-বিষয়ে বিভিন্ন কারণ অনুমিত হয় :—মহাপ্রভুর লীলাবসান একান্ত প্রাকৃত ব্যাপার বলেই তিনি তা' এড়িয়ে গেছেন, অথবা শারীরিক অশক্ততা নিবন্ধন কবি গ্রন্থ সমাপ্ত করতে পারেন নি, কিংবা গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বেই কবির মৃত্যু ঘটে।

চৈতন্যজীবনের প্রথমাংশ বর্ণনায় কবি বাহুল্য বর্জন করেছেন। পূর্বসূরী বৃন্দাবনদাস

বিস্তৃতভাবেই এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন বলেই কৃষ্ণদাস তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই এই সমস্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছিলেন। বস্তুতঃ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরিপূরক রূপেই তিনি তাঁর গ্রন্থের পরিকল্পনা ক'রেছিলেন—এ কথা তিনি একাধিক বার উল্লেখ ক'রে গেছেন।

কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' শুধু যে চৈতন্যজীবনের প্রামাণিক কাহিনী-রূপেই সমাদৃত, তা' নয়, বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের প্রামাণিক ব্যাখ্যাও রয়েছে, এত যে কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তই এ কথা বিশ্বাস করেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন: 'চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যচরিত কাব্যমাত্র নহে। জীবনীবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম বিবরণ, বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। তত্ত্ব বিচার গ্রন্থটির বাহ্যাংশ নহে; চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণবনীতি, দর্শন ও রসতত্ত্ব ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিরূপে অচ্ছেদ্য ভাবে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্ব কৃষ্ণলীলাকাহিনীর সহিত ওতপ্রোত; সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণলীলা যে অনেক পরিমাণে মুখ্যভাবে বিচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে বিস্ময়বোধ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই।'

বৃন্দাবনদাসের মতোই কৃষ্ণদাস কবিরাজও মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী অবলম্বনে বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেই আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস সম্ভবতঃ কবিপ্রাণ ছিলেন বলেই তাঁর রচনায় কখন কখন গীতিপ্রাণতা বা আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন একান্তই রসকষহীন নৈতিক বৈষ্ণব পণ্ডিত, তাই তাঁর গ্রন্থ আকারে মহাকাব্যতুল্য হ'লেও এতে কবির কবিধর্মের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন: 'বাঙলা ভাষায় বস্তুনিষ্ঠ মননশীল সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা এই যুগেও বর্তমান। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধরনের রচনা প্রায় দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে, শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগের নহে, সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনাই অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে—সমসাময়িক যুগে সাহিত্যে গদ্য ভাষার প্রয়োগ ছিল না বলিয়াই হয়তো কবিরাজ গোস্বামী পদ্যের শরণাপন্ন হইয়া-ছিলেন, নতুবা হয়তো গদ্যই হইত তাঁহার ভাবের বাহন। দৃঢ়বদ্ধ ভাব, ভাবোচ্ছ্বাসের স্বল্পতা এবং সরল প্রকাশভঙ্গী তাঁহার রচনাকে গদ্যধর্মী করিয়াই তুলিয়াছে। গ্রন্থে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ কম, কবিত্বের বিকাশও কম। কবি যুক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে গদ্যাত্মক রচনায় আপনার প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন।

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মে যে নিষ্ণাত ছিলেন, তা' বলাই বাহুল্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক্ দিয়ে এই গোস্বামীগণ যে সকল মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের সবকটিই সংস্কৃত ভাষায় রচিত

বলে জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য ছিল না। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যজীবনী রচনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও তত্ত্বকে জনসাধারণের গ্রহণোপযোগী ক'রে প্রকাশ করলেন বাঙলা ভাষায়। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অনেকের নিকট যে দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হয়, তার কারণ ভাষার কঠোরতা নয়—বিষয়ের কাঠিন্যই গ্রন্থটিকে সাধারণের নিকট কিছুটা দুর্বোধ্য ক'রে তুলেছে। তিনি গ্রন্থটিকে প্রামাণিক ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যেই যখনই কোন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, তখনই তার সমর্থনে শাস্ত্রীয় বাক্যও উদ্ধার করেছেন। এর ফলে গ্রন্থে সাত শতাধিক সংস্কৃত শ্লোকও স্থান লাভ করেছে—অবশ্য এর মধ্যে শত পরিমাণ শ্লোক কবিরাজ গোস্বামীরই রচিত। কবিরাজ গোস্বামী যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন—এখানেই তার প্রমাণ বর্তমান। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন: 'দার্শনিক চিন্তার জগতে চৈতন্যচরিতামৃতের দান অল্প নহে। স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম প্রচার করিয়াছেন, ভুক্তির ইচ্ছার ন্যায় মুক্তির ইচ্ছাও বর্জনীয়—"মোক্ষবাঞ্ছাকৈতবপ্রধান।" চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে পঞ্চম বর্গ বা পুরুষার্থ হইতেছে "প্রেম"। এই প্রেম কাম নহে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম' এবং এই প্রেম—'বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,' 'বিষামৃতে একত্রে মিলন'। ইহা কৃষ্ণদাসেরই নূতন বাণী। বৈধী ভক্তি অপেক্ষা অহৈতুকী রাগানুগা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য নহে মাধুর্যই ঈশ্বরের স্বরূপ, "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ"—প্রভৃতি বহু দার্শনিক তত্ত্ব চৈতন্যচরিতামৃত হইতেই জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।...তত্ত্বের শুধু প্রচার নহে, তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও কৃষ্ণদাস অল্প চেষ্টা করেন নাই।...তাঁহার কৃতিত্ব চৈতন্যবাণী ব্যাখ্যায়। চৈতন্য ধর্মের ব্যাখ্যাতা হিসাবেই তিনি বঙ্গ সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

বহুগুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যচরিতামৃত ও গ্রন্থকারদের কিছু শুষ্কতা ও ত্রুটির উল্লেখ প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বলেই কাব্যটি এত বেশি প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছে, যে এর কোন কাব্যগুণ প্রায় চোখেই পড়ে না। অসাধারণ বিনয়ী বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কবিরাজ গোস্বামীর ভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা বড় বেশি পীড়াদায়ক বলে মনে হয়। অবৈষ্ণবের রসনা, নাসা ও দেহকে কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন নিকৃষ্ট বস্তুরূপে বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণব তত্ত্ব-বিচারে তিনি যথেষ্ট যুক্তি, বিচার বুদ্ধি ও নিষ্ঠার পরিচয় দিলেও চৈতন্যদেবের পরিচয় দান-প্রসঙ্গে তিনি বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ফলে চৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষায় যে একটি ঐতিহাসিক জীবনী রচিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা একেবারেই তিরোহিত হলো। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' যেমন খাঁটি জীবনী হয়নি, তেমনি ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবার যোগ্যতাও হারিয়েছে।

ঙ. **অন্যান্য :**

বাঙলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং লোচনদাস এবং জয়ানন্দ-ব্যতীত অপর দুজন মাত্র কবির নামই উল্লেখ করা যায়, যাঁরা চৈতন্যজীবনী রচনায় সার্থকতা লাভ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনী ছাড়াও চৈতন্যপরিবারভুক্ত আরো কিছু মহাপুরুষের জীবনীও সেকালে রচিত হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য প্রভু এবং তৎপত্নী সীতাদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ', হরিচরণের 'অদ্বৈতমঙ্গল', নরহরি দাসের 'অদ্বৈত বিলাস' এবং লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' ও বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতা-গুণকদম্ব' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আছে 'ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, গৌরচরিতচিন্তামণি, প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্যপরিকরদের জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

১, 'গোবিন্দদাসের কড়্চা' :—জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ চৈতন্য-সহচর-রূপে গোবিন্দ কর্মকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—অপর কোন সূত্রে এই নামটি পাওয়া যায় না। মাত্র ১৮৯৫ খ্রীঃ 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে গ্রন্থটির প্রামাণিকতা নিয়ে পণ্ডিতমহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।—গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার আত্মপরিচয়সূত্রে জানিয়েছেন যে 'অস্ত্র হাতা,...বেড়ি' গড়াই ছিল তাঁর পেশা; তিনি 'নির্গুণ মূর্খ' বলে স্ত্রীদ্বারা অপমানিত হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং চৈতন্যের ভৃত্যের পদ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর সেবক ও নিত্য সঙ্গী। তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দিনলিপি বা কড়্চা রেখেছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনী-ব্যতীত মহাপ্রভু-জীবনের অপর কোন বিবরণ এই গ্রন্থে নেই।—গ্রন্থের ভাষা, বিষয়বস্তু-আদি বিচার করে মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁর 'গোবিন্দদাসের কড়্চা রহস্য' নামক গ্রন্থে এবং বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত 'Govinda Das's hadcha—a Black Forgery' নামক গ্রন্থে 'গোবিন্দদাসের কড়্চা'কে নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জাল বলে প্রমাণ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনও এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। আবার ডঃ দীনেশ সেন আদি প্রাচীনগণ এটির প্রামাণিকতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার মধ্যপন্থা গ্রহণ ক'রে মন্তব্য করেছেন—'গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া গোবিন্দদাসের কড়চা নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।'—গ্রন্থটির প্রামাণিকতা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এর বর্ণনায় হৃদ্যতা এবং কবির কবিত্বশক্তিকে স্বীকৃতি জানাতেই হয়।

২. 'চূড়ামণি দাস : গৌরাঙ্গবিজয়'—বৈষ্ণব পদকর্তা চূড়ামণিদাস-রচিত চৈতন্য-জীবনী-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ 'ভুবন মঙ্গল' বা 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামে পরিচিত। গ্রন্থকার ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য। অতএব কবি সম্ভবতঃ চৈতন্য-

লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, চূড়ামণিদাস সম্ভবতঃ ১৫৪২ খ্রীঃ—১৫৫০ খ্রীঃ-র মধ্যে কোন একসময় গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

কবি সম্ভবতঃ আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন খণ্ডে গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে-ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর গ্রন্থের অংশবিশেষ মাত্রই পাওয়া গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে কবি চৈতন্যমহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে কিছু নোতুন তথ্য পরিবেষণ করেছেন। মাধবেন্দ্রপুরী-বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ, নিত্যানন্দের বাল্যজীবন এবং চৈতন্যদেবের সহিত তাঁর পত্র-ব্যবহার-আদি বিষয়ে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যায়। কবি চৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন—কিন্তু এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি যেমন কোন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন নি, তেমনি কোন অলৌকিক কাহিনীরও অবতারণা করেন নি। গ্রন্থের কোন কোন চরিত্রসৃষ্টিতে এবং ঘটনা-বর্ণনায় কবি মোটামুটিভাবে বাস্তবতা বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

[কুড়ি] বৈষ্ণব সাহিত্য ঃ

প্রশ্ন ৪২। বৈষ্ণব পদাবলীর গুণাগুণ বিচার করে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

প্রশ্ন ৪৩। "সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে যদি এমন কোন ধারার উল্লেখ করতে হয়, যা বিশ্বসাহিত্যে পরিবেষণ যোগ্য, তবে তা' নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব সাহিত্য"—আলোচনা কর।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের পরই গীতিধর্মিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে অবশ্যই বৈষ্ণবকবিতার স্থান সর্বোচ্চ। একটা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীসাহিত্যরূপে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই বৈষ্ণব পদগুলি দেশকালের সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে কোন্ গুণে সর্বজনীন রসাবেদন-সৃষ্টিতে সার্থকতা অর্জন করেছে, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হ'তে পারে। তিনি বলেন ঃ "·· এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবল বেগে বাঙলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলঙ্কার শাস্ত্রের পাষাণবন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল ? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।"

এই বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন মহাকাব্যে ও পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে 'পূর্ণব্রহ্ম' কিংবা 'অবতারী' অথবা 'বিষ্ণুর অবতার' ব'লে বর্ণনা ক'রে তাঁর অপরিসীম শক্তি, বুদ্ধি-আদি বিভিন্ন গুণরাশির যথাযথ পরিচয় বিবৃত করা হ'লেও তিনি বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে যে বিভিন্ন লীলায় মত্ত ছিলেন, সেই প্রেম-

স্বরূপেরও কিছুটা বিবরণ আমরা বিভিন্ন সূত্রে পেয়ে থাকি। পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ কোন লৌকিক সূত্রে বৃন্দাবনের গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকার নামটি অনুপ্রবিষ্ট হ'লে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে কল্পিত হন। কিছু কিছু প্রাকৃত ও সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকে রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনীর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে জয়দেব গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা-অবলম্বন ক'রে যে অপূর্ব সঙ্গীতধর্মী 'গীতগোবিন্দ কাব্য' রচনা করেন, তাতেই আমরা সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ-লীলার পরিপূর্ণ বিবরণ লাভ করি।' 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ'-আদি কোন কোন অর্বাচীন পুরাণেও রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেষিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নামক এক নাট্যগীতিতে বাঙলা ভাষায় প্রথম রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী কীর্তিত হয়। প্রায় সমকালেই মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর বিভিন্ন দিক্ অবলম্বন ক'রে ব্রজবুলি ভাষায় কিছু পদ রচনা করেন। এগুলিকেই পদাবলী সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলে মনে করা হয়। সম্ভবতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসও এ সময় বাঙলা ভাষায় এ জাতীয় কিছু পদ রচনা করেছিলেন।

এ সমস্তই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালের কথা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণবধর্মের অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয় এবং বঙ্গদেশে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়' নামে এর একটি বিশেষ শাখা গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের উপাসক ছিলেন। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার। তাঁদের এই বিশ্বাস রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে স্বরূপ দামোদর-রচিত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে—

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ পুরীন্দুঃ॥'

অর্থাৎ রাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোকে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীও 'চৈতন্য চরিতামৃত-এ' বলেছেন :

'রাধাভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ॥'

চৈতন্যদেব এক দেহেই রাধা এবং কৃষ্ণের অবতার। 'তিনি অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ'— অন্তরে তিনি কৃষ্ণময়, আকারে রাধার তুল্য গৌরতনু। এই নবোদ্ভূত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মেও রসশাস্ত্রে যে পঞ্চরসের অস্তিত্ব এবং মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হ'য়েছে, তারি রস-ভাষ্যরূপে সৃষ্টি হ'লো চৈতন্যসমকালীন এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য। তাই বলা হয়, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবপদের নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান।—তা হ'লেই একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত এই সাহিত্য সর্বজনীন রসাবেদন সৃষ্টি করতে পারে কীভাবে?

প্রশ্নটি তুলেছেন রবীন্দ্রনাথও—

'সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি ?...'

একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার—বৈষ্ণবপদাবলীর কবিগণ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বৈষ্ণব হ'লেও তাঁরা কেউ 'আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়' নন, তাঁরাও মাটির পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, এখান থেকেই রস আহরণ ক'রে পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব সাধনা ছিল রাধাভাবের সাধনা। তাঁরা কেউ বা রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ উপলব্ধিতে তৎপর, কেউ বা রাধাভাব অবলম্বন না করেও সখী বা মঞ্জরীর অনুগভাবে সাধন ক'রে নিত্যযুগল লীলা আস্বাদন করতেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "পরবর্তী কালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ-কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়া সহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।" বস্তুতঃ পার্থিব লৌকিক মানবীয় প্রেমের আদর্শে কবিরা আপন হৃদয়ে সঞ্চিত প্রেমোপলব্ধিকেই একটু অলৌকিকতার স্পর্শ বুলিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বৈষ্ণবপদগুলি থেকে ভক্ত বৈষ্ণব অলৌকিক প্রেমের স্বাদ পেলেও যে কোন সাধারণ পাঠক এরি মধ্যে লৌকিক পার্থিব এবং মানবীয় রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় না। জনৈক রসজ্ঞ সমালোচক উভয় মনোভাবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান ক'রে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "...বৈষ্ণবপদাবলীকে পুরোপুরি মর্ত্যপ্রেমের নিরিখে বুঝা যাইবে না, আবার শান্তরসাস্পদ ভক্তির নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মনিবেদনও ইহার একমাত্র পরিচয় নহে—উভয়ের সংমিশ্রণে, প্রেমের বিষামৃতের তীব্রতায় ইহা অনন্যসাধারণ।" রোম্যান্টিক লক্ষণযুক্ত এই বৈষ্ণবপদ গুলিতে ভক্ত বৈষ্ণব যেমন ভাগবতচেতনা এবং ধর্মানুভূতির পরিচয় পান, সাধারণ পাঠকের মর্ত্যজীবনাশ্রয়ী সৌন্দর্যপিপাসু মননও তেমনি এখানে ভিন্নজাতীয় রসবৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভে ধন্য হ'তে পারেন।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণবপদাবলী রচিত হ'য়েছিল বলেই মহাজন পদ-কর্তাদের কিছুটা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হ'য়েছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পঞ্চরসকেই শুধু স্বীকৃতি দান করা হ'য়েছে—এই পঞ্চরস: 'শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর বা উজ্জ্বল'। এদের মধ্যে মধুর রসকেই সর্বোত্তম বলা হ'য়েছে—কারণ রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায় যথার্থ অভিব্যক্তি পেয়েছে একমাত্র মধুর রসেই।

শান্তরস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূল নয়। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিই শান্তরসের অধিকারী, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মোক্ষবাঞ্ছাকে 'কৈতবপ্রধান' বলে মনে করেন তাই বৈষ্ণব কবিতায় শান্তরসের স্থান নেই। অবশ্য চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিদ্যাপতির 'নিবেদন' শীর্ষক পদগুলি শান্তরসের অপূর্ব নিদর্শন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক কখনো প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হ'তে পারে না ব'লেই বৈষ্ণব পদে দাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় না বল্লেই চলে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে বাঙলার বাইরে কোথাও কোথাও এই দাস্য ভাবের দেখা পাওয়া যায়। মাতা যশোদার মনে বালক কৃষ্ণ বিষয়ে

যে স্নেহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে অবলম্বন ক'রে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট বাৎসল্য রসের পদ রচিত হ'য়েছে বাল্যলীলা-পর্যায়ে। বালক কৃষ্ণ ক্রমে কিশোর হ'য়ে সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে যেতেন—এই গোষ্ঠলীলা পর্যায়ের পদে সখ্যরসের প্রকাশ ঘটেছে। এই গোষ্ঠযাত্রা পথেই রাধাকৃষ্ণের পরস্পর দর্শন লাভ ঘটে, কৃষ্ণের বাঁশী শ্রীমতী রাধাকে আকুল ক'রে তোলে—এখান থেকেই শুধু মধুর রস। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম এবং মহত্তম অংশ এবং রাধাকৃষ্ণলীলার সমগ্র অংশই মধুর রসাশ্রিত। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকার এই মধুর রসের নানাবিধ পর্যায় কল্পনা করেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ রূপ গোস্বামী-বিরচিত 'উজ্জ্বল নীলমণি'।

'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে 'মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গা'র রসের দুটি প্রধান ভেদ কল্পনা করা হয়েছে: **বিপ্রলম্ভ** এবং **সম্ভোগ**। বিপ্রলম্ভ আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত :—**পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস**।—'মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় '**পূর্বরাগ**।" 'প্রতি নায়িকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নায়িকার মনে যে ঈর্ষ্যাজনিত বোধের উদ্ভব হয়, তাহারই আস্বাদ-যোগ্য অবস্থার নাম '**মান**।' 'প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিয় সন্নিকটে থাকিয়াও বিরহ-বোধজনিত যে বেদনা, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম '**প্রেমবৈচিত্ত্য**'। এই প্রেমবৈচিত্ত্যেরই অপর পরিচিত নাম '**আক্ষেপানুরাগ**'। 'দেশান্তর গমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকা-হৃদয়ে যে বিরহ-বেদনার সৃষ্টি হয়, সেই বেদনার আস্বাদ্য অবস্থা '**প্রবাস**'। 'প্রবাস'-এর দুটি প্রচলিত নামান্তর '**মাথুর**' বা '**বিরহ**'।

বিপ্রলম্ভের এই চারিটি বিভাগ ছাড়া শৃঙ্গার রসের অপর রূপ '**সম্ভোগ**'। 'সম্ভোগ' নায়ক-নায়িকার মিলন জাত উল্লাসময় ভাব। ইহাও বাস্তব নহে, কাব্যগত। বৈষ্ণব-পদাবলীর 'ভাবসম্মেলন' পর্যায়ের পদগুলিকেই সাধারণতঃ সম্ভোগ বলা হয়।—

বৈষ্ণবপদাবলী সাধারণতঃ কীর্তন-রূপে গীত হ'তো বলে এগুলিকে বিভিন্ন 'পালা' আকারে সাজানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা গমন পর্যন্ত কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন পালা গান রচিত হইয়াছে, যেমন—জন্মলীলা, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, কালীয় দমন, দানলীলা, রাসলীলা, হোলি প্রভৃতি।

আবার শ্রীমতী রাধিকার মনোভাব ও আচরণকে অবলম্বন ক'রে মধুর রসের পদগুলিকে নায়িকার অষ্টাবস্থা-রূপে বর্ণনা করা হয়। নায়িকা রাধিকার এই অষ্টাবস্থা :—'অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের যুগললীলার উপাসক হ'লেও তাঁরা মনে ক'রেন যে চৈতন্যদেবের মধ্যেই এই যুগললীলার প্রমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। তাই তাঁরা চৈতন্যদেবেরও উপাসক। সুতরাং রাধাকৃষ্ণলীলার মতই তাঁরা যে চৈতন্যলীলার পদ রচনা করেছেন, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে লক্ষণীয় এই—চৈতন্যদেবের প্রাক্-সন্ন্যাস যুগের যৌবন

সাধনাই বৈষ্ণব কবিদের অধিকতর আকর্ষণ ক'রেছিল বলেই পদগুলিকে চৈতন্য-বিষয়ক না ব'লে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক বলাই সমীচীন। গৌরাঙ্গদেবের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বন ক'রে বহু পদ রচিত হ'লেও কতকগুলি পদ রচিত হ'য়েছে রাধাকৃষ্ণলীলার আদর্শে। এ জাতীয় পদগুলিকে বলা হয় 'গৌরচন্দ্রিকা'। পদাবলী কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা-কীর্তন আবশ্যক। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনে যে জাতীয় রস বা কাহিনী পরিবেষিত হ'বে—গৌরচন্দ্রিকা থেকে সেই জাতীয় পদ গেয়ে কীর্তন আরম্ভ করতে হয়। রাধাকৃষ্ণের যুগললীলার যত প্রকার ভাববৈচিত্র্য বর্তমান, রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গ-জীবনেও তদ্রূপ ভাববৈচিত্র্য কল্পনা ক'রে বৈষ্ণবপদকর্তাগণ গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা ক'রে গেছেন। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর ছকে ফেলেই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি রচিত হ'য়েছে বলেই 'গৌরচন্দ্রিকা'তেও কৃষ্ণলীলার অনুরূপ পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ-আদি বিভিন্ন জাতীয় পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীগুলি এক ঈর্ষণীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের যদি এমন কোন শাখার নাম উল্লেখ করতে হয়, যা বিশ্ব সাহিত্যে পরিবেষণযোগ্য, তবে বৈষ্ণবসাহিত্যই সেই একমাত্র শাখা। আধুনিক যুগেও বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে, এমন কবি একান্তই মুষ্টিমেয়। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে এবং ব্যঞ্জনায় বৈষ্ণবপদাবলীগুলি অপূর্ব সার্থকতা অর্জন করেছে। বৈষ্ণব কবিতার বিশিষ্টতা বিষয়ে জনৈক সুধী সমালোচক বলেন: 'ইহারা সম্পূর্ণ বঙ্গীয়—বাংলা দেশের, বঙ্গপ্রকৃতির ও বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস। বাঙালী-হৃদয়ের ভাবুকতা, সৌন্দর্যবোধ ও সুকোমল মাধুর্য নিঃশেষে প্রকাশিত হইয়াছে বৈষ্ণব-পদাবলীতে। আরও কয়েকটি গুণে বৈষ্ণব কবিতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বঙ্গীয় কবিতা হইতে স্বতন্ত্র; সেগুলি হইতেছে কবিচিত্তের বিশাল বিস্তৃতি, অমুক্ততা ও গভীরতা। বৈষ্ণবপদাবলী অধ্যাত্মসাধনার উপযোগী অথচ পূর্ণভাবে মানবীয়, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য অথচ অদ্ভুতভাবে সর্বজনীন, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই আস্বাদ্য। অতিরিক্ত ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা বা যুগচেতনা ইহাকে দেশে ও কালে আবদ্ধ করে নাই। ইহারা চির স্বাধীন ও চির নবীন। ইহারা বাঙালী কবিকৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।'

[একুশ] বৈষ্ণবপদকর্তাগণ :

বাঙলা দেশে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য যে কী পরিমাণে জনস্বীকৃতি লাভ করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে পদকর্তাদের সংখ্যা থেকে। ডঃ দীনেশ সেন অন্ততঃ ১৪৫ জন মহাজন পদকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন ১১ জন মুসলমান কবি এবং তিনজন মহিলা কবি। শুধু কবির সংখ্যা নয়—এ তাবৎ কাল প্রাপ্ত পদের সংখ্যাও অগণিত। বলাই বাহুল্য, রচিত পদের একটা বিশেষ অংশই হয়তো কালগর্ভে নিমজ্জিত—এদের অধিকাংশই আর লোকচক্ষুর সামনে আসবার সুযোগ পাবে না। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই 'ক্ষণদা চিন্তামণি' নামে যে বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্কলন প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে

৪১ জন কবির তিনশত পদ রয়েছে। 'পদামৃত সমুদ্র' নামক সঙ্কলন গ্রন্থে আছে ৭৪৬টি পদ। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ১৩০ জন কবির ৩০০০-এর অধিক পদ সঙ্কলিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "আজ অবধি প্রকাশিত বৈষ্ণব গীতিকবিতার সংখ্যা সাত-আট হাজারের কাছাকাছি হইবে, ভবিষ্যতে আরও দুই-চারি হাজার কবিতা আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

[২০] বিদ্যাপতি

প্রশ্ন ৪৪। বৈষ্ণব পদ রচনায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব বিচার কর।

অথবা

প্রশ্ন ৪৫। বিদ্যাপতি বাঙালী ছিলেন না, বাঙলা ভাষায়ও পদ রচনা ক'রেন নি, তৎসত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যে তার অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য নির্ধারণ কর।

বৈষ্ণবপদাবলীর আদি কবির সম্মান দেওয়া হয় 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি ঠাকুরকে। 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচনা করেছিলেন, সেই পদের ভাষা 'ব্রজবুলি'-কে উনিশ শতকের বাঙালী মনীষীরা মনে করেছিলেন 'ব্রজের' ভাষা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামের ভাষা। বিদ্যাপতিকেও তাঁরা বাঙালী কবি বলেই মনে করেছিলেন। পরবর্তী কালের গবেষণায় উভয় ধারণাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলারাজ্যভুক্ত বিস্ফি গ্রামের অধিবাসী। তিনি স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান। অনুমান চতুর্দশ শতকের কোন এক সময় জন্ম গ্রহণ ক'রে সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। তিনি যে অন্ততঃ পাঁচজন মিথিলারাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা' তাঁর রচনা থেকেই জানা যায়। বিদ্যাপতি গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব কবিরূপে পরিচিত হ'লেও স্বদেশে তিনি পণ্ডিত-রূপেই খ্যাত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ 'বিভাগসার ও দানবাক্যাবলী', বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থ দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী, ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী, গঙ্গাবাক্যাবলী ও বর্ষাক্রিয়া', তীর্থকাহিনীমূলক গ্রন্থ 'ভূ-পরিক্রমা', কথা-সাহিত্য গ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার দিন গত বুঝতে পেরে তিনি অবহট্ট ভাষায় ইতিহাস-বিষয়ক দুটি গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' এবং 'কীর্তি-পতাকা' রচনা করেন। মাতৃভাষা মৈথিলীতে তিনি হরগৌরী-বিষয়ক পদ রচনা করে-ছিলেন বলে জানা যায়। অবহট্ট-জাত ব্রজবুলি ভাষায় তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বহু অমৃতমধুর বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। বৈষ্ণবপদের জন্যই বাঙলাদেশে তাঁর খ্যাতি প্রচারিত হ'লেও পাণ্ডিত্যের জন্যই যে অমরত্ব লাভ করতে পারতেন, এমন কথা বলেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বলেন : 'যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে

তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী।'

। বিদ্যাপতিই ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম পদ রচনা করেন এবং তাঁর পদগুলি গুণে ও মানে অতিশয় উন্নত ব'লে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট বহু পদই বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত। কবিশেখর, কবিবল্লভ, বিদ্যাবল্লভ-আদির রচিত বহু পদই বিদ্যাপতির নামে চলে আসছে। বাঙলাদেশে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন নামক এক পদকর্তাও 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। তাঁর অনেক পদও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত আছে। ফলতঃ বিদ্যাপতি-রচিত পদগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিদ্যাপতি-সমস্যার হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় হয়তো আর নেই।।

/ মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদের রসাস্বাদন করতেন ব'লে তাঁর জীবনীকারগণ উল্লেখ ক'রে গেছেন—বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ রূপেই এই তথ্যটিকে গ্রহণ করা চলে। বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ জয়দেবের অনুসরণেই 'মধুর কোমল কান্ত' পদ রচনা করেন, অন্ততঃ তাঁর 'অভিনব জয়দেব'-উপাধি থেকে এ কথা মনে হয়। কাব্যের আভ্যন্তর বিচারেও কিন্তু উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁরা দু'জনেই দেহবিলাস এবং সম্ভোগ-বর্ণনার কবি। সম্ভবতঃ সৌন্দর্যপ্রীতির জন্যই তাঁরা দেহবর্ণনার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁদের রচনায় রূপাসক্তি বহু ক্ষেত্রেই ভোগাসক্তিকে অতিক্রম ক'রে গেছে। তাঁদের রচিত সম্ভোগবর্ণনাও কল্পজগতের বস্তু বলে অনুভূত হয়। জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়েই ছিলেন রাজসভার কবি। তাই তাঁদের রচনা মার্জিত, অগ্রাম্য, শ্লীলতাপূর্ণ এবং কাব্যশ্রীমণ্ডিত। ছন্দে, অলঙ্কারে তাঁদের রচিত কাব্যদেহ যেন ঝলমল করতে থাকে।)

(রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিদ্যাপতির হাতে একটা সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। প্রেমের নবোদ্ভিন্ন রূপ, থেকে আরম্ভ ক'রে তার চরম পরিণতি পর্যন্ত স্তরে স্তরে লীলা-বৈচিত্র্যের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম ক'রে এসেছে। প্রেম তাঁর নিকট একটি জৈবিক বৃত্তি মাত্র নয়। লজ্জা, ভয়, ঈর্ষা, ছলনা, উদ্বেগ-আদি মানসিক বৃত্তিগুলি তাঁর অঙ্কিত প্রেমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।/ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির রাধা-প্রেমকে বিশ্লেষণ করেছেন নিম্নোক্তভাবে : "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি।···আপনাকে আধখানা প্রকাশ ও আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন ; "ছন্দ, সঙ্গীত এবং

বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য সুখ-সম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।"

বিদ্যাপতি প্রধানতঃ সম্ভোগরসের কবি ; তাঁর কাব্যে প্রেমের যে রসঘন জীবন্ত রূপ উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে, তা' ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে সার্বজনীন অনুভূতি লোকে উন্নীত হ'বার দাবি রাখে—ফলতঃ এই কারণেই বিদ্যাপতি বর্ণিত প্রেম একান্তভাবে বৈষ্ণবীয় না হওয়া সত্ত্বেও যেমন একদিকে বৈষ্ণবজনের প্রাণের বস্তু অপর দিকে তেমনি এর সার্বজনীন রসাবেদন যে কোন সাধারণ পাঠককেও অভিভূত ক'রে থাকে। বিদ্যাপতি যেমন সম্ভোগরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি বিরহ এবং ভাবোল্লাসের বর্ণনায় যেন আপনাকে আপনি অতিক্রম করেছেন। যে ভাবাবেগকে গীতিকাব্যের প্রাণ-রূপে গ্রহণ করা হয়, এখানে তার গভীরতাই বিশেষভাবে উপলব্ধিগম্য হ'য়ে থাকে। বিদ্যাপতির কাব্যে এই বিচিত্র ধরনের ভাবসমাবেশ ঘটেছিল বলেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির কাব্য থেকে অকৃপণভাবে রস-গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

পরিশেষে বিদ্যাপতি বিষয়ে আর একটি কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হ'বে। বিদ্যাপতি সাধারণভাবে রসসম্ভোগ এবং ভাবোল্লাসের কবি-রূপে পরিচিত হওয়াতে তাঁর জীবনানুভূতির লঘু দিকটিই আমাদের নজরে পড়ে। কিন্তু তিনি যে পদ-রচনার শেষ পর্যায়ে এসে দেহধর্মের ঊর্ধ্বলোকে অনির্বচনীয় শান্তরসে আশ্রিতচিত্ত হ'য়েছিলেন—এ সংবাদটা না জানলে বিদ্যাপতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর শান্তরসাশ্রিত 'প্রার্থনা' পদাবলী সাহিত্যকীর্তিরূপে এবং ভাবুকচিত্তে অপার্থিব রসের উদ্বোধনে পদাবলী সাহিত্যে একক ও অনন্য স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। বিদ্যাপতির রচনার সর্বত্র ঐশ্বর্যরসের প্রকাশ ঘটলেও অন্ততঃ এ জাতীয় প্রার্থনার পদগুলিতে যে আত্মদৈন্য, আত্মনিবেদন এবং ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা' একমাত্র রসিকচূড়ামণি চণ্ডীদাসের সঙ্গেই তুলনীয়। রূপের আরাধনা করতে করতে এক সময় বিদ্যাপতি অরূপের সন্ধান লাভ করলেন। রূপরসিক কবি সাধকচূড়ামণি পদে উন্নীত হ'লেন।

বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বন করেই পদ রচনা করেছেন। বিশ্লেষণে এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও দু'টি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে মনে হয়—সৌন্দর্য সাধনাই ছিল কবির ঈপ্সিত। এই স্তরে পড়ছে বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ ও অভিসার পর্যায়ের পদ। বয়ঃসন্ধি এবং পূর্বরাগের রাধা বাস্তব, অভিসারে যেন বাস্তবাতীতের ছায়াপাত ঘটেছে। পরবর্তী স্তরে—বিরহে এবং ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতি যেন স্বধর্মকে অতিক্রম ক'রে একটা মানসলোকে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন।

সর্বশেষ, বিদ্যাপতির অপর একটি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পর্যায়ে রস সৃষ্টি করতে গিয়ে বিদ্যাপতি এমন কিছু কিছু বাক্য রচনা করেছেন, যেগুলি প্রবচন বা প্রৌঢ়োক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে। যেমন—

'গগনক চাঁদ হাথ ধরি দেয়লু ।'
'নিধনে পাইল যেন কনক কটোরা ।'
'বানর গলে কাঁহা মোতিম মাল ।...
সুজনক পিরিতি কাঞ্চন সমান ॥'
'পরক বচনে কুএ ধস দেঅ
তৈসন কে মতিহীন ।'
'কূপ ন আবএ পথিকক পাশ ।'
'চোরজননী জঞো মনে মনে ঝাখিঞো
রোঞো বদন ঝরপাএ ।'
'মন্ত্র না মানে জমু বাল ভুজঙ্গ ।'

'ব্রজবুলি' :—বাঙালীর প্রথম ব্রজবুলি ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিদ্যাপতি-রচিত পদের মাধ্যমে। তৎকালীন বাঙালীর নিকট বিদ্যাপতিও বাঙালী রূপেই পরিচিত ছিলেন—যে অপরিচিত ভাষায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করেছিলেন, তাকে বাঙালীরা বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের ভাষা বলে মনে করে একে 'ব্রজবুলি' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। 'ব্রজবুলি' শব্দটির ব্যবহার বাঙলা ভাষায় খুব প্রাচীন নয়—সম্ভবতঃ উনিশ শতকে কবি ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন। 'ব্রজ-সম্বন্ধীয়' এই অর্থে 'ব্রজাওলি' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। যখন প্রমাণিত হ'লো যে এর ভাষা ব্রজভূমির নয়, তখন অনুমান করা হয় যে, ব্রজবুলির মূল ভিত্তি কবি বিদ্যাপতির মাতৃভাষা মৈথিলি—এর সঙ্গে কালক্রমে হিন্দী-বাঙলা-আদি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে ব্রজবুলি অবহট্টজাত একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা—অবশ্যই আঞ্চলিকতার প্রভাব এতে বর্তমান।

বিদ্যাপতিরও পূর্ববর্তী মিথিলার কবি উমাপতি উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ ব্রজবুলির আদি রূপকার। প্রায় সমসময়ে অথবা সামান্য পরেই যে এই ব্রজবুলি ভাষা সমগ্র পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙলায় ব্রজবুলির প্রথম রূপকার চৈতন্য-সমকালীন কবি যশোরাজ খান। তাঁর রচিত পদ 'এক প্রয়োধর চন্দনে লেপিত। আরে সহজই গোর।' উড়িষ্যায় রায় রামানন্দ রচিত 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।' পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত প্রথমপদ। আসামে শঙ্কর দেব এবং ত্রিপুরায় রাজপণ্ডিত জ্ঞান প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন বলে জানা যায়।

বাঙলাদেশে বহু কবিই ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বোত্তম গোবিন্দ দাস কবিরাজ এবং সর্বশেষ বাঙলা ভাষার সর্বোত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ—যিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে প্রথম জীবনে কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন।

(খ) চণ্ডীদাস :

প্রশ্ন ৪৬। পদকর্তা হিসাবে চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব বিচার কর।

চৈতন্যজীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে মহাপ্রভু 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-

গীতি' শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করতেন। এঁদের মধ্যে বিদ্যাপতির পদ এবং রায় রামানন্দের নাটক বাঙলা ভাষায় রচিত হয়নি। ফলতঃ চণ্ডীদাসই একমাত্র বাঙালী কবি যাঁর বাঙলা পদাবলী মহাপ্রভুর আস্বাদ ধন্য।

বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্য-আস্বাদিত চণ্ডীদাসের পদ নিয়ে মহা সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বর্তমান ছিলেন—মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বজনমান্যতা লাভ করেছে। কিন্তু চৈতন্যদেব যে গ্রাম্য, কুরুচিকর এবং ঐশ্বর্যরসের পোষক নাটগীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করতেন, এ কথা বিশ্বাস ক'রে ওঠা কষ্টকর। অতএব, অপর একটি সিদ্ধান্ত এই—চৈতন্য-পূর্ব যুগে অথবা তাঁর সমকালেই অপর একজন পদকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। আবার চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত এমন অনেক পদ পাওয়া যায়, যাতে চৈতন্যোত্তর যুগের লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবেই বর্তমান এবং এদের কাব্যোৎকর্ষ এমন অমুল্লেখ্য যে এগুলি চৈতন্যদেব দ্বারা আস্বাদিত হ'তো—এ কথা মেনে নেওয়া অসম্ভব। এই তৃতীয় চণ্ডীদাস ছাড়াও অপর একজন চতুর্থ চণ্ডীদাসকেও অবশ্য স্বীকার ক'রে নিতে হয়, যিনি সহজিয়া রসের পদগুলি রচনা করেছেন।'—এখন এই সমস্ত চণ্ডীদাসের পদ নামসাদৃশ্য-হেতু এমনভাবে মিশে গেছে যে, এদের পৃথক করা বোধ হয় আর সম্ভবপর নয়।

চণ্ডীদাস-সমস্যা-সৃষ্টির পূর্বে যে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলি বাঙালীর মন কেড়ে নিয়েছিল, সেই পরমস্বাদু পদগুলিকেই 'বৈষ্ণবমহাজন-পদ' নামে অভিহিত করা হয়। এইসব পদের ভনিতায় 'দ্বিজ' এবং 'দীন' আছে, আবার নিরুপাধিক পদও রয়েছে। এই জাতীয় চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলিকেই আলোচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হ'লো।

চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-পরিচয় ঘন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। কোন এক বা একাধিক চণ্ডীদাস 'বাসুলী-পূজক' ছিলেন। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল বীরভূম জেলার নান্নুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা, তবে খুবই সম্ভব এই দুই স্থানেই দুইজন চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করেন। 'চণ্ডীদাস-পরিচয়' নামক এক অর্বাচীন পুঁথিতে চণ্ডীদাসের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে তার প্রামাণিকতা অস্বীকৃত হওয়ায় বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের কোন পরিচয়ই আর জানবার উপায় নেই।

চৈতন্যপূর্বযুগে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে যাঁরা পদ রচনা করেছেন, তাঁরা নিজেরাই যেন সেই লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীমতী রাধার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছিলেন। চৈতন্যোত্তরকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায় পদকর্তারা চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই লীলার স্বাদ গ্রহণ করেন। এই বিচারে, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত উৎকৃষ্ট পদগুলি সবই চৈতন্য-পূর্বযুগেই রচিত হ'য়েছিল বলে বিশ্বাস করতে হয়। চণ্ডীদাসের এই ভাব-তন্ময়তা এবং একাত্মতাবোধই যে তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং বহিরঙ্গে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যে কেন চণ্ডীদাস বাঙালীর এমন আপনজন বলে গণ্য হ'তেন, চণ্ডীদাস পদাবলীর সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকেই তা' বোঝা যাবে। তিনি

লিখেছেন : 'চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর ন্যায় মানসক্ষেত্রে রাধার লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেছেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনার কথা নয় যে, সাজাইয়া গুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কৃত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি জিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন, লোকে লউক আর না লউক সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা সরল ও অলঙ্কারবিহীন। বর্ণনীয় বিষয় হইতে মনকে দূরে না আনিলে ত আর উপায় খোঁজা হয় না। সুতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য থাকে না' বস্তুতঃ কাব্যের সৌন্দর্য বলতে এটিকেও বোঝায়। কাব্যের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য সরাসরি পাঠকমনকে স্পর্শ করবে এবং কবিতে ও পাঠকে একটা সাহিত্যবোধের সৃষ্টি করবে। তাই রাধাভাবে তন্ময় চণ্ডীদাস যখন আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' তখন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনেও সাড়া জাগে। এই শ্যামনাম বিরহ-ব্যাকুল পাঠকদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ ক'রে তাদের হৃদয়কেও আকুল ক'রে তোলে।

বাঙলা সাহিত্যের পুরোধা ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন যেন চণ্ডীদাসের মর্মে প্রবেশ ক'রে কবিজনোচিত ভাবেই সেই মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন : "চণ্ডীদাসের বাণী সহজ সরল ও সুন্দর। বিদ্যাপতির পূর্বরাগের 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই'। ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই।'—প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুদ্‌ভিন্নযৌবনা রাধিকার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্যপ্রভুর ছুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্তি ভাষার পুষ্পপল্লবের বহু উর্ধ্বে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সেই স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহা প্রেমের নিজস্ব স্থান। এখানে শব্দের ঐশ্বর্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশি কার্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী এখানে উচ্চভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার তনু ত্যাগ করে এবং বাহ্য সৌন্দর্যের বাহুল্য না থাকিলেও মন্ত্রপূত কোটি হৃদয়ের অন্তঃপুর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।"

বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচনায় চেষ্টাকৃত কবিত্ব প্রকাশের কোন প্রয়াসই দেখা যায় না। যেখানে তিনি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, সেগুলিও দৈনন্দিন জীবন থেকেই আহৃত, যেমন—'শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে', কিংবা 'কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।' চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রূপকের আড়ালে একটা আধ্যাত্মিক জগৎ লুকিয়ে আছে—ভক্তের নিকট সেই জগতের মাধুরী অপরিসীম। কিন্তু যারা ঐ রসের পিপাসু নন, তাঁরাও চণ্ডীদাসের কাব্য থেকে বঞ্চিত হন না। কারণ চণ্ডীদাসের কাব্যের এমন একটা সার্বজনীন ও সার্বভৌম আবেদন রয়েছে, যা দেশ কালকে অতিক্রম ক'রে যে-কোন রসপিপাসু পাঠকের মনেই অনির্বচনীয় আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। এইখানেই চণ্ডীদাসের বিশেষত্ব, এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।

রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাকে অবলম্বন ক'রে চণ্ডীদাস ঐ লীলাপর্যায়ের বিভিন্ন দিককেই প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেছেন। সর্বত্র যে তিনি অসাধারণ সাফল্য-অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, তা' নয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

শ্রীমতী রাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস এক নোতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কবি বিদ্যাপতি এবং অপর সকলেই পূর্বরাগের পদে শ্রীমতীর লীলাচপলস্বরূপটিই ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস পূর্বরাগের পদেও রাধার মনে বিরহ বেদনার অব্যক্ত আকুতিকেই রূপান্বিত ক'রে তুলেছেন। অন্তরধনে ধনী রাধিকা তো কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা, তিনি তো সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ ক'রে বসে আছেন। কাজেই দেহসৌন্দর্যে তাঁকে মুগ্ধ করবার ভাবনা তার কল্পনায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম শোনামাত্র যিনি বিবশা হ'য়ে পড়েন, কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে যিনি অবশচিত্তা, শ্যাম সদৃশ মেঘের মধ্যেই যিনি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দ লাভ করেন, সেই যৌবনে-যোগিনী শ্রীমতি রাধিকার মনে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হ'লেও, তার প্রকাশ যে অপর সকলের মতো হবে না—এটাইতো একান্ত স্বাভাবিক; কারণ এ রাধিকার স্রষ্টা ভাবের কবি চণ্ডীদাস নিজে রাধার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেছেন বলে কবির নিজস্ব অনুভূতি রাধায় সংক্রামিত ক'রছে।

চণ্ডীদাস পূর্বরাগ অপেক্ষাও অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ-রচনায়। এখানে কবির তথা রাধার ভাবতন্ময়তা আরও গাঢ়, আরও স্পষ্ট। আক্ষেপানুরাগের আর যে সব বড় কবি আছেন, তাঁদের রাধিকা অহংকে ত্যাগ করতে পারেন নি, তাই সেই আক্ষেপের সঙ্গে অনুযোগও বর্তমান। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার মনে কোন অনুযোগ নেই, তিনি যে আপনার সর্বস্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন।

বিরহের পদ চণ্ডীদাস খুব বেশি রচনা করেননি, কারণ পূর্বরাগ থেকেই তো তাঁর বিরহের শুরু। বিদগ্ধ সমালোচকের ভাষায়: "পূর্বরাগ হইতে চণ্ডীদাসের বিরহ শুরু হইয়াছে, আপেক্ষানুরাগে তাহারই বৃদ্ধি, পর্যায়ের পর পর্যায়ে অগ্রসর হইয়া চণ্ডীদাস ভাবসম্মিলনের আনন্দ-মুহূর্তে বিচ্ছেদের অন্তিমতম বেদনাকে প্রকাশ করিয়াদিলেন। এমন ভাবে প্রকাশ করা—যে বোধ করি আর কোন বৈষ্ণব কবির দ্বারা সম্ভব নয়—

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥'

করুণ! মর্মস্পর্শী! কোনো বিশ্লেষণই এই চারিপংক্তির অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে পারিবে না।

চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যকৃতির চরমসীমায় আরোহণ করেছেন ভাবসম্মেলনের পদগুলিতে। এই পদগুলিতে আরও আন্তরিকতা, আরও সুস্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনভোর রাধিকা কৃষ্ণ-সন্ধানেই কাটিয়েছেন, কৃষ্ণ তো তাঁর জীবনের জ্বালাই শুধু বাড়িয়েছেন। তৎসত্ত্বেও যখন রাধিকা বলেন, 'জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি'-তখন

আর বিস্মিত না হ'য়ে উপায় থাকে না। রাধাপ্রেম কামনাবাসনাশ্রিত মর্ত্যলোক থেকে বহু উর্দ্ধে এক অধ্যাত্মলোকে বিচরণ করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলাল ঘরে'—এই শতবর্ষের ব্যবধানও যার চিত্তে একটুখানি মালিন্য স্পর্শ করতে পারেনি, সেই রাধাচিত্ত যে যুগ যুগ ধরে বিরহিনী-প্রাণে অমৃতবারি সিঞ্চন করবে তাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে! বস্তুত, এই কারণেই বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে চণ্ডীদাস-কৃত রাধার আত্মসমর্পণের পদগুলি অমূল্য বলে বিবেচিত হয়।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু কবিতাই অপর কোন কোন কবির কবিতায়ও পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার', 'আমার, বঁধুয়া আন বাড়ি যায়,' 'সজনি ও ধনী কে নহ বটে,' 'কাহারে কহিব মনের বেদনা' প্রভৃতি পদগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলি এখনও মতান্তর-রূপেই গৃহীত হ'য়ে থাকে, কোনটাই স্থির সিদ্ধান্ত নয়।

(গ) জ্ঞানদাস :

প্রশ্ন ৪৭। 'বৈষ্ণব পদ রচয়িতা কবি জ্ঞানদাস ছিলেন আধুনিক মনের অধিকারী'—জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব বিচার প্রসঙ্গে উক্তিটির সার্থকতা বিচার কর।

প্রশ্ন ৪৮। কবি জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলবার সার্থকতা বিচার কর।

মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাসের রচনায় যে আধুনিক যুগোচিত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে, তার বিবেচনায় সে কালের কবিকুলের মধ্যে তাঁর জন্য একটি বিশেষ আসন চিহ্নিত করে রাখা চলে। মঙ্গলকাব্যের সংখ্যাতীত কবির মধ্যেও কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে কারণে ভাস্বর হ'য়ে আছেন, সেই একই কারণে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে রাজচক্রবর্তী-রূপে বিবেচিত না হ'লেও জ্ঞানদাসও আপন বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল বলে পরিগণিত হ'য়ে থাকেন। সেকালের একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকেও জ্ঞানদাস যে কী ভাবে যুগাতিশায়ি ভাবধারার অধিকারী হ'য়েছিলেন, তা' ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অপর বৈষ্ণব কবিদের অনেক গুণ থাকলেও সমকালীনতার উর্দ্ধে উঠবার অধিকার আর কেউ অর্জন করতে পারেননি।

জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় খুব বেশি জানা যায় না। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে আনুঃ ১৫৩০ খ্রীঃ-র দিকে তিনি এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দশাখাভুক্ত এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে নরোত্তম দাসের আহ্বানে খেতরীতে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতএব জ্ঞানদাস চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ দর্শন না পেলেও যে প্রায় সমকালেই বর্তমান ছিলেন এবং চৈতন্য-পরিমণ্ডলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, এ

কথা প্রায় বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া চলে। বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দের ভাববর্ণনার পদগুলি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন নিজ চোখে দেখিয়া এগুলি লিখিতেছেন।"

অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবির মতই অনুমিত হয় যে মধ্যযুগে সম্ভবত'জ্ঞানদাস নামধারী একাধিক বৈষ্ণব কবি বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাদের পরিচয় কিংবা স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনও মন্তব্য করেছেন, "জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন।" অতএব জ্ঞানদাসকে নিয়েও ভবিষ্যতে সমস্যার আশঙ্কা রয়েই গেছে।

জ্ঞানদাসকে একালের পাঠকরা সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য এবং বাঙলাভাষার কবি রূপেই জানেন। কিন্তু তিনি যে সে-কালের ফ্যাশান-অনুযায়ী ব্রজবুলি ভাষাতেও অসংখ্য পদ রচনা করে গেছেন এ বিষয়ে অনেকেই অবহিত নন। তবে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের সংখ্যা বাংলা পদ অপেক্ষা বেশি হ'লেও উৎকর্ষ বাঙলা পদগুলিই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য-ব্রজবুলির ভাষায় রচিত তাঁর পদের উৎকর্ষ-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। তিনি বলেন, "Inana Das was the most careful writer of Brajabuli, though there are a few poems where Brajabuli is greatly mixed up with Bengali." কিন্তু সমকালীন কবি গোবিন্দদাসের তুলনায় জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ যে হীনপ্রভ তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ব্রজবুলিতে জ্ঞানদাস আড়ষ্ট,—তিনি অনুকরণের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলার সঙ্গে ব্রজবুলির যে মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহার কারণ কবি convention বা প্রথার খাতিরে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিলেও তাঁহার মনের কথাটি কিন্তু বাংলা পদেই যথার্থ ধরা পড়িয়াছে। রসলোকের খাস দরবারে প্রবেশের জন্য তিনি বাংলা পয়ার-ত্রিপদীর চাবিকাঠি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্রজবুলিতে বুদ্ধির কৌশল, আবেগ, আন্তরিক কলা-নৈপুণ্য—সবই আছে, কবি যেন গজকাঠি মাপিয়া মাপিয়া এই ব্রজবুলির পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য দুটি চারটি পদাবলীতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ যে নেই তাহা নহে, কিন্তু কবি যেন এই জাতীয় পদে বেশ সুস্থ হইয়া নিজেকে পুরোপুরি সঁপিয়া দিতে পারেন নাই।…ব্রজবুলি তাঁহার কবিভাষা, প্রাণের ধাত্রী নহে।"

বাঙলাভাষার পদগুলিতেই কবি জ্ঞানদাস আপনাকে স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন। ভাবে এবং ভাষায় এ জাতীয় বহু পদই রসোত্তীর্ণ হয়েছে, এমন কি কালের বিচারেও তাঁর কোন কোন পদ অসামান্য রসে অভিহিত হবার যোগ্যতা রাখে। মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাসের রচনায় এই আধুনিক যুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গী বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁর পদে আমরা আধুনিক মানব-মানবীর হৃৎস্পন্দন অনুভব করি—সেকালের কবির পক্ষে এই কৃতিত্বকে অসাধারণ বলেই বিবেচনা করা চলে। জ্ঞানদাস যে ভাবকল্পনায় দিক থেকেই এই অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন, তা' নয়—তাঁর রচনার ভাষারীতিও আশ্চর্যরকমভাবে নবীন

নিম্নে জ্ঞানদাসের রচিত কয়েকটি পদ দৃষ্টান্ত রূপে উদ্ধৃত হ'লো যেখানে ভাবকল্পনা এবং ভাষারীতির অপূর্ব সমন্বয় পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো অদ্বয় বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। কল্পনা করতে বাধা নেই—কোন এ কালের কবিও এজাতীয় পদ রচনা করতে পারলে নিজেকে ধন্য বিবেচনা করবেন।—

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥'
'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥"
'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥'
'দেইখ্যা আইলাম তারে সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥'

সাধারণভাবে জ্ঞানদাসকে বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মতো সচেতন ভাষাশিল্পী-রূপে অভিহিত করা সম্ভবপর না হলেও এ জাতীয় পদে যে ভাষা বাণীর যথার্থ বাহক হ'য়ে উঠতে পেরেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রসঙ্গক্রমেই এখানে ভাষার কথা বলা হ'য়েছে, আসলে এই পদগুলির প্রাণ 'রোম্যান্টিকতা'—যাকে আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণ বলে মনে করা হয়। জ্ঞানদাসের তুল্য রোম্যান্টিকতা অপর কোন বৈষ্ণবপদে দুর্লভ। এই কারণেই জ্ঞানদাসের কবিতাগুলিকে খাঁটি লিরিক কবিতার মর্যাদা দান করা চলে। রোমান্টিকতা মনোভাব সাধারণতঃ একটু বিষণ্ণতার ধার ঘেঁষে চলে বলেই জ্ঞানদাসের বিরহের পদগুলিও মানবিক আকৃতিতে সমৃদ্ধ।

জ্ঞানদাসের রোমান্টিক রহস্যপ্রিয়তার সঙ্গে মাধুর্যের স্বাদও যেন সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শব্দব্যবহার, প্রকাশরীতি, বর্ণনাভঙ্গী এবং ঘটনাসংস্থান রচনায় এই মাধুর্যগুণের জন্যই বিরহের তীব্রতা বা মর্মভেদী হাহাকার তাঁর রচনায় দুষ্প্রাপ্যের বেদনার মধ্যেও জ্ঞানদাস তত গভীরতা প্রকাশ করতে পারেন নি, তার মধ্যেও যেন একান্ত প্রশান্ত নিরাসক্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানদাসের রচনার দোষগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, "ভাষানির্বাচনে জ্ঞানদাসের মনোদুর্বলতাই কবিরূপে তাঁহার বাণীদুর্বলতার মূলে অন্য যে সকল ব্যর্থতা আছে, যথা, কোনো কোনো রসপর্যায়ে প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ না করা—সেগুলিকে ব্যর্থতা না বলে সীমাবদ্ধতা বলাই ভাল, সীমাবদ্ধতা সব সময় দোষের নয়…সীমাবদ্ধতা নিবিড়তার সহায়ক।…জ্ঞানদাস অনুরাগ, রূপানুরাগ, রসোদ্গার ইত্যাদির শ্রেষ্ঠ কবি। নিবেদন, আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসীয় দুঃখনিবিড়তা তাঁহার আয়ত্ত। এবং দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, নাপিতানী মিলন, বংশী শিক্ষা ইত্যাদি পূর্ণ ও খণ্ড পর্যায়ে তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রমাণ পেয়েছি।"

রাধাকৃষ্ণের লীলাপর্যায়ে যত প্রকার শাখা রয়েছে, জ্ঞানদাস তার প্রায় সর্ববিধ শাখায়ই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন; অবশ্য সর্বত্রই যে তিনি সমানভাবে সার্থকতা লাভ করেছেন,

এমন কথা বলা চলে না। গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ-বিষয়ক অনেক পদ তিনি রচনা ক'রেছেন, সেগুলিতে প্রত্যক্ষতার পরিচয় থাকলেও রসোত্তীর্ণ হয়নি। আবার যেখানে তিনি বিদ্যাপতির অনুকরণ করতে গেছেন, সেখানেও তিনি স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বলেই অপেক্ষাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। জ্ঞানদাস ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য—চণ্ডীদাসের অনুসরণেই তিনি সর্বাধিক সার্থকতা অর্জন করেছেন। তবে জ্ঞানদাস মূলতঃ আত্মগত কবি ছিলেন বলেই চণ্ডীদাসের মতো তদ্‌গতচিত্ত হ'তে পারেন নি। সমালোচকগণ বলেন "কবিত্বের বাইরের লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাস অপেক্ষা উচ্চতর কারুশিল্পী, কারণ রূপনির্মিতিতে জ্ঞানদাস অধিকতর শিল্পপ্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন।"

রাধার বাল্যলীলার চিত্র, দানখণ্ড, নৌকাবিলাস-আদি বিচিত্র ধরনের বিষয় অবলম্বনে জ্ঞানদাস যে সকল পদ রচনা করেছেন, তাদের কোন কোনটিতে জ্ঞানদাস যে চিত্রপ্রতীক ও আবেগপ্রতীক রচনা করেছেন, তাতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। রসোদ্‌গারের পদে জ্ঞানদাসের কৃতিত্বই সর্বাধিক। এ জাতীয় পদে সাধারণতঃ আদিরসের বাহুল্য থাকলেও জ্ঞানদাসের পদে সম্ভোগের উত্তাপের চেয়েও স্নিগ্ধ সজল মমতার কোমল স্পর্শই লক্ষ্যণীয়। আবার এ জাতীয় পদে জ্ঞানদাসের আধুনিক মনেরও প্রকাশ ঘটেছে।—আক্ষেপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের তুল্য কৃতিত্ব অর্জন করতে না পারলেও, কোন কোনটি যে অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রূপানুরাগের কবিতায়ও জ্ঞানদাসের উল্লেখযোগ্য সমর্থকরা অধিকারী হয়েছিলেন অবশ্য রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস যে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, জ্ঞানদাসের পদ তেমন অতুলনীয় হয়ে উঠতে না পারলেও কাব্যরূপে পদগুলি যে কবিত্বের উচ্চসীমা স্পর্শ করেছে এ কথা সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন।

ভাবসম্মেলনের পদগুলিতে ভক্ত কবিগণ যে কল্পনার স্বর্গ রচনা ক'রে মিলন সুখ অনুভব ক'রে থাকেন, জ্ঞানদাস হয়তো তাতে সান্ত্বনা পেতেন না বলেই এ ধরনের পদ রচনায় খুব আগ্রহবোধ করেন নি।

(ঘ) গোবিন্দদাস :

প্রশ্ন ৪৯। "বাঙালী কবিদের মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনায় গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য"—আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৫০। গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতিরূপে অভিহিত করবার সার্থকতা বিচার কর।

অথবা

প্রশ্ন ৫১। গোবিন্দদাসকে 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য' বলবার কারণ কি?—আলোচনা কর।

ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচয়িতা বাঙালী কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কবিদের নামসাদৃশ্য এত বেশী লক্ষ্য করা যায় যে কোন নির্দিষ্ট কবিকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসকে নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, গোবিন্দদাসকে নিয়েও আমাদের অনুরূপ সমস্যারই সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে। শুধু ষোড়শ শতাব্দীতেই 'গোবিন্দ' নাম ধারী অন্তত ৪ জন বৈষ্ণব কবির সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্য পার্ষদগোষ্ঠির অন্তর্গত গোবিন্দ আচার্য এবং গোবিন্দ ঘোষও পদ রচনা করতেন। এ ছাড়া ছিলেন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামক অপর একজন পদকর্তা। সর্বোপরি আলোচ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ যিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনার সামর্থ্যে বিদ্যাপতির সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন। 'গোবিন্দদাস' ভনিতায় বাঙলা ভাষায়ও পদ পাওয়া যায়—এদের সঙ্গে গোবিন্দদাস কবিরাজের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা সম্ভব নয়। এই চারজন গোবিন্দ দাসের রচনায় জট পাকিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়—কোন এক গোবিন্দদাসের সমস্ত রচনা সুনির্দিষ্টভাবে অপর সকল গোবিন্দদাসের রচনা থেকে পৃথক ক'রে নেওয়া বোধ হয় এখন অসম্ভবই।

সম্ভবতঃ ১৫৭৭ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে মাতামহ 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থ-প্রণেতা দামোদর গৃহে গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। প্রথম জীবনে কবি শাক্ত মাতামহের প্রভাবাধীন থাকলেও পরে দেবীর স্বপ্নাদেশেই শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে খেতরীর মহোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সম্ভবতঃ ১৬১৩ খ্রীঃ কবিরাজ গোবিন্দদাস দেহত্যাগ করেন।

বিদ্যাপতির অনুগামী গোবিন্দদাস শুধু ব্রজবুলি ভাষারই শ্রেষ্ঠ পদ-রচয়িতা নন, ভাবের দিক থেকেও বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যহেতু তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য রূপে অভিহিত করা হয়। দীর্ঘকাল পূর্বে কবি বল্লভ দাসও এ বিষয়ে লিখে গেছেন:

'ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥'

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনার ভাষা ও ভাবের সঙ্গে গোবিন্দদাসের রচনার ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্য হেতুই যে বাইরের সমালোচকরা গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলে প্রচার ক'রে থাকেন, তা' নয়,—স্বয়ং গোবিন্দদাসও অতিশয় সজ্ঞানেই বিদ্যাপতির অনুসরণ করতেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বেশ কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসেরও ভনিতা পাওয়া যায়। 'পদামৃত সমুদ্র' নামক প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলনের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর এ থেকে অনুমান করেছিলেন যে বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ-

গুলির পূর্ণতা সাধন করেছিলেন বলেই কবি গোবিন্দদাস তাতে যুগ্ম ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এই অনুমানের যৌক্তিকতায় আস্থা স্থাপন করতে না পেরে স্বয়ং অনুমান করেন "গোবিন্দদাস কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলিতে তিনি বিদ্যাপতির নাম করিয়া গিয়াছেন।" আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ত্রিচরণপদের চতুর্থ পদটি পূরণ করেছেন :

'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে শ্রীখণ্ডের কবি কবিরঞ্জনও ছিলেন 'বিদ্যাপতি' উপাধিকারী। তাঁকে সাধারণতঃ 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করা হয়। এঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বহু পদ বিদ্যাপতির নামেই প্রচলিত রয়েছে।

'গোবিন্দদাস' ভনিতাযুক্ত বাঙলা ভাষায় রচিত যে সকল পদ পাওয়া যায়, সেগুলি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা ধরে নিয়ে শুধু ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলির কর্তৃত্বই গোবিন্দদাস কবিরাজকে দেওয়া হয়। এ জাতীয় পদ-নির্বাচন বিজ্ঞান-সম্মত না হওয়া সত্ত্বেও এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই আনুমানিক নির্বাচনের ভিত্তিতেই গোবিন্দদাসের পদগুলি বিচার করে সাহিত্য সমালোচকগণ গোবিন্দদাস কবিরাজকে চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তার মর্যাদা দান ক'রে থাকেন। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচনা করেছেন তাদের ভাষা অবিমিশ্র ব্রজবুলি ; অন্য অনেকের রচনার মতো তাঁর রচনায় বাঙলা ভাষার মিশ্রণ ঘটেনি। গোবিন্দদাস তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করেছেন অপেক্ষাকৃত কম—তৎসম এবং অর্ধতৎসম শব্দের সংখ্যাই তাঁর রচনায় অনেক বেশি।

কবিতার আঙ্গিক তথা বহিরঙ্গের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সমালোচকগণ গোবিন্দদাস কবিরাজকে বৃথাই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করেন নি। ভাষায় ছন্দে ও অলঙ্কার ব্যবহারে গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাষার স্থাপত্যশিল্পে গোবিন্দদাসের দক্ষতা অতুলনীয়। পদের লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিদ্যাপতি শিষ্য গোবিন্দদাস স্বীয় গুরু বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী। তাঁর রচনার প্রধান গুণ যে শ্রুতিমাধুর্য, তা' কবি নিজেও উল্লেখ করেছেন :—

'রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দ দাস॥'

গোবিন্দদাসের পদ বিচার ক'রে ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন, "ইহার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাসের ও উপমা রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদকর্তাই করিতে পারেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিত্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের গীতিকবিতাগুলি বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

গোবিন্দদাস ছিলেন সৌন্দর্য রসিক রূপ-দক্ষ কবি। যে ধরনের পদ বিলাস-বিভ্রম-সৃষ্টির অনুকূল, কবি সাধারণতঃ ঐ ধরনের পদ রচনায়ই বিশেষ আগ্রহ এবং অধিকার

বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অভিমত উদ্ধার যোগ্য। তিনি বলেন, "সংযম বুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তুটির আবির্ভাব ঘটেছে, তাকে কাব্যের স্থাপত্যবিদ্যা বলা চলে। তাঁর অধিকাংশ পদ যেন কুঁদে তৈরী—'কুন্দে যেন নিরমাণ।' প্রতিভার আলোড়নক্ষণে অর্ধবাহ্যদশায় আত্ম-সংবিতের বিলয় মুহূর্তে প্রেরণার হাত ধরে কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেন নি। তাঁর কবি-ভাবনা কাব্যের সব ক'টি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ ক'রে অপরিসীম রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্প-দৃষ্টির সহায়ে একটির পর একটি পদ রচনা করে গিয়েছে। ফলে···কাব্যের রূপ-সম্পূর্ণতা যাকে বলে, সেই finish-এর অসৌন্দর্য কোথাও ঘটে নি।"

গোবিন্দদাসের সৌন্দর্যপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তাঁর রাধিকাকে তিনি তিল তিল সৌন্দর্যের সমাহারে তিলোত্তমা ক'রে তুলেছেন; এ রাধা যেন মর্ত্যলোকের কোন নারী নয়, গোবিন্দদাসের কল্পলোকেই তার আশ্রয়ভূমি। গোবিন্দদাসের কাব্য সাধনার মূলে যে রূপাসক্তি, তারই জন্য তিনি কখনও রূপের প্রতি যত্নহীন হ'তে পারেন নি।

ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারের বাইরে গোবিন্দদাসের রচনার আর একটি বড় গুণ—সঙ্গীত-ময়তা। এখানে তিনি বিদ্যাপতির শিষ্য নন, তিনি বৈষ্ণব কবিতার আদি পুরুষ জয়দেব গোস্বামীর কাছ থেকেই যেন সুরের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। কোন কোন বিদগ্ধ সমালোচক মনে করেন, সূক্ষ্ম সঙ্গীতবোধ তথা কাব্যের সুর-চেতনা একান্তভাবেই বাঙালীর নিজস্ব, ভারতের অন্যত্র এ বস্তু সহজপ্রাপ্য নয়।

গোবিন্দদাসের রচনার আরও বিশেষ গুণ—নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা। বিভিন্ন পর্যায়ের যে সমস্ত পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সন্দেহাতীত, সে সমস্ত পদেই এই দুটি গুণের কোন একটির উপস্থিতি অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়, কখন কখন এদের যুগপৎ উপস্থিতি কাব্যসৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এই সমস্ত গুণাবলীর কারণে গোবিন্দদাসের পদগুলি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকে এবং সর্বকালের বাঙালী কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের স্থানও উচ্চেই অবস্থিত।

গোবিন্দদাস যদিও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন, তাদের সব কিছু কিন্তু সমান রসোত্তীর্ণ হয়নি। কবি যেখানে চিত্র রচনার সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর সার্থকতা; হৃদয়ের আর্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি নিজেকে যথোপযুক্তভাবে প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি।

গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অপর সকল কবির প্রচেষ্টাকে ম্লান ক'রে দেয়। এ বিষয়ে সমালোচক বলেন, "গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদাবলীতে ভক্তি অপেক্ষা কবি-আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত রূপসার্থকতাই বড় হ'য়ে উঠেছে। ধর্মবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাঁর এই বিষয়ক পদাবলীতে প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে চৈতন্যের ব্যক্তি-মহিমা সমুন্নীত মনোমুগ্ধকর রূপের পরিচয় মেলে।

মূলতঃ চিত্ররসের কবি বলেই গোবিন্দদাস রূপানুরাগের কবিতায় অতুলনীয় শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে রাধার দৃষ্টিতে কৃষ্ণের বিচিত্র রূপের মতো কৃষ্ণের দৃষ্টিতে রাধার তেমন রূপ ফুটে উঠবার অবকাশ পায়নি। কবি গোবিন্দদাস অবশ্যই সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অভিসার-পর্যায়ের বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে। "কবি গোবিন্দদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য যথার্থভাবেই ধরা পড়েছিল বলেই তিনি রাধার চিত্ররচনায় প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন,—তাঁর অভিসারের পদগুলি এই কারণেই রসোত্তীর্ণ হ'য়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে।" (বৈষ্ণবপদাবলী: পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)।—বিরহ ও প্রেমবৈচিত্ত্যসৃষ্টিতে কবি গোবিন্দদাস তাঁর প্রতিভার যথোপযুক্ত পরিচয় দিতে পারেন নি—এইখানেই তাঁর ব্যর্থতা।

(৬) বলরামদাস:

বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রধান চতুষ্টয়কে বাদ দিলে যাদের কথা প্রথমেই মনে হয়, তাঁদের মধ্যে বলরামদাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য পদকর্তাদের পরিচয় নিয়ে বারবার যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, বলরামকে নিয়েও আমাদের সেই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে—এককথায় একে বলা চলে কবির পরিচয় সমস্যা। 'গৌরপদ তরঙ্গিনী'র সম্পাদক বলরামদাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "বলরামদাস লইয়া সাহিত্যজগতে বিষম গোল। আমরা ১৯ জন বলরামের সন্ধান পাইয়াছি।" আরও সতর্ক পর্যবেক্ষণে অবশ্য এই সংখ্যাকে আরো সীমিত করা সম্ভবপর। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সংখ্যাকে পাঁচের নীচে নামাতে পারেন নি। কিন্তু কবির প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনে এই পাঁচ সংখ্যাটিও যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। বলরামদাসের নামে যে সকল পদ প্রচলিত রয়েছে, তাদের মধ্যে যেমন আছে বাঙলা ভাষায় রচিত পদ, তেমনি আছে ব্রজবুলির পদ। অতএব অতি সঙ্গত কারণেই অনুমান করা চলে যে, বলরামদাস নামক কোন কবি বাঙলা ভাষায় পদ রচনা করেছেন, কোন কবি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন এবং কোন কোন কবির পক্ষে বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষায় পদ রচনা করাও অসম্ভব নয়। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, বলরামদাস নামাঙ্কিত সব পদই সমান রসোত্তীর্ণ নয়। যে পদগুলি শ্রেষ্ঠ তাদের রচয়িতাকেই আমরা প্রধান বলরামদাস-রূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর কাব্য পরিচয় দান করবো।

চব্বিশ পরগণা জেলার দোগাছিয়া গ্রামনিবাসী এক বলরামদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। অনুমান করা হয় ইনিই প্রধান বলরাম দাস। এই বলরামদাস চৈতন্য-দর্শনে বঞ্চিত বলে আক্ষেপ করলেও অনুমান করা যায় যে ইনি চৈতন্য-সমকালেই বর্তমান ছিলেন, কারণ ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। বাঙলা ও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত যে উৎকৃষ্ট পদগুলিতে 'বলরামদাস' ভনিতা রয়েছে, ঐ পদগুলিই এই নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরামের রচিত বলে গ্রহণ করা হয়। বুধরী গ্রামের অধিবাসী একজন বলরামদাস ছন্দো-বৈচিত্র্যযুক্ত এবং অলঙ্কারবহুল ভাষায় বেশ কিছু ব্রজবুলি পদ রচনা

করেন। ইনি ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। এঁর রচিত পদগুলির উপভোগ্যতাও স্বীকৃত হ'য়ে থাকে। অপর একজন বলরামের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি 'নিত্যানন্দদাস' ভনিতায় কিছু পদ রচনা করেন। ইনি 'প্রেম-বিলাস' নামক গ্রন্থের রচয়িতা এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও দু'জন বলরামের পরিচয় পাওয়া যায়—ভনিতা থেকেই যাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বের ক'রে নেওয়া চলে—এঁদের একজন 'বসু বলরাম' এবং অপরজন 'দীন বলরাম' ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই বলরামদাসের ভনিতা পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদে ছন্দের ঝঙ্কার এবং অলঙ্কারের সার্থক ব্যবহার পদগুলিকে শ্রবণসুভগ ক'রে তুললেও এদের কাব্যগুণ তেমনভাবে প্রকাশিত হয়নি। এদের তুলনায় বাঙলা ভাষায় রচিত পদগুলি অনেক বেশি কাব্যশ্রীমণ্ডিত। বলরামদাস বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনা করলেও তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল বাৎসল্যরসের পদরচনায়। বলরামদাস কৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং গোষ্ঠলীলার বিভিন্ন পদ রচনায় যশোদা-জননীর হৃদয়-উৎকণ্ঠা প্রকাশে কবির আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। বলরাম ছিলেন বালগোপালের উপাসক—তাই রাধা-কৃষ্ণের লীলারহস্য তাঁর মনকে ততটা অধিকার করতে পারেনি বলেই মধুর রসের পদ রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। বাৎসল্যরসের প্রকাশকেই কবি আপন প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ বলরামদাসই বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকেন। তাঁর রচিত 'শ্রীদাম সুদাম দাম/শুন ওরে বলরাম' কিংবা 'বলরাম, তুমি মোর গোপাল লইয়া যাইছ' ইত্যাদি পদগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলরামদাসের রচনায় যে মানবিক আবেদন এবং সহজ জীবন-রস-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, তারই জন্য যে কোন পাঠক ঐ রচনার সঙ্গে আপনার হৃদয়কেও যোগযুক্ত করতে পারেন। বলরামদাসের বাৎসল্যরসের পদগুলিকে এই কারণেই উত্তরকালের শাক্তপদকর্তাদের পদে বর্ণিত বাৎসল্যের সঙ্গে সার্থকভাবেই তুলনা করা চলতে পারে।

বলরামদাস বাৎসল্যরসের বাইরে বিভিন্ন মধুর রসের পদ রচনা করলেও কোন মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। তবে অকৃত্রিম সরলতা এবং শুচিশুভ্র পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি যে সার্থকতা লাভ করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলরাম দাসের কৃতিত্ব-বিষয়ে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ছন্দ-অলঙ্কার, ভাষাভঙ্গিমা, কল্পনার অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের সুবিহিত প্রয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাঁহার এই পদগুলিতে বিশেষ কোন কবিত্ব ও নিপুণতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহার কারণ তাঁহার পদে চমকপ্রদ শিল্পগুণের একান্ত অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পদে প্রত্যক্ষ শিল্পায়ন অপেক্ষা ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত একটু বেশি। এইজন্য যাঁহারা বৈষ্ণবপদে ছন্দ ও অলঙ্কারের কারুকর্ম দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলরামের এই সমস্ত জলবৎ তরল পদ-গুলিতে উগ্র স্বাদ পাইবেন না।"

(চ) **রায়শেখর :**

বৈষ্ণব কবিদের পরিচয়-সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের যেন এক সুনিশ্চিত স্থায়ী জটিল সমস্যা। এক নামে বহু কবিই কাব্যরচনা করবার ফলে এঁদের মধ্যে যিনি মূল এবং প্রধান, তাঁর রচনাকে অপরদের থেকে পৃথক্ করা যেমন এক অসাধ্য ব্যাপার তেমনি আবার একজন কবিই বহু বিচিত্র নামে নিজেকে প্রকাশ করবার ফলেও আর এক জাতীয় জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরামদাস বৈষ্ণবপদকর্ত্তারূপে বিশেষ খ্যাতিমান্—কিন্তু এদের প্রত্যেকটি নামেই অন্ততঃ একাধিক কবি বর্ত্তমান ছিলেন। আবার বিপরীতক্রমেও দেখা যায় যে, 'রায়শেখর' নামে একজন পদকর্ত্তা বহু বিভিন্ন নামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন বলে অনুমান করা হয়, যার ফলে ঐ বিভিন্ন নামের ব্যক্তিরা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি অথবা তাঁরা সকলে মিলে একজন তা' নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, 'রায়শেখর' নাম কবিই 'শেখর রায়, কবিশেখর, শেখরকবি, কবিশেখর রায়' প্রভৃতি বিচিত্র নামে ব্যবহার ক'রে গেছেন। শুধু 'শেখর' ভনিতাযুক্ত পদও পাওয়া যায়,—উনিও রায়শেখর কিনা বলা সম্ভব নয়। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "…স্বয়ং বিদ্যাপতির ভনিতাতেও 'কবিশেখর' ভনিতা আছে। সুতরাং শেখর, রায়শেখর ও কবিশেখর এই তিনজন পৃথক্ কবি হবেন বলেই অনুমান।" আবার অন্য অনেকের মতে এঁরা একই ব্যক্তি।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে 'কবিশেখর' নামক এক কবি 'গোপাল বিজয়' নামক এক বাঙলা কাব্য এবং একাধিক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। অনুমান করা যায়, ইনিই পদকর্ত্তা রায়শেখর। তিনিই 'গোপালবিজয়' কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তা' থেকে জানা যায় যে কবির পৈতৃক নাম ছিল দৈবকীনন্দন এবং পিতার নাম চতুর্ভুজ।—

'সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রী কবিশেখর নাম বলে সর্বজন॥'

কবি রায়শেখর ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলিই অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করলেও সাধারণ বাঙলা ভাষায় এবং লোচনের ধামালীর মতো চটুল ছন্দেও তিনি অনেক পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলিতে তাঁর কৃতিত্ব-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ব্রজবুলি কবিতা রচনায় দক্ষতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিরঞ্জন এবং রায়শেখরের নাম ক'রিতে হয়।" বিদ্যাপতির রচনা বলে প্রচলিত 'সখি, হামারি দুখক নাহিক ওর' পদটি কিন্তু প্রাচীনতর ও প্রামাণিক পুঁথিতে 'শেখরে'র ভনিতাতেই পাওয়া যায়—এ থেকেই রায়শেখরের কবিপ্রতিভার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। শুধু এটিই নয়, এ জাতীয় রায়শেখরের আরো কিছু কিছু পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত রয়েছে।

(ছ) **অন্যান্য :**

বষ্ণবপদকর্ত্তার সংখ্যা শতাধিক বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। এঁদের মধ্যে

প্রধানদের বাদ দিলেও এমন কিছু কিছু কবি রয়েছেন যাদের কৃতিত্ব অস্বীকার করবার মতো নয়। নিয়ে অল্প কয়জনের পরিচয় দেওয়া হ'লো।

১. 'লোচনদাস' :—'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা লোচনদাস-রচিত ধামালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদগুলি 'নদীয়ানাগরী-ভাবে'র। চটুল ছড়ার ছন্দে রচিত পদগুলিতে একজাতীয় গ্রাম্য সৌন্দর্য বর্তমান। 'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি' এবং 'অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো' প্রভৃতি সাধারণ পদে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

২. 'নরোত্তমদাস ঠাকুর' :—খেতুরীর রাজবংশের সন্তান নরোত্তমদাস ঠাকুরই প্রথম স্বগ্রামে এক মহোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম কীর্তন গানের প্রবর্তন করেন। প্রার্থনাসূচক পদ-রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৩. 'কবিরঞ্জন' :—বাঙলা এবং ব্রজবুলি ভাষায় অনেক পদ রচনা করলেও ব্রজবুলি ভাষার পদ রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁর অনেক পদও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত রয়েছে।

৪. জগদানন্দ' :—ইনি সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা—বাঙলা এবং ব্রজবুলি—উভয় ভাষায় পদ-রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ধ্বনিমাধুর্য এবং শব্দ চিত্র রচনায় তিনি শ্রেষ্ঠ কবিদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন। 'মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপশব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ' পদটি তাঁরই রচনা।

সৈয়দ মর্তুজা, মসির মামুদ, আলাওল প্রভৃতি মুসলমান কবিও কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন।

[বাইশ] রোসাঙ্ রাজসভা ও মুসলমানী সাহিত্য :

প্রশ্ন ৫২। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভায় বঙ্গীয় মুসলমান কবিদের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৫৩। সপ্তদশ শতকের মুসলমান মহাকবি আলাওলের সাহিত্য-কীর্তির পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ৫৪। রায়গুণাকরের আবির্ভাবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মুসলমান কবিরাই বাঙলা কাব্যবাসরে দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। লক্ষণীয় তাঁহাদের কাব্যের প্রেরণা প্রায়শঃ বাঙলাদেশের বাহিরের বিষয়। আরও আশ্চর্য, এই কবিকুলের পৃষ্ঠপোষকতাও আসিয়াছে বাঙলাদেশের বাহির হইতে। কোন কবি বা কাব্য সম্পর্কেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে উপরিউক্ত ঐতিহাসিক সত্যটি মাত্র প্রতিফলিত কর।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি শাখা বস্তুত লোকসাহিত্য-রূপে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে। এই লোকসাহিত্যের তিনটি ধারা—'কিস্‌সা সাহিত্য,' 'পল্লীগীতিকা' ও 'লোকসঙ্গীত'। 'কিসস্‌া সাহিত্য' কথাটি যথোপযুক্তভাবে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত না হওয়ায় কথাটি অনেকটা অপরিচিত। এর অতিশয় পরিচিত কিন্তু অবাঞ্ছিত প্রতিশব্দ 'মুসলমানী সাহিত্য' কথাটিই অধিকতর প্রচলিত। মুসলমান কবিরাই এই সাহিত্যের স্রষ্টা এবং পোষ্টা বলেই এর এবম্বিধ পরিচিতি। রূপকথা বা কিস্‌সা জাতীয় কাহিনীই এর উপজীব্য। এই কাহিনীগুলিতে কখন কখন ঐতিহাসিক ঘটনার স্পর্শ থাকলেই এরা যে মূলতঃ আদিম কল্পনা থেকেই জাত, এ কথা সহজ সত্যরূপেই স্বীকৃত। এ জাতীয় সাহিত্যের অপর বৈশিষ্ট্য : প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এগুলি অনুবাদ অথবা অনুকরণ মাত্র। বাঙলা ভাষায় স্বাধীন মৌলিক কিসস্‌া সাহিত্য রচনা প্রচেষ্টা প্রায় দেখা যায় না বলেই মনে হয়।

'মুসলমানী সাহিত্য' বা 'কিস্‌সা সাহিত্যে'র আলোচনা প্রসঙ্গে রোসাঙ্ রাজসভার উল্লেখ অপরিহার্য। এই অঞ্চলটি বর্তমান কালে ব্রহ্মদেশের আরাকানে অবস্থিত হ'লেও

একসময় এখানে বাঙালী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। এক সময় এখানে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। আবার মুসলমানগণ বাঙলাদেশে প্রভাব বিস্তার করবার পূর্বেই এই অঞ্চলটি তাদের দ্বারা অধ্যুষিত হ'য়েছিল। ফলে রোসাঙ্ রাজসভা ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও ইসলামী সভ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গমে পরিণত হ'য়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রোসাঙ্ রাজগণ অনেকেই মুসলিম উপাধিও গ্রহণ করতেন। বাঙলাদেশে মুসলমান-পাঠান সংঘর্ষকালে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রোসাঙ রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু মুসলমান কবি এখানে এক বিশিষ্ট সাহিত্য সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন—'কিস্‌সা সাহিত্য' বা 'মুসলমানী সাহিত্য' নামে পরিচিত এই সাহিত্যধারা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মানবিক ভাবযুক্ত 'রোমান্স সাহিত্য'।

এই সাহিত্যধারার স্রষ্টা মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ স্বাধীন রচনায় উদ্বুদ্ধ না হ'য়ে অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এই অনুবাদ কোথাও মূলানুগ, কোথাও বা ভাবানুগ। গ্রন্থকারগণ প্রধানতঃ ফার্সী সাহিত্যের দ্বারস্থ হ'লেও কখন কখন তাঁরা হিন্দী সাহিত্য থেকেও তাঁদের উপজীব্য আহরণ ক'রেছেন। কাজেই লোকসাহিত্যের এই ধারাটি যে একান্তভাবেই অভারতীয় প্রেরণায় জাত, এমন কথা বলা চলে না। সুকুমার সেন মনে করেন যে এই ধারার সাহিত্যস্রষ্টা মুসলমান কবিরা 'ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানী ছিলেন। এই মুসলমান কবিদের অনেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যেমন ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তেমনি ভারতীয় পুরাণাদির সঙ্গেও ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই এই 'মুসলমানী সাহিত্যেও সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু পুরাণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাবও অস্পষ্ট নয়। বস্তুতঃ নামে 'মুসলমানী সাহিত্য' হলেও বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবের সমন্বয় প্রচেষ্টা এদের মধ্যে প্রকট হ'য়ে ওঠে।

[ক] দৌলত কাজী :

রোসাঙ্-রাজ থিরি-থু-ধম্মা বা রাজা শ্রীসুধর্মার লস্কর উজীর পণ্ডিতপ্রধান আশরফ খানের ঠেট-হিন্দিতে সাধন-রচিত 'মৈনা-সৎ' বা সতী ময়নার কাহিনী শুনে কবি দৌলত কাজীকে দেশী ভাষায় রচনা করতে অনুরোধ করেন—কবি দৌলত কাজী আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে এই তথ্যটি জ্ঞাপন করেছেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে ১৬২২ খ্রীঃ ১৬৩৮খ্রীঃ, অতএব এই কালেই কবি তাঁর 'সতী ময়নামতী' বা 'লোর চন্দ্রানী' কাব্যটি রচনা করে-ছিলেন বলে অনুমান করা চলে।

'লোর চন্দ্রানী' নামে বিখ্যাত সতী ময়নামতীর কাব্যকাহিনীর প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বারবাস্যার এগারো মাস পর্যন্ত রচনা করবার পর দৌলত কাজী দেহ-ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন কবি আলাওল। আলাওল উল্লেখ করেছেন :

'বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিলা ॥
তবে কাজী দৌলত স্বর্গেতে হইল লীন।'

লোর চন্দ্রানীর কাহিনী অনেকটা রূপকথাধর্মী। লোর রাজার 'ময়না' নামে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি গোহারীর রাজকন্যা এবং বামনবীরের পত্নী চন্দ্রানীর প্রতি আকৃষ্ট হন। বামনবীর লোর রাজার হস্তে মৃত্যুবরণ করেন। গোহারীর রাজা সংবাদ পেয়ে লোর রাজাকে সমাদরে রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং তার হাতে কন্যা চন্দ্রানীকে সমর্পণ করেন। এখানেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতীর বিরহ। এক রাজার পুত্র ছাতন ময়নাকে হস্তগত করতে চাইলে সতী ময়না তা প্রত্যাখ্যান করেন। তৃতীয় খণ্ডে—কী ভাবে সতী ময়না এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় আবার লোর রাজার মনে পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে এনে তাকে ফিরে পেলেন, সেই কাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে দৌলত কাজীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি যেমন একদিকে লৌকিক সাহিত্যধারার প্রথম কবি, তেমনি আবার মুসলমান কবিদের মধ্যেও তিনি প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ। কবির পৃষ্ঠপোষক উজীর আসরফ খান ছিলেন 'চিস্তি খানদান', কবি নিজেও সুফী সাধনার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। সম্ভবত সুফী-বাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকায় তাঁর কাব্যে একটা অতিশয় উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কালিদাস, জয়দেব এবং বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুর বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাকাব্য সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে এ সমস্ত প্রসঙ্গও বহুবার তিনি উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যে বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বশক্তি যুক্ত হওয়াতে তাঁর 'লোর চন্দ্রানী' কাব্য বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ডঃ সুকুমার সেন দৌলত কাজীর কবিত্বপ্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন: "দৌলত কাজীর কবিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কি বাঙলা কি ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন।"

দৌলত কাজী রচিত 'লোর চন্দ্রানী' গ্রন্থটি সাধারণভাবে অনুবাদ গ্রন্থ-রূপে পরিচিত হ'লেও কবি যে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, এমন কথা বলা চলে না। সাধন-রচিত যে মূল গ্রন্থ অবলম্বনে দৌলত কাজী তাঁর 'লোর চন্দ্রানী' রচনা করেন, সেই মূল গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র পুঁথি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। তা থেকে অনুমান করা চলে যে দৌলত কাজী উক্ত গ্রন্থের কোন কোন অংশ আক্ষরিক অনুকরণ করলেও বহু স্থলেই কাহিনীমাত্র গ্রহণ ক'রে আপন প্রতিভাবলে তার পূর্ণতা সাধন করেছেন। কাজেই দৌলত কাজী অনুবাদ রচনা করলেও তাঁর মৌলিক প্রতিভা যথাযোগ্য স্বীকৃতির দাবী রাখে। গ্রন্থের যে সমস্ত অংশ কবি স্বয়ং রচনা করেছেন, অর্থাৎ যে অংশটি অনুবাদ নয়, তার বিচার বিশ্লেষণে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি আলাওল দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণতা দান করেন এবং স্বয়ং বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে বাঙলা সাহিত্যের

ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তুলনামূলক বিচারে কিন্তু আলাওল-রচিত অংশ অপেক্ষা দৌলত কাজী-রচিত অংশের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

সুধী সমালোচক ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় আলাওলের তুলনায় দৌলত কাজীর রচনার উৎকর্ষ এবং কবির বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে মন্তব্য ক'রেছেন : "আলাওল যেটুকু সমাপ্ত করেন তার কাব্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর, গল্পের বাঁধুনি শিথিল, অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে ভারাক্রান্ত। আলাওল কাব্যটি সমাপ্ত করেছেন বটে, কিন্তু দৌলত কাজীর কবিত্ব ও মেজাজের ধারা অনুসরণ করতে পারে নি।...আলাওল অধিকতর বিখ্যাত ও বিচিত্র প্রতিভাধর। কবি হ'লেও প্রকৃত কবিত্বে দৌলত কাজী অধিকতর শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। এর পরিচ্ছন্ন ভাষা, নিপুণ ছন্দ-জ্ঞান, সংস্কৃত সাহিত্য-পুরাণে অবাধ বিচরণ, জীবনের অভিজ্ঞতা অতি উৎকৃষ্ট। 'লোর চন্দ্রানী বা সতী ময়না' কাব্য মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে এক অভিনব আদর্শের পথ খুলে দিয়েছে—কিন্তু হিন্দু কবিরা এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ মুসলমান কবিদের কাব্য বিশেষত যাতে দেবদেবীর কথার চেয়ে মানুষের কথা থাকত বেশী, সে যুগে তার হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রভাব ছিল না। তাই এই উৎকৃষ্ট কাব্যখানি সে যুগে ততটা প্রচারিত হয় নি। কিন্তু আধুনিক কালের রসিক পাঠক কবি দৌলত কাজীকে যথার্থ কবিপ্রতিভার অধিকারী বলে শ্রদ্ধা করবেন।"

(খ) আলাওল :

প্রাগাধুনিক যুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত কবি আলাওল অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ কবিও বটেন। আলাওল-ও দৌলত কাজীর মতোই রোসাঙ রাজসভাকে অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। তিনি তাঁর কোন কোন কাব্যে আত্মপরিচয় দান ক'রেছেন, তাতে তাঁর জীবনের বিচিত্র এবং ঘটনাবহুল কাহিনী বিস্তৃতভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত, বর্তমানে ফরিদপুর-বরিশাল অথবা চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ পরগণার জালালপুর গ্রামে কবি আঃ ১৬০৮ খ্রীঃ (অথবা ১৫৯২ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আলাওল পিতার সঙ্গে ভ্রমণ-কালে একবার জলদস্যুদের হাতে পড়েন এবং তখন পিতার মৃত্যু ঘটে। আলাওল রোসাঙে উপনীত হ'য়ে অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্তি হ'ন। সত্বরই স্বীয় পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে তিনি রোসাঙরাজ বদো মিস্তোর (রাজত্বকালে ১৬৪৫ খ্রীঃ—১৬৫২ খ্রীঃ) মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুরের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং তাঁর সহায়তায় রোসাঙ রাজসভায়ও আশ্রয়প্রাপ্ত হন। ১৬৬১ খ্রীঃ বাদশা শাহ্ জাহানের পুত্র শাহ সুজা রোসাঙ্ রাজসভায় আশ্রয়লাভ করলে তাঁর সঙ্গে আলাওলের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। সাহ্ সুজা রাজকোপে পতিত হ'লে আলাওলকেও কিছুদিন কারাগার জীবন যাপন করতে হ'য়েছিল। বন্দীজীবন থেকে মুক্তি লাভের পরও আলাওলকে কিছুদিন নানাপ্রকার দুর্ভোগে পড়ে বিড়ম্বিত হ'তে হয়েছিল। অবশেষে কবি রোসাঙের কাজী সৈয়দ মুসার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কাদেরী মতে

দীক্ষিত হন। কবি আলাওল রোসাঙ্‌রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার রাজসভাতে বর্তমান ছিলেন। কবি ১৬৭৩ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন।

সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কবি আলাওলের মতো ভূরি-স্রষ্টা কবি মাত্র একজনই ছিলেন, তিনি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী। এছাড়া অপর কোন কবিই আলাওলের মতো এত অধিক গ্রন্থ রচনা ক'রে উঠতে পারেন নি। আলাওল রচিত প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মাবতী' তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচিত হয় সম্ভবতঃ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। কবির দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' রচনা করেন সম্ভবতঃ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই। গ্রন্থটি দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। পরে সৈয়দ মুসার নির্দেশে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন সম্ভবতঃ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর। দৌলত কাজী তাঁর একমাত্র কাব্য 'লোর চন্দ্রানী' বা সতী ময়না, অসমাপ্ত রেখে পরলোকগমন করলে আলাওল সম্ভবতঃ ১৬৫৯ খ্রীঃ গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে আলাওল ১৬৬০ খ্রীঃ বা কাছাকাছি সময় রূপকথা জাতীয় গ্রন্থ 'সপ্ত পয়কর' বা 'হপ্ত পয়কর' রচনা করেন। আলাওলের অপর একটি গ্রন্থ 'তয়ফা' বা 'তোহ্‌ফা' ১৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ সমাপ্ত হয়েছিল ব'লে কবি উল্লেখ ক'রে গেছেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান আমাত্য মজলিস্ নবরাজের আদেশে কবি সম্ভবতঃ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 'সেকেন্দারনামা' রচনা সমাপ্ত করেন। এগুলি ছাড়াও আলাওল 'য়ুসুফ-জোলায়খা, লায়লা-মজনু, শিরিঁ-খোসরোনামা, এবং 'আজিজকুমার রসবতী' নামক কয়েকটি কাব্যও তিনি রচনা করেছেন বলে অনুমান করা হয়—কিন্তু এই অনুমানের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই বললেই আশঙ্কা করা হয়। তবে আলাওল যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ এবং 'রাগনামা' নামে একটি সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এ বিষয়ে বিশেষ মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

এত সমস্ত গ্রন্থ রচনা করা সত্ত্বেও যে কবি আলাওল সামগ্রিকভাবে বাঙলা সাহিত্যে খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি এবং তাঁর জনপ্রিয়তা যে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—তাঁর রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই ইসলামী কাহিনী ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক। এই গ্রন্থগুলি তিনি আরবী বা ফার্সী থেকে ভাষান্তরিত করেছেন মাত্র—এতে তিনি কোন মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। আরব্য উপন্যাসের 'আলফা লায়লা' কাহিনী অথবা কোন ফার্সী কাহিনী-অবলম্বনে কবি আলাওল নায়ক সয়ফুল মুলুক এবং নায়িকা বদিউজ্জমাল-এর রোমান্টিক প্রেমকাহিনী রচনা করেন। ইরানী কবি নেজামী সমরকন্দের ফার্সী ভাষায় রচিত আরব রাজকুমার বাহ্‌রামের যুদ্ধ জয় এবং তাঁর সাতজন পত্নীর কাহিনী অবলম্বনে আলাওল 'সপ্ত পয়কর' গ্রন্থ রচনা করেন। এটিও অনুবাদ গ্রন্থ। শেখ য়ুসুফ-রচিত 'তুহ্‌ফাতুন্নসা' নামক ফারসী নীতিকাব্য অবলম্বনে আলাওল 'তহ্‌ফা' বা 'তোহফা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। নীতি-উপদেশে এই গ্রন্থটি কাব্যের মর্যাদাই লাভ করতে পারে না। ফারসী কবি নেজামী সমরকন্দীর 'ইস্‌কান্দারনামা' নামক আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ী কাহিনীর রূপকথা-জাতীয়

গ্রন্থের সরল অনুবাদ আলাওলের 'সেকেন্দারনামা' তবে এই গ্রন্থে কবি তাঁর পঞ্চ ভাষা-জ্ঞানের উল্লেখ ক'রে বলেছেন :

'আরবী ফারসী পোস্ত নছরাণী ইহুদী।
পহ্লবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি।'

দৌলত কাজী রচিত 'লোর চন্দ্রানী' গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করলেও দৌলত কাজীর মান বজায় রাখতে পারেন নি। কবিত্বের দিক থেকে দৌলত কাজী অধিকতর প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন—বস্তুতপক্ষে কবি আলাওলের যত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তা' প্রধানতঃ তাঁর পদ্মাবতীকে অবলম্বন করেই।

'পদ্মাবতী'কে কেউ কেউ বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্সের মর্যাদা দান ক'রে থাকেন। কিন্তু 'পদ্মাবতী' কোন মৌলিক কাব্যগ্রন্থ নয়। মালিক মুহম্মদ জায়সী আরবী ভাষায় 'পাদুমাবৎ' নামে যে কাব্য রচনা করেন, কবি আলাওল তাকেই বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে আলাওলের পদ্মাবতীকে নিছক অনুবাদও বলা চলে না, কারণ উভয়ের মধ্যে কাহিনীগত মোটামুটি ঐক্য থাকলেও কবি বহুস্থলেই স্বাধীনচিত্ততারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রা চলে। মুহম্মদ জায়সী তাঁর 'পদুমাবৎ' কাব্যকে রূপক-রূপে বর্ণনা করেছেন। কাব্যোক্ত চিতোররাজ্যকে তিনি মনরূপে রাজা রত্নসেনকে জীবাত্মারূপে, রাণী পদ্মাবতীকে বিবেকরূপে এবং শুকপক্ষীকে ধর্মগুরুরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। আলাওল রূপক পরিহার করেছেন, তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক ভাবনারও অভাব রয়েছে। আলাওলের কাব্যটিকে একান্তভাবে প্রেমকাব্যরূপেই গ্রহণ করা চলে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পদ্মাবতীকে কিছুটা নিজস্বতায় মণ্ডিত করেছে। মূল 'পদ্মাবতী' কাব্যে মুসলমান-সম্রাট আলাউদ্দিনের জয় প্রদর্শন করা হ'য়েছে, কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতীতে আলাউদ্দিনের পরাজয় ঘোষিত হ'য়েছে। কবির এই কাহিনী পরিবর্তন থেকে তাঁর ওপর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন : "কবির যুগজয়ী বিশ্বমানবতাই এই ইতিহাস বিরোধিতার প্রকৃত কারণ। আলাওল ছিলেন সৌন্দর্যগত-প্রাণ সত্যকার কবি। তাঁহার ধারণা ছিল—বিশ্বজগতে, অন্ততঃপক্ষে কাব্যজগতে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ই চিরন্তন সত্য। কোনোরূপে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার এ-বিশ্বাস টলাইতে পারে নাই।" এছাড়া মূল গ্রন্থ থেকে এই অনুবাদ গ্রন্থ আরো একদিক থেকে অনেকখানি পৃথক। মূল কাহিনীটি বিয়োগান্তক হ'লেও আলাওল এটিকে মিলনান্তক কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন।

রস-বিচারেও পদ্মাবতীর কিছুটা বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে হয়। কবি আলাওল ছিলেন কাদেরী সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মীয় উদারতা। আলাওল রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর থেকেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এই বৈষ্ণবতাবোধ পদ্মাবতীতেও যে সংক্রামিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সমালোচকদের কেউ কেউ পদ্মাবতীতে বৈষ্ণব কাব্যের রসে সিক্ত বলেই অনুভব করেন। আলাওল বৈষ্ণব পদের সাদৃশ্য-

যুক্ত অনেকগুলি পদও তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সুফী সাধক আলাওল-এর সঙ্গে বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের একটা ভাবগত ঐক্য ছিল বলেই পদ্মাবতী কাব্যে কবির বৈষ্ণব-সম-প্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পদ্মাবতীতে কাহিনী রয়েছে দু'টি অংশ। প্রথম অংশে চিতোর রাজ রত্নসেনের সঙ্গে সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ এবং চিতোর প্রত্যাবর্তন কাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে পাঠান-সম্রাট আলাউদ্দিন কর্তৃক পদ্মাবতীকে অধিগত করবার আকাঙ্ক্ষায় চিতোর আক্রমণ, যুদ্ধে আলাউদ্দিনের পরাজয় কিন্তু রত্নসেনের মৃত্যু এবং পদ্মাবতীর সহমরণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির দ্বিতীয় অংশের জটিলতা বেশি থাকায় এখানে নাটকীয়তা প্রকাশের সুযোগও বেশি ছিল, কিন্তু কবির আকর্ষণ ছিল কাহিনীর প্রথমাংশের প্রতি—কারণ এর প্রেমকাহিনীটিই কবির প্রতিভা বিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হ'য়েছিল। এই সরল সহজ প্রেমকাহিনী-বর্ণনায় কবি আলাওলের কবিত্বশক্তি যেমন সচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে অগ্রসর হ'য়েছে, পরবর্তী জটিল, নাটকীয় এবং ঐতিহাসিক কাহিনী-বর্ণনায় কবিচিত্ত স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে উঠতে পারেনি। আলাওল মূলতঃ কবি ছিলেন বলেই পদ্মাবতীতে যেমন স্ব-ধর্মের জয় ঘোষণা করেননি, তেমনি ঐতিহাসিক নিষ্ঠার প্রতিও বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেননি। প্রেমকে প্রধান উপজীব্য ক'রে তিনি খাঁটি কাব্য রচনা করতে চেষ্টা করেছেন এবং তা থেকেই আমরা অনুভব করতে পেরেছি, কবির হৃদয়ানুভূতির ক্ষেত্র ছিল কত গভীর, কত প্রসারিত। এই গুণেই, মূল 'পদুমাবৎ' কাব্য অপেক্ষা আলাওলের 'পদ্মাবতী' অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। জনৈক সুধী সমালোচক আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যকে তার যথোপযুক্ত মর্যাদা দান ক'রে মন্তব্য করেছেন, "বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম সত্যকার ব্যক্তিসাহিত্য।···এই কাব্যের সূচনায় যেমন কবির ব্যক্তি-জীবনকে। তেমনি কাব্যের মধ্যে কবি-মানসকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।··· ইহাতে ইতিহাসাংশ থাকিলেও ইহা যথার্থ কাব্য এবং রঘুবংশ, কাদম্বরী প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল কাব্যে সমশ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। সপ্তদশ শতকে রচিত হইলেও ইহা উদার ও সর্বজনীন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই।"

[তেইশ] শাক্তপদাবলী :

প্রশ্ন ৫৫। বাঙলা ভাষায় শাক্তপদাবলীর উদ্ভব ও বিষয়বৈচিত্র্য এবং সমকালীন জীবনের প্রতীকরূপে এর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা কর।

তুর্কী আক্রমণের আকস্মিক অভিঘাতে গৌড়বঙ্গে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সূচিত হয়েছিল তারই মধ্যে শুভ ইঙ্গিতও আভাসিত হ'য়ে উঠেছিল। আর্য-অনার্য সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে এতকাল যে একটা ব্যবধানকে দুরতিক্রম্য বলে মনে হয়েছিল, এই আকস্মিক অভিঘাত সেই ব্যবধানকে নিকটতর করেছিল। ফলে আর্য-অনার্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে কিছুটা মিশ্রণ দেখা দেয়—বেশ কিছু অনার্য দেবদেবী আর্য-সমাজে গৃহীত হ'লেন। এদের মধ্যে ছিলেন মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি। জনসাধারণ এদের পূজা করতেন, এঁদের মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য অনেকেই বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যও রচনা করেন। দেবী চণ্ডী পূজা পেলেও তার সঙ্গে ভক্তদের সম্পর্ক ছিল ভয়ের, দেবী ভক্তের হৃদয়ে তখনো ভক্তির আসন লাভ করতে পারেননি। ক্রমে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে থাকে—অনার্যকুল থেকে আগতা চণ্ডী জগজ্জননী কালীমাতায় রূপান্তরিতা হ'লেন। ভক্তের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক কখনো মাতা-পুত্রের, কখনো বা মাতা-কন্যার। ইতোমধ্যে সামাজিক অবস্থারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুঘল শাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মানুষের মনে প্রেম-বোধকেও জাগিয়ে তোলে। এরপর আবার মুঘল সাম্রাজ্যের পতনদশায় দেশ সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়; চৈতন্যদেবের প্রভাবও অস্তমিত হওয়াতে বাঙালীর সম্মুখে আর কোন মহৎ স্থির আদর্শও বর্তমান ছিল না। এই অবক্ষয়ের যুগে, দেশব্যাপী সামগ্রিক অন্ধকারের মধ্যেও বাঙলাদেশে অন্ততঃ কবি যেন বিদ্যুৎচমকের মতোই আলোর স্ফুরণ লক্ষ্য ক'রেছিলেন—এই কবি সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ। তিনি সর্বব্যাপ্ত অব্যবস্থার মধ্যে জগজ্জনীর নিকট শরণ-গ্রহণের মধ্যেই বিপদ-মুক্তির সন্ধান পেলেন। তিনি দেবীর নিকট সুখ-দুঃখ সমন্বিত জীবন নিয়ে একেবারেই আত্মসমর্পণ ক'রে বসলেন।

মধ্যযুগের শুরুতেই বৈষ্ণবগণ তাঁদের আরাধ্যদেবতা রাধাকৃষ্ণের উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণবপদ-রচনা এবং পদ-কীর্তনকে। রামপ্রসাদ জগজ্জননী কালীর আরাধনায়ও এই আদর্শকে গ্রহণ ক'রে রচনা করলেন নানাপ্রকার শাক্তপদ এবং স্বয়ং তাতে সুর সংযোগ ক'রে সেগুলিকে গীতিরূপও দান করলেন। এইভাবেই সৃষ্ট হলো

শাক্তপদাবলীর। বৈষ্ণব পদের আদর্শের সৃষ্ট হ'লেও শাক্তপদাবলী কোন কোন দিক্ থেকে বৈষ্ণবপদাবলীর সমজাতীয় হ'লেও আবার কোন কোন দিক থেকে এর নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্র্যও সহজেই পরিলক্ষিত হয়। শাক্তপদগুলিও বৈষ্ণবপদের মতই বিভিন্ন রস-পর্যায়ে বিভক্ত এবং ক্ষুদ্রাকৃতি পদের মাধ্যমে আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। রামপ্রসাদের পদ-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন, "Not only does he imitate in places characteristic diction and imagery of Vaisnaba Padabalis but he deliberately describes the Gostha, Rasa, Milana of Bhagabati in imitation of Brindaban Lila of Srikrisna." বৈষ্ণবপদ থেকে স্বতন্ত্রতার বিচারে দেখা যায়—যৌবনের জয়গানে মুখর বৈষ্ণব পদে যতই মাধুর্যরসের অবতারণা করা হোক, কিংবা আধ্যাত্মিকতা আরোপিত হোক না কেন, সুস্থ গৃহীজীবনের পক্ষে বৈষ্ণবীয় প্রেম কখনও কাম্য নয়। বৈষ্ণব পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক হৃদয়বৃত্তি গৃহজীবনে একান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈষ্ণব রসতত্ত্বকে বাস্তবজগতে রূপায়িত করা সম্ভব নয়, বৈষ্ণব গীতিকবিতার সঙ্গেও বস্তুতঃ বাঙালীর বাস্তবজীবনের কোন যোগ নেই। ফলে বৈষ্ণব সাধনায় আরাধ্য দেবতা চিরকাল ভাবলোকেই বিরাজ করেন। কিন্তু শাক্তপদগুলিকে বলা যায় একান্তভাবেই গৃহস্থ জীবনের কাব্য। আরাধ্যা দেবী জগজ্জননী কালী শাক্তসাধকের দৃষ্টিতে জননী বা কন্যা-রূপে আমাদের সমস্যা-জর্জরিত সংসারেরই একজন। শাক্তসাধককে নির্জনে সাধনা করবার জন্য গ্রামপ্রান্তে আখড়া স্থাপন করতে হয় না—সাধক কবি সংসারে বাস ক'রেই দায়-দায়িত্বও সেই আরাধ্যার কাঁধেই চাপিয়ে দিয়ে উদ্ধার হতে চান। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শাক্তপদগুলিকে আমাদের সংসার জীবনের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন : "পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখে-ইঙ্গিতে তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিগ্রি-ডিসমিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি ; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রকরণকে রূপক-রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি ; বহু-বিবাহ-বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীন, বিমাতৃ-শাসিত পিতার ঔদাসীন্যের খবর পাই··· শাক্তপদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্লানি, কুশ্রীতা, দারিদ্র্য, রিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট ও ইহার সাধনাক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত, উহার মধ্যে কোন নিগূঢ় ব্যঞ্জনা নাই।··· বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালীর মনের কথা যেন বেনামীতে ব্যক্ত হয় ; শাক্ত পদাবলীতে উহার একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেইজন্য মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকে বাঙালীর সংসার ও ভাবজীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাই তাহার ভক্তিসাধনার নূতন রীতিতে ও বাক্যপ্রকাশের নূতন ভঙ্গীতে স্বতঃই প্রতিফলিত হইয়াছে।"

শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলী উভয়ই ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত হ'লেও বৈষ্ণব পদের একটা বিশেষ গুণ এই যে সুর বর্জন করলেও এর সুখপাঠ্যতার হানি হয় না ; কিংবা

রসানুভূতির ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা হয় না—শাক্তপদাবলীর এই গুণ নেই। পক্ষান্তরে শাক্তপদাবলীগুলি ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে ধর্ম-সম্পর্ক বর্জিত-রূপে পাঠ করলেও এদের স্বাভাবিক মানবিক আবেদন অক্ষুণ্ণই থাকে। এ বিষয়ে ডঃ ভূদেব চৌধুরী বলেন, "বৈষ্ণবপদাবলী গোষ্ঠীগত প্রেম-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই, এই পদসাহিত্যে ধর্ম ও মর্মানুরাগ সমসূত্রে বিধৃত; এক অন্য থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু শাক্তসঙ্গীতের মর্মোৎসারিতা ধর্ম-নিরপেক্ষ; ব্যক্তি-চিত্ত-প্রবাহে সমাকুল। এইখানেই এই দুই শ্রেণীর ধর্মনির্ভর গীতিসাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য মূল।"

জীবনাশ্রয়ী এবং মানবিক আবেদনে পুষ্ট শাক্তপদাবলীকে বিষয়বস্তুর বিচারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে:—১. কন্যা-সাধনাত্মক 'উমাসঙ্গীত' বা 'আগমনী-বিজয়া'র গান এবং ২. মাতৃসাধনাত্মক 'শ্যামাসঙ্গীত' বা 'কালীকীর্তন'।

১. 'উমাসঙ্গীত':—উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়ার গানে আরাধ্যাদেবীকে কন্যারূপে ভজনা করা হ'য়েছে। আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি ভগবতী হিমালয়-গৃহে মাতা মেনকার গর্ভে পার্বতী উমা বা গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবের সঙ্গে বিবাহিতা হবার পর থেকেই তিনি কৈলাস ধামে স্বামিগৃহবাসিনী। উমার জন্য জননী মেনকার উৎকণ্ঠা, উমাকে নিয়ে মেনকার সাধ-আহ্লাদ এবং কন্যার বিদায়-উপলক্ষ্যে জননীর হৃদয়ভেদী হাহাকারই এ জাতীয় পদের বিষয়বস্তু। এতে কোন পৌরাণিক রসবস্তু নেই, এতে রয়েছে একান্তভাবেই বাঙালীর ঘরের কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বাঙ্গালার জলবায়ুতে মধুর রস বিরাজ করে, তাই বাঙলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদ-বিধুর কন্যারূপে,—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দররূপে দরিদ্র বাঙালীর ঘরে মধুর রসসঞ্চার করিয়াছেন।" উমাসঙ্গীতগুলিতে বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া—তিন জাতীয় পদ রয়েছে। এই ত্রিবিধ পদেই বাৎসল্যরসের অনুপম প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্যরসের তুলনায় শাক্তপদাবলীর বাৎসল্যরসে অনেক বেশি আন্তরিকতা এবং বাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে। শাক্তপদাবলীর এ জাতীয় পদগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়, কোন্ উপলব্ধি থেকে ইংরেজ কবি লিখেছিলেন—'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' পরিবারিক জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির এমন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ বিশ্বসাহিত্যের কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার।

২. 'শ্যামাসঙ্গীত':—শাক্তপদাবলীর শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে সাধক কবিগণ জগজ্জননীকে শ্যামাজননীরূপেই গ্রহণ করেছেন। এ জাতীয় পদে শক্তিতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্বের পরিচয় রয়েছে। শক্তিতত্ত্বের পদে বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে যে ভাবে দেবীর রূপ ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে, তাতে ভক্তসাধক-ব্যতীত অপর কারো পক্ষে এর পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র তন্ত্রসাধনার সঙ্গে পরিচয় থাকলেই শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব। সাধনতত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিতও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়; তবে এ শ্রেণীর কিছু পদে ভক্তের আকুতি এমনভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে যে এদের

একটা সার্বজনীন আবেদনকে স্বীকার ক'রে নেওয়া চলে। এতে মায়ের কাছে সন্তানের অভিযোগ, আব্দার এমন মানবিক আবেদন নিয়ে উপস্থিত যে সাধ্য ও সাধকের অন্তরঙ্গ যোগটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ জাতীয় পদগুলিতে আমাদের সমাজ ও সংসার-জীবনের অনেক বাস্তবচিত্রও অঙ্কিত হ'য়েছে। এই পদগুলিতে কবি সমাজ-সংসারের জটিলতা এবং তা থেকে মুক্তির জন্য দেবীর নিকট আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেছেন।

(ক) রামপ্রসাদ ঃ

প্রশ্ন ৫৬। সাধক কবি রামপ্রসাদের সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে আলোচনা কর।

বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিলেও রামপ্রসাদ প্রধানতঃ সাধক কবি এবং শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতারূপেই বিখ্যাত। বৈষ্ণবপদাবলীর বিভিন্ন কবিদের পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা বারবার যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি, রামপ্রসাদ-সম্বন্ধেও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ঐ রকম সমস্যার মুখোমুখী হ'তে হ'য়েছে। সাধারণভাবে আমরা জানি, কুমারহট্ট বা হালিশহরের বৈদ্যবংশীয় সাধক-কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন-ই শাক্তপদাবলীর স্রষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীতে 'রামপ্রসাদ' নামের সঙ্গে যুক্ত যে সকল ভণিতা পাওয়া যায়, তা' থেকে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে—রামপ্রসাদ কি একজনই ছিলেন? 'দীন রামপ্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রাসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ, দাস রামপ্রসাদ, প্রসাদ'—আদি ভণিতা রামপ্রসাদ-সমস্যাকে জটিলতর ক'রে তুলেছে।

সম্ভবতঃ ১৭২০ খ্রীঃ চব্বিশ পরগণা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'শ্যামাসঙ্গীত' ছাড়াও 'কবিরঞ্জন' নামে যে 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন, তাতে আত্মপরিচয়-সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। সম্পন্ন পরিবারের সন্তান রামরাম সেন কর্মসূত্রে কলকাতার নিকটবর্তী কোন এক ধনী গৃহে বাস করতেন। রামপ্রসাদের প্রথম যৌবনেই পিতা রামরামের মৃত্যু হ'লে সংসার-ভার ন্যস্ত হয় রামপ্রসাদের উপর। রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ কোন এক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন। প্রবাদ এই, তিনি জমা-খরচের খাতায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন। গুণগ্রাহী উক্ত ধনী-ব্যক্তি রামপ্রসাদের ভক্তি এবং গীত-রচনাদর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা ক'রে দেন। অতঃপর রামপ্রসাদ স্বগৃহে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন ক'রে সাধন-ভজনে কালাতিপাত করতে থাকেন। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন মাঝে মাঝে জমিদারী দর্শনে কুমারহট্টে আসতেন। তিনি রামপ্রসাদের গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাতে স্বীকৃত হন নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান ক'রে সম্মানিত করেন। রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে সমাধি লাভ

করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। রামপ্রসাদ অসংখ্য শাক্তপদ রচনা করা ছাড়াও 'কালীকীর্তন' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা ক'রেছিলেন।

রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তনে'র সামান্য অংশমাত্রই পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। কারণ প্রাপ্ত অংশে শুধু পার্বতী উমার কাহিনীই শুধু আংশিক বর্তমান। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' খুব উল্লেখযোগ্য রচনা ব'লে বিবেচিত হয় না। এই কাব্যটি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র পর রচিত হ'য়েছিল। এতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বর্তমান, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মনোহারিত্ব এতে নেই। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, "বিদ্যাসুন্দরের মত বিপুলায়তন ও বিষয়ধর্মী কাব্যরচনা প্রসাদী প্রতিভার স্বধর্ম নহে ;...বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রসাদের সহজ প্রতিভার পরিচয় নহে। এজন্য সাহিত্য হিসাবে ইহার স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নহে।"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কৃতিত্ব একান্তভাবেই নির্ভরশীল তাঁর শাক্তপদাবলীর উপর। কিন্তু শাক্তপদাবলীতেও রামপ্রসাদ সেনের অন্ততঃ একজন 'রামপ্রসাদ' নামধারী প্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছেন—তিনি 'দ্বিজ রামপ্রসাদ'। এই উভয় রামপ্রসাদের পদ এমনভাবে মিলে মিশে আছে যে তাদের পৃথক্ করা প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার চিনিশপুর কালীবাড়ির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অপর এক রামপ্রসাদ—ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ-সন্তান। অনুমান হয়, 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা যুক্ত যাবতীয় পদই তাঁর রচনা, এই ভণিতার বাইরেও তাঁর পদ থাকা অসম্ভব নয়। চিনিশপুরের রামপ্রসাদও ছিলেন কালীসাধক। ইনিও সম্ভবতঃ বৈদ্য রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এঁর কন্যার নাম ছিল জগদীশ্বরী এবং ইনিই রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধতে সহায়তা ক'রেছিলেন। গবেষক ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের সাহায্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ এবং দ্বিজ রামপ্রসাদের পদগুলিকে কতকাংশে পৃথক্ করবার পদ্ধতির কথাও বলেছেন; আবার কেহ কেহ 'কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী' রচিত কিছু শাক্তপদের কথাও উল্লেখ করেন। 'ডিক্রি ডিস্মিস্' প্রভৃতি শব্দযুক্ত পদগুলি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ-রচিত বলেই তাঁরা মনে ক'রে থাকেন।

রামপ্রসাদ উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত—উভয় ধারার স্রষ্টা এবং উভয় ধারাতেই তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শুধু সঙ্গীত রচনা ক'রেই ক্ষান্ত হননি, উক্ত সঙ্গীতে একপ্রকার বিশেষ সুর আরোপ ক'রে সঙ্গীতগুলিকে আরও তাৎপর্যময় ক'রে তুলেছেন—এই বিশেষ সুরটি 'প্রসাদী সুর' নামেই সাধারণতঃ পরিচিত। এই বিশেষ সুরটি ছাড়া যেন শ্যামাসঙ্গীতের পূর্ণ আমেজ আসে না বলেই অপর সকল কবির শাক্তপদগুলিও প্রসাদী সুরেই গীত হ'য়ে থাকে। এই প্রসাদী সুর ও সঙ্গীতের এমনই একটা মোহনীয় প্রভাব রয়েছে, যার ফলে তান্ত্রিক সাধনায় অদীক্ষিতরাও অন্ততঃ উমা-সঙ্গীতের মাতা ও সন্তানের সহজ সম্বন্ধটির রসগ্রহণে অপারগ হয় না। রামপ্রসাদ-রচিত উমাসঙ্গীতের এই বিশিষ্টতা-বিষয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন: "রামপ্রসাদ

আবার তাঁহার কালীস্তুতির সহিত দুর্গার বাল্য ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়া-বিষয়ক গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর দুর্বোধ্য, ভয়-দেখানো আচরণের সহিত উমার বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত, স্নেহের দুলালী কন্যামূর্তি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমলরূপ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গেল—শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের পরিচিত স্নেহ আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয়তা মমতা-পরাবারে ডুবিয়া গেল।"

রামপ্রসাদের উমাসঙ্গীতগুলির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। বাঙালীর গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনও পদগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। মাতৃহৃদয়ের যে সকরুণ বেদনা সাধারণতঃ কোথাও প্রকাশের ভাষা পায় না, তাও এখানে উপেক্ষিত হয়নি। বরং মাতৃত্বের বেদনা ও বাৎসল্য মহিমাই উমাসঙ্গীতের তথা আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিকে পরম মাধুর্যে মণ্ডিত ক'রে আস্বাদ্য ক'রে তুলেছে। উমাসঙ্গীতের এই সামাজিক এবং সাহিত্যমূল্য সাধারণ পাঠকের নিকট গ্রহণীয় হ'লেও ভক্ত পাঠক এর আধ্যাত্মিক দিকটাকেও উপেক্ষা করতে পারেন না। এই উমাসঙ্গীতের যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ ক'রে ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : "বিশ্বজননীকে কন্যারূপে কল্পনা ও আরাধনা ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম আশ্রয় এবং এই সাধনাকে আশ্রয় করিয়াই মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য অপূর্ব আধ্যাত্মরূপ লাভ করিয়াছেন।...অধ্যাত্মসাধনার গূঢ় রসকে দৈনন্দিন জীবনে এই ধরনের রূপান্তর বিরল। রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ইহাদের সহজ, সরল, অকপট প্রাণবন্ত ভাষা, এবং এই ভাষারূপের সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।...এই জাতীয় গানের ভাষার সকরুণ ইঙ্গিত, ইহার অনাবিল আবেগ এবং ইহাদের একান্ত ঘরোয়া সুরের মধ্যে করুণ মাধুর্যের ব্যাপ্তি বাঙালীর ভাবমুগ্ধ চিত্তকে এক মুহূর্তে জীবনের গভীরতার মধ্যে টানিয়া লয়।"

উমাসঙ্গীতে রামপ্রসাদ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, শ্যামাসঙ্গীতে তা' আরো যেন বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। উমাসঙ্গীতে বিষয়ই শুধু বিশিষ্টতা লাভ করেছিল, শ্যামাসঙ্গীতে তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে, ভাব, ভাষা, ছন্দ-অলঙ্কারাদির ঐশ্বর্য। শ্যামাসঙ্গীতে স্বভাবতঃই রয়েছে যে নিগূঢ় আধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত, তাকে জনজীবনের সঙ্গে যোগযুক্ত করবার মতো অসাধ্য সাধন ক'রেছেন রামপ্রসাদ। বাঙলার পল্লীকুটির ও পল্লীজীবন থেকে উপমাদি অলঙ্কার সংগ্রহ ক'র সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য সংযুক্ত করেছেন, তাতে শুধু অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিতটিই সুব্যক্ত হয়নি, সমসাময়িক বাঙলার সামাজিক জীবনেরও একটা বাস্তব ও বিশ্বাস্য চিত্রও তাতে ফুটে উঠেছে। বাঙলাদেশের জনমজুর, কলু, কামার, চাষী বা মাঝির জীবনও রামপ্রসাদের শাক্তপদে একটা বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের কয়েকটি পদের উল্লেখ অসমীচীন হ'বে না : 'মা আমায় ঘুরাবে কত', 'খুলে দাও মা চোখের ঠুলি', 'একে তোর জীর্ণ

তরী', 'তু'খান তরী নিমক ভারী' প্রভৃতি পদের মধ্যে রামপ্রসাদের মনোজীবনের চিত্রটি স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে সাধনতত্ত্বও অব্যক্ত নয়। বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদির প্রসঙ্গ কিংবা নানাবিধ তত্ত্বকথাও এই সমস্ত পদে বর্তমান, কিন্তু রামপ্রসাদ শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তুর জটিলতা এবং তুর্বোধ্যতাকে পরিহার ক'রে তাঁর শাস্ত্রবোধকে জীবনবোধের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে নিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবন ও অধ্যাত্মসাধনাকে এমনভাবে এক ক'রে নেবার মধ্যেই কবির শাক্তসঙ্গীতের চরম সাহিত্যিক সার্থকতা সম্পাদিত হ'য়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় ছন্দ রচনায় রামপ্রসাদ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বলতে গেলে, রামপ্রসাদই সর্ব প্রথম লৌকিক ছড়ার ছন্দকে সার্থকভাবে বাঙলায় ব্যবহার ক'রে পথপ্রদর্শকের মর্যাদা লাভ করেছেন।

(খ) কমলাকান্ত :

বৈষ্ণব পদকর্তাদের সংখ্যা প্রায় অগণিত এবং তাঁদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ক'বির সংখ্যাও কম নয়। সেই তুলনায় শাক্তপদকর্তার সংখ্যা অনেক কম, উল্লেখযোগ্য কবি তো মুষ্টিমেয় মাত্র। তা-ও এঁদের অনেকেই তু'চারটি ক'রে পদ রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ ছাড়া আর একজন মাত্র কবিরই নাম উল্লেখ করা যায়, পদের সংখ্যা এবং উৎকর্ষে রামপ্রসাদের সঙ্গেই যাঁর নাম উচ্চারিত হ'য়ে থাকে—ইনি সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কমলাকান্ত বাঙলা ভাষায় 'সাধক-রঞ্জন' নামক তন্ত্রসাধনার যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে আত্মপরিচয়-সূত্রে নিজের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেষণ ক'রে গেছেন। কমলাকান্তের পৈতৃক বাসভূমি ছিল অম্বিকা কালনা। তিনি সম্ভবতঃ ১৭৭২ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য এবং পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে বর্ধমান-রাজ তেজচন্দ্র বর্ধমান শহরের কোটালহাট অঞ্চলে তাঁর আবাসস্থল নির্মাণ করিয়ে দেন। সম্ভবতঃ ১৮০৯ খ্রীঃ থেকে কবি সেই গৃহে বসবাস করেন এবং এখানেই তাঁর সাধনপীঠ স্থাপন ক'রে সাধন-ভজন করতেন। আর ১৮২১ খ্রীঃ সাধক কবি কমলাকান্ত দেহান্তরিত হন। বর্ধমান রাজবংশের কেহ কেহ কমলাকান্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে জানা যায়।

সাধক কমলাকান্তের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি আছে। জগজ্জননী কালী বাগ্দীকন্যারূপে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন; তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ দস্যুদল তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল প্রভৃতি কাহিনী সত্য না হলেও সমসাময়িক মানুষের মনে যে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কমলাকান্ত ন্যূনাধিক তিনশত পদ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত—উভয় জাতীয় পদই রয়েছে। তবে উমাসঙ্গীত তথা আগমনী-বিজয়ার গানে কমলাকান্ত যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা' অতুলনীয় বিবেচিত হ'য়ে

থাকে। এমন কি উমাসঙ্গীতের স্রষ্টা স্বয়ং রামপ্রসাদের পদগুলিও কাব্যাংশে কমলাকান্তের পদের তুলনায় হীনপ্রভ বলে মনে হয়। উমার বাল্যলীলা, কন্যা উমার জন্য মা মেনকার অন্তর-বেদনা, কন্যাকে পিতৃগৃহে না আনার জন্য স্বামী হিমালয়ের প্রতি অনুযোগ-অভিযোগ, উমার প্রতি আদর-যত্ন এবং তার ফিরে যাবার ব্যাপারে মেনকার ঘোরতর আপত্তি প্রভৃতি বর্ণনায় কমলাকান্ত এমন গার্হস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যাকে বাঙালী-জীবনের শাশ্বত পরিচয় রূপেই গ্রহণ করা চলে। আবার শ্যামাসঙ্গীত-রচনাতেও কমলাকান্তের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। আরাধ্যাদেবীর স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশে তাঁর কয়েকটি সত্যই অপূর্বতা লাভ করেছে। 'সদানন্দময়ী কালী', 'তাই শ্যামারূপ ভালবাসি', 'শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে না', মজিল মনভ্রমরা' প্রভৃতি গানের ভাষা এবং বিন্যাস পদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ়বদ্ধ। কল্পনা, ভক্তিভাব প্রভৃতির সঙ্গে উৎকৃষ্ট রচনারীতির মিশ্রণে কমলাকান্তের পদগুলি রসোত্তীর্ণ হ'য়ে কালজয়ী হ'বার সুযোগ পেয়েছে।

একাদশ অধ্যায় | যুগসন্ধিকাল

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়াতেই গোটা ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়। বাদশা ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু (১৭০৭ খ্রীঃ) বাঙলার রাজনৈতিক পরিবেশকেও ঘোরালো করে তোলে। ১৭১৭ খ্রীঃ মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙলার সুবেদারি লাভ ক'রে দেশে কিছুটা শাসন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মুর্শিদকুলি খাঁর কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় ১৭২৭ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দিন বাঙলায় সিংহাসনের অধিকারী হন। তিনি শেষজীবনে বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেন। ১৬০৯ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার উত্তরাধিকারী হন। উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠায় আমীর-ওমরাহ, জমিদার দেশি ও বিদেশি বণিক সকলেই মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করে। ১৭৪০ খ্রীঃ প্রধান কর্মচারী আলিবর্দি খাঁ বিশ্বাসঘাসকতা ক'রে সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে বাঙলার মসনদ অধিকার করেন। আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকালে ১৭৪২ খ্রীঃ থেকে ১৭৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত মারাঠা বর্গীদের অত্যাচারে সারা বাঙলা জুড়ে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর তার দৌহিত্র নবীন যুবক সিরাজদ্দৌলা বাঙলার সিংহাসন অধিকার করলেও নবাব আলিবর্দির প্রধান কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকায় এবং ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতায় ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত এবং নিহত হন। বস্তুতঃ এইসঙ্গেই বাঙলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক এক ইংরেজ বণিক-কোম্পানীর অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত কেউ কেউ নামে মাত্র নবাবী করলেও বস্তুতঃ দেশ শাসিত হ'তে থাকে ঐ বণিকদের দ্বারাই। গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়েই বিদেশি বণিকদের লোভ-লোলুপতার চূড়ান্ত আকার ধারণ ক'রে সমগ্র বাঙলাদেশে অত্যাচার ও শোষণের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক ইংরেজ বণিক কোম্পানীই শুধু নয়, ফরাসী, পর্তুগীজ, দিনেমার এবং ওলন্দাজ বণিকরাও তখন আখের গোছাবার তালে ছিল।

অষ্টাদশ শতকের এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের মধ্যেও সারা দেশে একটি মাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র সাহিত্যের আকাশে দীপ্তিমান্ হ'য়ে উঠেছিল—এই নক্ষত্রটিই মধ্যযুগের শেষ এবং সক্ষম প্রতিনিধি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। ১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বস্তুতঃ শতাব্দীকাল বাঙলা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিভার দর্শন পাওয়া যায় না। পলাশীর যুদ্ধ এবং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকালের দিক থেকে যে যুক্ত, তাকে আকস্মিক ঘটনামাত্র বলা চলে না—এটি ইতিহাসেরই ইঙ্গিত। এ থেকেই শুরু হ'লো যুগান্তর কাল বা ক্রান্তিকাল। ভারতচন্দ্র ছিলেন যুগসন্ধিক্ষণের কবি—তাঁর মধ্যে প্রাচীন ও নবীন যুগের বিভিন্ন লক্ষণের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল।

বাঙলার বুকে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর শাসন চলছিল শতাব্দীকাল—১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশী-যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহিবিদ্রোহ পর্যন্ত। এই বণিক কোম্পানীর শাসনকালই বাস্তবে বাঙলার যুগান্তর কাল—ভাঙাগড়ার কাল। সিপাহিবিদ্রোহের পরই বাঙলার শাসনভার ন্যস্ত হয় সমসাময়িক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থাপক ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের হাতে। ঘটনাক্রমে ঠিক ঐ সময়ই বাঙলা দেশে ঘটে বাঙলা-সাহিত্য-সংস্কৃতির রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। কয়েকটি তারিখ দেখা যাক—১৮৫৮ খ্রীঃ যুগান্তর কালের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু এবং একালের প্রথম কবি রঙ্গলালের সাহিত্য-জগতে আবির্ভাব; ১৮৬০ খ্রীঃ মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা; ১৮৬১ খ্রীঃ প্রথম আধুনিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

সমগ্র যুগান্তরকাল অর্থাৎ পূর্বোক্ত শতাব্দীকাল জুড়ে বাঙলা সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছিল কবি, যাত্রা, তরজা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নরুচির সাহিত্যকীর্তি।

অষ্টাদশ শতকের শেষ বছরটি অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীঃ নানা কারণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অতিশয় উল্লেখযোগ্য তারিখ। ঐ বছরই শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশন ও মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বাঙলা গদ্যসাহিত্য রচনার ইতিহাসে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মহৎ দানকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং গদ্য রচনা-প্রচেষ্টা—দুয়ের সম্মেলনে সংবাদপত্রের সহায়তায় যুগান্তরকালে এই ভাবেই ভবিষ্যৎ সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষের পথ তৈরি হ'য়ে চলছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজে রূপান্তরিত হ'লে দেশীয় সন্তান-দেরও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলবার চেষ্টা করা হয়। ডিরোজিও, রিচার্ড-সন-আদি মহৎ শিক্ষকদের কাছ থেকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ ক'রে Young Bengal বা নব্য বঙ্গীয় যুব সম্প্রদায় দেশে রেনেসাঁস বা নব জাগরণের পথ তৈরী ক'রে দেন। এরই প্রত্যক্ষ ফল—বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সৃষ্টিকাল থেকেই এক হিসেবে আধুনিক যুগের আরম্ভ, কারণ এ যুগের সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা—গদ্যসাহিত্যের শুরু এখান থেকেই। কিন্তু মানসিকতার বিচারে এই পর্বে যে আধুনিকতার উদ্ভব ঘটেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এ কালের বিভিন্ন কবিওয়ালা তর্জাওয়ালা প্রভৃতির রচনায়, এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়ও। বস্তুতঃ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ও রঙ্গলাল-মধুসূদনের আবির্ভাবকাল থেকেই আধুনিক যুগ সূচিত হ'য়ে থাকে।

[চব্বিশ] ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল :

প্রশ্ন ৫৭। বাঙলা মঙ্গলকাব্য ধারার শেষতম কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সর্বশেষ এবং সক্ষম প্রতিনিধি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ ১৭০৭ খ্রীঃ অথবা ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে পাঁড়ুয়া বা রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্র রায় ছিলেন ভূরসুটের রাজবংশের সন্তান। বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্রের অত্যাচারে ভারতচন্দ্র জন্মস্থান পরিত্যাগ ক'রে মাতুলালয়ে চলে যান। তিনি টোলে সংস্কৃত এবং দেবানন্দপুর গ্রামে ফার্সী ভাষায় পাঠ গ্রহণ করেন। শেষোক্ত স্থানেই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'। এর পর তিনি ঘরে ফিরে আসেন এবং রাজরোষে পড়ে কারাগারে নীত হন। ঘুষ দিয়ে ভারতচন্দ্র কারাগার থেকে পলায়ন ক'রে সন্ন্যাসী দলের সঙ্গে নানাস্থান পরিভ্রমণ ক'রে এক সময় ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট উপস্থিত হ'লে দেওয়ান তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত ক'রে 'রায় গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। গুণগ্রাহী রাজা তাঁকে মূলাজোড়ে প্রচুর ভূসম্পত্তিও দান করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছাতেই ভারতচন্দ্র তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্র বহুমূত্র-রোগে দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্র প্রথম জীবনেই দু'খানি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়—প্রথমখানি আশ্রয়দাতা হীরারাম রায়ের নির্দেশে এবং দ্বিতীয়খানি রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশে বাংলা ১১৪৪ সালে রচিত হয়। বিভিন্ন সংস্কৃত ও মৈথিল গ্রন্থের সার অনুবাদরূপে ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ ১৭৪৯ খ্রীঃ-র পূর্বেই 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা 'অন্নদামঙ্গল'। গ্রন্থটি ১৭৫২ খ্রী; রচিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এর কিছু পূর্বেই ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় 'নাগাষ্টক' রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'গঙ্গাষ্টক' বিবিধ কবিতা এবং 'চণ্ডীনাটক' নামক একটি গ্রন্থের ভূমিকা অংশ রচনা করেন—এই অংশটিতে তিনি সচ্ছন্দে সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি ভাষা ব্যবহার করেন।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এবং প্রাগাধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের রচনাকাল বিষয়ে কবি লিখেছেন:

> 'বেদলয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
> সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, কাব্যটির রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খ্রীঃ। কবির এ কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত: প্রথম খণ্ডে 'অন্নদামঙ্গল' দ্বিতীয় খণ্ডে 'কালিকা মঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনী স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের অন্নদামঙ্গল প্রধানতঃ পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয়খণ্ডের বিদ্যাসুন্দর সম্ভবতঃ কোন লৌকিক কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে অনেক পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। তবে ভারতচন্দ্রের কাব্য কোন গ্রন্থের অনুবাদ নয়—সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা। তৃতীয় খণ্ডের ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত।

কবি কাব্যটিকে মঙ্গলকাব্যের রূপকল্পেই গঠন করেছেন, কাজেই গ্রন্থারম্ভেই বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা এবং গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। অপর যে কোন মঙ্গল-কাব্যের মতোই এই কাব্যটি রচনার পিছনেও দেবী অন্নদা-প্রদত্ত স্বপ্নাদেশ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ।

গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং এর প্রথম খণ্ডই প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত 'অন্নদা মঙ্গল'। অপরাপর মঙ্গল কাব্যের মতোই এই খণ্ডের প্রথমেই দেবীর পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—এতে দক্ষখণ্ডে সতীর দেহত্যাগ, উমা-পার্বতীরূপে পুনর্বার জন্মগ্রহণ, শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, শিবের শ্বশুর গৃহে বাস, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতি অংশ মোটামুটি ভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তীর অনুসরণে রচিত হ'য়েছে।—এই অংশে শিবের কাশী প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাসকাহিনী যুক্ত হয়েছে। এরপর শুরু হ'লো নরখণ্ড। প্রথমে হরিহোড়ের কাহিনী—দেবীর কৃপায় হরিহর লক্ষপতি হলেও তার গৃহে পারিবারিক কলহের কারণে দেবী আন্দুলিয়া গ্রামের রাম সমাদ্দারের গৃহে উপনীত হ'লেন। রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুমদার দেবীর কৃপা লাভ করেন, ইনিই মূল গ্রন্থের প্রধান চরিত্র এবং এরই বংশধর কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর'। মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যশোরপতি প্রত্যাপাদিত্যকে দমন করতে এসে সেনাপতি মানসিংহ এক আকস্মিক বিপর্যয়ের মুখে কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হন। ভবানন্দই প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আবার মানসিংহ ও ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী। ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করে রাজকীয় খেতাবের জন্য ভবানন্দকে নিয়ে দিল্লী যান। তথায় অবশ্য দেবীর মাহাত্ম্যও কিছু কিছু প্রদর্শিত হয়। দিল্লী দরবার থেকে 'রাজা' উপাধি নিয়ে ভবানন্দ দেশে ফিরে আসেন। কবি ভারতচন্দ্রের এই গ্রন্থ-রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে দেব-অংশ বলে বর্ণনা এবং তাঁর মাহাত্ম্য-স্থাপন—এই মূল উদ্দেশ্যটুকু মাথায় রেখেই কবি চারদিক থেকে এত কাহিনী টেনে এনে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রকৃত 'অন্নদা-মঙ্গল' কাহিনীতেই ভারতচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশিত হ'য়েছে। গ্রন্থোক্ত হরিহোড় এবং ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী কবির স্ব-উদ্ভাবিত, অবশিষ্ট অংশ কবিকঙ্কণ, ঘনরাম এবং স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে গৃহীত হ'য়েছে। এই খণ্ডে কবি ভাষা, ছন্দ অলঙ্কারাদির সার্থক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটিকে রাজসভার যোগ্য ক'রেই তুলেছিলেন। মঙ্গলকাব্যে দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনে ও কাহিনী বর্ণনায় কবির যে আন্তরিকতা প্রত্যাশিত, আলোচ্য গ্রন্থে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই খণ্ডে কলমের দু' একটি আঁচড়ে কবি ঈশ্বরী পাটনীর যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন, তেমন সজীব চিত্র প্রাচীন সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। বস্তুত সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে

কবিকৃতির নিদর্শনরূপে অন্নদা মঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একমাত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডীই উপমিত হবার যোগ্যতা রাখে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর'-কে কবি অসাধারণ কুশলতায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে যোগযুক্ত করেছেন। এই খণ্ডের অধিষ্ঠাতা দেবী অন্নদা নন, 'কালিকা'। তাই কেউ কেউ একে 'কালিকামঙ্গল' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। বাঙলা-ভাষায় যত 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী রচিত হ'য়েছে, তাদের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। বিদ্যা এবং সুন্দরের অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবিকে অনেক সময়ই শ্লীলতা এবং সুরুচির গণ্ডী অতিক্রম করতে হয়েছে—ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেকেই এই অভিযোগ উত্থাপন করলেও প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন; "ভারতচন্দ্রের" অশ্লীলতার ভিতর 'আর্ট' আছে, অপরের আছে শুধু 'ন্যাচার"। তবে দোষে-গুণে এই খণ্ডটিই যে বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম নাগরিক সাহিত্য এ সত্য অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ভিত্তি ইতিহাস হ'লেও এটিতেই কবির দুর্বলতা সর্বাধিক প্রকট। মুঘল-সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ও বাঙলার বারো ভুইঞার অন্যতম যশোর-পতি প্রতাপাদিত্য এবং তাঁদের সংগ্রাম ঐতিহাসিক বিষয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র এর ইতিহাসের উপর গুরুত্ব আরোপ না ক'রে প্রধানতঃ লোকশ্রুতির উপরই নির্ভর করেছেন। এর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি কোন ঐক্যসূত্রে বিধৃত না হওয়াতে কাহিনীটি জমাট বাঁধতে পারেনি। চরিত্র-সৃষ্টিতেও কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারায় তৃতীয় খণ্ডটি সাধারণতঃ উপেক্ষিত হ'য়েই থাকে। পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে ভারতচন্দ্র লোকশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করেছিলেন, ফলে কিন্তু ইতিহাসেরও বিকৃতি ঘটেছে। মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যে সংঘর্ষকে ভিত্তি ক'রে তিনি এই কাব্য রচনা করলেন, একালের ঐতিহাসিকগণ ঐ ভিত্তিকেই প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংস ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে অনুরূপ কোন যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি। অতএব কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে ইতিহাসের মর্যাদাও রক্ষিত হয়নি।

বিচ্ছিন্নভাবে ভারতচন্দ্রের কাব্যের অংশত্রয় বিচার-বিবেচনা করা হ'লেও তাঁর কাব্যবিচারের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরই আলোচনায় আসে। সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে বিবেচনা করা হয়। ভারতচন্দ্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ছিলেন ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বশক্তি দুইই ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন একটা অবক্ষয়ের পরিবেশে বর্তমান ছিলেন যে তিনি প্রধানতঃ কাব্যের অঙ্গ-নির্মাণের সমস্ত পটুত্ব ও কৌশল প্রদর্শনে বাধ্য হয়েছিলেন। যদি তিনি এই কাব্যে প্রাণ সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করতে পারতেন।

কবির মাতৃভাষা বাঙলা; তিনি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত এবং মুন্সীর কাছে পারসীভাষার পাঠ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘকাল উত্তর ভারত পরিভ্রমণ সূত্রে তিনি হিন্দী এবং মৈথিলি ভাষাতেও যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণের অভাব নেই। বস্তুতঃ বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্যের বিচারে সেকালে ভারতচন্দ্রের জুড়ি ছিল না। এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্ব শক্তির সংযোগে ভারতচন্দ্র যে কাব্য রচনা করেন, তার উৎকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য। তিনি সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও বাঙলা ভাষার মিশ্রণে যে পদ রচনা করেন, তাতে শ্রুতিমাধুর্য কিম্বা অর্থবোধের কোন হানি ঘটেনি।—

'শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়্‌দ্ কুবর,
কাতর দেখে আদর কর, কাহে মর রো রোয়কে।
যক্তুং বেদং চন্দ্রমা, ছুঁলালা চে রেমা,
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, মেট্টিমে কাহে শোয়কে।"

মানসিংহের সঙ্গে বাদশার কথোপকথনে যে ফারসী ভাষার মিশ্রণ প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তিনি বলেন :—

'না রবে প্রসাদগুণ, না হ'বে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মেশাল ॥"

কাব্যপাঠের চরম আনন্দ যে রসের আবেদনে, এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সচেতনতা সেকালের পক্ষে অবশ্যই এক বিস্ময়ের ব্যাপার। তিনি সেই শেষ কথাটি উচ্চারণ করেছেন :—

'যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য রস লয়ে।'

কবি অকৃপণ হস্তেই অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রস পরিবেষণ করেছেন, হয়তো সে রস কোথাও একটু কড়াপাক, কোথাও একটু গেঁজে গেছে। কাব্যে যথার্থ রসের সৃষ্টিতে তাতে যে গীতিপ্রাণতার সৃষ্টি হয়, তার দৃষ্টান্তও ভারতচন্দ্রের কাব্যে দুর্লভ নয়। তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ের গোড়ায় তিনি কিছু কিছু 'বিষ্ণু পদ' সৃষ্টি করেছেন, সেগুলিকে বৈষ্ণবপদের সমকক্ষ বলেই জ্ঞান করা হয়। অনেকেই এগুলিতে আধুনিক গীতিকবিতার পূর্বাভাষ লক্ষ্য ক'রে থাকেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "যে গীতি-সুর ও গীতিরস ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয় লাভ করিল।"

শব্দশিল্পে ভারতচন্দ্র যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা সেকালে দুর্লভ। তিনি তাঁর কাব্যকে ছন্দে অলঙ্কারে রাজসভার উপযোগী করেই সাজিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে যথাযথ মন্তব্য করেছেন : "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদা-মঙ্গল গান রাজ-কণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে ত্রিবিধ ছন্দ-ব্যবহারের কৃতিত্ব ভারতচন্দ্র-ব্যতীত অপর কোন কবিই দেখাতে পারেন নি। প্রধানতঃ তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী এবং চৌপদী রূপকল্পই ব্যবহার করেছেন। পয়ারে মালঝাঁপ-আদি ব্যবহারে, ত্রিপদী

ও চৌপদীতে পর্বান্তিক মিল ব্যবহারে তিনি একালের কবিদের চেয়েও অধিকতর পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সর্বত্র মিল-ব্যবহারে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুল্য দৃষ্টান্ত সর্বকালেই দুর্লভ। তিনি ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক-আদি সংস্কৃত ছন্দকেও সার্থকভাবে বাঙলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন—এ প্রচেষ্টা সেকালের অপর কোন কবির কাব্যে দেখা যায় না। আবার ভাবের অনুসারী ক'রে ছন্দ-ব্যবহার করায় তাঁর রচনা অসাধারণ কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে। তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দেও একটি পদ রচনা ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ জাতীয় ছন্দের মূল প্রকৃতিটি তিনি যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের মধ্যে ব্রজবুলির কবিদের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতচন্দ্রের মত এমন ছন্দের সৌষ্ঠব, বৈচিত্র্য ও পারিপাট্য দ্বিতীয় কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই।"

অলঙ্কার-ব্যবহারেও ভারতচন্দ্র অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অলঙ্কার নির্বাচনে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন শব্দালঙ্কারে—কারণ কাব্যের বহিরঙ্গের প্রসাধন-সাধনেই তিনি অধিকতর যত্নপর ছিলেন। তবে উপমা, রূপক, ব্যতিরেক, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগেও তাঁর কুশলতা অবশ্য স্বীকার্য। ভারতচন্দ্রের ছন্দ-অলঙ্কার-ব্যবহারের প্রকৃতি বিচার ক'রে ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, "ভারতচন্দ্রের কাব্য ইহার ভাষা ও ছন্দ-অলঙ্কারাদির এই বিশেষ প্রকৃতির মূলকথাই সমসাময়িক নাগর ও দরবারী জীবনের রুচি ও রূপ। ভারতচন্দ্র প্রধানতঃ এই জীবনেরই প্রতিনিধি। এ জীবনের সকল আর্টই অলঙ্কারধর্মী (decorative), সৃষ্টিমূলক (বা creative) আর্টের সঙ্গে সে জীবনের পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে। কাজেই কাব্যের আর্ট ও অনুরূপ। সে জীবনের মান এতই স্থূল যে সৃষ্টিমূলক বা প্রতীকধর্মী আর্টের উদ্ভব তখন সম্ভবই ছিল না। যে সূক্ষ্ম জীবনবোধ বা মননশীলতা, ধ্যান ও কল্পনার ঐশ্বর্যে সেই উৎকৃষ্ট আর্টের জন্ম, অষ্টাদশ শতকের জীবনে তাহার উদ্ভবের সম্ভাবনা কোথায়? এইজন্যই ভারতচন্দ্রের কাব্যের আর্ট কবির শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার—আগা-গোড়াই একরূপ অলঙ্কার ধর্মী।"

ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে অপর গুণ বিশেষভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তা থেকে তাঁর হাস্য-রসিক, ব্যঙ্গনিপুণ একজন উঁচুদরের স্যাটায়ারিস্ট রূপটির সঙ্গেই আমরা পরিচিত হ'য়ে থাকি। সামাজিক কু-প্রথা এবং অভিজাত জীবনের নানা প্রকার অসঙ্গতির প্রতি বক্রোক্তি নিক্ষেপে তিনি একজন নিপুণ শিল্পী ছিলেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "তাঁহার ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শন রূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।" ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কথা বলেছেন, "ভারতচন্দ্র বিশেষ করিয়া এক

অভিনব বাস্তববোধের এক নূতন সমাজ-সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ, মোহমুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির, জীবন-পর্যালোচনার এক স্বতন্ত্র স্বকীয়তার জন্য আধুনিকতাধর্মী।"

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অসম্পূর্ণতার বিষয়ে লিখেছেন ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, "যেহেতু ভারতচন্দ্রের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে সমসাময়িক বৃহত্তর সমাজ-মানসের তেমন সহজ যোগ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এবং দরবারী প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত থাকায় কবি সেই প্রশস্ত জীবন ও সমাজের সঙ্গে আপন জীবনকে এক ও অভিন্ন করিয়া ভাবিতে পারেন নাই, সেইজন্য অন্নদামঙ্গলের দেব বা মানবচরিত্র এদেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের দৃষ্টিতে কেমন বিসদৃশ মনে হয় এবং এই সকল চরিত্রের সহিত সংযুক্ত বৈষয়িক সামাজিক বা তজ্জাতীয় নানা কাহিনীও অনেক ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক। ইহাদের শিল্পের দিক ফুটিলেও প্রাণের দিক ফুটিতে পারে নাই।"

[পঁচিশ] মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্ব :

প্রশ্ন ৫৮। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ বিষয়ে আলোচনা কর।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কিছু কিছু যুগলক্ষণের উপর নির্ভর ক'রে সাহিত্যের যুগবিভাগ কল্পনা ক'রে থাকি। সেই হিসেবে আমরা খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে 'প্রাচীন যুগ' এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত কালকে 'মধ্যযুগ' নামে অভিহিত ক'রে থাকি। এরপর উনবিংশ শতক থেকে 'আধুনিক যুগে'র শুরু। প্রতি দু'টি যুগের অন্তর্বর্তী কালকে বলা হয় 'যুগসন্ধি কাল'। যুগসন্ধিকালে একদিকে দেখা যায় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, অপরদিকে নোতুন যুগের আগমনী সূচক লক্ষণ। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত মধ্যযুগে আমরা বহু বিচিত্র সাহিত্যধারার সঙ্গে পরিচিত হ'লেও তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ বর্তমান ছিল। ঐ যুগের উল্লেখযোগ্য শাখার মধ্যে রয়েছে—বিবিধ অনুবাদ-সাহিত্য, নানাবিধ মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবপদাবলী ও জীবনী সাহিত্য। সব শাখাতেই কিন্তু ধর্মীয় লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। অনুবাদ সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতপুরাণই প্রাধান্য পেয়েছে। সংস্কৃতে 'পুরাণেতিহাস' নামে অভিহিত এই শাখার অনুবাদের মধ্য দিয়ে সুপ্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল লেখকদের কাম্য। বিবিধ ধারার মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনার্য সমাজ থেকে আগত দেব-দেবীদের আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা এবং তাঁদের মাহাত্ম্যকীর্তনই ছিল লেখকদের উদ্দিষ্ট। কিছু পৌরাণিক দেবতাকে অবলম্বন ক'রেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে কোন কোন মঙ্গলকাব্য রচিত হ'য়েছিল। বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সাহিত্য একান্তভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই কাব্যধারার মধ্যে একটা সার্বজনীনতা এবং উদার মানবিকতাবোধের স্বাদ

পাওয়া যায়। জীবনীসাহিত্যও বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনী—মহাজনদের চরিত্রে অলৌকিকত্ব আরোপ ক'রে জনমানসে তাঁদের ধর্মীয় মাহাত্ম্য-স্থাপনের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার পরিচয় এতে সুস্পষ্ট। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই সকল ধারাই অব্যাহতগতিতে আপনাদের পথ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকেই প্রথম দিক পরিবর্তনের কিছুটা ইঙ্গিত—মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের গোড়াতে দিল্লীর বাদশা ঔরংজেবের মৃত্যুর পরই (১৭০৭ খ্রীঃ) দেশব্যাপী সামন্তরাজগণ আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হ'য়ে ওঠায় সর্বত্র শাসন-শৃঙ্খলায় লক্ষণীয় অবনতি সূচিত হয়। বাঙলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলার সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়, তার ফলে বিদেশি বণিক কোম্পানী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। আবার মারাঠা বর্গীর দলও এক দশক কাল দেশের সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠনে মত্ত থাকায় দেশের সুশাসন বিঘ্নিত হয়। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ক্ষমতার লোভে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রবৃত্ত হয়। ফলে ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার তৎকালীন তরুণ বয়সী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন। কার্যতঃ বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই সঙ্গে বাঙলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হ'লে শতাব্দীকাল দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত রইলো।

আমরা দেখেছি, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ কাল থেকে দেশের সর্বত্র অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। এই রাজনৈতিক অব্যবস্থা সমাজ-জীবনেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করায় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমরা তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। এর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু রামেশ্বরের 'শিবায়ন' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। এই দুই কবিই অসাধারণ প্রতিভাধর হওয়া-সত্ত্বেও সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হ'য়েছিলেন। তাই পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাব্যে সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্নও স্পষ্টতঃই ফুটে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে যে সুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ কাব্যে তার প্রতিফলন ঘটলোনা। এই দুইজন ব্যতীত সমগ্র অষ্টাদশ শতকে আর কোন উল্লেখযোগ্য কবির সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। তখন চলছিল শুধুই পুরাতনের চর্বিত-চর্বণ যা মানসিক অস্বাস্থ্যেরই সূচনা করে।

আগেই বলা হ'য়েছে যে প্রতিটি যুগ-সন্ধিকালেই একদিকে যেমন ঘটে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, তেমনি অপরদিকে নোতুন যুগের কিছু কিছু সূচনা-চিহ্নও একালে লক্ষিত হয়। ১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলার রাজশক্তির হস্তান্তর—এ থেকেই শুরু যুগসন্ধিকাল। শতাব্দীকাল ছিল এর স্থায়িত্ব। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহি-বিদ্রোহের পর কোম্পানী-কর্তৃক বাঙলার রাজশক্তি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে সমর্পণ, ১৮৫০ খ্রীঃ যুগসন্ধিকালের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ও পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত কবি রঙ্গলালের আবির্ভাব—এর ফলে যুগসন্ধিকালের সমাপ্তি ঘোষিত এবং আধুনিক যুগের আবির্ভাব সূচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের যে সকল নোতুন ধারা প্রবর্তিত হয়, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শাক্তপদাবলী, গাথাসাহিত্য বা পল্লীগীতিকা এবং বাউল-গান। বৈষ্ণবপদাবলীর আদর্শে রচিত হ'লেও শাক্তপদাবলীতে গার্হস্থ্য-জীবন এবং সামাজিক জীবনের পরিচয় এমন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে এগুলিকে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও এই সাহিত্য সর্বাংশে জীবনমুখী—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শাক্তপদাবলীর একটি ধারা—উমাসঙ্গীতে একান্তভাবেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বলতে গেলে, এতে দেব-মাহাত্ম্য কিছুই নেই, এ একেবারেই মানবিক সাহিত্য। শাক্তপদাবলীর অপর ধারা—শ্যামাসঙ্গীত। এতে সাধনতত্ত্ব-বিষয়ে আলোচনা থাকলেও এতে যে সমস্ত উপমারূপকাদি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আমাদের জটিল সামাজিক জীবনের চিত্রই ফুটে উঠেছে। শাক্তপদাবলীর দুই শ্রেষ্ঠ রূপকার রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে একদিকে ছিল ইতিহাস-চেতনার অভাব, অপর দিকে ছিল মানবধর্মী সাহিত্যের অভাব। সেই অভাব পূরণের কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে গাথা ও গীতিকা সাহিত্যে। সাঁওতাল হাঙ্গামা, কৃষক বিদ্রোহ, বর্গীর হাঙ্গামা, পীরফকিরের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, নীলকরের অত্যাচার, কোম্পানীর জুলুমবাজি প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনার উপর নির্ভর করে রচিত হয় অসংখ্য ছড়া ও গাঁথা—যাতে ইতিহাস-চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। এ ছাড়া 'রাজমালা' নামক কাব্যে ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী এবং 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীর হাঙ্গামার কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্ব-ময়মনসিংহ থেকে প্রাপ্ত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় যে সকল কাহিনী সঙ্কলিত হ'য়েছে, তাদের কয়েকটিতে রূপকথার আমেজ থাকলেও অধিকাংশ গীতিকাই বাস্তব জীবন-নির্ভর। এই গীতিকাগুলির বিষয়ে মনীষী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "...ময়মনসিংহ গীতিকা উপন্যাস-সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না।...পল্লীসাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত,...তবে সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিনও আরও অগ্রবর্তী হইত।"—আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন মানবমুখী ধারার ঐতিহ্য আমরা বজায় রাখতে পারিনি।

অষ্টাদশ শতকে বাউল গানের আবির্ভাব এক অভিনব ব্যাপার। এই বাউল গানে কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন না থাকায় হিন্দু মুসলমান সমভাবেই বাউল সাধনায় এবং বাউল-গান রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যে সকল উপমা-রূপক ও আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে বাউলগণ তাঁদের তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন, তাতে আধুনিক জীবনযাত্রার বহু উপকরণকেই সাদরে গ্রহণ করা হ'য়েছে। অষ্টাদশ শতকে প্রবর্তিত এই নোতুন ধারাটি সচ্ছন্দে একাল পর্যন্ত প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধটি প্রধানতঃ কবিওয়ালাদের যুগ। কবিগান ছাড়াও টপ্পা, পাঁচালী, তরজা, খেউর, আখড়াই প্রভৃতি নানাবিধ লোকসঙ্গীতই একালের বাঙালীর সাহিত্য পিপাসা মেটানোর ভার নিয়েছিল। সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতও যেমন ছিলেন, তেমনি বিষয়-বস্তুর দিক থেকেও তাঁরা সমভাবে প্রাচীন এবং নবীনকে গ্রহণ করেছিলেন। যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পা মিলিয়ে চলছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব বাঙলা দেশেও নোতুন জীবনের আবির্ভাব সূচনা করে। ১৮০০ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে প্রথমেই বাইবেলের গদ্য-অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই ইংরেজ সিভিলিয়ান্‌দের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই কেরী সাহেবের প্রবর্তনায় এবং কলেজের পণ্ডিত মুন্সীদের সহায়তায় বাঙলা গদ্য সাহিত্য রচনা শুরু হয় এবং রাতারাতি বাঙলা সাহিত্য একটা নোতুন যুগে ও জগতে উপনীত হ'লো।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পূর্ববর্তী আটশ' বছর বাঙলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবেই পদ্যাশ্রিত। তৎকালে বাঙলা গদ্যের যে কোন চিহ্নই ছিল না, তা' নয়,—তবে তাকে সাহিত্য বলা চলে না। সাধারণতঃ সেই গদ্য ছিল চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে এবং ক্বচিৎ বৈষ্ণব গ্রন্থের দুই একটি পংক্তিতে নিবদ্ধ। বাঙলা গদ্যে অবশ্য দুটি গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। একটি পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল-দ্য-আসাম্পশাঁও-কর্তৃক রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—রচনাকাল ১৭৩৪ খ্রীঃ—এটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে ১৭৩৪ খ্রীঃ রোমান হরপে মুদ্রিত হয়। অপরটি বাঙালী খ্রীষ্টান ভূষনার রাজপুত্র দোম্ আন্তনিও-কর্তৃক রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'—এটিও ১৭৪৩ খ্রীঃ সম্ভবতঃ রোমান্ হরপে মুদ্রিত হ'য়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া বাঙলা ব্যাকরণ বা কিছু কিছু আইনের গদ্য অনুবাদও রচিত হ'য়েছিল। কিন্তু সচেতন সাহিত্য প্রচেষ্টা শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপনের পর থেকেই। এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই পরে হিন্দু কলেজে রূপান্তরিত হ'লে সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলেও ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। তার ফলে, তাঁদের সম্মুখে এক বিশাল নোতুন জগতের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে একদিকে তাঁরা যেমন য়ুরোপীয়ান ক্লাসিক, রোম্যান্টিক ও আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পেলেন, তেমনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গেও পরিচিত হ'লেন। আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী সাহিত্যের উপকরণ রূপে আর দেবতা এবং ধর্মের প্রয়োজন বোধ করলেন না, মৃত্তিকাতলচারী মানবজীবনই হ'লো তাদের সাহিত্যের উপজীব্য। ধর্ম এবং দেবতাকে গ্রহণ করলেও তাঁরা আধুনিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাদের সংস্কার সাধন ক'রে নিলেন।

গদ্যভাষা তৈরির ফলে সাহিত্যে নোতুন নোতুন ধারার প্রবর্তন ঘটলো। প্রথমেই এলো সাময়িক পত্রিকা—তাতে সংবাদ ছাড়াও বিশেষভাবে স্থান পেলো জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা। ফলে গড়ে উঠ্‌লো প্রবন্ধ সাহিত্যের শাখা। সংস্কৃত নাটকের

অনুবাদ এবং মৌলিক নাটকও রচিত হ'তে আরম্ভ হ'লো; রচিত হলো বিভিন্ন উপন্যাস। মাইকেল আধুনিক রীতিতে সৃষ্টি করলেন মহাকাব্য, বিহারীলাল লিখলেন খাঁটি গীতিকবিতা। সাহিত্যের সর্বশেষ সন্তান ছোট গল্পও এলো রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "য়ুরোপের রেনেশাঁস, রিফর্মেশন, রেস্টোরেশন এবং আধুনিকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উনিশ শতকের বাঙালী-জীবনে ও বাংলাসাহিত্যে বিকশিত হতে আরম্ভ করল। একে আমরা সাধারণতঃ বাঙালী-জীবনের 'উনিশ শতকী রেনেশাঁস' বলি। ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'Such a Renaissance has not been seen any where else in the world's history'."

[ছাব্বিশ] কবিগান:

প্রশ্ন ৫৯। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বাংলার কবিয়ালদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটেছে, অথচ আধুনিক যুগের উদ্বোধন ঘটেনি, এমন একটা যুগসন্ধিকালে বাঙলার সাহিত্য প্রাঙ্গণকে মুখর করে রেখেছিল 'কবিগান'— যাঁরা এই গান গাইতেন ও রচনা করতেন, তাঁদের বলা হতো-'কবি' নয়-'কবিওয়ালা'। কবিওয়ালা শব্দটার সঙ্গে যে কিছুটা সম্ভ্রমহীনতা যুক্ত রয়েছে, তারও কারণ আছে। কবি-গানের উদ্ভব যুগটা ছিল সব দিক থেকে দেশ ও জাতির জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্ন। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের বিশ্বাসভাজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছে এবং কার্যতঃ দেশের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে এক বণিক্ কোম্পানীর উপর। সামাজিক ঐতিহ্য ও মর্যাদাবিহীন তাঁবেদাররাই সমাজজীবনে প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে। এই সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটে কবিওয়ালাদের। এদের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ এদের গোধূলিমুহূর্তে অকস্মাৎ-দৃষ্ট সপক্ষ পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষাসভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিকৃতরুচি অথচ অর্থবান এই তাঁবেদার গোষ্ঠীর তুষ্টিসাধনে তৎপর এই কবিওয়ালারা শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ অগ্রসর না হ'লেও এদের দুটি বিশেষ গুণ ছিল—এক) পদ্য রচনায় অশিক্ষিতপটুত্ব, (দুই) উপস্থিতবুদ্ধি।

সাধারণতঃ আসরে দুটি কবির দল উপস্থিত থাকে। গানে এবং ছড়ায় এরা প্রায় প্রশ্নোত্তরের আসর জমিয়ে রাখেন। দেবতার বন্দনা এবং পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়েই সাধারণতঃ আসর আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত অশ্লীলতার মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগানের একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। দু'দলে প্রথমে ঠাকুরদেবতার গান দিয়ে শুরু করতেন, ক্রমে রাত বাড়ত, চাঁদোয়ার তলে রেড়ীর তেলের প্রদীপ শিখা ম্লান হয়ে আসত, কবিওয়ালাদের সুর দুন থেকে চৌদুনে পৌঁছাত, ঠাকুরদেবতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তখন তাঁরা নিজ মূর্তি ধারণ করতেন, সরস্বতীপ্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ শক্তিকে চরম অশ্লীল ও অশিষ্টতায় ব্যবহার করতেন। শ্রোতাদের নেশা লেগে যেত, চূড়ান্ত অশ্লীল

জায়গায় এসে ঢোল-কাঁসি তারস্বরে চীৎকার করে উঠত, পৃষ্ঠপোষক ধনী-ভূস্বামী বাহবা দিয়ে জয়ী পক্ষকে প্রচুর খেলাত দিতেন। শাল-দোশালার তো কথাই নেই, দরিদ্র কবি-ওয়ালাদের ভাগ্যে বহু টাকাকড়িও জুটে যেত। প্রতিভায় এঁরা যে স্তরেরই হোক্ না কেন, উপস্থিত বুদ্ধি, পুরাণের জ্ঞান, ভাষা, ছন্দ ও সঙ্গীতে অসাধারণ দখলের জন্য এঁরা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণের যোগ্য।

১. **কবিগান::** কবিগানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে একে জনসাহিত্য না বলে উপায় নেই। উঠ্‌তি বড়লোক বা ভূস্বামীরা এর পৃষ্ঠপোষক হলেও আপামর জন-সাধারণই ছিল এর শ্রোতা এবং রসভোক্তা। এই জনসাহিত্য কবিগানের সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে আরো কিছু এ জাতীয় গান। অনেকে মনে করেন 'মালসী' বা 'উমাসঙ্গীত' অর্থাৎ 'আগমনী-বিজয়া'ও মূলত কবিগান এবং এগুলি কবিগানের পূর্ব অঙ্গ আর 'খেউড়' গান কবিগানের পশ্চাৎ অঙ্গ। অর্থাৎ উমাসঙ্গীত দিয়ে কবিগানের আরম্ভ, আর খেউড়ে তার সমাপ্তি। প্রারম্ভে দেবতার কথা, সমাপ্তিতে অশ্লীলতার চূড়ান্ত। যাত্রা, তরজা, পাঁচালী প্রভৃতি কবিগানেরই পরিণত রূপ।

উমাসঙ্গীত, মালসী বা ভবানী-বিষয়ক গানের শ্রষ্টা সাধক কবি রামপ্রসাদ হ'লেও রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালারাই এর প্রধান পোষ্টা। কবিওয়ালাদের রচনা হ'লেও এতে কবিগানের উত্তেজনা নেই—বরং একে বলা চলে সামাজিক জীবনের বিষাদসঙ্গীত। পুরাণে উমাসঙ্গীতের সঙ্গে দুর্গাপূজার কোন সম্পর্ক না থাকলেও বাঙালী জনতার কবির কল্পনা এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এগুলি শ্যামাসঙ্গীতের মতো সাধন-সঙ্গীত নয়, এতে কোন গূঢ় ইঙ্গিতও নেই, এই সঙ্গীতগুলিতে এক প্রকার মধুর রসাত্মক বাৎসল্য রসের আস্বাদন লাভ করা যায়।

২. **যাত্রা:** এই জনসাহিত্য ধারায় সর্বাধিক জনপ্রিয়তা যাত্রাগানের। উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনীত এই নাটগীতে থাকে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য—এই দিক থেকে এগুলি অপেরা-গোত্রীয়। কৃষ্ণলীলা বা কালীয়দমন, রামলীলা এবং বিদ্যাসুন্দর পালা ছিল প্রধানতঃ যাত্রার বিষয়। প্রাচীন যাত্রায়ও ছিল উমাসঙ্গীতের মতো গান—এমন কি উক্তি প্রত্যুক্তিও ছিল পদ্যে রচিত। অবশ্য যাত্রাগানের রঙ্গতামাসাও যথেষ্ট ছিল—কালুয়া-ভুলুয়া, কেশো-বেশো, মেথর-মেথরাণী সেজে নাচগান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। শতবর্ষ পূর্বে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহ্তর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নৃত্য করে।...বাঙ্গালা এক্ষণে নূতন। বাঙ্গালা এক্ষণে বালক। সেই জন্য এত নৃত্য।'

৩. **পাঁচালী:** জনসাহিত্য গোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচালীই সর্বাধিক পরিণতি লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিও পাঁচালী নামে পরিচিত হ'লেও এই অর্বাচীন পাঁচালী কিন্তু সেরূপ বৃহদায়তন নয়। এগুলিতে ক্ষুদ্রাকার উপকাহিনীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যেমন—শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, বিধবা-বিবাহ, নলিনী-ভ্রমরোক্তি প্রভৃতি। পাঁচালী গানে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার হালচাল,

আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শ্লেষাত্মক রঙ্গ-রসিকতা অধুনিকতারই পরিচায়ক। আবার কোন কোন পাঁচালীগানে যুক্তিসিদ্ধ ভক্তিবাদেরও অভাব নেই।

৪. **টপ্পা :** জনসাহিত্য শাখার অপর একটি পুষ্ট ধারা 'টপ্পাগান'। টপ্পাগান ছিল এক জাতীয় হাল্কা চালের মার্গসঙ্গীত। হিন্দী টপ্পার উদ্ভাবনার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর সরিমিয়ার নাম জড়িত রয়েছে। সেই হিন্দী টপ্পা ভেঙেই বাঙলা টপ্পা প্রবর্তন করা হয়। এই টপ্পার উপাদান বিশুদ্ধ মানবীয় প্রণয়, অবশ্য টপ্পার ঢঙে ভক্তিমূলক গানের রীতিও প্রচলিত ছিল। টপ্পাগানের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "একদা এই টপ্পা গানের খুব কদর ছিল। প্রথমতঃ এই সমস্ত গানে বিশেষ কোন সুরুচিপূর্ণ ব্যাপার থাকত না, দ্বিতীয়তঃ এর প্রণয়ঘটিত বর্ণনা ও আবেগবিশিষ্ট লীরিকের পূর্বাভাস বলে গৃহীত হ'য়েছিল। তৃতীয়তঃ এতে মার্গরীতি ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত বলে, ঈষৎ অভিজাত শ্রেণীর ও মার্জিতরুচির বিলাসী-সম্প্রদায় এর খুব অনুরাগী ছিলেন। আখড়াই গানে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী, তালমান অনুসৃত হত, মার্গরীতি পদে পদে অনুসরণ করা হত, নানাপ্রকার জটিল বাদ্যযন্ত্রের কৌশলও এ গানকে বড়ই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল। তখন এই আখড়াই গানকে কিছু সহজসাধ্য করে, মার্গরীতিকে কিছু লঘুচপল করে এবং বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ কমিয়ে ফেলে 'হাফ আখড়াই' গানের উৎপত্তি হল। যাঁরা হাফ আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষক ও উহার ভক্ত ছিলেন তাঁরাই টপ্পাগানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিলেন।"

১ ক. **কবিওয়ালা' :**—বাঙলা ভাষায় কে প্রথম কবিগান রচনা করেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা না গেলেও অনেকেই অনুমান করেন যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে আবির্ভূত 'গোঁজলা গুঁই'-ই সম্ভবতঃ আদি কবিওয়ালা। আসরে উপস্থিত দুই কবিওয়ালা যে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কবিতার লড়াই করতেন, এই কবির লড়াই বা 'লহরের প্রবর্তক সম্ভবতঃ 'রঘুনাথ দাস'। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন 'হরুঠাকুর' বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (১৭৩৮-১৮১২ খ্রীঃ)। ইনি সমস্যাপূরণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবিওয়ালাদের মধ্যে 'রাম বসু' একটি বিশিষ্ট নাম। তার রচিত 'সখী-সংবাদ' এবং বিরহ সঙ্গীত' অনেকের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। ডঃ দীনের সেনের মতে "রাম বসুর" 'বিরহে' বঙ্গবধুর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হ'য়েছে।" 'মালসী' বা আগমনী-সঙ্গীত রচনাতেও রাম বসু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে মনে করেন যে রাম বসুর গানে আধুনিক মন ও গীতিমূর্ছনার আবেশ বর্তমান রয়েছে। তবে গানে অনুপ্রাস-যমকাদির অতিশয়িত ব্যবহার কখন কখন রাম বসুর রচনাকে বিরক্তিকর পর্যায়েও তুলে দিয়েছে। যেমন—

> 'গেল গেল কুল কুল, যাক কুল, তাতে নাই আকুল,
> লয়েছি যাহার মূল সে আমারে প্রতিকুল।
> যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায়
> অকূলের তরী কূল পাবে পুনরায়।'

রবীন্দ্রনাথের মতেও এখানে 'কুলের কূল পাওয়া দুষ্কর।' কবিগানের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী 'ভোলা ময়রা।' ভোলাময়রার সঙ্গে আণ্টনি ফিরিঙ্গির বাগযুদ্ধ প্রায় ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেছে। ভোলা ময়রা ছিলেন বাগ্‌বাজারের বাসিন্দা আর আণ্টনি ফিরিঙ্গির জন্মস্থান পর্তুগাল। 'ঠাকুর সিংহ' নামক এক কবিয়ালের প্রশ্নের জবাবে আণ্টনি ফিরিঙ্গি বলেছিলেন :

'এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি ;
হয়ে ঠাকুরে সিং-এর বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।'

তিনি বাঙালী পোষাক পরতেন, বাঙালী রমণীকে বিয়ে করেছিলেন এবং কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভোলাময়রার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অসাধারণ। কিন্তু তিনি কবির লড়াইয়ে অশ্লীলতার আমদানি ক'রে অতিশয় কুরুচির পরিচয় দান করেন। ডঃ দীনেশ সেন বলেন, "ভোলার যে সকল গান প্রসিদ্ধ, সেগুলি অ্যাণ্টনি সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি। ভোলার নির্ভীকতার কিংবা প্রগল্‌ভতার সীমা ছিল না; দেশের বড় বড় ভূস্বামীদের সম্মুখে অম্লানবদনে নিঃসঙ্কোচে ভোলা অশ্লীল খেউড়ের সহিত এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকেও দুকথা শুনাইয়া দিত।"

২ ক. যাত্রাওয়ালা : যে সকল যাত্রাওয়ালা যাত্রা গান লিখে বা যাত্রার দল ক'রে তৎকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের একজন 'গোপাল উড়ে'। ইনি উড়িষ্যাবাসী হ'য়েও বাঙলা গান-রচনায় যথেষ্ট পটুত্ব দেখিয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দর' পালা এবং হীরামালিনী রূপে এর ব্যক্তিগত অভিনয় সেকালে যথেষ্ট উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী'। এঁর 'স্বপ্নবিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রার পালাগান এককালে যেন দিগ্বিজয় করেছিল। ডঃ দীনেশ সেনের মতে কবিহিসাবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই নাকি তাঁর স্থান, কিন্তু একালের সমালোচকগণ তাঁকে এতটা সম্মান দিতে রাজি নন। তৎকালে যাত্রাওয়ালাদের অনেকেই ছিলেন 'অধিকারী' পদবীধারী। এঁদের মধ্যে আছেন— 'কৃষ্ণযাত্রার' প্রথম যুগে লোচনদাস অধিকারী; পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম দাস ও সুবল দাস। কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ অধিকারী, কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী এবং ঢাকার কালাচাঁদ পালও কৃষ্ণযাত্রায় বেশ নাম করেছিলেন। রামযাত্রায় পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী এবং জয়চাঁদ অধিকারী উল্লেখযোগ্য।

৩ক. পাঁচালীকার :—পাঁচালীকারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ নাম দাশরথি রায় বা দাশু রায়ের। দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালী রচনা করে সমকালে জনমানসে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাকে এক কথায় অতুলনীয় বলা চলে। সমকালে তিনি শুধু সাধারণ লোককেই মুগ্ধ ক'রে রাখেন নি, বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ পর্যন্ত তাঁর গুণবত্তায় মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। সাময়িক জীবন-সত্য এবং সাময়িক সমস্যাকেই দাশু রায় তাঁর পাঁচালীর বিষয় ক'রে নিয়েছিলেন বলেই তিনি সমকালে যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তেমনি কালাতিক্রমে তিনি হলেন উপেক্ষিত। তিনি শুধু যুগের

দাবিকেই মিটাতে পেরেছিলেন, যুগকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন নি। এ ছাড়াও তিনি সভার মনোরঞ্জনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন, প্রতিভার যথার্থ ব্যবহারে স্থায়ী কীর্তি অর্জনে যথেষ্ট হন নি বলেই দাশু রায় অকৃত্রিম ও অবিমিশ্র বাঙলা ভাষার এবং বাঙালী মনোভাবের সর্বশেষ কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী কালের বাঙালা সাহিত্যে প্রায় উপেক্ষিত থেকে গেলেন। দাশরথি রায়ের প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণ ক'রে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন: "ইনি ইংরেজ-পূর্ব আধুনিক যুগের যুগন্ধর কবি। এই যুগের সমস্ত কবির সমগ্র শক্তির কেন্দ্রীভূত বিগ্রহ দাশরথি। তাঁহার প্রাণশক্তি বিপুল, রচনাশক্তি অসামান্য।···কেবল প্রাচুর্যে নহে, ঐশ্বর্যেও দাশরথির কবি-প্রতিভা অসামান্য। একদিকে প্রাচীন পদাবলীর মতো ভাবোদ্দীপক গানে এবং মঙ্গলকাব্যের মতো নানা জ্ঞাতব্য বস্তুতালিকায়, অপরদিকে অর্বাচীন তর্জার বাগ্‌বিতণ্ডায় কবিগানের রসকলহে, যাত্রার অভিনয়ে, খেউড়ের কৌতুকে তিনি পাঁচালীকে করিয়া তুলিয়াছেন সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যময়। দাশরথির পাঁচালীতে ভক্তের ভক্তি, সমাজসেবীর লোকশিক্ষা, সংস্কারকের সমালোচনা, বিদূষকের রঙ্গকৌতুক এবং সভাসদের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য একত্র দেখা যায়।"

পাঁচালীকারদের মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য নাম 'মধুকান' বা 'মধুসূদন কিন্নর'। তিনি 'ঢপ' পাঁচালীর প্রবর্তক—ঢপ পাঁচালীর ভাষণ অংশ গদ্যে রচিত হ'য়ে থাকে।

৪ ক. **টপ্পাওয়ালা :**—বাঙলায় টপ্পাগানের প্রবর্তক 'নিধুবাবু' বা 'রামনিধি গুপ্ত'। ১৭৪১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করলেও দীর্ঘজীবি নিধুবাবু ১০৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। নিধুবাবুর টপ্পা গানে মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হলেও আসলে এগুলি একেবারেই secular বা মানবীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত। এগুলি গান করা হ'তো বলে এর ভাষা এবং ছন্দে ততোটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি, নতুবা বিষয়বস্তু এবং মনোভাবের দিক্ থেকে টপ্পাগানগুলি খাঁটি গীতিকবিতা হ'য়ে উঠতে পারতো। নিধুবাবুর টপ্পাগানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। নিধুবাবু প্রেমকে রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক রোমান্স থেকে মুক্ত করে মানবিক আধারে স্থাপন করেন। প্রেম যে সহজ সাধারণ বস্তু—কোন কঠিন সাধনা নয়, তাও প্রমাণিত হ'য়েছে নিধুবাবুর টপ্পায়, টপ্পায় বর্ণিত প্রেমে বৈষ্ণবপ্রেমের গভীরতা না থাকলেও এতে ঔদার্য অনেক বেশি।

ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য নিধুবাবুর টপ্পা বিচার বিশ্লেষণ ক'রে মন্তব্য করেছেন, "নিধু-বাবুর টপ্পার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মননশীলতা। এই মননশীলতা তৎকালিক নাগরিক জীবনের ফল। এইখানেই টপ্পা আধুনিক। ইহা প্রেমের কবিতা বটে, কিন্তু ভাব-সর্বস্ব সরল ও কোমল কবিতা নহে। ইহা জটিল চিন্তায় সবল এবং বুদ্ধির দ্বারা সুসংহত। আধুনিক মনের কবি বলিয়া নিধুবাবুর দৃষ্টিও রিয়্যালিষ্টিক—তাঁহার কবিতা প্রাচীন রোমান্টিক মনোবিলাসের প্রবল প্রতিবাদ"।

টপ্পা রচয়িতাদের মধ্যে নিধুবাবু ছাড়া অপর দুই কবির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে

হয়—শ্রীধর কথক ও কালী মীর্জা। এঁদের গানগুলিও বিশুদ্ধ লীরিক কবিতার সূচনা-রূপে প্রশংসিত হবার যোগ্য।

[সাতাশ] বাউল গান :

প্রশ্ন ৬০। লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা বাউলগানের উপর আলোকপাত কর।

সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ বহু দেশে বহু জাতির মধ্যেই দেখা যায়। বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভবলগ্নে আমরা যে চর্যাপদগুলির সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি, সেই চর্যাপদগুলি যে গানও ছিল, তার প্রমাণ তার সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। বাঙালী-জীবনের এই সঙ্গীত-প্রিয়তা পরবর্তীকালে দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, একটি পদাবলী সাহিত্যের ধারা, অপরটি লোক সঙ্গীতের ধারা। পদাবলী সাহিত্যের ধারায় বৈষ্ণবপদাবলী এবং শাক্তপদাবলী রচিত হয়েছিল। লোকসঙ্গীতের ধারায় কালে কালে যে সকল গীত রচিত হ'য়েছিল, সম্ভবতঃ সেগুলি মুখে মুখে চলতো বলেই হয়তো এক সময় কাল-কবলিত হ'য়ে-ছিল। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে একমাত্র নাথপন্থীরাই তাদের সঙ্গীতগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন বলে তার কিছু কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লোকসঙ্গীতের যে ধারাটি শুধু পশ্চিম বঙ্গেই বা সমগ্র বঙ্গেই নয়, প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতেই কিঞ্চিৎ পার্থক্যসহ বর্তমান, তা হ'লো 'বাউলগান'—এরি একটু রকমফের 'মারফতী গান' ও মুর্শিদী গান।'

বাউল বাঙলার এক জাতীয় সাধক সম্প্রদায়। তাদের রচিত গানই বাউল গান। কিন্তু কবে এই বাউল সম্প্রদায় বা বাউলগানের উদ্ভব ঘটেছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম এদের আবির্ভাব ঘটে, এমন অনুমান অযৌক্তিক না হওয়াই সম্ভব। বাউল গান-বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউল ধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।" বাউলরা মরমীয়া সাধক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারা নিজেদের 'সহজিয়া' বা 'সহজপন্থী' বলে মনে করেন। কোন প্রকার প্রচলিত ধর্মমতে তারা বিশ্বাসী নয়, তাই যে কোন প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেরই তারা বিরোধী। তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই হিন্দুগুরুর মুসলমান শিষ্য যথেষ্ট রয়েছে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বন্ধনকেই তারা স্বীকার করেন না,—তারা নিজেদের মনে করেন মুক্ত পুরুষ। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থে বলেছেন : "নিজস্ব পৃথিবীর মধ্যে থেকে বাউলরা জীবনের আর্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পথ হলো প্রেমের পথ। সহজিয়াদের মত তাঁদের লক্ষ্যও হলো সহজ হওয়া। শাস্ত্রীয় আচার বিধিবিধান সহজ মানুষের সৃষ্টি নয়, ভেদবিদ্বেষে জর্জরিত বিষয়কর্মে নিয়োজিত স্বার্থান্ধ মানুষের সৃষ্টি। সেই স্বার্থান্ধ মানুষের পথ বর্জন করে তাঁরা প্রেমের পথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই

প্রেমের আয়ুধ সামগ্রিক ক্রিয়ার, সমবেতভাবে প্রয়োগ করার আয়ুধ নয়। আদর্শটা এখানে ব্যক্তিগত। বড় জোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অন্য এক মানুষ লুক্কায়িত রয়েছেন যিনি 'মনের মানুষ', যিনি প্রেমময় কল্যাণস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ। সেই মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্যই বাউলদের আকৃতি।"

বাউল সাধকগণ দেহাত্মবাদী—দেহকে কেন্দ্র ক'রেই যোগ-সাধনাদি যাবতীয় প্রক্রিয়া তাদের অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। দেহের উর্দ্ধে অপর শক্তিতে বাউলদের কোন আস্থা নেই। হিন্দু সাধনায়ও দেহভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক বলে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু হিন্দুরা দেহবাদী নয়। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে দেহের উর্ধ্বে মন, মনের উর্ধ্বে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির উর্ধ্বে আত্মার স্থান। বাউলদের দেহসাধনা ইহযোগের সাধনা—বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং নাথ ধর্মের সঙ্গে এর মিল রয়েছে, কিন্তু এটি হিন্দু সাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাউলগণ গুরুবাদী বলেই পরিচয়স্বরূপ তাদের সাঁই, দরবেশ, কর্তাভজা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বাউল গান মনের মানুষের সন্ধানেই জীবনপাত করেন, তাদের মতে মনের মানুষই একমাত্র সাধনযোগ্য। মনীষী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই মনের-মানুষ সম্বন্ধে বলেন, "In the conception of the 'Man of the heart' of the Bauls, we find a happy mixture of the conception of the Paramatman of the Upanisads, the sahaja of the sahajiyas and Sufi-istic conception of the Beloved." অর্থাৎ ডঃ দাশগুপ্তের মতে উপনিষদের পরমাত্মা, সহজিয়াদের সহজ এবং প্রেমিক বিষয়ে সুফী ধারণার মিলনেই বাউল ধর্ম ও সাধনার উৎপত্তি।

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে মতান্তর থাকলেও অনুমান করা হয় যে 'বাতুল' শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি। 'বাউল' শব্দের সঙ্গে আরবী 'আউল' শব্দটি অনেক সময়ই যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়—অর্থের দিক থেকে এই দুই শব্দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আশ্চর্যের বিষয় অসামাজিক ব্যবহারের জন্য অন্যেরা এদের পাগল বা উন্মাদ বলে যেমন অভিহিত ক'রে থাকে, তেমনি এরা নিজেরাও নিজেদের অত্যন্ত হীনভাবে চিত্রিত ক'রে থাকে। বাউল সঙ্গীত এদের সাধনার এক অপরিহার্য অঙ্গ সাধারণতঃ একতারা নামক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যসহ বাউলরা বাউল সঙ্গীত গেয়ে থাকে। এ কারণে বাউল সঙ্গীতের মধ্যে একটা নৃত্যচ্ছন্দও অনুভব করা যায়। বাউল সঙ্গীত-বিষয়ে অধ্যাপক উপেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "বঙ্গীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে বাউল-সঙ্গীত। ভাষা ভঙ্গী ও সুরের এতখানি সরলতা, সাবলীলতা ও বাঙ্গালীভাব বাংলার অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না। বাউল-সুর মৌলিক ও বঙ্গজ। ইহা লঘু, তরল ও দ্রুতলয়-বিশিষ্ট, স্বভাব ধর্মে গ্রাম্য।...। বাউল সঙ্গীত সর্ববিধ ভার হইতে মুক্ত, ইহার সুর সহজ প্রাণের সুর, অমার্জিত পল্লী-ভাষার নিত্য-সহচর, তাছাড়া নৃত্য সহচরও বটে।"

যে কোন সহজিয়া সাধনসঙ্গীতের মতোই বাউল সঙ্গীতও দুর্বোধ্য এবং রহস্যময়।

এ বিষয়ে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন : "এই রহস্য বুদ্ধিগত, অতিন্দ্রিয় মিষ্টিক কবিতায় রহস্যের ন্যায় ভাবগত নহে। সেইজন্য ইহাকে রোমাণ্টিক কবিতাই বলা উচিত। অর্থের দিক দিয়া মিষ্টিক কবিতাও অস্পষ্ট বটে, তবে তাহার কারণ স্বতন্ত্র। মিষ্টিক কবিতার ভাবগত অর্থ অনির্বচনীয়, কিন্তু বাউল কবিতার অর্থ 'অকথ্য'। অবশ্য ইন্দ্রিয়সর্বস্ব বাউল কবিতায় স্পষ্টতাই স্বাভাবিক। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ইহাতে থাকিতে পারে না তথাপি কবিতায় সাধনা-সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষণ বাউল কবির পক্ষে নিরাপদ নহে।···দ্বিতীয়তঃ রোমাণ্টিক কবি-কল্পনার দ্বারা কবিতা রহস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বাউলকবি মানবদেহকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।" বাইরের দিক থেকে দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলির একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া গেলেও এর গুহ্যতত্ত্ব একমাত্র মরমীয়া-পন্থীরাই উপলব্ধি করতে পারেন। শিক্ষিত ভদ্রসমাজে বাউলগানগুলির বিশেষ কোন মর্যাদা না থাকলেও অশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজে বাউল গানগুলি অতি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয়। এর আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের সহজেই আকর্ষণ করে থাকে।

সপ্তদশ শতক থেকে আরম্ভ ক'রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালে বাউল গান যে পরিণতি লাভ করেছে, দুর্ভাগ্য-ক্রমে তার ক্রমবিবর্তনটি যথাযথভাবে ধরা যাচ্ছে না। কারণ, যথার্থ প্রাচীন বাউলগানের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বাউল-গানের ভণিতা থেকে অসংখ্য বাউলের নাম জানা যায়, কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই পরিচয় অজ্ঞাত। গবেষকদের সঙ্কলন থেকে বিশেষভাবে এই নামগুলি পাওয়া যায়— 'লালন শাহ্, পাঞ্জ শাহ্, পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, হাউড়ে গোঁসাই, রসীক গোঁসাই, গোপাল, লালশশী, এরথান শাহ্, অনন্ত বাউল, মদন বাউল, জগা কৈবর্ত, প্রভৃতি। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর বাউলরা সম্ভবতঃ গোপনতা রক্ষা করে চলতেন ব'লেই তাঁদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউল-সঙ্গীতের প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরে এ বিষয়ে সঙ্কলন ও গবেষণায় অগ্রসর হন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, মনসুরউদ্দিন আহ্মদ, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি মনীষী।

১. **'লালন শাহ্'** : রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউলগান শুনেই প্রথম মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর বাউলগান সংগ্রহ করেন। লালন ফকিরের আগে পরে আরো অনেক বাউল সাধকই গান রচনা করলেও এঁর নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। লালনের কবিত্ব, ভক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যই তিনি বস্তুতঃ বাউল-সমাজে মুকুটহীন সম্রাটের মর্যাদা লাভ ক'রে থাকেন। লালন-সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য খুব বেশি পাওয়া না গেলেও অনুমান হয়, ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। অনুমান, ১৭৭৪ খ্রীঃ ইনি কুষ্টিয়ার ভাঁড়রাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেঁউরিয়া গ্রামে সম্ভবতঃ আখড়া স্থাপন ক'রে এখানেই তিনি বসবাস করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় কুয়াসাচ্ছন্ন হ'লেও অনুমান করা হয় তিনি কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে তিনি পথে অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। এক মুসলমান দম্পতি তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ ক'রে তোলেন। অতঃপর তিনি গৃহে ফিরে এলেও তাঁকেও আর সমাজে গ্রহণ করা হয়নি। তিনি ফকিরি গ্রহণ

ক'রে 'লালন শাহ্ ফকির' নামে পরিচিত হন। তিনি বাউল সাধক ছিলেন এবং বহু হিন্দু ও মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন, লালন ফকির এক মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু লালন ফকিরের গানে রাধাকৃষ্ণ বা গৌর-বিষয়ক গানে যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় না যে, তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য মুসলিম ধর্মীয় বিষয়েও তিনি সমান আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ থেকে অন্ততঃ বোঝা যায় যে লালন ফকিরের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। যে কোন ধর্মের মূল তত্ত্ব বিষয়ে বাউলদের শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও যে কোন ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের তারা নিন্দাই করেছেন। লালনের বাউলগানগুলি-বিষয়ে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : "সীমা-অসীম বা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কও তিনি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষা স্নিগ্ধ গীতিমূর্ছনায় পূর্ণ, উপমারূপকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা এবং ভাবের গভীরতা এ যুগেও বিস্ময়কর। মূলতঃ তিনি বাউল সাধনার সঙ্কেত দিয়ে গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তত্ত্ব-কথাও তাঁর ভাষায় বিচিত্র কাব্যশ্রী লাভ করেছে সর্বোপরি আধুনিক মনের সঙ্গে তাঁর গানগুলির কেমন যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন (যদিও তাঁদের দেখাশুনা হয়নি) এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এখনও স্মরণীয় হ'য়ে আছেন।"

রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেন। 'লালন গীতিকা' নামক সঙ্কলন-গ্রন্থে লালনের ৪৬২টি গান সংগৃহীত হ'য়েছে। সম্ভবতঃ ১৮৯০ খ্রীঃ প্রায় ১১৬ বৎসর বয়সে লালন দেহত্যাগ করেন। সেঁউড়িয়া আখড়ায় তাঁরে সমাধিস্থ করা হয়।

২. **পাঞ্জশাহ্ :**—বাউল গান-রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকিরের পরই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম পাঞ্জশাহ্-এর। বাংলা ১২৫৮ সনে ইনি যশোহর জেলার শৈলকুপা-গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সুফী-সাধক হেরাজতুল্লা খোন্দকারের নিকট বাউল-সাধনায় দীক্ষিত হন; জন্মগত ভাবে মুসলমান হলেও এঁর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ইনি যেমন ইসলামী অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন, তেমনি হিন্দুযোগ শাস্ত্রেও তাঁর পারঙ্গমতা ছিল। তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো। মুসলমানের মতো অনেক হিন্দুও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাউল ও অধ্যাত্মমার্গের একজন অগ্রগামী সাধক এবং স্বভাবকবি ছিলেন—

৩. **অন্যান্য :**—'গগনহরকরা' ছিলেন লালনের শিষ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে মুগ্ধ হ'য়ে বহু প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখ করেছেন। 'আমি কোথায় পাবো তারে' গানটি এঁরই রচনা। শ্রীহট্টের 'হাসন রজা চৌধুরী'ও একজন উৎকৃষ্ট বাউল সঙ্গীত রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথ এঁর রচনারও সমজদার ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তান মতিনাথ সান্যাল 'হাউড়ে গোঁসাই' ভণিতায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাউলসঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি চণ্ডীদাস-রজকিনী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'গোপাল গোঁসাই'-ও বাউলসঙ্গীত রচনা করে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দান করেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আধুনিক যুগ

ভূমিকা | বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

[এক] বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত আধুনিক যুগ কখন থেকে এবং কি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তা বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট কর।

উত্তর। বাংলা দেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠা থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগটিকে চিহ্নিত করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যকার আধুনিক সুর বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয় অনেক পরে। যুগবিভাগের সুবিধার জন্যই ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই এই নামকরণ করা হয়েছে ; তবে এ কথা সত্য যে এর বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি এবং গতি-প্রকৃতির মধ্যে নতুন ভাবব্যঞ্জনা পূর্বতন যুগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে ইংরেজের শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। তবে এ কথাও ঠিক যে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নতুন সৃষ্টিমূলক ধারা বড় একটা দেখা যায় না। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আবার এই কথাও মানতে হবে যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন সুরের ধ্বনি শোনা যায়, এবং এই নতুন ধ্বনির প্রভাব থেকে কবি ঈশ্বর গুপ্তকে মুক্ত বলা যায় না। তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক দিয়ে নতুনের পদধ্বনিকে মেনে নিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে নতুন এবং পুরাতনের এক মিশ্রিত তরঙ্গ বয়েছিল। তাই সত্যকার আধুনিক যুগ বলে কোন একটা বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করতে হলে উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই গ্রহণ করতে হয় এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকেই তার প্রারম্ভিক সূচনা বলতে হয়। কোনও কোনও সমালোচক উনিশের শতকের প্রথমার্ধকে (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গঠনমূলক যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল

এই আধুনিক যুগের :বাংলা সাহিত্য নবজাগ্রত বাঙালী মননের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল এবং তার স্পর্শে নতুন জীবনবোধের এক ঐশ্বর্যময় দিগন্ত উন্মুক্ত

হল। সকল কিছুর মধ্যেই এক লক্ষণীয় পরিবর্তনের তরঙ্গ এসে বাঙালীর ভাবচেতনার গভীরে দোলা দিয়ে গেল এবং তারই প্রভাবে মধ্যযুগের দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যকে পেছনে রেখে নতুন রূপ ও আঙ্গিকের মাধ্যমে এক বিস্ময়কর সৃষ্টির অধ্যায় রচিত হল। ধর্মীয় চেতনার মধ্যেও দেখা দিল নতুন যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ। বহুদিনকার চিরাচরিত প্রথায় পাপপুণ্যের কথা তখন আর বড় নয়, বাঙালীর দৃষ্টির কেন্দ্রমূলে তখন এসে দাঁড়িয়েছে মানুষ। কাব্য এবং ভাবচিন্তার জগৎ থেকে দেবতাদের নেপথ্য বিধান করে বীর্যবান মানুষের জীবন-জয়গানই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যুগন্ধর কবি মধুসূদনের কাব্যলোকে ভগবানের অবতারস্বরূপ রামচন্দ্র অবজ্ঞাত হলেন। তাঁরই অনুসরণ করে কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রাচীন পটভূমিকার মধ্যে নতুন যুক্তিবাদী ভাবনাকে মিশিয়ে আখ্যান কাব্যকে নতুন রূপ দিলেন। চরিত্রসৃষ্টিতে সামাজিক বাস্তববোধের ভাবচেতনায় দোলা লাগল বলে উপন্যাস-সাহিত্য ও ছোটগল্পের জন্ম হল। মধ্যযুগে যে-প্রকৃতি সাহিত্য চিন্তায় একটি গৌণ স্থান গ্রহণ করেছিল, সেই প্রকৃতিই তখন জীবন-চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে পড়ল। জগৎ এবং জীবনচিন্তার সঙ্গে জীবনাতীত পরমাশক্তিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার স্পৃহা জন্মাল। এইভাবেই একটি বৃহত্তর এবং সামগ্রিক জীবনবোধ বাংলা সাহিত্যের নতুন অধ্যায় রচনার সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীধারাকে অতিক্রম করে যেমন নতুন আঙ্গিকে মহাকাব্যের সৃষ্টি হল, তেমনি ব্যক্তিহৃদয়ের ভাবোদ্বেলতাকে বক্তব্যের স্নিগ্ধ মাধুর্যে গীতিময় করে সৃষ্টি হল গীতিকবিতার। বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সেই গীতিকবিতার স্রষ্টা। মধুসূদন এই গীতিকবিতার ভূমিকা রচনা করেছিলেন মাত্র। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি মধুসূদন সৃষ্টি করলেন চতুর্দশপদী বা সনেট। সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নতুন গীতিধ্বনি শোনা গেল।

এই যুগের অন্যতম একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে উঠল সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারের মাধ্যমে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ই এই জাতীয়তাবোধের নতুন মন্ত্রধ্বনি শোনা যায়; তিনিই সর্বপ্রথম বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে আদর করবার জন্য বাঙালী হৃদয়ের কাছে আবেদন জানান। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এ গ্রথিত 'স্বাধীনতা হীনতায়' কবিতার সুরে স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায়ে আত্মবিসর্জনের জন্য নতুন আহ্বান ধ্বনিত হল। কবি মধুসূদনের কাব্যেও পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবোধের ধ্বনি শোনা যায়। হেমচন্দ্র জাতীয়তাবোধের কবি বলেই বাঙালীদের কাছে পরিচিত। নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও জাতীয়তাবাদের আবেগ-সুন্দর প্রকাশ ঘটেছিল। সবচেয়ে ব্যাপকতর জাতীয়তার প্রকাশমুখরতা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে—তাঁর প্রবন্ধে, উপন্যাসে ও সাংবাদিকতায়।

এই যুগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব। এই সাহিত্যের মাধ্যমেই বাঙালীর ভাবকল্পনা ও মননশীলতার একটি অপরূপ সমন্বয় সাধিত হল। বাংলা দেশের তৎকালীন চিন্তানায়কগণ এই গদ্যের মাধ্যমেই সমস্ত প্রধান সৃষ্টিকর্মে এবং দেশের গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গদ্য সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক পত্র একটি উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল এবং নবযুগের চিন্তাধারাকে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করবার প্রয়াস পেল। দেশের সম্মুখে নিত্যনতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে আরম্ভ হল। জ্ঞানলাভের মানসিকতাকে উজ্জীবিত করল এবং নতুন যুগের সমস্ত দিকের সাহিত্যকেই পরিপুষ্টি দানের মহৎ ব্রত গ্রহণ করল এই সাময়িক পত্র। পাঠক-সাধারণের রসপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য উপন্যাস এবং গল্পসাহিত্যের যেমন উদ্ভব ঘটল, তেমনি এই গদ্যের মাধ্যমে মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যেরও জন্ম হল, বাংলা এবং বাঙালীর চিন্তার দিগন্তকে তা প্রসারিত করে তুলল।

ক্রমশঃ ইংরেজী সাহিত্য ও ভাবধারার নিবিড় সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় ধরনের রঙ্গমঞ্চ গঠনের প্রয়াস পেলেন বাঙালী নাট্যরসপিপাসু ব্যক্তিগণ এবং সেইসঙ্গে নাটক রচনারও প্রেরণা এল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম হল। এই সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাচীন বাংলা কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকে ট্র্যাজিডির কোনরূপ স্বীকৃতি দেওয়া হত না; কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলা নাটকে ইওরোপীয় সাহিত্যের অনুসরণে এই ট্র্যাজিডি-ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকৃত হল। বাংলা সাহিত্যে এই ট্রাজেডি-ধর্মের সঞ্চারে উজ্জ্বল সাহিত্যকৃতির সঙ্গে একটি পূর্ণতার দিকও যেন সম্পাদিত হল।

[দুই] ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের পরিচয় দাও।

উত্তর। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন। শ্রীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রেস থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে যাবতীয় বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তা ভিন্ন আধুনিক সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ সম্ভব ছিল না, উইলিয়ম কেরির নেতৃত্বে মিশনের কর্মিবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের, বিশেষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে মুদ্রণযন্ত্রের বৈপ্লবিক সহায়তা দান করেছেন। মিশনের প্রেসে প্রথম 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' নামক গদ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর পর বৃহৎ গদ্য গ্রন্থ 'ধর্মপুস্তক' বা বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করে মিশন বাংলা মুদ্রণ শিল্পের যথার্থ সূচনা করে। সংগঠিতভাবে বাংলা গদ্যচর্চার প্রচেষ্টা হিসাবে কেরির নেতৃত্বে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ আমাদের গদ্যের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। এই অনুবাদ উইলিয়ম কেরি, জন টমাস এবং রামরাম বসুর যৌথ প্রচেষ্টার ফল। এই গ্রন্থের গদ্যভাষা সাহিত্যিক গুণবর্জিত হলেও বাংলা গদ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু প্রকাশ করা সম্ভব তা প্রথম প্রমাণিত হয়।

শ্রীরামপুর মিশন :
মুদ্রণ শিল্পের সূচনা :
বাইবেল অনুবাদ :

ঠিক এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন কর্তৃপক্ষ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের এদেশের রীতি-নীতি ও ভাষা বিষয়ে সুশিক্ষিত করে তোলবার প্রয়োজনে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লর্ড ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেরিকে আহ্বান জানান। বাইবেলের অনুবাদ এবং মিশনের অন্যান্য কর্মধারার নায়করূপে কেরি ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করে তিনি আপন প্রতিভা প্রয়োগের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেন। মনে রাখতে হবে যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল বিদেশী কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য ; এখানকার কর্মধারার সঙ্গে স্বভাবতই তাই দেশীয় জনসমাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কেরি পঠন-পাঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথমেই ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রণয়নের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন। পাঠ্যপুস্তক চাই, কিন্তু কে রচনা করবেন ? কেরি গ্রন্থ রচনা এবং অধ্যাপনার জন্য কলেজে কয়েকজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ করলেন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী এবং রাজীব

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা।

মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেরি নিজে এবং এই অধ্যাপকবৃন্দ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১২ খানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেরির 'কথোপকথন' (১৮০১), 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) এবং রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮১২)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেছেন বাঙালী গ্রন্থকারেরা, কিন্তু তাঁদের পরিচালনা করেছেন উইলিয়ম কেরি। বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতি এবং এই ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে কেরির একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁরই নায়কত্বে বাংলা গদ্য কয়েক বছরের মধ্যে সুপরিণত হয়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে সব বিষয়ে অসাধারণ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। শুধু কলেজে নয়, কলকাতার বিদ্বৎ সমাজে মৃত্যুঞ্জয়ের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত, সুতরাং তাঁর রচনার ভাষায় সংস্কৃত রীতির গদ্যই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তিনি খাঁটি বাংলা রীতিকেও উপেক্ষা করেন নি। তাঁর রচনাবলীতে তিনি বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, সংস্কৃতাশ্রয়ী ও কথ্যরীতিনির্ভর—উভয় রীতির গদ্যই তিনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখক।

ইংরেজ কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে গদ্যচর্চা চলছিল বাইরের বৃহৎ জনসমাজের সঙ্গে তার কোনও সংযোগ ছিল না। বাইরের জনসমাজের জন্য সর্ব বিষয়ের এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রধানতঃ রামমোহন রায়-এর। রামমোহনের রচনার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভাষা তুলনা করলে দেখা যায়, তিনি কলেজী গদ্যরীতির দ্বারা কোনক্রমেই প্রভাবিত হননি। তিনি যে বৃহৎ জনসভার জন্য গদ্য রচনা করতে বসেছিলেন তাদের গদ্য-বোধশক্তি ছিল না। কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি তিনি যে উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি তা তাঁর রচনার বিষয় থেকেই প্রতিপন্ন হয়। জনসাধারণকে অযোগ্য মনে না করে তিনি তাদের জন্য বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ প্রস্তুত করেছিলেন। এইসব দুরূহ বিষয়-সম্পর্কিত আলোচনায় রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্য যে-রূপ লাভ করেছে, তাকে বলা যায় যুক্তির ভাষা।

রামমোহন রায়
(১৭৭৪-১৮৩৩)

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতায় তথা সারা বাংলাদেশে সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনে রামমোহনই ছিলেন প্রধান নায়ক। প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার সংঘাতে আলোড়িত সেই সমাজে রামমোহন ছিলেন কেন্দ্রীয় পুরুষ এবং তাঁর সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন বাংলাদেশের নির্মীয়মান নতুন যুগের ধ্যান-ধারণাকে সুগঠিত করে তুলেছিল। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়

রামমোহনের সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রতি পদে এই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্রসর হয়েছেন। একদিকে স্বদেশের ঐতিহ্যে নিহিত যা কিছু সার বস্তু, তা উদ্ধার করে দেশবাসীর সম্মুখে ধরে দেবার জন্য তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর সার সংগ্রহ করেছেন, অন্যদিকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তাঁকে সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের বিচার বিতর্ক করতে হয়েছে। তাঁর প্রথম শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্ত সার' (১৮১৫)। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮২৯) প্রভৃতি। রামমোহনের এইসব রচনার ভাষায় সাহিত্যিক সৌন্দর্যের একান্ত অভাব, কিন্তু মননশীল রচনার ভাষা হিসেবে তাঁর আবেগবর্জিত, প্রাঞ্জল, যুক্তিবহ ভাষাশৈলীতে গদ্যের একটা স্বতন্ত্র শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৪ বৎসরের গদ্য রচনার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহনের গদ্যই প্রতিনিধিস্থানীয়।

এই সময়ের আর একজন জনপ্রিয় গদ্যলেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) এবং 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) বই দুটি সমসাময়িক কলকাতার সমাজজীবনের সরস ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সামাজিক নকশা জাতীয় রচনা 'নববাবুবিলাস'-এ উপন্যাসের অস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)

ফোর্ট উইলিয়ম-রামমোহন যুগের পরবর্তী যুগটিকে তত্ত্ববোধিনী যুগ নামে অভিহিত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট পরিণতি দেখা দেয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায়। তাঁরা তিনজনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত স্বকীয় রচনাশৈলীর জন্য খ্যাত এই যুগের আর একজন শক্তিমান লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গদ্য যখন শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর বাহন না হয়ে 'কলা-বন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত' এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তখনই গদ্যে প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাংলা গদ্যভাষার নিজস্ব প্রকৃতিগত সৌন্দর্য প্রথম পরিস্ফুট হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায়। "বাংলা ভাষাকে পূর্ব-প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন" (রবীন্দ্রনাথ)। তিনি পদ-বিন্যাসের মধ্যে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য রচনা করে বাংলা গদ্যে ছন্দস্পন্দ পরিস্ফুট করেন। তাঁর 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনাত্মক গদ্য যথার্থ সৌন্দর্যমণ্ডিত। অন্যদিকে জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্যের শক্তি পরিণত হয়ে

তত্ত্ববোধিনীর যুগ ও বিদ্যাসাগর

উঠেছে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায়। অক্ষয়কুমারের মন ছিল বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজের একটা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। এই তথ্যনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন লেখক একাগ্র সাধনায় আধুনিক মানুষের বুদ্ধির পক্ষে অধিগম্য সকল বিষয় বাংলা গদ্যে আলোচনা করে প্রমাণ করে গেছেন যে এই ভাষা আধুনিক বিদ্যার সকল শাখারই যথার্থ বাহন হতে পারে। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের মতো দেবেন্দ্রনাথের রচনা সংখ্যায় বিপুল নয়, কিন্তু তিনি একটি পরিচ্ছন্ন গদ্যশৈলী আয়ত্ত করেছিলেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গভীরতা এবং প্রখর সৌন্দর্যচেতনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় একটি স্নিগ্ধ প্রশান্তির স্বাদ পাওয়া যায় যা তখনকার অন্য কোন লেখকের রচনায় দুর্লভ।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্যারীচাঁদ মিত্র এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, কিন্তু তিনি বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বাংলা গদ্যের আদি লেখক রামরাম বসু একান্তভাবে কথ্যরীতির গদ্যের ওপরে নির্ভর করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ধারায় এই দৃষ্টান্ত কেউ অনুসরণ করেন নি। গদ্য ক্রমেই সংস্কৃতনির্ভর হয়ে উঠেছে। এর বহুদিন পরে, যখন গদ্যের একটা সাধারণ রূপ স্থিরীকৃত হয়ে এসেছে—তখন প্যারীচাঁদ প্রচলিত সাধুভাষার পরিবর্তে কথ্যরীতিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এর সাফল্যে প্রমাণিত হল যে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বাহন হতে পারে। এইসঙ্গে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র কথাও উল্লেখ করা উচিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্যারীচাঁদের অনুসরণে অপরিমার্জিত কথ্যভাষায় গ্রন্থ রচনার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য়। আলালী ভাষা বা হুতোম প্যাচার ভাষা সাহিত্যিক রচনার আদর্শ ভাষা নয়। কিন্তু এই দুখানি গ্রন্থে অতিরিক্ত সংস্কৃতনির্ভব কৃত্রিম গদ্যরীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল। ভবিষ্যৎ লেখকেরা, বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ভাষারীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে বাংলা গদ্যের আদর্শ শৈলী গড়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে গদ্যের সাহিত্যিক সুষমামণ্ডিত রূপ একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাতেই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যরীতির ওপরে নির্ভর করে এই ভাষার নিহিত সম্ভাবনাকে পূর্ণ পরিণতি দান করেছেন।

প্যারিচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

গদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রধানত দুটি। একটি—কাহিনী বর্ণনা, এক্ষেত্রে যে গদ্য ব্যবহৃত হয় তাকে বলা যায় বর্ণনাত্মক গদ্য। অপরটি মনন-চিন্তনের বাহন, অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক গদ্য। ফোর্ট উইলিয়ম-এর যুগ থেকেই গদ্যের এই দুই শৈলীর চর্চা ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। বঙ্কিম-পূর্ব যুগে প্রথম ধারার গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বিদ্যাসাগর। দ্বিতীয় ধারায় রামমোহন, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে

প্রবন্ধের পরিণত রূপ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়

উল্লেখযোগ্য। যুক্তিবাদী মনের বাহনরূপে গদ্যের আদর্শ রূপ পাওয়া যায় ভূদেবের রচনায়। বিশেষভাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা প্রবন্ধের একজন প্রধান লেখক। তাঁর রচনার প্রতিটি বাক্য যুক্তির শৃঙ্খলে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ এবং যুক্তিধারার পারম্পর্য অনুযায়ী অনুচ্ছেদ বিন্যাসের কৌশলে তিনি গঠনের দিক থেকে প্রবন্ধের সুঠাম রূপ গড়ে তুলেছেন।

•[তিন] শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনে বাংলা গদ্যচর্চার পরিচয় দাও এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা দেশে সংগঠিতভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে জন টমাস উইলিয়ম কেরিকে (১৭৬২-১৮৩৪) বাংলা দেশে নিয়ে আসেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে হলে দেশীয় ভাষার মাধ্যম অবলম্বন করা প্রয়োজন। টমাস এ বিষয়ে প্রথম থেকেই উদ্যোগী ছিলেন, কেরির মতো একজন প্রতিভাসম্পন্ন ভাষা-বিজ্ঞানীর সহায়তা লাভ করায় ইংরেজ মিশনারীদের কর্মধারায় নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হল। কেরি এদেশে এসে যথার্থভাবে কাজ আরম্ভ করবার মতো একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের সঙ্গে মিশনারীদের সম্পর্ক ভালো না থাকায় কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন কোন এলাকায় স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অসম্ভব হয়। ইতিমধ্যে কেরি একটি কাঠের তৈরী মুদ্রাযন্ত্র সংগ্রহ করেন, বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজও অনেক দূর অগ্রসর হয়, কিন্তু একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলবার মতো স্থানের অভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কোন কাজই এঁরা ভালোভাবে আরম্ভ করতে পারেন নি। অবশেষে মিশনারীগণ ইংরেজ রাজত্বের বাইরে ডেনিশ শাসনাধীন শ্রীরামপুরকেই নির্বাচন করেন। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান ছিলেন কেরির প্রধান সহযোগী, তাঁরা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে এসেছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেরি খিদিরপুর থেকে শ্রীরামপুর এসে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং এই কারণেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, ১২ই জানুয়ারি থেকে যথারীতি মিশনের কাজ শুরু হল। গদ্যভাষা গড়ে তোলার দিক থেকে এঁদের রচনাবলীর মূল বিষয়ে মতান্তর আছে, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের বৈপ্লবিক সহায়তায় ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের শক্তিবৃদ্ধির ঐতিহাসিক কৃতিত্ব শ্রীরামপুরের মিশনারীদেরই প্রাপ্য।

উইলিয়ম কেরির প্রচেষ্টা

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা

মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের যথার্থ ইতিহাসের সূচনা হয়েছে শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর থেকে। শ্রীরামপুর থেকে বাইবেলের অনুবাদ এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তিকা ভিন্ন কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং বাঙলা গদ্যের প্রথম পাঠ্যপুস্তকগুলি রচিত হয়েছিল। এই প্রেস থেকেই বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্রও ছাপা হয়। কোন সাহিত্যই মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা ভিন্ন আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হতে

পারেনি; বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সহায়তায়ই সম্ভব হয়েছিল একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখা দরকার। এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্ভব হয়েছিল উইলিয়ম কেরির নেতৃত্বে, তাই বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

মিশনের প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত বাংলা বই 'Gospel of St. Matthew'-এর অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' রচিত হয়। মূল গ্রীক থেকে এ বই অনুবাদ করা হয়েছিল। মূল অংশের শেষে 'কালের অল্প বিবরণ এবং কতক ভবিষ্যৎ বাক্যে যীশুখ্রীষ্টের বিষয়' নামে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছিল। এই অংশটুকু স্বাধীন রচনা, অনুবাদ নয়। এই পুস্তকটি ১৮০০ সালেই ছাপা হয়। পুস্তিকাটির ভাষায় তদ্ভব-শব্দের প্রাধান্য, কথ্য ভাষানুসারী এবং সেই কারণেই কিছুটা সহজ। তৎসম শব্দের বানান প্রায়ই অর্ধ-তৎসমের মত করা হ'য়েছে। মূলের বাক্য গঠন অনুসরণের ফলে বাক্যবিন্যাসরীতি বাঙলা ভাষার রীতি-বিরুদ্ধ। এটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত প্রথম বাঙলা বই। পরিশিষ্ট অংশ স্বাধীনভাবে রচিত, তাই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এই অংশেরই মূল্য বেশী।

শ্রীরামপুরে আসবার আগেই উইলিয়াম কেরি তাঁর ভাষা-শিক্ষক রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের অনুবাদ শেষ করেছিলেন। 'ধর্মপুস্তক' নামে এক গ্রন্থ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম অংশের অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছিল। বাংলা গদ্যের ইতিহাসের স্মরণীয়

বাইবেলের অনুবাদঃ 'ধর্মপুস্তক'

এই গ্রন্থটি রচনার কৃতিত্ব কোন একজনের প্রাপ্য নয়। কেরি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সকল কর্মের প্রেরণা-উৎস। তবুও গ্রন্থ রচনা বিষয়ে তিনি রামরাম বসু ও জন টমাসের সহায়তা যে গ্রহণ করতেন একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। শ্রীরামপুর থেকে এই গ্রন্থের শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতি সংস্করণেই ভাষার সংস্কার সাধন করা হয়েছে। কিন্তু রচনাশৈলী বিশেষ উন্নত হয় নি। সংশোধনে বাক্যগঠনরীতি পরিমার্জিত হলেও তদ্ভব শব্দের স্থানে তৎসম শব্দের ব্যবহার তথা ভাষার সংস্কৃতায়নে তার স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস পেয়েছিল। তবুও এই প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে কেরির অকৃত্রিম নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কেরিই ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান নায়ক, কিছুদিন পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে চলে যাওয়ায় গ্রন্থ রচনার দিক থেকে মিশনের ভূমিকার গুরুত্ব কমে যায়।

শ্রীরামপুর মিশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাংলায় সাময়িক পত্র প্রকাশ। বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' এখান থেকেই ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের এক মাসের মধ্যে মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক

সাময়িক পত্র প্রকাশ

পত্রিকা প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সাময়িক পত্রিকা অবলম্বন করেই উত্তরকালে বাংলা গদ্যভাষার দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছে, শ্রীরামপুর মিশন এইদিক থেকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

[চার] বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য—ইংরেজ ও বাঙালী মনীষীদের সহযোগিতা। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এদেশের রীতি-নীতি এবং ভাষা সম্পর্কে শিক্ষাদান। এ কাজ শুধু এককভাবে ইংরেজ বা বাঙালী কারও পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। বাস্তব প্রয়োজনেই দুই সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের এখানে আহ্বান জানানো হয়েছিল। শ্রীরামপুর থেকে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের পর বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ইংরেজ রূপে উইলিয়ম কেরির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে নবগঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। শ্রীরামপুরে কেরির সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল ধর্মপ্রচারের সীমার মধ্যে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এসে তিনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপন প্রতিভার শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পান। যে ভাষায় তখনো পর্যন্ত একটিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নি, সেই সম্পূর্ণ অগঠিত বাংলা গদ্যভাষাকে সর্ববিধ প্রয়োজনের ভাষারূপে গড়ে তুলবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। উপযুক্ত ব্যক্তির উপরেই যে এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা কেরির কর্মপদ্ধতি এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে। কেরি সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে, উপযুক্তভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রচনার জন্যে একটি শক্তিশালী অধ্যাপক-লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি কলেজের বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রন্থ রচনা এবং অধ্যাপনার জন্য আটজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রমানাথ বাচস্পতি নিযুক্ত হলেন পণ্ডিতের পদে, আর সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হল শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি এবং আত্মারাম বসুকে। কেরির নায়কত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই অধ্যাপকবৃন্দ নিজেদের রচনার দ্বারা বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ভূমিকা প্রস্তুত করে গিয়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রন্থ রচনার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী

অন্যান্য অধ্যাপক

রামরাম বসু—
- রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
- লিপিমালা (১৮০২)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—
- বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
- রাজাবলি (১৮০৮)
- প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)
- রচনাকাল (১৮১৩)

গোলকনাথ শর্মা—	হিতোপদেশ	(১৮০২)
চণ্ডীচরণ মুন্সী—	তোতা ইতিহাস	(১৮০৫)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	(১৮০৪)
হরপ্রসাদ রায়—	পুরুষপরীক্ষা	(১৮১৫)
উইলিয়াম কেরি সম্পাদিত—	কথোপকথন	(১৮০১)
	ইতিহাসমালা	(১৮১২)

গ্রন্থগুলোর প্রকাশকালের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই লেখকবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গদ্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন। লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বাংলা গদ্যের কোনও আদর্শ এঁদের সম্মুখে ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার রচনাশৈলীই এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। কেরির 'কথোপকথন' এবং রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' কথ্যরীতি অনুসরণে লেখা, কিন্তু এর ভাষাকেও আদর্শ ভাষা বলা চলে না। সংস্কৃত নির্ভরতাই যে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির উপায় এ বিষয়ে কেরি কৃতনিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু ভাষায় গতি সঞ্চার ও সহজবোধ্যতার জন্য লোক-প্রচলিত ভাষার উপকরণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। সংস্কৃত-নির্ভর বাংলা গদ্যের সঙ্গে প্রচলিত কথ্যভাষার সামঞ্জস্য সাধন একটা জটিল সমস্যা। ফোর্ট উইলিয়াম-এর লেখকবৃন্দ দুই রীতির গদ্যই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোন সামঞ্জস্যের সূত্র উদ্ভাবন করতে পারেন নি। কথ্যভাষার প্রাঞ্জলতা ও সংস্কৃতের শব্দসম্পদের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগে পরিচ্ছন্ন গদ্যশৈলী নির্মাণের মতো প্রতিভা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের ছিল না। কিন্তু তাঁদের রচনায় বাংলা গদ্যের মূল সমস্যাগুলি সঠিকভাবে ধরা পড়েছিল এবং গদ্যের একটা নির্ভরযোগ্য কাঠামো এই লেখকবৃন্দ প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং কেরির 'কথোপকথন' ভিন্ন ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্যান্য রচনা অনুবাদমূলক; সংস্কৃত, আরবী-ফারসী এবং ইংরেজী হতে এসব রচনার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে।

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

কেরীর সংকলিত ও সম্পাদিত কথোপকথনে কথ্যভাষার কিছু কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলালে সাধুভাষার কাঠামোয় কথ্যভাষা প্রয়োগের যে পরীক্ষা করেছিলেন, কথোপকথনে তার প্রাথমিক রূপ দেখা যায়। ইতিহাসমালার প্রস্তাবগুলিতে সংকলিত দেড়শত গল্পে অধিকাংশই দেশীয় লেখকদের দ্বারা লিখিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল। বাঙলা ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিহাসমালা প্রথম গল্প গ্রন্থ। সাহিত্যের বাহন না হলেও যে লোকব্যবহারে বাঙলা গদ্য উনবিংশ শতাব্দীর আগেই যে কতটা সরল ও শক্তিশালী হয়েছিল, ইতিহাসমালার অনেক গল্পে তার উদাহরণ মেলে। রামরাম বসুর ভাষায় কোথাও কোথাও আড়ষ্টতা ও আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকলেও তাঁর কথকতার ভাষারীতির অনুযায়ী রচনাশৈলীর 'সরলতা ও সুগম্যতা এবং লোকপ্রচলিত শব্দ, পদ ও ইডিয়মের ব্যবহার' প্রভৃতি গুণ লক্ষ্য করা যায়।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের** (১৭৬২-১৮১৯) কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যেই নয়, বাংলাদেশের তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজে হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি একদিকে যেমন নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অগ্রসর হয়ে নিজের ভাষাকে শক্তিশালী করে তুলেছেন, তেমনই বিচিত্র বিষয় অবলম্বনের দ্বারা সেই ভাষার প্রকাশশক্তির পরীক্ষা করেছেন। তিনি "একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার কৌতুহলের ব্যাপকতা ও সাহিত্যকৃত্যের নানামুখিতার পরিচয় দিয়াছেন। দুইখানি অনুবাদ গ্রন্থ, একখানি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ও একখানি বিবিধবিদ্যাসম্বন্ধীয় ও মুখ্যত দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি যে কেবল ফরমায়েসী লেখক নহেন ও তাঁহার মনন শক্তি যে বিচিত্রগামী তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি বিষয় দ্বারা অভিভূত না হইয়া বরং নানা বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের শক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গদ্যভাষার মধ্যেও বিষয়োপযোগী প্রয়োগকুশলতা ও বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া নূতন পথে পদক্ষেপ ও নব পরীক্ষার সাহসিকতা দেখা যায়।...মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সচেতন শিল্পীমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্য নির্মিতির ভিত্তি রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।... তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহ্যহীন, অপাংক্তেয় বাংলা গদ্যের মধ্যেও কিছু মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দস্পন্দের একটা ক্ষীণ আভাষ প্রবর্তন করিয়াছেন" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
(১৭৬২-১৮১৯)

কথ্য ও সাধু ভাষা উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয়ের রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে স্থানে স্থানে ভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারী হওয়ার জন্য আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কথ্যভাষাশ্রয়ী অংশগুলি সরল ও সজীব। অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ, যেমন, কহব, কারিদর্শীক, কাশ, দোধূয়মান ইত্যাদি, সংস্কৃতের মত পদ ধাতু ও সন্ধির ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয়ের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যচর্চা সম্পর্কে আর একটি কথা এই যে, এখানকার লেখকেরা কলেজের ছাত্রদের জন্যই গ্রন্থ রচনা করতেন, বাইরের জনসমাজের সঙ্গে এইসব রচনার বিশেষ কিছু যোগ ছিল না। সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতার সংস্পর্শেই সাহিত্য-কর্মীদের মনন চিন্তনে সচলতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য আসে। বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলের সাথে সম্পর্কহীন এই লেখকগোষ্ঠী মৌলিক চিন্তা-ভাবনার কোন উদ্দীপনা অনুভব করেন নি। লেখক হিসাবে এঁরা কখনো স্বাবলম্বী হতে পারেন নি। প্রধানতঃ অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকার ফলে অধিকাংশেরই রচনায় স্বাধীন পরীক্ষার সাহসিকতা এবং সেইপথে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস একান্তভাবেই অনুপস্থিত।

• [পাঁচ] রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের জনক নামে অভিহিত করার যৌক্তিকতা বিচার কর।

অথবা

"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।"—বাংলা গদ্যে রামমোহনের অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থ্য আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) রচনাবলীর মূল্য নিরূপণের আগে আলোচনার সুবিধার জন্যে তাঁর প্রধান রচনাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বেদান্তগ্রন্থ' এবং 'বেদান্তসার'। প্রথম গ্রন্থটি বেদান্তের বঙ্গানুবাদ এবং দ্বিতীয়টি বেদান্তের সার সংকলন। ১৮১৬-১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শাস্ত্রীয় বিচারমূলক রচনা 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় বিচার-বিতর্কমূলক অন্যান্য পুস্তিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭) এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮)। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র উপরে লিখিত হয়েছিল। সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রচনা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) রামমোহনের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি পাঁচখানি উপনিষৎ অনুবাদ করেন এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে একটি বাংলা ভাষায় ব্যাকারণ সংকলন করেন। রামমোহন-রচিত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ছোট বড়ো মিলিয়ে তিরিশখানি।

রামমোহনের রচনাবলী

এই গ্রন্থ তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে রাম-মোহন রায়ের দুঃসাহসে বিস্মিত হতে হয়। তিনি কোনও বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য রচনায় প্রবৃত্ত হন নি, জনসাধারণই তাঁর রচনার লক্ষ্য ছিল। এই সব দুরূহ বিষয় আলো-চনার উপযুক্ত ভাষা তখনও গড়ে ওঠেনি, সাধারণ মানুষের গদ্য বোধশক্তিও ছিল না। কিন্তু রামমোহন জনসাধারণের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে উচ্চতম জ্ঞানের বিষয় তাদের সম্মুখে ধরে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন,—"কেবল পণ্ডিতের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন করা রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্ব-সাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন।" রামমোহনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে অন্ততঃ বারখানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং রামমোহন থেকেই বাংলা গদ্যের সূচনা একথা কোনক্রমেই বলা চলে না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম-এর লেখকদের রচনা এবং রামমোহনের গদ্যচর্চার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ফোর্ট উইলিয়ম-এর

পূর্ববর্তী লেখকদের তুলনায় রামমোহনের বৈশিষ্ট্য

এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা আর ছাত্রেরা সেই বিবরণ শুনেন কিনা আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কিনা এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কিনা শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস আলাপেতে কহিয়া থাকেন কিনা আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কিনা।"

[ছয়] বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন গ্রন্থের পরিচয় দিয়ে বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) মহাশয়ের প্রধান রচনাবলীর তালিকাটি নিম্নরূপ: 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'জীবন চরিত' (১৮৪৯), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭১-৭৩) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫১)। বিদ্রূপাত্মক বেনামী রচনা—'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও স্বরচিত জীবনী—'বিদ্যাসাগর চরিত্র'।

বিদ্যাসাগরের রচনাবলী

কালের বিচারে বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে লিখিত। বিগত শতাব্দীর প্রথম অর্ধের সামাজিক ইতিহাস নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে আলোড়িত। য়ুরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে তখন আমাদের বহুকালের প্রসুপ্ত চিত্তে একটা নতুন চেতনা, নতুন আলোড়ন অনুভূত হচ্ছিল, কিন্তু এই চেতনা সংগঠিত ও সংহত হয়ে উঠতে পারেনি। নবোদ্ভূত জীবন-চেতনা জাতীয় জীবনে ধীরে ধীরে স্থায়িভাবে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত হয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে সর্বাত্মকভাবে আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলবার প্রয়াস। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-অর্ধ নতুন সৃষ্টির কাল, নবযুগের পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট লক্ষণ এই সময়ের সাহিত্যকৃতিতে সমুজ্জ্বল-ভাবে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাসাগর আট বৎসর বয়সে কলকাতায় আসেন এবং ১৮৪১ সালে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়। অর্থাৎ কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে নবযুগের অভ্যুদয়ের কালটিই বিদ্যাসাগরের জীবনেরও প্রস্তুতি পর্ব। কর্মজীবনে প্রবেশের পর থেকে বাংলা দেশের সর্ববিধ প্রগতিশীল কর্মধারায় তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক।

বাংলার ইতিহাসের এই পর্ব সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এক্ষণে আমরা বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তের যে যুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার প্রধান পুরুষ পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এককালে রামমোহন রায় যেমন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী ও আদর্শ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার পদভরে বঙ্গসমাজ কাঁপিয়া গিয়াছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।" এই যুগের বাংলা সাহিত্যে, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এবং সর্বায়ত সমাজভূমিতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত ব্যাপকভাবে পড়েছে যে তাকে 'বিদ্যাসাগর যুগ' বলাই সঙ্গত। যুগনায়করূপে বিদ্যাসাগর একটি জাতির জীবনধারার গতি পরিবর্তন করে গেছেন। তাই কোন একটি ক্ষেত্রের কাজের পরিমাপের দ্বারা দেশের ওপরে তাঁর প্রভাবের গুরুত্ব বিচার করা সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগরের সমকালীন সামাজিক পটভূমি

তবুও একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা গদ্যকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরই তাঁর প্রধানতম স্থায়ী কীর্তি। বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর প্রকাশকালের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কর্মজীবনে প্রবেশের পর থেকে প্রায় ধারাবাহিকভাবে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন। শিক্ষকরূপেই তিনি জীবন শুরু করেছিলেন। শিক্ষকতার কাজ থেকে পরবর্তীকালে অবসর গ্রহণ করলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তিনি আমৃত্যু সংযুক্ত ছিলেন। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কর্মধারার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলা-শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টা। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। এটাই তাঁর বাংলা ভাষাচর্চার মুখ্য প্রেরণারূপে কাজ করেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কালের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতার রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত, তিনি রচনার বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের চিরায়ত গ্রন্থ থেকে। তথ্য ও তত্ত্বের পরিবর্তে উচ্চতর সাহিত্য-রস পরিবেশনই তাঁর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, তিনি সংগৃহীত বিষয়বস্তু স্বাধীনভাবে, নিজের কল্পনাশক্তি-দ্বারা পুনর্গঠিত করে নিজস্ব ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। এইজন্য তাঁর কোন রচনাকেই ঠিক অনুবাদ বলা চলে না। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, শেক্স্পিয়রের কমেডি অব এররস্ অবলম্বনে রচিত ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি রচনাকে মৌলিক সৃষ্টি বলাই সঙ্গত। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক অবলম্বনে রচিত বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার এই নিম্নোদ্ধৃত অংশে নারী চরিত্রগুলির কথোপকথনের প্রাণবন্ত চলিত ভাষাশ্রয়ী বাগ্‌ভঙ্গি, সখীদের হাস্যপরিহাস এবং তাদের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক অপূর্ব মাধুর্য ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে: 'উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি জন্য শকুন্তলা সর্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিণী যেমন

সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন সেইরূপ আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন, এটি তোমার আপনার মনের কথা।' এই নারী চরিত্রগুলি বাঙালি নারীসুলভ কোমলতা, স্নেহমমতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটক ও সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বনে রচিত সীতার বনবাসেও সীতা অশ্রুমুখী বাঙালি কুলবধূতে পরিণত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা হিন্দী বৈতাল পচ্চিসী অবলম্বনে রচিত বেতাল-পঞ্চবিংশতিতেও তিনি নিজস্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ, তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও ইডিয়মের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের শব্দকুশলতার পরিচয় মেলে। ভ্রান্তিবিলাসে প্রহসনের বিষয়কে কাহিনীর রূপে প্রকাশ করেও বিদ্যাসাগর নিজের মৌলিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ভ্রান্তিবিলাসের রচনারীতি লঘু, সরস ও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

রচনারীতির বৈশিষ্ট্য

রচনাভঙ্গীর স্বকীয়তার জন্যই তাঁর রচনাবলী রসোজ্জ্বল। বাংলাগদ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাঁর রচনাভঙ্গির অনন্যতা বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। গদ্য বিদ্যাসাগরের পূর্বেও অনেকে লিখেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে শিল্পসুষমা-মণ্ডিত করে তোলেন। কবিতার মত গদ্যের যে নিজস্ব ছন্দ আছে, বিদ্যাসাগরের পূর্বে আর কোনও বাঙালি গদ্যলেখক আবিষ্কার করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাংলা ভাষাকে পূর্ব-প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য পালন করিয়া, তার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" শিল্পের শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত করে তিনি উচ্ছৃঙ্খল বাংলা গদ্যকে যথার্থ সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ভাষায় পরিণত করেছেন—এটাই বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদ বিদ্যাসাগরের রচনায় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সংস্কৃত ভাষা থেকে সংগৃহীত উপাদানগুলি তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিন্যস্ত করেছেন। ভাষা তখনই শিল্প-সুষমামণ্ডিত হয়, যখন বিষয়বস্তু উপস্থাপনের অতিরিক্ত একটা সৌন্দর্য ভাষাদেহে বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। আমাদের গদ্যভাষায় এই সৌন্দর্য প্রথম দেখা গেল বিদ্যাসাগরের রচনায়। অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ পরিহার করে প্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ, ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য সাধন, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহকে পর্বে পর্বে ভাগ করে ছন্দপ্রবাহ সৃষ্টি এবং শব্দ ও বাক্যাংশ গ্রন্থনে বাক্যগুলির ভারসাম্য রক্ষা করে তাদের সুসমঞ্জস ও সূক্ষ্ম রূপ নির্মাণ—এইগুলিই বিদ্যাসাগরের গদ্যের বিশিষ্ট গুণ।

বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কৃত-নির্ভর সাধুভাষা, কথ্যরীতির গদ্যের ওপরে তিনি নির্ভর করেন নি। কথ্যরীতির গদ্য নিয়ে পরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম-এর যুগ থেকেই চলে

আসছে। কিন্তু এই রীতিতে লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাচার নকশা'র মতো দু-একটা ব্যতিক্রম ভিন্ন বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা অবলম্বনেই অগ্রসর হয়েছে।

নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তক

'সবুজপত্র'-এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন যে সাধুরীতির গদ্য, তার যথার্থ সূচনা বিদ্যাসাগরের রচনায়। বর্ণনাত্মক গদ্যভাষার মূল কাঠামোটা তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন, তাই তাঁকে বাংলা সাধুভাষার জনক বলা যায়। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে মৌলিকতার অভিযোগ কেউ কেউ উত্থাপন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতামাত্র, তাঁর রচনা মৌলিক নয়, সবই ইংরেজি অথবা সংস্কৃতের অনুবাদ, সুতরাং বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। এই অভিমত বা অভিযোগ অযৌক্তিক। রাজনারায়ণ বসু সে বিষয়ে যথার্থই বলেছেন: "অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত 'সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এবং বিধবা-বিবাহ বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোলরচনা-শক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরেজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোলকল্পিত গ্রন্থ বলিলে হয়।"

[সাত] প্রাক্-বঙ্কিম যুগের গদ্য সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্তের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাঁর রচনাবলীর বিস্তৃত পরিচয় দাও।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ঠিক আগের যুগটিকে বলা হয় 'তত্ত্ববোধিনীর যুগ'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে এই যুগের সাহিত্যিক উদ্যোগ সংহতি লাভ করেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন এই সারস্বত সমাজের কেন্দ্রীয় পুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা জানতে হলে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনাবলীর পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন।

তত্ত্ববোধিনী যুগ ও অক্ষয়কুমার

বিদ্যাসাগর যেমন বর্ণনাত্মক গদ্যের রূপ শিল্প-সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিলেন, অক্ষয়কুমারও তেমনি আধুনিক মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধে জ্ঞানচর্চার ভাষারূপে বাংলা গদ্যের সামর্থ্য ও শক্তি নিঃসংশয়িত-ভাবে প্রমাণ করেছেন। অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা আবিষ্কার করেন ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তই তাঁকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের আয়োজন করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক নিয়োগের জন্য একটা রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতায় অক্ষয়কুমারের রচনা শ্রেষ্ঠ

বিবেচিত হওয়ায় তাঁকেই সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বার বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার উন্নতির জন্য তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, দৈহিক সামর্থ্য—সবই উৎসর্গ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে, অক্ষয়কুমারের মতো সম্পাদক না পেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এত উন্নতিসাধন সম্ভব হত না। অক্ষয়কুমারের রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হত। অনেক রচনা এখনও এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রয়েছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

মানসিক গঠনের দিক্ থেকে অক্ষয়কুমার ছিলেন বৈজ্ঞানিক। আবেগ বা অন্ধবিশ্বাস নয়, কঠিন বুদ্ধির পথে তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণের দ্বারাই তিনি জগৎ ও জীবনের সত্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মস্থ করার চেষ্টায় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বলা হয়, দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার এবং জাতীয় ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতনতা সঞ্চার বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর পুরোন সংখ্যার পাতাগুলি খুঁজলে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে অক্ষয়কুমার এই কাজ শুরু করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের কোন রচনাই ঠিক সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। তাঁর ভাষাও প্রসাদগুণবর্জিত। কিন্তু জ্ঞানচর্চার বাহন হিসেবে তাঁর হাতে বাংলা গদ্য এমন সরলতা এবং প্রাঞ্জলতা লাভ করেছে যে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের শিক্ষা দ্বারা লভ্য সকল বিদ্যাই এই ভাষায় আলোচনা করা সম্ভব। এই যুগে একদিকে বিদ্যাসাগর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেছেন। আর অক্ষয়কুমারের হাতে জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্য প্রভূত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভাষাকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করার দিকে অক্ষয়কুমারের চেষ্টা ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের বিষয় সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা। রামমোহনে যার সূচনা—সেই জ্ঞানচর্চার ভাষারূপে বাংলা গদ্যের বিকাশের একটা পরিণত স্তর দেখা যায় অক্ষয়কুমারের রচনায়। রামমোহনের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, অক্ষয়কুমার উপযুক্ত ছেদচিহ্নের দ্বারা নিয়মিত এবং অনেক বেশী অর্থবহ বাক্য রচনা করতেন। ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বৈচিত্র্যেও তাঁর ভাষার আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অক্ষয়কুমারের রচনাবলী

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনাই প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় সুপরিকল্পিত বৃহৎ গ্রন্থের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অংশগুলিও বস্তুত এক-একটা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধেরই আকারসম্পন্ন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালের লেখকদের মধ্যে প্রাবন্ধিক হিসেবে অক্ষয়কুমারের বিশেষ স্থান আছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ **বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার** এবং **ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়**। 'বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি জর্জ কুম্ব রচিত 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থের ওপরে নির্ভর করেছেন, কিন্তু এটা ঠিক অনুবাদ হয়। অক্ষয়কুমার নিজেই লিখেছেন : "ইহা ইংরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেইরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণস্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।"

অক্ষয়কুমারের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

অক্ষয়কুমারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা **ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়**। গ্রন্থটি দুভাগে যথাক্রমে ১৮৭০ এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে এটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে H. H. Wilson-এর লেখা Religious Sects of the Hindus নামক নিবন্ধ অক্ষয়কুমারের এই গবেষণামূলক রচনার ভিত্তি। উইলসনের নিবন্ধে ৪৫টা সম্প্রদায়ের বিবরণ ছিল। অক্ষয়কুমার স্বাধীন গবেষণা-দ্বারা, আরও বহু সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন। তাঁর গ্রন্থে ১৮২টা সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে এই মহাগ্রন্থ রচনায় তিনি যে পরিশ্রম করেছিলেন এবং যে একাগ্র নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন বাংলা দেশে তা সুলভ নয়। গ্রন্থটির উপক্রমণিকা অংশ সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "দুই ভাগেরই উপক্রমণিকার অংশ সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য (ইন্দো-ইয়োরোপীয়), আর্য (ইন্দো-ইরানীয়) এবং ভারতীয় আর্য (বৈদিক এবং সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী-কর্তৃক এই প্রথম। দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ বৈদিক এবং পৌরাণিক ধর্ম ও দর্শন সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে।......অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় বাঙালীর মনীষার প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।" বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থ রচনায় যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তা আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা-যোগ্য আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

অক্ষয়কুমার দত্তের অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **পদার্থবিদ্যা** (১৮৪৫) এবং **চারুপাঠ**-এর তিন খণ্ড (১ম—১৮৫৩, ২য়—১৮৫৪, ৩য়—১৮৫৯)। 'চারুপাঠ' দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় 'চারুপাঠ'ই তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত এবং পঠিত গ্রন্থ। চারুপাঠের রচনাগুলিই যে প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সেবিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "এই লেখাগুলিতে অক্ষয় কুমারের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনের প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যগঠনরীতিতে কিছুটা গতিস্বচ্ছন্দতা, অনায়াসলভ্য

সাবলীলতার অভাব থাকিলেও তাঁহার মননের ঋজুতা ও তথ্যের বিন্যাস-পারিপাট্য পাঠকচিত্তের অভিনন্দন লাভ করে। তাঁহার তিনটি স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক নিবন্ধ, ইংরেজ প্রাবন্ধিক অ্যাডিসনের দৃষ্টান্ত-প্রভাবিত হইলেও, রূপক-কল্পনার সার্থক প্রয়োগ ও লেখকের নিবিড় মানসানুভূতির স্পর্শে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে, শুধু তথ্য ও জ্ঞানের প্রকাশ-সীমা অতিক্রম করিয়া পাঠকের মনে রসবোধের আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে।"

• [আট] সাহিত্যে কথ্যরীতির গদ্য প্রচলনের প্রচেষ্টার দিক্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনার মূল্য বিচার কর।

উত্তর। সাহিত্যে কথ্যরীতিই গদ্যভাষাকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। ১৯১৪ সালে তিনি 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে কথ্যরীতির গদ্য প্রচারের জন্য জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল প্রকার গদ্য রচনায় চলতি ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করায় সাহিত্যে চলতি ভাষা তর্কাতীতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা গদ্যের উদ্ভবকাল থেকে সাধুরীতি এবং চলতি রীতির মধ্যে যে বিরোধ চলে আসছিল—এইভাবেই তার সমাধান হয়। ১৮০০ সাল থেকে ১৯১৪, অর্থাৎ এক শতাব্দীরও বেশী সময় বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সাধু ও চলতি রীতিঘটিত বিরোধ-বিতর্ক একটানা চলে আসছে। ফোর্ট উইলিয়ম-এর লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত পদের বাহুল্য এবং ক্রিয়াপদের সাধুরূপের ব্যবহার তাঁদের অধিকাংশের গদ্য রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রামরাম বসু এবং উইলিয়ম কেরি কথ্যভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেন। রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং কেরির 'কথোপকথন' এইদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা। কিন্তু সাধারণভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভাষারীতিতে বাংলা গদ্যের সাধুরীতিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রামমোহনের যুগে মোটামুটিভাবে কথ্যভঙ্গির ওপরে নির্ভর করতে চেষ্টা করেছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নতুন বাঙালী সমাজের বিকার-বিকৃতি ছিল তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য। বাস্তব জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে স্বভাবতঃই তাঁকে অনেক পরিমাণে লোকপ্রচলিত ভাষার ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে। তাঁর 'নববাবু-বিলাস' (১৮২৫) গ্রন্থের ভাষা এই কারণেই কথ্যরীতিনির্ভর হয়ে উঠেছে। রামমোহন রায় এবং পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁদের সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের বিরাগভাজন হন। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের উদ্দেশ্যে যে কটূক্তি করা হত অনেক সময়ে তাঁরা সেই সব আলোচনার উত্তর দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর এই জাতীয় কয়েকটা রচনায় গম্ভীর চালের সাধুভাষা পরিত্যাগ করে রঙ্গব্যঙ্গমুখর চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। দেখা যাচ্ছে বঙ্কিম-পূর্ব যুগের অনেক লেখকই প্রয়োজনবোধে কথ্যরীতির গদ্য ব্যবহার করেছেন। তবুও একথা সত্য যে বিদ্যাসাগর,

কথ্যরীতির গদ্য প্রচলনের প্রচেষ্টা

অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের হাতে সাধুভাষার পরিণতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার তুলনায় কথ্যরীতির গদ্যের কোন স্থির আদর্শ গড়ে ওঠেনি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাহনরূপে কথ্যরীতির গদ্যের শক্তি কেউ পরীক্ষা করে দেখেন নি।

এই পটভূমিতে **প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪—১৮৮৩)** সাহিত্যচর্চার ইতিবৃত্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষারীতির সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা এবং একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের চেষ্টা প্যারীচাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্যারীচাঁদ তখনকার মনীষীদের তুলনায় কোনদিক থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। মনীষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সৃজনক্ষম প্রতিভা। ভাষা বিষয়ে সচেতনতা এবং মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা—প্যারীচাঁদের এই দুই বিশেষত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের হাতে যে ভাষা গড়ে উঠেছিল তা সুমধুর ও মনোহর হলেও সর্বজনবোধগম্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে "সংস্কৃত বা ইংরেজী গ্রন্থের সার সংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাংলা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বাঙালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না।" "এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙালী-কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরেজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহ-যোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়, এই পত্রিকায় "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।" অর্থাৎ কথ্যরীতির গদ্যই হবে এই পত্রিকার সমস্ত রচনার ভাষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার সঙ্গে সাধারণ বাঙালী পাঠকদের পরিচয় সাধনের জন্য সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে প্যারীচাঁদ এইভাবে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন। এই পত্রিকাতেই তিনি **টেকচাঁদ ঠাকুর** ছদ্মনামে ধারাবাহিকভাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ করেন। **'আলালের ঘরের দুলাল'** বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস, স্বাধীন কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং কথ্যভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "উহাতেই প্রথম এ বাংলাদেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংলা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্বজন হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা

প্যারীচাঁদ মিত্র

আলালের ঘরের দুলাল
(১৮৫৮)

জানিতে পারা বাঙালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাংলা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে।" আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ ভাষা নয়। কিন্তু এই গ্রন্থেই প্রমাণিত হয় যে লোক-প্রচলিত বাংলা ভাষাও ভাব প্রকাশের দিক্ থেকে সংস্কৃতনির্ভর ভাষার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। প্যারীচাঁদের প্রভাবে পরবর্তী লেখকেরা সংস্কৃত রীতি এবং কথ্যরীতির গদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে আদর্শ গদ্যভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণেই বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। কথ্যভাষাশ্রয়ী ভাষাভঙ্গিতে কলকাতার নাগরিক জীবনের পরিবেশকে কত বাস্তব ও জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে, আলালের ঘরের দুলালে'র এই বর্ণনায় তার উদাহরণ মেলে: 'রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস ২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুহু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি হইয়া পরস্পর মনের কথা কহিতেছে।

শুধু ভাষার দিক থেকে নয়, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস-রূপেও ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন রচনা। ইতিপূর্বে সামাজিক নক্শা-জাতীয় রচনাগুলিতে (যেমন ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস') উপন্যাসের অস্পষ্ট পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত উপন্যাস রচিত হয়নি। সমাজপটে ব্যক্তি চরিত্র স্থাপন করে একটা নির্দিষ্ট কাহিনীর বন্ধনের মধ্যে বাস্তব জীবনচিত্র পরিস্ফুট করা উপন্যাস শিল্পের প্রাথমিক দায়িত্ব, বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদই প্রথম সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা একটা নির্দিষ্ট, পূর্ণায়ত কাহিনী 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে উপস্থাপন করলেন। বড়লোকের আদুরে ছেলে মতিলালের পদস্খলনও শেষে সৎপথে ফিরে আসা উপন্যাসটির মূল প্রসঙ্গ, ঘটনাগুলি মতিলালকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ঠকচাচা নামক চরিত্রটিই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ঠকচাচা উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; উহার মধ্যে কূট কৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে যে, পরবর্তী উন্নত শ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা আনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সঙ্গীতপ্রিয়তায়, কেহ বা কোন বিশেষ বাক্যভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে—স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে।...কৃত্রিম সাহিত্যরীতি অর্জন ও কথ্যভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে 'আলাল'-এর বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কণ আরও বাস্তব রসসমৃদ্ধ হইয়াছে।"

বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস

প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মদ-খাওয়া বড় দায়', 'জাতি থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬১), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিক' (১৮৮০)।

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনার রীতি অনুসরণ করেছিলেন **কালীপ্রসন্ন সিংহ** (১৮৪০-১৮৭০)। প্রায় কিশোর বয়স থেকে কালীপ্রসন্ন বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একটিমাত্র গ্রন্থ রচনা করে কালীপ্রসন্ন বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, সেই গ্রন্থ **হুতোম প্যাঁচার নকশা** (১৮৬২)। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থে.ক কলকাতার সমাজে 'বাবু' নামে অভিহিত একশ্রেণীর বিত্তবান মানুষের আধিপত্য দেখা দেয়। নীতিহীন বিলাস-ব্যসন এবং কুরুচিপূর্ণ আমোদ-প্রমোদে তাদের দিন কাটত। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনায় তারা আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় এই শ্রেণীর মানুষের বিকৃত জীবনযাত্রা এবং সাধারণভাবে কলকাতার সামাজিক আবহাওয়ার বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে। শুধু কথ্যভাষার ভঙ্গিই নয়—শব্দ ব্যবহারেও তিনি চলতি ভাষার ভাণ্ডারের ওপরেই একান্তভাবে নির্ভর করেছেন। প্যারীচাঁদের ভাষায় বহু ক্ষেত্রে সাধুভাষার ক্রিয়ারূপ এবং বাক্য গঠনের সাধুরীতি অনুসরণ করা হয়েছে দেখা যায়। কালীপ্রসন্ন কোথাও সাধুরীতি অনুসরণ করেন নি। চড়কতলার মেলার তাই বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব ও মজার: 'এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রংকরা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেচে, "ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের কোল বাজে, গোলাপিখিলির দোনা বিক্রি হচ্ছে।'

হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২)

প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহ একান্তভাবে চলতি ভাষার ওপরে নির্ভর করবার যে দুঃসাহস দেখালেন তার ফলে সংস্কৃত-নির্ভর গদ্যের সঙ্গে কথ্যরীতির গদ্যের সামঞ্জস্য বিধানের একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দিক্ থেকেই প্যারীচাঁদের রচনার গুরুত্ব নির্দেশ করে বলেছেন: "বাংলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় উপযুক্ত ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার দ্বারা, আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারিচাঁদ মিত্র আদর্শ বাংলা গদ্যের স্থষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে প্যারিচাঁদ প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।"

[নয়] ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর রচনাবলীর পরিচয় দাও এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন, "ভূদেব চরিত্রের মূলসূত্র তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও

আত্মবিসর্জন করিয়া পাশ্চাত্ত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। একদিকে বিলাতী শিক্ষার নয়নান্ধকারী উজ্জ্বল চাকচিক্য, অন্যদিকে স্বদেশীয় ধর্মশাস্ত্রের নির্বাণোন্মুখ বিকৃত বহিরালোক, ভূদেব উভয়ের একটিকেও নিজের লক্ষ্য করেন নাই। বিচারকুশল প্রাচীনকালের প্রবীণ আর্যের ন্যায়, নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তির সাহায্যে উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্বভৌম উদার আলোকে উভয়কে বুঝিয়াছিলেন, চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্য পথের নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।” এই বিশ্লেষণ যথার্থ। ভূদেব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি শিক্ষালাভ করেন তখনকার দিনের প্রগতিশীলতার পীঠস্থান হিন্দু কলেজে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য সেকালের শিক্ষিত যুবকদের মনে কি ধরনের মোহ বিস্তার করত তা ভূদেবের সহপাঠী মধুসূদন দত্তের জীবনী থেকে জানা যায়। কিন্তু এই ঘোরতর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও ভূদেব নির্বিচারে পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণ করেন নি। তিনি নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত মন নিয়ে যুক্তির পথে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শসমূহের সত্যাসত্য বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভঙ্গি আধুনিক, কিন্তু নির্বিচারে আধুনিকতার সবকিছু মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই কারণে সমকালীন প্রধান পুরুষদের তুলনায় তাঁকে কিছুটা রক্ষণশীল, কিছুটা প্রাচীনপন্থী মনে হয়। কিন্তু ভূদেবের রচনাবলী পাঠ করলে মনে হয়, যে জীবনাদর্শ তিনি মেনে চলেছেন তা অন্ধ সংস্কারভিত্তিক নয়, যুক্তি-বিচারের ওপরেই তার ভিত্তি। এই প্রখর যুক্তিবাদিতার জন্যেই তাঁর রচনার ভাষাও হয়ে উঠেছে ভাবাবেগ-বর্জিত language of reason। ভাষার নিজস্ব সৌন্দর্যের চেয়ে বক্তব্যের যুক্তি-পারম্পর্য সঠিকভাবে প্রকাশের ক্ষমতাই এই ভাষার প্রধান গুণ। যুক্তির গ্রন্থনে বাক্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে এক-একটা অনুচ্ছেদ বক্তব্যের এক-একটা স্তরকে স্পষ্ট এবং আকারবদ্ধ করে তোলে। বিচার-বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ রচনায় ভূদেব অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে এত বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর আর কোন লেখক লেখেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সকল প্রাবন্ধিকই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মানসিকতা ও চরনাবীতি

বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যস্ত করে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনাই প্রথমে প্রকাশিত হয় ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রিকায়। প্রবন্ধ সংকলনগুলির নাম—‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ (১৮৮২), ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ (১৮৯২), ‘আচার প্রবন্ধ’ (১৮৯৪) এবং ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (১ম খণ্ড—১৮৯৪, ২য় খণ্ড—১৯০৫)। এ ছাড়া

ভূদেব রচনাবলী

তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম বই 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬) শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ক, পাঠ্যপুস্তকরূপে সমাদৃত 'পুরাতত্ত্বসারে' (১৮৫৮), পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন পারসীকদের বিবরণ পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা পাই। ভূদেব-রচিত অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক হল, 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ইংলণ্ডের ইতিহাস', 'গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস' ইত্যাদি। 'আচার-প্রবন্ধে' ভূদেব হিন্দুশাস্ত্র ও লোকাচার-সম্মত নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। যে শিক্ষায় নারী সুগৃহিণী হতে পারে, সেটাই পারিবারিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দু সমাজ গঠনের বৈশিষ্ট্য, ইংরেজের সম্পর্কে বাঙালি কি ভাবে উপকৃত হতে পারে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'আচার প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'পুষ্পাঞ্জলি'—এই প্রবন্ধ পুস্তকগুলির জন্য হিন্দু সমাজের উপদেষ্টা ভূদেবচন্দ্রকে বাঙালি অনেকদিন স্মরণে রেখেছিল।

ভূদেবের রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান গ্রন্থ **ঐতিহাসিক উপন্যাস**-এর (১৮৫৭) কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি দুটি ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয় সংক্ষিপ্ত রচনার সংকলন। কাহিনী দুটির নাম 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। বিষয়বস্তু 'Romance of History' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, কিন্তু রচনাভঙ্গিতে মৌলিকতা আছে। বিশেষভাবে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক আখ্যানটি পূর্ণাঙ্গ এবং উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত। এর ভাষা বিদ্যাসাগর-এর বর্ণনাত্মক গদ্যের অনুবর্তী। অনেক সমালোচক মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছেন। সামাজিক উপন্যাস-এর সূচনা প্যারীচাঁদ-এর 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে, আর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হয়েছে ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' থেকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বাধীন কল্পনামূলক রচনা হিসেবে 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৪) বইটার নামও উল্লেখযোগ্য। রচনাটি প্রথমে এডুকেশন গেজেটে ৭ই কার্তিক ১২৮২ সাল থেকে পুস্তকাকারে ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে নায়কেরা যদি জয়লাভ করত, তবে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের রূপ কী হত, তারই একটি গৌরবমণ্ডিত কাল্পনিক চিত্র স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুলে ধরা হয়েছে। ভাষা সংস্কৃত-অনুযায়ী হওয়া সত্ত্বেও সহজ স্বচ্ছ ও লালিত্যপূর্ণ। ভূদেবের গদ্য রচনায় প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপ যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য স্মরণীয়: "রামমোহন ও অক্ষয়কুমার যেমন যুক্তিবাদের দ্বারা উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্মের গ্রহণীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ভূদেব সেই যুক্তি-প্রয়োগেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যে সাধারণতঃ মনন-প্রধান তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি ইহারই পিছনে এক অবরুদ্ধ-সংযত আবেগ, এক আদর্শস্বপ্নচারী ভাষাশিল্প ঈষৎ আভাসিত হইয়া প্রবন্ধগুলির উপর একটি অনতিস্পষ্ট কাব্যব্যঞ্জনা আরোপ করিয়াছে।"

৬ [দশ] বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও আধুনিক সাহিত্যের গঠনে ইহার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। গদ্যভাষার মাধ্যমে এবং মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা ভিন্ন কোন ভাষায় সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয় না। বাংলা মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তক শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়। বাংলা গদ্যচর্চায় এদের উৎসাহের কথাও সর্বজনবিদিত। এই মিশনারীরাই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা গদ্যরীতির সরলীকরণে ও উন্নয়নে সাময়িক পত্রের দান অসামান্য, এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রের বিকাশধারা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় এক-একটা সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং এইসব পত্রিকা-গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ বিশেষ বিশেষ যুগের ধ্যান-ধারণার নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বকে এইসব সাময়িক পত্রের নামে চিহ্নিত করা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী, 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি এইরূপ এক একটা যুগ-প্রবর্তক পত্রিকা। আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই আমরা ইংরেজদের কাছে ঋণী। সাময়িক পত্রেও ইংরেজ মিশনারীরাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

সাময়িক পত্র আধুনিক গদ্যভাষার প্রধান মাধ্যম

শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত **দিগদর্শন** প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। মার্শম্যানের সম্পাদনায় এই বছরে মে মাসেই **সমাচার দর্পণ** সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের সাংবাদিকতা এবং সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সমাচার দর্পণ'-এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৩৫ বছর কাল এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদনায় মার্শম্যানকে সহায়তা করতেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রভৃতি সংস্কৃত পণ্ডিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের সামাজিক ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলিতে সঞ্চিত হয়ে আছে। এর পরিচালকগণ খ্রীষ্টান মিশনারী হলেও প্রত্যক্ষভাবে ধর্মপ্রচারের কাজে পত্রিকাটিকে ব্যবহার করা হয়নি। সমকালীন সমাজজীবনের বহুমুখী স্রোতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার ফলে এবং সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য হবার প্রয়োজনে সমাচার দর্পণের ভাষা যে কত সহজ, প্রাঞ্জল ও গতিশীল ছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। সমাচার দর্পণে প্রকাশিত 'বাবু' বিষয়ক ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা পরবর্তীকালের সামাজিক ব্যঙ্গমূলক নক্‌শা প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালের' প্রেরণার উৎস।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ

কলকাতা থেকে বাঙালীর সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র **বাঙ্গাল গেজেটি** (সাপ্তাহিক)। শ্রীরামপুর ছাপাখানার একজন প্রাক্তন কর্মচারী গঙ্গাকিশোর

ভট্টাচার্য এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় রামমোহন রায়-কর্তৃক প্রকাশিত **ব্রাহ্মণ সেবধি** পত্রিকার কথা। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় তার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হত। খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মসংক্রান্ত বিচার-বিতর্কই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

বাঙ্গালীর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকার প্রথম ভাগ

রামমোহন-যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণের **সম্বাদ কৌমুদী** (ডিসেম্বর, ১৮২১) সেই সময়ে হিন্দু সমাজের মুখপত্র ছিল। রামমোহন রায় প্রথমাবধি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর বহু প্রগতিশীল মতবাদ এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। ক্রমে ধর্মবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ভবানীচরণ 'সম্বাদ-কৌমুদী' পরিত্যাগ করে যান এবং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে **সমাচার চন্দ্রিকা** প্রকাশ করেন। সমাচার চন্দ্রিকার পর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত বঙ্গদূতের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার এবং পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইত্যাদি। ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গৌরীশংকর তর্কবাগীশ সম্পাদকীয় কাজ করতেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারীর পর পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাঙলায় প্রকাশিত হতে থাকে, প্রায় দশ বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বাঙলার নবজাগরণের একটি দিগ্‌দর্শনরূপে পত্রিকাটির মূল্য স্বীকার করতে হয়। এই পত্রিকাগুলির মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়। রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রভাবে সমাজের মধ্যে যে নানামুখী বিচার-বিতর্ক আলোড়িত হচ্ছিল স্বভাবতই পত্রিকাগুলির রচনায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এইসব বিচার-বিতর্কের সূত্রেই নবগঠিত বাংলা গদ্য বৃহৎ জন-সমাজের চিন্তা ভাবনার বাহন হয়ে ওঠে। পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী থেকে বাইরে এসে বাংলা গদ্যকে সচল জীবন-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে এই পত্রিকাগুলি গদ্যভাষার বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলা সাময়িক পত্রিকার এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয় **সংবাদ প্রভাকর** থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনা পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে তিনি একটি উন্নত আদর্শ সম্মুখে রেখে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটিকে তিনি শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন এবং ধর্ম-বিষয়ক বিতর্কের মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে সাহিত্যচর্চার মাধ্যম করে তুললেন। বিশেষ কোন ধর্মমত বা সংস্কারমূলক আন্দোলনের মুখপত্ররূপেই এর আগে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর' সংবাদ পরিবেশন বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এবং সামগ্রিক সমাজচিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করে। এর সঙ্গে

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৩১

'সংবাদ প্রভাকর'-এর একটা বড় আকর্ষণ ছিল সাহিত্যিক রচনাবলী। এই পত্রিকায় ঈশ্বর গুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যের সংকলন প্রকাশ করতেন। প্রাচীন কবিদের জীবনী সম্পর্কিত আলোচনা এবং সমসাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা দ্বারা তিনি নব্যবঙ্গের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর মতো প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের তিনিই সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নব্য-বাংলার সাহিত্যচর্চার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা ক্রমে সংগঠিত হয়ে ওঠে। এদিক্ থেকে সংবাদ প্রভাকরের ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী যুগে ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা সাহিত্যে নায়কত্ব করেছেন। ১৮৩৯-এর জুন থেকে সংবাদ প্রভাকর দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে, বাংলা ভাষায় সংবাদ প্রভাকরই প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব বহনের জন্য তিনি একটা 'পেপার কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশ করলেও দেবেন্দ্রনাথ দল-মত-নির্বিশেষে প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের এই পত্রিকা পরিচালনার কাজে আহ্বান জানান এবং সব ব্যাপারে নিজ মতের অনুবর্তী না হওয়া সত্ত্বেও সম্পাদক অক্ষয়কুমারকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার দেন। প্রধানত অক্ষয়কুমারের চেষ্টাতেই পত্রিকাটি সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানচর্চার প্রধানতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। বঙ্কিম-পূর্ব যুগের প্রধান লেখকদের মধ্যে অনেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী একটা প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকায় পরিণত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ই প্রথম জটিল ও গভীর জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় বাঙলা গদ্যের শক্তি সামর্থ্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়। ডিরোজিও-র শিষ্য রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ং-বেঙ্গলরা বাঙলা সাময়িক পত্রিকাগুলিতে গালিগালাজের কুৎসিত প্রতিযোগিতা চলত বলে ঘৃণায় তাদের স্পর্শ করতেন না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মননোজ্জ্বল রচনাগুলিই তাঁদের বাংলা রচনা পাঠে উদ্বুদ্ধ করে। এই পত্রিকা মননের ক্ষেত্রে বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
১৮৪৪

বাঙলা গদ্য সাহিত্যে সাময়িক পত্রের দান সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে বলেছেন: 'কোন দেশেই সংবাদপত্র, এমনকি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাও, সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পায় না। বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের স্থান নির্দেশ করিতে হইতেছে তিনটি বিশেষ কারণে—(১) গদ্যরীতির সরলীকরণে ও উন্নয়নে ইহার উল্লেখযোগ্য

অংশ আছে ; (২) ধর্মবিষয়ক বিচার বিতর্ক, আক্রমণ ও জবাবের ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অবতারণা করিয়া ইহা বাংলার মনীষা ও লিপিকুশলতাকে পুষ্ট করিয়াছে ; এবং (৩) সমাজের উৎকেন্দ্রিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিয়া ইহা বাংলা বিদ্রূপাত্মক উপন্যাসের প্রেরণা জোগাইয়াছে—এখানেই সাহিত্যের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন এই সাংবাদিকতার সূত্র ধরিয়াই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

[এগার] বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর দানের মূল্য বিচার কর।

উত্তর। 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রচার'—এই দুটি পত্রিকার প্রধান লেখকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রবন্ধ রচনা করেন তা বিষয়বস্তু এবং ভাষা-ভঙ্গির বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই তাঁর অবাধ গতি ছিল। প্রতিটি বিষয়ই তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন এবং নিজস্ব চিন্তার বিশিষ্টতায় নিজের মতো করে সেই বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এইজন্যেই তাঁর কোন রচনাকেই নিছক সার-সংকলন বা অপরের দ্বারা উদ্ভাবিত বিষয়ের চর্বিতচর্বণ বলে মনে হয় না। প্রতিটি রচনাই তাঁর প্রখর মনীষার আলোকে দীপ্ত। আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের দুরূহতম বিষয় বাংলা ভাষায় বিচার-বিশ্লেষণ করে মানুষের মনন-চিন্তনের ভাষারূপে বাংলা গদ্যের সামর্থ্য তিনি অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করেছেন। তাঁর এই বিচিত্র বিষয়-আশ্রিত রচনাগুলি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা যায়—(১) জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রবন্ধ, (২) সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, (৩) ধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কিত রচনা, (৪) ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসমূলক রচনা।

[এক] জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দুই খণ্ড ১৮৮৭ ও ১৮৯৩) এবং 'সাম্য' (১৮৭৯)—এই তিনটি গ্রন্থের সংকলিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে যথাযোগ্য স্থান করে নিতে হলে ভারতে বিজ্ঞান-সাধনা যে অপরিহার্য—বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস ছিল। বাংলা দেশে মানুষের মনে বিজ্ঞান-বিষয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার জন্যে বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। 'বিজ্ঞান রহস্য' গ্রন্থ এইসব প্রবন্ধেরই সংকলন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে।" 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের বিষয়বস্তু নানা শ্রেণীর। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য ও রাজনীতির নানা প্রশ্ন নিয়ে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও প্রধান লেখকরূপে প্রায় সকল বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্রকে অবিরত লিখতে হত। "বিবিধ প্রবন্ধের বিপুল প্রবন্ধাবলীতে নিষ্ঠাবান সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে আছে। দেশের মানুষের

জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রবন্ধ

আগ্রহ ও কৌতুহল আধুনিক মানব-বিছার সকল দিকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার আগ্রহ থেকেই এই গ্রন্থাবলীর সৃষ্টি।" 'সাম্য' সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

[দুই] রবীন্দ্রনাথের কথায় "রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" নিজের রচনার দ্বারা বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে একটি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সেই আদর্শ যাতে অন্যান্য লেখকদের রচনায়ও অক্ষুণ্ণ থাকে সেইজন্যেই তাঁকে সাহিত্য সমালোচকের কাজ করতে হত। প্রধানতঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকার পুস্তক পরিচয় অংশটিতেই তিনি সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা করতেন। তাঁর সমালোচনামূলক রচনার মধ্যে এক অংশ দেশী এবং বিদেশী চিরায়ত সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে 'উত্তর চরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক সাহিত্য-সম্পর্কিত রচনার মধ্যে দীনবন্ধু, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে গভীর আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রই শুরু করেন। তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যে সাহিত্য বিচারের একটা নির্দিষ্ট নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন রচনার মূল্য বিচারে তিনি চিরায়ত বা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের মান ব্যবহার করেছেন।

সাহিত্য সমালোচনা

[তিন] বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম ও দর্শন চিন্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯২) এবং 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) গ্রন্থে। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিশেষভাবে দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম ও অগস্ট কোঁতের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরিণত বয়সে তিনি যখন হিন্দুদর্শন সম্পর্কে গভীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন তখনও অনেক পরিমাণে বেন্থাম ও কোঁতের প্রভাবেই তাঁর চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মানুষের সর্ববিধ গুণের সামঞ্জস্যপূর্ণ মনুষ্যত্বের উপলব্ধিই ধর্ম সাধনার লক্ষ্য—বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক চরিত্ররূপে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে স্বাধীন যুক্তির দ্বারা তিনি কৃষ্ণচরিত্রের অলৌকিক অংশ পরিবর্জন করে চরিত্রটিকে আপন আদর্শের প্রতিভূরূপে মহত্তর মানুষরূপে চিহ্নিত করেছেন। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তিনি আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। ধর্মগ্রন্থের প্রতিপাদ্য—মানুষের শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, স্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্বলাভ সম্ভব হয়। এই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম।

ধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কিত রচনা

[চার] পত্রিকা সম্পাদন করতে হলে সকল শ্রেণীর পাঠকের রসরুচির তৃপ্তি সাধনের দিকে নজর রাখতে হয়। শুধু তত্ত্বমূলক আলোচনা দ্বারা কোন পত্রিকা যে সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রিয় হতে পারে না—তা বঙ্কিমচন্দ্র ভালোভাবেই জানতেন। এজন্য বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যায় লঘু উপভোগ্য রচনা প্রকাশ করা হত। এই রচনাগুলিই 'লোকরহস্য' (১৮০৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর'

হাস্যরসাত্মক রচনা

(১৮৭৫) এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' (১৮৮৪) এই তিনটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। হয়তো বা নিছক পাঠকদের চিত্ত বিনোদনের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের হাস্যরসাত্মক রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার এক নতুন শক্তি বিকশিত হয়ে উঠেছে। হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে চিরকাল অপাংক্তেয় ছিল। অশ্লীলতা এবং ভাঁড়ামি ভিন্ন যে হাস্যোদ্রেক করা যেতে পারে তা প্রাচীন বাংলার কোন লেখক কল্পনাও করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসকে অশ্লীলতার কলুষমুক্ত করেছেন। যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেও উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তি প্রয়োজন। মানব স্বভাবের নানাবিধ অসঙ্গতি এবং মানব জীবনের নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেই প্রকৃত হাস্যরস নিহিত থাকে। হাস্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তাই জীবন-সত্য এবং জীবন-রহস্যের গূঢ় রহস্য উন্মোচিত করে দেখানো যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে এই উচ্চমানের হাস্য-রসাত্মক রচনা প্রবর্তন করেন। 'লোকরহস্য'র খণ্ড খণ্ড রচনায় এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' আধুনিক বাঙালী জীবনের নানা অসঙ্গতি হাস্যকরুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর'। নেশাখোর অর্ধ-উন্মাদ কমলাকান্তের ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তা আপাত হাস্যকর হলেও এই রচনাগুলির মূলে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী গভীর দার্শনিক চিন্তার ফল। বঙ্কিমের দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ঐতিহ্যপ্রীতি, ধর্ম ও নীতিবোধ—তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার নানাদিক এই গ্রন্থে কমলাকান্তের বিসদৃশ চরিত্রের হাস্যকর আচার-আচরণ এবং উদ্ভট ভাবভঙ্গিতে অতি বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে গদ্যভাষায় যা রচিত হয়েছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়; লেখকের সংখ্যাও কম নয়, অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময়ব্যাপী এই অনুশীলনে গদ্যভাষার একটা বনিয়াদ নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। একদিকে রামমোহন অক্ষয়কুমারের রচনায় জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্যের একটা রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অপরদিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের আদর্শ রূপ বিদ্যাসাগরে একটা পরিণতি লাভ করেছে। এর সঙ্গে ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের হাতে কথ্য-ভাষারীতি ব্যবহারেরও একটা পরীক্ষা চলে এসেছে। এই পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। অতএব একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিতান্ত অপ্রস্তুত ভূমিতে পদার্পণ করেন নি। তাঁর পরেই বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। এইসব পত্র-পত্রিকায় মনীষী লেখকবৃন্দ প্রবন্ধাদি রচনা করে একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছেন। এই পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ায় নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কাজ শুরু করা সহজ হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে নতুন অধ্যায় রামমোহন থেকে সূচিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র আপন মৌলিক প্রতিভার শক্তি দ্বারা তা সুসম্পূর্ণ করে তুললেন। তিনি নতুন করে কিছু শুরু করেন নি, যা ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল তাই তাঁর প্রতিভার স্পর্শে পরিপূর্ণতা লাভ করল। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি মূলতঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলী

বিদ্যাসাগরের রচনারীতির ওপরে নির্ভর করে ক্রমে একটা নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসাগরের বর্ণনাত্মক গদ্য বাংলা কথ্যভাষার তীক্ষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্যের সামঞ্জস্যে মিলিত হয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অন্বয়ে তিনি প্রাঞ্জলতা এনেছেন। বাক্যগুলিও যথাসম্ভব ছোট এবং গতিশীল। অসমাপিকা ক্রিয়া যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নাত্মক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের মননক্রিয়া সজাগ রাখা বঙ্কিমের রচনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনো-বা তিনি পাঠককে সম্বোধন করে নিবিড়তর ভঙ্গিতে কথা বলেন। বর্ণনায় নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইসব গুণের জন্যই তাঁর হাতে বাংলা গদ্যের ভারবহন ক্ষমতা এবং স্পর্শবোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাষার অসাড়তা ঘুচে গিয়ে সচল প্রাণাবেগ দেখা দিয়েছে। এই গদ্য মানুষের সূক্ষ্ম ও গভীরতম অনুভূতি, প্রবল হৃদয়াবেগ বা শাণিত বুদ্ধির গতিবিধি আনায়াসে অনুসরণ করতে সক্ষম। যথার্থ মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রাতভার স্পর্শ ভিন্ন কোন ভাষা যথার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বাংলা গদ্যভাষা প্রথম সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শ লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রে। তাঁর হাতে বাঙলা গদ্য সাহিত্য যে ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ পূর্ণতা লাভ করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থভাবেই নির্দেশ করেছেন : 'ইহার স্থূল প্রয়োজনাত্মক উচ্চারণ-শ্লথতার মধ্যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-তির্যগ ভাষণের তীক্ষ্ণতা, পরিহাস-রসিকতার চমক, আবেগময় ভাবমুগ্ধতা, গীতিকবিতার সুর উচ্ছ্বাস, জীবন-পর্যালোচনার অন্তরঙ্গ অন্তর্মুখিতা, ক্ষোভ-অনুযোগ-আশা-নৈরাশ্যের সম্মিলিত ঐকতান-মানবকণ্ঠের সমগ্র সুর-গ্রাম, অনুভূতির সর্বসঞ্চারী ভাবসমষ্টি আপনাদের যথাযথ বাক্ ছন্দটি খুঁজিয়া পাইয়াছে।'

[বারো] বাঙলা গদ্য সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। মাত্র তিরিশ বৎসরের স্বল্পায়ু জীবনে (১৮৪০-৭০খ্রীঃ) কালীপ্রসন্ন সিংহ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নবরূপ নির্মাণে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা স্মরণ করতে হয়। কালীপ্রসন্ন যখন চতুর্দশবর্ষীয় তরুণ, তখনই তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা সাহিত্যচর্চার জন্য যে সভা প্রতিষ্ঠা করেন, সেটিই পরে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রূপ নেয়। সমাজসেবা তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা সাহিত্যের চর্চা এবং সাহিত্যিকদের বিভিন্ন উপায়ে উৎসাহ দান। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজের রচিত কবিতা প্রবন্ধাদি এখানে পাঠ করতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষীরা এই সভার সভ্যরূপে তার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। সেকালের বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষা-বিদেরাও কেউ কেউ আমন্ত্রিত হয়ে এই সভায় ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন। সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' সদস্যদের রচনা নিয়ে প্রতি মাসে প্রকাশিত হত। বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি সভার একটি অনুষ্ঠানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য পাদ্রী জেম্‌স্

লঙ যখন দণ্ডিত হন তখন বিচারকক্ষে তাঁর জরিমানার এক হাজার টাকা কালীপ্রসন্নই দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সর্ববিধ উপায়ে সাহায্য দান করেছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গ-মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চে রামানারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটক', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক ও সাবিত্রি-সত্যবান নাটক অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন তাঁর 'হুতোম প্যাচার নকশার' (১৮৬১) জন্যই বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এটি তাঁর রচনা নয়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। এই অভিমতের প্রতিবাদও কেউ কেউ করেছেন! যতদিন না এই সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন কালীপ্রসন্ন সিংহকেই 'হুতোম প্যাচার নকশা'র লেখকরূপে স্বীকার করতে হবে। কালীপ্রসন্ন এই নকশায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'কে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মাত্র সাধুগদ্যের কাঠামোয় চলিত ভাষা প্রয়োগ করেন, কলকাতার সমকালীন কথ্যভাষায়ই তার সমস্ত নকশাগুলি রচনা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারের সূত্রে এক শ্রেণীর বাঙালি দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান প্রভৃতির কাজে বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করেছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষাহীন বংশধরদের ভোগবিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, কুৎসিত আমোদপ্রমোদ ইত্যাদির ব্যঙ্গাত্মক রেখাচিত্রই কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাচার নকশা'য় অঙ্কিত করেছেন। বাবু নামে অভিহিত এই ধনীসন্তানদের ভোগবিলাস ও আমোদপ্রমোদে পংকিল জীবনযাত্রা সে-যুগের কিছুসংখ্যক নাটক ও নকশার উপজীব্য হয়েছিল। আধুনিক সমাজ সচেতনতাপ্রসূত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে সমাজের পর্যবেক্ষণে এবং বাস্তবচিত্রণ দক্ষতায় তাদের মধ্যে 'হুতোম প্যাচার নকশা'র শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। কলকাতার রাস্তাঘাট, বিভিন্ন উৎসবপার্বণ, বড়মানুষদের বিকৃতরুচি ইত্যাদির চিত্র এত বাস্তব ও জীবন্ত যে 'হুতোম প্যাচার নকশা'কে সমকালীন কলকাতার সমাজের দলিলরূপে গ্রহণ করা হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সাতজন পণ্ডিতের সাহায্যে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে (১৮৬০-৬৬) বেদব্যাসের মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাতে ক্ষান্ত হন। বিদ্যাসাগরের প্রেরণায়ই কালীপ্রসন্ন এই কঠিন শ্রমসাধ্য বিরাট কাজে অগ্রসর হন। বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করেন। বাঙলায় অনুদিত মহাভারতে তিন হাজার কপি ছাপা হয়েছিল, এই বই বিনামূল্যে বিতরণ করে তিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় দেন।

[তেরো] বাঙলা গদ্যসাহিত্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

উত্তর। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশিষ্ট ও অনন্ত স্থানের

অধিকারী। ছাত্রজীবনেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। পুরাবৃত্ত চর্চায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছেই তাঁর দীক্ষা, রাজেন্দ্রলালের প্রভাবেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল। আমরা তাই হরপ্রসাদের রচনাবলীতে একাধারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যিক গুণের সমন্বয় ঘটতে দেখি। হরপ্রসাদ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাবিদ্‌রূপেই তাঁর খ্যাতি। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁর বহু প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। বঙ্কিম যুগের লেখকদের মধ্যে তাঁর মত এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এমন বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ আর কোনও লেখক রচনা করেননি। সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাণ্ডিত্য ও তথ্যের ভারে নীরস, আড়ষ্ট এবং সাধারণ পাঠকদের কাছে দুরূহ হয়ে থাকে। শাস্ত্রীমশাইয়ের প্রবন্ধগুলি এই ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তার কারণ, প্রথমত, ইতিহাস তাঁর কাছে শুধু সন তারিখের হিসেব ও তথ্য সংগ্রহ ছিল না, একটি যুগের জীবনাচরণের বহু বিচিত্র দিক, সাধারণ মানুষদের জীবনবোধ ও জীবনযাত্রা, তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির মধ্যেই তিনি ইতিহাসের প্রাণবন্ত রূপ সন্ধান করতেন। দ্বিতীয়ত, নিজের পাণ্ডিত্যের উচ্চচূড়ায় বিচ্ছিন্ন না হয়ে থেকে সাধারণ পাঠকদের হৃদয়মনের কাছে পৌঁছোবার ঐকান্তিক আগ্রহে সাধুভাষার কাঠামোয়ই কথ্যভাষার আশ্চর্য রকমের সজীব বাক্-ছন্দের ব্যবহার। তাঁর প্রবন্ধগুলির অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার ভাষার সহজ সরল সৌন্দর্য, স্বচ্ছতোয়া নদীর মত তার গতি এবং তার প্রসন্ন কৌতুকবোধ সমস্ত প্রবন্ধগুলিকে যেভাবে হার্দ্য ও রমণীয় করে তুলেছে বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদের বিশিষ্টতা নির্দেশ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষায় একজন প্রধান নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি কেবল ইতিহাস ও সাহিত্য লইয়াই নহে, উপরন্তু আধুনিক বাঙালির জীবনের ছোটো-খাটো নানা সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে লক্ষণীয় তাঁহার বিচারশৈলীর যৌক্তিকতা, তাঁহার রচনাভঙ্গির সাবলীলতা, এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার রোচকতা, এবং সর্বোপরি, তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা বাংলার এক অপূর্ব সম্পদ। যতই গভীর বিষয় হোক না কেন, প্রকাশভঙ্গি এমনই স্বচ্ছ, সহজ ও সর্বজনবোধ্য হওয়া উচিত যাহাতে বক্তব্য অনায়াসে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই পৌঁছিতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার লেখায় এই গুণ যে সহজভাবে প্রকটিত হইত তাহার পিছনে ছিল সহজভাবে কথা প্রসঙ্গে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার তাঁহার অসামান্য শক্তি।"

'বেনের মেয়ে' (১৯২২) ও 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬) উপন্যাসে হরপ্রসাদ তাঁর সৃষ্টিশীল

সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'বেনের মেয়ে' সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণীয় : "হরপ্রসাদের শেষের দিকে লেখায় রচনাভঙ্গি বেশ সরল, লঘু ও দ্রুতগতি হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলে ইহার শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা রচনা 'বেনের মেয়ে' নামক ঐতিহাসিক আখ্যাচিত্রে। বেনের মেয়ের বইটির পাত্র-পাত্রী প্রায় সবই কাল্পনিক হইলেও পরিবেশ জমাটভাবে ঐতিহাসিক। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রামের এক ধনী বৌদ্ধ পরিবারের চিত্র এবং স্থানীয় উৎসবাদির উজ্জ্বল বর্ণনা ইহাতে আছে। এই অজ্ঞাত যুগের দৃশ্য এমন জ্বলন্তভাবে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ চিত্রিত করা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অপর কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচনায় দেখি নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গির ইতিহাসে 'বেনের মেয়ের' একটি বিশেষ স্থান আছে।"

[চোদ্দ] মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর পরিচয় দাও।

উত্তর। মীর মশাররফ হোসেন বাঙলা ভাষায় একজন বিশিষ্ট লেখক। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর নদীয়া জেলার লাহিড়ীপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর কালে বাঙলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে মুসলমানেরা বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন নি। ছাত্রাবস্থায়ই মশাররফ হোসেন বাঙলা ভাষায় রচনার সম্পর্কে উৎসাহী হন। তিনি এই সঙ্গে তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন : "কলিকাতার 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সহকারি সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করে ছাপাইতেন। আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন— 'আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা', কেউ জানিত না যে আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা। সাদাসিদাভাবে লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন।" কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্ত্তা'র সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। মশাররফ হোসেন 'আজীজন নেহার' নামে একটি মাসিকপত্রও কিছুদিন সম্পাদন করেছিলেন।

মীর মশাররফ হোসেন প্রায় ছাব্বিশটির মত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস 'রত্নাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। লোককাহিনী থেকে রত্নাবতীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল। 'বসন্তকুমার নাটক' (১৮৭৩), 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) নাটক এবং প্রহসন 'এর উপায় কি ?' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিন অঙ্কে বিভক্ত 'জমিদার দর্পণে'র বিষয়বস্তু গ্রামের এক মুসলমান জমিদারের অত্যাচার-কাহিনী। নাট্যকার মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অনুসরণ করেছিলেন। নামকরণে বোঝা যায় 'নীলদর্পণে'র প্রেরণাও ছিল। সমাজের বাস্তবচিত্র হিশেবে নাটকটির কিছু মূল্য আছে। 'গোজীবনে' (১৮৮৯, ৮ই মার্চ) লেখক হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জন্য মুসলমানদের গরু না খেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভারতী ও বালক পত্রিকায় (চৈত্র, ১২৯৫) এই রচনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল; "লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন যেরূপ অপক্ষপাতিভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন

তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি, অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।" 'উদাসীন পথিকের কথা' (১৮৯০) ও 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) উপন্যাস। প্রথমটিতে পাই চা-করদের বৃত্তান্ত, নীলচাষ-বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গও আছে। দ্বিতীয়টিতে পাই মফঃস্বল অঞ্চলের সমাজচিত্র, ইংরেজের আইন আদালতের প্রচ্ছন্ন সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য। ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'আমার জীবনী' (১৯০৯-১০)-তে লেখক তাঁর প্রথম বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে ১৩১৪ সালের বৈশাখ শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারত মহিলা'য় প্রকাশিত কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত আমলা-সদরপুরের ভূম্যধিকারিণীর সহিত নীলকর কেনী সাহেবের সংঘর্ষ-কাহিনী 'প্যারী সুন্দরী' উল্লেখযোগ্য।

মীর মশারফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা মহরম-পর্ব, উদ্ধার পর্ব ও এজিদ-বধ পর্ব এই তিন পর্বে বিভক্ত 'বিষাদ-সিন্ধু' (১২৯১-৯৭) গ্রন্থটি কারবালার শোচনীয় বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত। প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখক মহরমের বিষাদময় ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। 'বিষাদসিন্ধু'ই মীর মশারফ হোসেনকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে। রচনাটি সেই সময় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় এই মন্তব্য তার প্রমাণ : "ইহা মহররমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস! ইহার বাঙ্গলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩০৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রদীপ'-এ মশারফ হোসেনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন : "তদ্‌কালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।" মশারফ হোসেনের কাব্যগ্রন্থ গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের ১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যায় যে মন্তব্য করেছিলেন সেটিও স্মরণীয় : "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দুমুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক্ পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালীর প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দুমুসলমানে ঐক্য জন্মে, কত-দিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষায় একতা। অতএব মীর মশারফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর।"

[পনের] স্বামী বিবেকানন্দের কথা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন করিয়া আলোচিত হয় না। কিন্তু তাঁহার লিখিত বাংলা গ্রন্থগুলি

অপূর্ব মনস্বিতার জন্য এবং অনবদ্য গদ্যরূপের জন্যে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। বিবেকানন্দের রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ও ভাষারূপের আলোচনা করে এই মন্তব্যের সারবত্তা দেখাও।

উত্তর। বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সুপরিচিত। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের প্রভাব পড়েছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসার পর তিনি আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ করেন। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড তেজস্বিতা, স্বদেশের দুর্গতির জন্য প্রবল বেদনাবোধ, বিপুল কর্মোদ্দীপনা ও মানবপ্রীতি নিয়ে তিনি দেশের ধর্ম ও সমাজজীবনে নতুন প্রেরণা ও উদ্যম সঞ্চারিত করেছিলেন। বাঙলার বিপ্লববাদী তরুণেরা বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকেই দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

স্বামীজী কখনও সচেতনভাবে সাহিত্য সাধনা করেন নি, তার অবসরও তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনে ছিল না। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি ভাষায় লিখিত। বিবেকানন্দের নামে প্রচলিত বাঙলা রচনাগুলির অধিকাংশই তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ, দু একখানি মাত্র তাঁর নিজের লেখা। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মি, তাঁর রচনাভঙ্গিতে বাগ্মিতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণদেবের সহজ সরল লৌকিক ভাষায় গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বকে সজীবভাবে প্রকাশ করার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঙলা ভাষায় ভাবপ্রকাশ বিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট চিন্তা ছিল। বিবেকানন্দ সাধু বা চলিত যে ভাষায়ই রচনা করতেন না কেন, সর্বত্রই সর্বজনবোধ্য কথ্যভাষার বাক্‌-ছন্দই অনুসরণ করেছেন। ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মোৎসবের সময় প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম কি ?' পুস্তিকাটিতে বিবেকানন্দ যে সাধুগদ্য ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ তার সমালোচনা করলে স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন : "আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।...এরপর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্য-সেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙলা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে ; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ) এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় বেশী জোর হয়।...তোদের ডাল ভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; আবার, চালচলন, ভাব, ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সবদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত

হয়।” সংস্কৃতপ্রধান সাধুভাষা রীতির বিপরীতে কথ্যভাষার সমর্থনে তার এই বিখ্যাত উক্তিটিও স্মরণীয়ঃ “স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না।···আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ একচাল···নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।’

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে ‘পরিব্রাজক’ (১৯০৩), ‘ভাববার কথা’ (১৯০৫), ‘বর্তমান ভারত’ (১৯০৫), ‘পত্রাবলী’ (১৯০৫), ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য’ (১৩৫৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত রচনায় তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রামকৃষ্ণদেবের বাণী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পার্থক্য, ভারতীয়দের পক্ষে গ্রহণীয় জীবনাচরণের আদর্শ, সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির বিবরণ, বাঙলা ভাষা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বদেশবাসীরা যাতে তাদের ভীরুতা, দুর্বলতা, দাসত্বের মোহ দূর করে মনুষ্যত্বের ধর্মে জীবন গঠন করতে পারে, তার জন্য তাদের প্রতি স্বামীজীর উদাত্তকণ্ঠের আহ্বান এই রচনাগুলিতে মেঘমন্দ্রে ধ্বনিত হয়েছে। যুক্তির তীক্ষ্ণতায় ও আবেগের তীব্রতায় শ্রোতাদের সামনে প্রত্যক্ষ ভাষণের মত তাঁর উক্তিগুলি পাঠকদের হৃদয়মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিবেকানন্দের রচনাভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেনঃ “বিবেকানন্দের ভিতরে ছিল যে চরম শ্রেয়োবোধে প্রতিষ্ঠিত কর্মচঞ্চল সন্ন্যাসী, যে মহানুভব মানবপ্রেমিক—যে মিথ্যাচার-বিরোধী সংস্কারক—তাঁহার লেখার ভিতরে তাহার জীবন্ত পরিচয় আছে। কথা বলা এবং লেখার বিরোধটাকে স্বামীজী অনেক স্থানে আশ্চর্যরকম মিটাইয়া লইয়াছেন, কথ্যভাষা এবং কথ্যরীতির উপরে তাঁহার একটা বিশেষ দখল ছিল; অনুরক্ত গোষ্ঠীর ভিতরে তিনি যেমন করিয়া অনুপ্রাণিতভাবে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন, তেমন করিয়াই তিনি অনায়াসে লিখিয়া যাইতে পারিতেন। সাহিত্যে তিনি সর্বদাই কথ্যভাষা ও কথ্যরীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কায়ক্লেশে ভাষাকে ‘সাধু’ করিয়া সাজাইবার তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না,—কথ্যভাষা ও রীতিকেই তিনি এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া টিপিয়া গড়িয়া লইতে চাহিয়াছিলেন যেন সে সব জাতীয় মনোভাব প্রকাশেরই উপযোগী হয়। এই বিশিষ্ট ভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে বিবেকানন্দের লেখার ভিতর দিয়া তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্পষ্ট কথা বলিতে শোনা যায়। ভাষার উপরে অসাধারণ দখল না থাকিলে এই রীতিটিকে এইভাবে জমাইয়া তোলা সহজ হইত না।”

[ষোল] বাংলা কাব্যের পালা বদলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-কৃতির পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রাচীন যুগের শেষতম কবি, অথবা আধুনিক যুগের প্রথম কবি—কোন্ পরিচয়ে পরিচিত করা যায় তাহা বিচার কর।

অথবা,

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে কোন বড় কবি নহেন, তবু তিনি বাংলা কাব্যে নবযুগের প্রবর্তক।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিকৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

উত্তর। প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রাণশক্তি ভারতচন্দ্রেই নিঃশেষিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের পরবর্তীকাল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত যা কিছু রচিত হয়েছে, সেই কবিগানে বা জনরঞ্জক অন্যান্য গীতিকবিতায় প্রাচীন ধারারই জের টানা হয়েছে। এইসব রচনায় যেটুকু অভিনবত্ব চোখে পড়ে তা নিতান্তই চটুল ভঙ্গিসর্বস্ব, প্রাণশক্তির দৈন্য তার মধ্যে প্রকট। ইতিমধ্যে বাংলার নতুন সংস্কৃতিকেন্দ্ররূপে কলকাতা নগরী সর্বময় প্রাধান্য অর্জন করেছে। দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসনজনিত একটা স্পষ্ট পরিবর্তন সমাজের সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষে নতুন ও পুরনো ভাবধারায় সংঘাত ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্য-কর্মীদের মধ্যে এক বাস্তব জীবনাগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এই আগ্রহটা সম্পূর্ণ নতুন এবং এটা আধুনিক মানসিকতার প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে। জন্মস্থান কলকাতার অদূরবর্তী কাঁচড়াপাড়ায়। গ্রামেই তিনি মানুষ হয়েছেন। তখনও গ্রাম-জীবনে প্রাচীন সাংস্কৃতিক আবহাওয়া কিছু পরিমাণে জীবন্ত ছিল। সেই পরিবেশের প্রভাবেই ঈশ্বর গুপ্ত লালিত হয়েছেন। খুব অল্প বয়স থেকে তিনি কবির দলের জন্য গান রচনা করতেন। এইভাবেই তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েনি। দেশজ সংস্কৃতির মৃত্তিকাই তাঁর প্রধান আশ্রয় ছিল।

বাঙালী সংস্কৃতির নবযুগ ও ঈশ্বর গুপ্ত

এই গ্রামের মানুষ ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতার উত্তরঙ্গ এবং বিচিত্র পথে ধাবিত জীবনের মুখরতার মধ্যে যখন এসে দাঁড়ালেন তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই মিলিয়ে নিতে পারেন নি। আধুনিক জীবনের প্রতি সন্দেহ ও সংশয় এরূপ মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কোনদিনই ঈশ্বর গুপ্ত সে সংশয় থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রূপপরায়ণতার মূল নিহিত আছে এই সংশয়বোধে। তিনি সতর্ক সমালোচকের দৃষ্টিতেই সমসাময়িক জীবনকে দেখেছেন।

বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ

অথচ এই ঈশ্বর গুপ্তই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দ্রুত রূপান্তরশীল আধুনিক জীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। কলকাতার সমাজর একজন প্রধান পুরুষরূপে শিক্ষা ও সংস্করমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁকে জড়িত হতে হয়েছে। তিনি বুঝেছেন, ভাল-মন্দয় মিশ্রিত এই নতুন যুগ একটা বাস্তব সত্য, এবং সত্যকে স্বীকার না করে কোন উপায় নেই। এই-ভাবে ঈশ্বর গুপ্তের মনে একই সঙ্গে প্রাচীনের প্রতি মমত্ববোধ ও প্রাচীন জীবনের মূল্যবোধগুলি অবসিত হয়েছে দেখে বেদনা এবং অন্যদিকে কর্মসূত্রে আধুনিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে এই জীবনের প্রগতি ধারাকে বোঝবার চেষ্টা—এই দুই বিপরীত বৃত্তি একত্রে কাজ করতো। তিনি যে সমাজে, যে কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সেই পটভূমিতে এই দোটানা একান্তই স্বাভাবিক ছিল।

কবিগান ও হাফ-আখড়াই-এর কবিরা কলকাতার অপরিমার্জিতরুচি শ্রোতাদের তৃপ্তির জন্য যে চটুল, শালীনতাহীন কাব্য রচনা করতেন তার পটভূমিতে দেখলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বুদ্ধিদীপ্ত, বস্তুনিষ্ঠ মননভঙ্গির প্রকাশকে অবশ্য নিঃসন্দেহেই নতুন কাব্যরীতির ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়। তিনি খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতা রচনা করতেন।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

এই কবিতা ছিল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এইসব কবিতায় বিষয় হিসাবে নীতিবাদ, সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনা, খাদ্যবস্তুর বর্ণনা এবং সমসাময়িক বহু ঘটনা ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয় যাই হোক, সর্বত্র তাঁর বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল ব্যঙ্গপ্রবণ মনের প্রকাশে কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে রচিত কবিতাটা তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো।
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না।
আমরা ভূষি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না।"

অকৃত্রিম খাঁটি বাংলা ভাষার ওপরে ঈশ্বর গুপ্তের অপরিসীম অধিকার ছিল। সেই

ভাষাকেই তিনি আবশ্যক মতো পরিমার্জিত করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য—বস্তুনিষ্ঠ জীবন পর্যবেক্ষণ, সুস্থ জীবনাগ্রহ এবং বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গির প্রকাশ। জীবনের প্রতি তিনি কখনও বিমুখ ছিলেন না। জীবনের তুচ্ছ দিকগুলির প্রতিও তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। আনারস, তপসে মাছ বা পাঁটা-প্রশস্তি, পৌষ-পার্বণের বর্ণনা—প্রভৃতি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং তীব্র কৌতুকপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তপসে মাছ ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনায়—

কষিতকনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফ দাড়ি, তপস্বীর প্রায়।

'পাঁটা-প্রশস্তি' প্রসঙ্গে তিনি লেখেন,—

"রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল॥
... ...
তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস॥"

তাঁর গভীর ও বিস্তৃত সমাজ-চেতনা এবং স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় নীলকর বা মাতৃভাষা-মাতৃভূমি সম্পর্কে রচিত কবিতাগুলিতে। বাঙালি জীবনের তুচ্ছ ও মহৎ সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁর অকৃত্রিম আকর্ষণ ছিল।

এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহ, ভাবালুতাবর্জিত বুদ্ধির আলোকে জীবনকে বোঝবার চেষ্টা—বাংলা কাব্যে একান্তভাবে নতুন। ঈশ্বর গুপ্তের মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই বাংলা কাব্যে তিনি একটা নতুন স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সচেতন সাহিত্যিক, দায়িত্ববোধসম্পন্ন লেখক। আপন কালের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করার সচেতন প্রয়াস এবং সাহিত্যিক দায়িত্ববোধে তাঁর ব্যক্তিত্বের আধুনিকতারই লক্ষণ পরিস্ফুট। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথাসিদ্ধ খাদ্যবর্ণনাত্মক কবিতা লিখেছেন, কবিওয়ালাদের অনুপ্রাস-যমকে পূর্ণ কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন, ভাবে-ভাষায় তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই প্রাক্-আধুনিক যুগের সাহিত্যিক মেজাজটা অনুভব করা যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের শিল্পীমানসের বৈশিষ্ট্য

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের এই বিশিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন, "যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন এমন খাঁটি বাংলায়, এমন বাঙালির প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতরে

প্রবেশ করে।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ যথার্থ। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলিতে সমাজ বাস্তবতার প্রতি, প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে—তা একান্তভাবেই আধুনিক মানসিকতার লক্ষণ। এজন্য শেষ বিচারে তাঁকে একান্তভাবে প্রাচীন কাব্যধারার কবি বা একান্তভাবে আধুনিক কালের কবি—কোনটিই বলা যায় না। তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের, এক ক্রান্তিকালের সংশয়িত জীবনচেতনার ভাষ্যকার বলাই সঙ্গত। আধুনিকতার লক্ষণগুলি তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে বলেই ঈশ্বর গুপ্ত বড় কবি না হয়েও বাঙলা কাব্যে নবযুগের প্রবর্তক।

[সতের] "রঙ্গলালের রচনার কাব্যমূল্য বেশি নয়। কিন্তু তাঁহার দ্বারা নিশীথিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্ট মূল্য আছে।"—রঙ্গলালের কাব্য-কৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

অথবা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার কাব্যমূল্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যরূপে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনার ওপরে গুপ্তকবির প্রভাব পড়েছে। কিন্তু রঙ্গলালের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ক্রমে গুরুর প্রভাব অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে প্রতিভা বিকাশের পথ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক শিক্ষার আলোক পাননি। রঙ্গলাল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলা দেশে যে নতুন শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাদের রুচি-প্রকৃতি ছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পাঠকদের তৃপ্তি-সাধনের উপযুক্ত কাব্য-সম্পদ ঈশ্বর গুপ্ত সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর হালকা রঙ্গ-ব্যঙ্গমুখর কবিতা ম্যুর-ব্যয়রন-স্কট পড়া নব্য পাঠকদের পক্ষে রুচিকর না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। রঙ্গলাল সর্বপ্রথম এই রূপান্তরিত রসরুচি বিষয়ে অবহিত হন এবং সাধ্যমত আধুনিক পাঠকদের জন্য দেশীয় আখ্যান অবলম্বনে ইংরেজী কাব্যে রোমান্স-রস পরিবেশনের আয়োজন করেন। ঈশ্বর গুপ্তের অগভীর রঙ্গ-ব্যঙ্গের পরিবর্তে দেশপ্রেম এবং রোমান্স-রসের কাব্যে রঙ্গলাল যে আবেগের গভীরতা আনলেন—পরবর্তীকালে সেই পথেই বাংলা কাব্য নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইউরোপীয় কবিদের গভীর ভাববস্তু দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করা কিছু অসম্ভব নয়। তিনি প্রশ্ন করেছেন, "যুরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না ?" করা যে যায় রঙ্গলাল আপন কাব্যকৃতিত্বে তার প্রমাণ করেছেন। উত্তরকালের শক্তিমান কবিদের সকলের রচনাতেই এটা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা কাব্যের পালা বদলের স্পষ্ট সূচনা রঙ্গলাল থেকেই হয়েছিল একথা অসংশয়ে বলা যায়।

ইংরেজীশিক্ষায় অনুপ্রাণিত প্রথম বাঙালী কবি

রঙ্গলালের **পদ্মিনী উপাখ্যান**কে (১৮৫৮) বলা যায় আধুনিক কালের

প্রথম বাংলা কাব্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রঙ্গলাল অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু কিছু গবেষণামূলক কাজও করেছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর এই অনুরাগ কাব্য রচনায় বিশেষ সহায়তা করেছে। টডের রাজস্থানের ইতিহাস থেকে চিতোরের পতন অংশটা তিনি এই কাব্যের কাহিনী গঠনে ব্যবহার করেছেন। রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লেখেন তখন পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের প্রতি এদেশের শিক্ষিত মানুষের মনে শ্রদ্ধাবোধের অভাব দেখা দেয়নি; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তীব্র হয়ে ওঠেনি। রাজপুত বীরত্বের যে কাহিনী রঙ্গলাল রচনা করলেন তার মধ্যে কোথাও কোথাও স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

রঙ্গলালের রচনাবলী

এর মূলে আছে ইংরেজী কাব্যের প্রভাব। ইংরেজী কাব্যের উচ্ছ্বসিত দেশবন্দনা এবং স্বাধীন-চিত্ততা নব্যশিক্ষিতদের মুগ্ধ করত, রঙ্গলাল সেই ভাববস্তু দেশী কাহিনীর আধারে পরিবেশন করে নতুন পাঠক সমাজের চিত্তহরণ করেছিলেন। অবশ্য ক্ষত্রিয়দের উদ্দেশ্যে রানা ভীমসিংহের উৎসাহ বাণী—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল, বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

ইত্যাদি অংশ পরবর্তীকালে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে প্রভূত উদ্দীপনা যুগিয়েছে। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী' প্রকাশের পূর্বেই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মধুসূদনের আবির্ভাব হয় এবং স্বভাবতই রঙ্গলালের কাব্যের গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিষয় এবং ভাববস্তুর দিক থেকে একটা নতুন পথের নির্দেশ দান করেছিল।

চারটি সর্গে সম্পূর্ণ **কর্মদেবী** (১৮৬২) কাব্যের বিষয়ও রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। রাজপুত কাহিনী-নির্ভর তাঁর তৃতীয় কাব্য **শূরসুন্দরী** প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **কাঞ্চী কাবেরী** নামক কাব্যটি বিষয়ের দিক থেকে একটু অভিনব। উড়িষ্যার একজন প্রাচীন কবি পুরুষোত্তম দাসের রচনা থেকে রঙ্গলাল 'কাঞ্চী কাবেরী'র রোমান্টিক কাহিনীটা সংগ্রহ করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং মধুসূদনের মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়টুকুকে রঙ্গলাল বাংলা দেশের প্রধান কবিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আজ তাঁর কাব্যের রসমূল্য বিচার করতে গেলে মনে হবে যতোটা খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন, কাব্য প্রতিভায় তিনি ততো বড় কবি সত্যই ছিলেন না। সত্যকার প্রতিভাসম্পন্ন কবির রচনায় দেখা যায় কাব্যের আঙ্গিক এবং প্রকাশরীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা। আপন কাব্যের

রঙ্গলালের কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

উপযুক্ত আঙ্গিক উদ্ভাবনের নিরলস প্রচেষ্টায় বড়ো কবিরা সমগ্রভাবে কাব্যের ইতিহাসের গতিমুখ নতুন নতুন পথে প্রবাহিত করে দেন, যেমন দিয়েছেন মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ। রঙ্গলাল এদিক থেকে কোন বিশিষ্ট শিল্প-চেতনার পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি নতুন

ভাববস্তু প্রকাশ করতে চেয়েছেন, নতুন ধরনের কাব্য রচনায় উৎসাহ বোধ করেছেন, কিন্তু ভাষা, ছন্দ এবং প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে একান্তভাবেই তিনি প্রাচীন রীতির অনুবর্তন করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি বাংলা কাব্যে পালাবদলের সূচনা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু কাব্যের আত্মিক রূপান্তর কাব্যদেহের রূপান্তর ভিন্ন যে তা সম্ভব হয় না রঙ্গলাল তা বোঝেন নি। বিশুদ্ধ কাব্যের বিচারে তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূল্য খুব বেশী নয়। অধ্যাপক সুকুমার সেন রঙ্গলালের কাব্যকৃতির মূল্যবিচার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "রঙ্গলালের নব-রোমান্টিক কবিত্ব প্রত্যুষান্ধকারে অকাল-জাগ্রত এক বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলির ন্যায় অপূর্ণকণ্ঠ এবং দ্বিধাগ্রস্ত। রঙ্গলালের বাণী যাঁহাদের অন্তরের মৌন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল সেই নব প্রবুদ্ধ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির ভবিষ্যতের আশা তখনো তেমনি অস্ফুট তেমনি সংশয়-বিজড়িত ছিল। পদ্মিনী উপাখ্যানে শিক্ষিত বাঙালী আপনার চিত্তের নিগূঢ় অনুভূতিকে বাঙ্ময় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। রঙ্গলালের রচনার কাব্যিক মূল্য বেশি নয়। কিন্তু তাহার দ্বারা নিশীথিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্ট মূল্য আছে। কাব্য-রঙ্গভূমিতে মধুসূদনের প্রবেশের পূর্বে রঙ্গলাল নান্দী গাহিয়াছিলেন।"

• [আটার] "মধুসূদন হইতে বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগের সূচনা।" মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থগুলির পরিচয় দাও এবং প্রসঙ্গত উদ্ধৃত মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থগুলির সম্যক্ পরিচয় দিয়া উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে উহাদের অভিনবত্ব বিচার করিয়া দেখাও।

উত্তর। কোন জাতির জীবনে যখন নতুন ভাবের জোয়ার আসে সেই ভাববস্তু এক এক জন মনীষীর প্রতিভা আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ সাহিত্যের প্রচলিত রূপ-রীতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়, সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়। বাংলা কাব্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম একটা বড়ো পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল মধুসূদনের কাব্যকৃতিতে। মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের বিস্তার খুব বেশী নয়। তাঁর সাহিত্য-চর্চার প্রধান পর্ব ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মাদ্রাজ প্রবাস থেকে বাংলা দেশে কবি যখন প্রত্যাবর্তন করেন—সেই সময়ে বাংলার নবগঠিত সারস্বত সমাজের কাব্যরস-পিপাসা নিবৃত্তির উপকরণ ছিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পরিহাস-রসিকতা এবং রঙ্গলালের ভাবাতিরেকে আক্রান্ত রোমান্টিক কবিতা। সাহিত্যরুচির ক্ষেত্রে তখন নতুন হাওয়া বইছিল, কিন্তু নবযুগের ভাবপ্রেরণা আত্মস্থ করে যথার্থভাবে নতুন কাব্য-কলা সৃজনের উপযুক্ত প্রতিভার আবির্ভাব তখনও হয়নি। মধুসূদন এই সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অগঠিত একটা

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব

সাহিত্যিক আবহাওয়ায় কাজ শুরু করেন। উচ্চাভিলাষী যুবক মধুস্থদন পাকা সাহেব হবার বাসনায় একান্তভাবে ইউরোপমুখী হয়েছিলেন। বাইরের দিক থেকে স্বদেশের প্রতি উপেক্ষাই তাঁর সকল আচার আচরণে প্রকট ছিল। স্থতরাং মাতৃভাষায় নতুন কিছু স্থষ্টি করা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব একথা তখনকার সাহিত্যিক সমাজের কারও পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। রামনারায়ণের নাটক ইংরেজীতে অমুবাদ করে দেবার জন্তে তাঁকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আহ্বান জানান। এই যোগাযোগেই বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে মধুস্থদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর রচনার প্রতিজ্ঞা করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে দেশের সাহিত্যিক সমাজে আলোড়ন স্থষ্টি করলেন। বাজি রেখে অসম্ভবকে সম্ভব করার ঝোঁকে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' সম্পূর্ণ করলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে **তিলোত্তমাসম্ভব** কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে মধুস্থদনের কবি-জীবনের স্থচনা, এই কাব্যেই বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগেরও স্থচনা।

স্থন্দ-উপস্থন্দ নিধনের জন্য অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তিলোত্তমা স্থষ্টির পৌরাণিক কাহিনী মধুস্থদন এই কাব্যে ব্যবহার করেছেন। নতুন ছন্দ স্থষ্টির প্রতিই কবির আগ্রহ প্রবল হওয়ায় কাহিনী-বিন্যাস এবং গঠনের দিক থেকে তিলোত্তমা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ রচনা। দেবচরিত্রগুলির পরিকল্পনায় এবং এক সর্বাতিশায়ী দৈবশক্তির কল্পনায় মধুস্থদন কিছু পরিমাণে গ্রীক কাব্যের অনুসরণ করলেও পুরানো কাহিনীটাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন নি। তিলোত্তমাসম্ভবে একটা আখ্যানধারা আছে, কিন্তু সেই আখ্যানকে মহাকাব্যোচিত সংহত আকার দেওয়া হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটা বর্ণনা, বিশেষভাবে নিসর্গ বর্ণনাগুলিতে কবির রোমান্টিক প্রবণতা এবং লিরিক ভাবোচ্ছ্বাসে যথার্থ নতুন কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়। এই কাব্যের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুটি: [এক] পৌরাণিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনার এই প্রথম প্রয়াস। [দুই] ভারতীয় কাহিনী বিন্যাসে পাশ্চাত্ত্য কাব্যের বর্ণনা-পদ্ধতি এবং পাশ্চাত্ত্য জীবন-ভাবনার মিশ্রণ।

তিলোত্তমাসম্ভব, ১৮৬০

মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কোন কবিই অন্ধভাবে প্রচলিত কাব্যকলার অমুবর্তন করেন না। আপন জীবন-ভাবনালব্ধ সত্য এবং আপন কল্পনার জগৎটাকে প্রকাশের জন্য নতুন আঙ্গিক, নতুন ভাষা তাঁকে নির্মাণ করতে হয়। বাণীর নতুন রূপ স্থষ্টি মৌলিক প্রতিভার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। আধুনিক কালের কবি মধুস্থদনের পক্ষে রূপান্তরিত জীবন-চেতনা প্রকাশের জন্যে নতুন কাব্যভাষা এবং নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবন অপরিহার্য ছিল। আত্মপ্রকাশের দুরন্ত আগ্রহে কবি প্রাচীন ছন্দের বন্ধন ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণ করেছেন। মধুস্থদনের এই প্রয়াসে বাংলা কাব্যে ছন্দোমুক্তির স্থচনা হয়। আট এবং নয় মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত চরণ এবং এইরূপ দুটি অন্ত্যমিল-

যুক্ত চরণ নিয়ে অক্ষরবৃত্ত পয়ার গঠিত হত। চরণের আট ও ছয়মাত্রার পর্ব দুটি একই সঙ্গে অর্থগত ভাগ এবং শ্বাসগত ভাগরূপে পরিগণিত হত। সুতরাং এই ছন্দে ছেদ এবং যতি পড়ত একই স্থানে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে দৃশ্যত বড়ো বৈশিষ্ট্য দুই চরণের মধ্যে চরণান্তিক মিলের অভাব, কিন্তু এটাই অমিত্রাক্ষরের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। প্রধান বৈশিষ্ট্য ছেদ ও যতি স্থাপনের নতুন পদ্ধতি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে শ্বাসগত বিভাগ প্রাচীন পয়ারের মতোই আট এবং ছয় মাত্রার দুটি পর্বে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে এইভাবে পর্ব ভাগ করা যায় না। চরণ অতিক্রম করেও বক্তব্য-ধারা অন্য চরণে সংক্রমিত হতে পারে। ফলে একটা ভাব দুটি চরণের পয়ারের মধ্যেই সম্পূর্ণ করবার বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন,

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

'কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসারণে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম সঞ্চালনে!" [মেঘনাদবধ, ষষ্ঠ সর্গ]

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল শক্তি এই নতুন বিন্যাস-রীতিতেই নিহিত। মিলের অভাব-জনিত শূন্যতা কবি পূর্ণ করেছেন সুনির্বাচিত শব্দপ্রয়োগে সৃষ্ট ধ্বনির বিচিত্রতা দ্বারা। লঘু ও গুরু শব্দের সংঘাতে এই কবিতায় এমন ছন্দোসঙ্গীত সৃষ্টি হয়—যার ফলে মিলের অভাব অনুভূতই হয় না। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে এই ছন্দ অনেকটা পরীক্ষামূলক-ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্রতর ব্যবহার দেখা যায়। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নমনীয়তা এবং সৌন্দর্যের চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মধুসূদনের বিশিষ্ট প্রতিভার শক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে **মেঘনাদবধ কাব্যে**। এই কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ এবং এটা মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ তিলোত্তমার কাব্যভাষা এবং কাব্যের ছন্দ বিষয়ে কবি যে পরীক্ষার সূচনা করেছিলেন, পরীক্ষামূলকতার স্তর অতিক্রম করে তা এই কাব্যে নতুন সৃষ্টির প্রাণোন্মাদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধের বিরাট পটভূমির মধ্যে নানা ধরনের চরিত্র এবং নানা রসের সমাবেশ ঘটেছে। অনুভূতির বিচিত্রতা এবং আবেগের ভিন্ন ভিন্ন স্তর এই কাব্যে কবি অমিত্রাক্ষরের মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশ করেছেন। তিনি দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্ববিধ প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু শুধু ভাষা ও ছন্দের জন্যেই নয়, মর্মগত বক্তব্যের জন্যেও মেঘনাদবধ বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্টি। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে আবহমান কাল ধরে সমাদৃত রামায়ণ কাহিনী থেকে মধুসূদন এই কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, ভারতীয় সমাজের নীতি-চেতনা, ধর্মবোধ, গার্হস্থ্য বন্ধন প্রভৃতি যে আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রামায়ণে সেই আদর্শকেই রূপ দেওয়া হয়েছিল এবং এই জীবন-নীতির বিরোধী যা কিছু—তাই প্রতিফলিত

মেঘনাদবধ কাব্য, ১৮৬১

রামায়ণের রাবণ চরিত্রে। মধুসূদন মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে আধুনিক জীবন-চেতনায় দীপ্ত ব্যক্তি-মানুষের মহিমা বড়ো করে দেখাবার জন্যে এই ধর্মদ্রোহী রাবণকেই তাঁর কাব্যে নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন এবং রাবণ ও তার পক্ষভুক্ত বীরদের চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। যে রামচন্দ্র প্রতি পদক্ষেপে নীতিশাস্ত্রের সূত্র মিলিয়ে চলে তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নবযুগের কবি আত্মশক্তির বলে বলীয়ান অসীম শক্তিধর স্পর্ধিত রাবণকেই কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। রাবণ চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলাতেই কবি আনন্দবোধ করেছেন। এই রাবণ একদিকে অমিত বলবীর্যশালী—অন্যদিকে স্নেহে-প্রেমে মমতায় পূর্ণ হৃদয় নিয়ে মানবতার আদর্শ বিগ্রহ। যে মানবতাবাদ ইউরোপ থেকে সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের দেশের উনিশ শতকের জীবনচেতনায় এক নবজাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল, মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বপ্রথম সেই নতুন জীবনাদর্শের রূপায়ণ দেখা গেল। মেঘনাদবধ কাব্যে ভাব ও রসের ক্ষেত্রে অতি সচেতনভাবে যে পরিবর্তন ঘটানো হল, প্রাচীন ধর্ম ও নীতি-শাসিত জীবনের পরিবর্তে আত্মশক্তিনির্ভর অটল ব্যক্তিত্বে উন্নতশির মানুষের মহিমা মূর্ত করে তোলা হল—তাতেই যথার্থভাবে আধুনিক কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারগৃহে লক্ষ্মণের সহযোগী রূপে বিভীষণকে দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশ্যে মেঘনাদ যখন এই কঠিন ধিক্কার উচ্চারণ করে তখন তার মধ্যে আমরা আধুনিক স্বাজাত্যবোধকেই উদ্ভাসিত হতে দেখি :

> ……ধর্ম্মপথগামী,
> হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
> তুমি ;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
> জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এসকলে দিলা
> জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
> পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
> নির্গুণ স্বজন শ্রেয় ; পরঃ পরঃ সদা !

বিষয়বস্তু এবং কাব্যকলা—উভয়দিক থেকেই মেঘনাদবধ আধুনিক শিল্পবোধসম্পন্ন কবির মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। নতুন ছন্দ ও রূপান্তরিত ভাষার প্রয়োগে, সুপরিকল্পিতভাবে কাহিনী বিন্যাসে, সংহত কাব্যকায়া নির্মাণের দক্ষতাতে মধুসূদন এই কাব্যে আধুনিক কবিদের সামনে কবিতার শিল্পরূপ সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পর্কে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। মেঘনাদবধ'ই রাধুনিক যুগের প্রথম বাংলা কাব্য।

'মেঘনাদবধ' কাব্যই মধুসূদনের কবিখ্যাতির প্রধান অবলম্বন হওয়ায় তিনি মহাকাব্যের কবিরূপে পরিচিত। মেঘনাদবধের মহাকাব্যোচিত সমারোহের মধ্যেও মাঝে মাঝে গীতিরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে সীতার বিলাপে, রাবণের আর্তস্বরে মধুসূদনের প্রকৃতিগত রোমান্টিক লিরিক মানসপ্রবণতা প্রকাশ পায়। তার কবিমানসের লিরিক প্রবণতার জন্যেই মেঘনাদবধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে রাধাবিরহ প্রসঙ্গ

নিয়ে কাব্য রচনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন। বৈষ্ণব কাব্যের রোমান্টিক পরিবেশ এবং রোমান্টিক প্রেমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য মধুসূদনের **ব্রজাঙ্গনা** কাব্যে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। তার বৃহৎ কাব্যগ্রন্থগুলির পাশে খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার এই সংকলনটি তেমন মর্যাদা পায়নি, তবুও ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলি ভাষা-ছন্দের পরীক্ষার দিক থেকে আকর্ষণীয়। দেশজ ভাষার ছন্দস্পদ যে মধুসূদনের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল না 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য তার প্রমাণ।

মধুসূদনের গীতিধর্মিতা : ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা

"কেনে এত ফুল তুলিলি, সজনি —
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রতনে
তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম রজনী
ব্রজের বালা ?"

মেঘনাদবধ রচনার সমসময়েই ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদন এইরূপ স্বাচ্ছন্দ্যময় লিরিক লিখেছেন। খাঁটি বাংলা ভাষার ছন্দস্পন্দ যে তার মজ্জাগত উদ্ধৃত অংশটিতেই তা প্রমাণিত হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র ব্যবহার কবিতার গঠনে, যতি সংখ্যা এবং চরণ সংখ্যা বিন্যাসের অপরিসীম স্বাধীনতায় ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলি বাংলা কবিতার আঙ্গিকগত পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বীরাঙ্গনা (১৮৬২) ওভিদের 'হেরোইদায়' কাব্যের অনুকরণে রচিত পত্রকাব্য। ওভিদের কাব্যে একুশখানি পত্র আছে, মধুসূদনেরও পরিকল্পনা ছিল একুশ সর্গে বীরাঙ্গনা কাব্য সম্পূর্ণ করার। কিন্তু মাত্র একাদশটি পত্রের সংকলন রূপে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী থেকে এগারটি নায়িকা চরিত্র নির্বাচন করে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে নায়িকাদের পত্রের আকারে এই কাব্যের এগারটি সর্গ রচিত হয়েছে। প্রতিটি সর্গই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কাব্যটির সাধারণ বিষয় প্রেম। কিন্তু এক একটা নারী চরিত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আধারে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেমের রূপ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্র এবং চরিত্রগত সমস্যার বিচিত্রতার ফলে হৃদয়াবেগের স্তরগুলি সর্বত্র এক নয়, কিন্তু মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিষয়ের উপযুক্ত আধার হয়ে উঠেছে। বীরাঙ্গনার পত্রিকাগুলিতে এক একটা আখ্যানের ক্ষীণ আভাস আছে, প্রতিটি সর্গই বিশেষভাবে চরিত্রগুলির উক্তিরূপে রচিত। তথাপি তার মধ্যে আখ্যান-কাব্যের নয়, গীতিকাব্যের ধর্মই বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। প্রতিটি সর্গ একটা স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবের প্রকাশ হওয়ায় বস্তুত সর্গগুলি খণ্ড খণ্ড গীতিকাব্যেরই রূপ ধারণ করেছে। আর এই কাব্যে মধুসূদন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'কে সপ্তস্বরা বাঁশীর মতো ব্যবহার করেছেন। তাতে বীর, করুণ, বীভৎস বিভিন্ন রসের সার্থক সৃষ্টি করেও মধুসূদন এর দ্বারা গীতি-কবিতাসুলভ মধুর রস সৃষ্টিতেই অধিকতর সার্থকতা দেখিয়েছেন।

এই বিষয়ে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং বীরাঙ্গনা কাব্য একসূত্রে গ্রথিত। বীরাঙ্গনার ভাষাকেও গীতিকাব্যের আদর্শ ভাষা বলা যায়।

মধুসূদনের শেষতম কাব্যগ্রন্থ **চতুর্দশপদী কবিতাবলী** বা সনেট সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। সনেট বস্তুত গীতিকবিতারই একটা প্রকারভেদ। বাংলায় পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলা আত্মীকরণের ঝোঁক মধুসূদনের কবিজীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবি-জীবনের প্রথম পর্বেই তিনি সনেট রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম সনেটটির রচনাকাল মেঘনাদবধের সমসাময়িক। কিন্তু এর পরে কবি দীর্ঘদিন এই কাব্যরূপটির চর্চা করেন নি। ইউরোপ প্রবাস কালে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাই শহরে কবি যখন বাস করছিলেন তখনই সনেটগুলি রচনা করেন। পরবাসে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কবির ক্লিষ্টচিত্ত স্বদেশের জন্যে, দেশের কাব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্যে যে ব্যাকুলতা অনুভব করত এই খণ্ড খণ্ড কবিতায় তাই অনুরূপভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থেই ব্যক্তি-মানুষ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। আখ্যান নয়, চরিত্রসৃষ্টির আগ্রহ নয়, একান্তভাবে কবির নিজস্ব আবেগ অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে সনেটগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক-কর্তৃক অনুপ্রাণিত হলেও মধুসূদন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল্টনের মিলবিন্যাস রীতি অনুসরণ করেছেন।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬

মধুসূদনের কবি-জীবনের বিস্তার খুব বেশী নয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কবিজীবনে মাত্র কয়েকটা কাব্যগ্রন্থে তিনি বাংলা কবিতায় আবহমান ধারায় মৌলিক রূপান্তর সাধন করে গেছেন। তিনিই বাংলা কবিতার বিশ্ব-কাব্যলোকেব উন্নততর আদর্শ এবং রুচির প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় জটিলতা এবং অতিলৌকিকতায় আচ্ছন্ন বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মানবিক অনুভূতির বিচিত্রতা ও মানব মহিমাকেই কাব্যবিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ মুক্তিপথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। কবিতার ভাব ও রসের ক্ষেত্রে যেমন তিনি বিপ্লব সাধন করেছেন তেমনই এই নতুন ভাববস্তুর উপযুক্ত আধার রচনার জন্য প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রকাশরীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন কাব্য-আঙ্গিক উদ্ভাবন করেছেন। সুতরাং মধুসূদন থেকেই বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের সূচনা—এই উক্তিতে একটা তর্কাতীত ঐতিহাসিক সত্যই বিঘোষিত হয়েছে বলা যায়।

[ষোল] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর পরিচয় দাও এবং প্রসঙ্গত বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর। আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে পরম্পরার দিক থেকে হেমচন্দ্রের (১৮৩৮—১৯০৩) স্থান মধুসূদনের ঠিক পরেই। নিজের কালে মধুসূদনের চেয়েও তিনি বেশী জনসমাদর লাভ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বছরে কবি হিসেবে তাঁর অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা ছিল। মধুসূদনের বৈপ্লবিক প্রতিভা বাংলা কাব্যের আবহমান ধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক পাঠক সমাজ

ইংরেজী কাব্যের রসবস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে মাতৃভাষার সেই রসাস্বাদ প্রত্যাশা করতেন। নবযুগের এই রূপান্তরিত রুচির পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত কাব্যকলা সৃষ্টির পথ মধুসূদন প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদন যতটা উচ্চাঙ্গে বাংলা কাব্যের সুর বেঁধে দিলেন —তার সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো কবি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর আবির্ভূত হয়নি। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যের নতুন বাণীমূর্তির সৃষ্টিকৌশল হয়তো বুঝতেন, কিন্তু তেমন বস্তু সৃষ্টি করার যোগ্য প্রতিভা তাঁদের ছিল না। ফলে মধুসূদন-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলেও তাঁদের রচনায় মধুসূদনের ধ্রুপদী-সুর অনেক পরিমাণে তরলীকৃত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে মধুসূদনের কাব্যকলা দুরূহ মনে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হেমচন্দ্র সেই সব ভাব এবং ভাবনাই সুগমভাবে উপস্থাপিত করায় পাঠকসাধারণ তাঁকে প্রিয় কবিরূপে, নিজেদের রুচি-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন প্রতিভা রূপে সমাদর করেছে। হেমচন্দ্রের জনসমাদর লাভের মূল রহস্য এটাই। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের কালক্রমে পাঠকদের রুচির এবং রসবোধের মান পরিবর্তিত হয়। যে কবি যুগে যুগে বিবর্তনশীল জনরুচির দ্বারা সমানভাবে গৃহীত হন তাঁকেই বলা যায় যুগোত্তীর্ণ প্রতিভা। কোনকালেই মধুসূদনের কাব্যের বিপুল জনসমাদর ছিল না। পরিশীলিত রুচি-বিদগ্ধ সমাজেই তাঁর কাব্য সমাদৃত হয়েছে। এতকাল পরে আজও এইরূপ উচ্চকোটির রসিক সমাজে মধুসূদনের কাব্যের সমাদর অক্ষুণ্ণই আছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের আজ আর পাঠক নেই। যে জনসাধারণ আপনাদের রুচির পরিমাপের অনুসারী বলে তাঁর কাব্যের সমাদর করত তাদের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের কবি-খ্যাতি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে। একথা আজ নিঃসংশয়েই বলা যায় যে হেমচন্দ্রের কাব্য শাশ্বত রসমূল্যের দিক থেকে ঐশ্বর্যহীন, সমসাময়িক যুগকে অতিক্রম করে তিনি কাব্যরসধারা যুগান্তরে প্রবাহিত করে দিতে পারেন নি। তিনি বিশেষ যুগেরই কবি, নিত্যকালের কবি নন। তবুও একটা যুগকে যে কবি কাব্যরসধারায় পরিতৃপ্ত করে গেছেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান তুচ্ছ নয়। হেমচন্দ্রের কাব্যকৃতি সাহিত্যের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

প্রকাশকাল অনুযায়ী হেমচন্দ্রের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম চিন্তাতরঙ্গিনী (১৮৬১), বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), কবিতাবলী (১৮৭০), বৃত্রসংহার (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২) এবং চিত্তপ্রকাশ (১৮৯৮)। মেঘনাদবধ কাব্যে মহাকাব্য রচনার একটা নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারার একটি অংশ মহাকাব্য জাতীয় রচনা। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে হেমচন্দ্রের সুবৃহৎ **বৃত্রসংহার**

রচনাবলী

কাব্যের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং এই কাব্যই হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতির প্রধান কারণ। 'বৃত্রসংহার' ২৪টি সর্গে সম্পূর্ণ। বৃত্রাসুর-কর্তৃক ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকারের পর থেকে দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রের আঘাতে বৃত্রের পতন পর্যন্ত বিস্তৃত কাহিনী হেমচন্দ্র এই কাব্যে বর্ণনা করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনের যে দৃষ্টান্ত মধুসূদন মেঘনাদবধ

কাব্যে স্থাপন করেছিলেন হেমচন্দ্রও সেই পদ্ধতির অনুবর্তন করেছেন। ফলে এই কাব্যেও রাবণের মতো দেবদ্রোহী বৃত্রই নায়ক। রুদ্রপীড় চরিত্র মধুসূদন-সৃষ্ট ইন্দ্রজিতের আদর্শে গঠিত। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন সীতার অপমান রাবণের পতনের হেতু—এই কাব্যেও সেইরূপ বৃত্রাসুরের পতনের হেতু ইন্দ্র-পত্নী শচীর লাঞ্ছনা। মেঘনাদবধের তুলনায় বৃত্রসংহার কাব্যের পটভূমি অনেক বিস্তৃত এবং এই কাহিনীতে যথার্থ মহাকাব্যিক আবহ অনেক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়েছে সন্দেহ নেই। চরিত্র-সৃষ্টিতেও হেমচন্দ্র দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের কাব্যে কল্পলোকের শুদ্ধ সৌন্দর্যের পরিবর্তে মাটির পৃথিবীর দ্বন্দ্বময় জটিলতাই বেশী তাতে "গার্হস্থ্য জীবনের রূপ, রস, সাধারণ দ্বন্দ্ব-জটিলতাও বিষণ্ণ করুণ অনুভূতি" প্রাধান্য পাওয়ার সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই কাব্যের রস গ্রহণ সহজসাধ্য হয়েছিল। মাঝে মাঝে পাতালপুরে দেবতাদের যন্ত্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনা, বৃত্রাসুরের অন্তিম সংগ্রামের বিবরণ প্রভৃতি অংশে হেমচন্দ্রের গভীর ভাব-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্রাজ্ঞানের অভাবের ফলে সমগ্র কাব্যে তথ্য এমন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে যে কাব্যরস নিবিড় হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি। কাব্যের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার দাম্পত্য সম্পর্ক ও তাদের ভোগবৃত্তি এবং আত্মাভিমানের স্থূলতা। বৃত্র-চরিত্রের পরিচয় পরিস্ফুট করা হয়েছে প্রধানতঃ গার্হস্থ্য-জীবনের পটভূমিতে। ফলে মেঘনাদবধের তুলনায় এই কাব্যে জীবনের বাস্তব আবেগের স্বাদ অনেক বেশী পাওয়া যায়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিকট সম্পর্কের জন্যেই সমসাময়িক পাঠকদের কাছে এই কাব্য নিজেদেরই জীবনের কাব্যরূপে মনে হয়েছিল। মধুসূদন মানবিক প্রবৃত্তির যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আদর্শায়িত ভাবে কল্পনার ইন্দ্রজালে মণ্ডিত করেছিলেন হেমচন্দ্র তাকে বাস্তব জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার স্তরে নামিয়ে এনেছেন। হেমচন্দ্রের কাব্য উপভোগের জন্যে তাই উচ্চকল্পনার প্রয়োজন হয় না। এ কাব্য সাধারণ মানুষেরও আয়ত্তগম্য। বৃত্রসংহারে কোথাও কোথাও বর্ণনাভঙ্গিতে হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন অসুরসভায় বৃত্রের আগমন বর্ণনা—

> "ত্রিনেত্র, বিশাল বক্ষ অতি দীর্ঘকায়,
> বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
> পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
> নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
> পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—"

হেমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে আখ্যানধর্মী কাব্য হিসেবে বৃত্রসংহার ভিন্ন 'বীরবাহু' কাব্যটাও উল্লেখযোগ্য। 'বীরবাহু' কাব্যের কাহিনী সম্পূর্ণ কবির কল্পনাপ্রসূত। কবির নিজের ভাষায়, "পুরাকালে হিন্দু কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাঁহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।"

খণ্ড গীতি-কবিতা রচনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব কম নয়। প্রধানত দেশাত্মবোধই তাঁর গীতি-কবিতার উপজীব্য বিষয় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সদ্যোজাগ্রত দেশাত্মবোধকে

হেমচন্দ্র ভাষা দিয়েছিলেন তাঁর 'ভারত সঙ্গীত' এবং অনুরূপ আরও বহু গীতি-কবিতায়। দেশের জনমনে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত করে তোলবার দিক থেকে এইসব কবিতার প্রভাব নগণ্য নয়। হেমচন্দ্রের তিনখানি কবিতা সংকলন 'কবিতাবলী' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) এবং 'চিত্তবিকাশ'-এ গীতি-কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আখ্যান-আশ্রিত বৃহৎ কাব্যের চেয়ে খণ্ড কবিতাতেই হেমচন্দ্রের দক্ষতা বেশি ছিল। বিশেষভাবে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাসমূহের পরিহাস-রসিকতা আজও আকর্ষণীয় মনে হয়। বাজিমাৎ-এর তিক্ত-মধুর ব্যঙ্গ সত্যই উপভোগ্য :

আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হোতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লহাকিলো তারে।

লংফেলো, শেলী, কীট্‌স, পোপ, ড্রাইডেন প্রভৃতি বিদেশী কবিদের অনেক কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বিদেশী কাব্যকলার সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের পরিচয় সাধনের এই শ্রমসাধ্য প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

[সতেরো] কবি নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দাও এবং তাঁহার রচনার কাব্যমূল্য বিচার কর।

উত্তর। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কালের বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ছিলেন অবিংসবাদিত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবি। নবীনচন্দ্র কবিত্বশক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলা দেশের সারস্বত সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিশোর বয়স থেকে নবীনচন্দ্র কাব্যচর্চা শুরু করেন। 'আত্মজীবনী'র একস্থানে তিনি লিখেছেন, "পাখীর যেমন গীতি, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থিমজ্জায় নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চারিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।" কবির এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় কি গভীরভাবে তিনি কাব্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের জীবনের তথ্যাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি আজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। নবীনচন্দ্রের জীবনব্যাপী কাব্য-চর্চার ফল বারোখানি কাব্যগ্রন্থ। তা ছাড়া অনুবাদ এবং অন্যান্য গদ্য রচনাও আছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ—১৮৭১, ২য় ভাগ—১৮৭৮), 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'অমৃতাভ' (১৯০৯)। নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূল সুর

রচনাবলী

দুটি, স্বদেশপ্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা। স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাই তাঁর কবিত্ব-শক্তিকে উদ্দীপিত করেছিল। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ছাত্রজীবন থেকেই নবীনচন্দ্র খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতা রচনা করতেন। এইসব কবিতায় স্বদেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনায় তখন স্বাদেশিকতা একটা নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে এই স্বাদেশিকতাবোধ

বাঙালী সমাজে সকল কর্মের কেন্দ্রীয় প্রেরণাস্বরূপ হয়ে ওঠে। নবীনচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা অনেক পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি বঙ্কিম যুগের প্রধান ভাবধারা গুলিকেই কাব্যে রূপায়িত করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের গীতি-কবিতাগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর একজন উদারনৈতিক, প্রগতিবাদী শিক্ষিত মানুষের চিন্তাভাবনাব যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়—সেই যুগের মানসিক বাতাবরণটি বোঝাবার পক্ষে তা বিশেষভাবে সহায়ক। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দু' খণ্ডে বিচিত্র বিষয়াশ্রিত বহু গীতি-কবিতা সংকলিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্রের পূর্বে আর কোন কবি এত অধিক সংখ্যক গীতি-কবিতা রচনা করেন নি। অবশ্য তাঁব কবিতায় অনিয়ন্ত্রিত ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত কবিতার স্বাদ পাওয়া যায় না। কল্পনাদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত এক-একটা ভাবসত্যকে নিটোল বাণীরূপেব আধারে বিধৃত করে সার্থক গীতি-কবিতা-রচনার জন্য যে সংযম ও শিল্পচেতনা প্রয়োজন নবীনচন্দ্রে তার অভাব ছিল। তাই সংখ্যাব বিপুলত্বেব জন্য তিনি মর্যাদা দাবি কবলেও যথার্থ বসোত্তীর্ণ গীতি-কবিতা সৃষ্টিতে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি একথা স্বীকাব করতেই হয়।

পলাশীর যুদ্ধই নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতির প্রধান অবলম্বন। উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে সাধারণতঃ দূরকালের ইতিহাস বা পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হত। নবীনচন্দ্র অনতিদূরবর্তীকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে সাহসেরই পরিচয় দিয়েছিলেন বলতে হবে। যে পরাধীনতার জন্যে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে গ্লানি বোধ দেখা দিয়েছিল তার প্রধান কারণ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়। তখনকার ইংরেজ-রচিত ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র কলঙ্কিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র সিরাজ-চরিত্র চিত্রণে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তাই সিরাজকে কাব্যে প্রধান চরিত্রের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন। এ কাব্যে দেশপ্রেমের উদ্দীপ্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছে মোহনলালের কণ্ঠে। 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর পাঁচটি সর্গে আদ্যন্তযুক্ত কোন পূর্ণায়ত কাহিনী পাওয়া যায় না। প্রতিটি সর্গে এক একটি চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। দেশাত্মবোধ প্রকাশের জন্য কবি প্রধানত নির্ভর করেছেন মোহনলাল এবং রানী ভবানী চরিত্রের ওপরে। নবীনচন্দ্র এই কাব্যের বহুস্থানে বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' কাব্যের যুদ্ধবর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাকে রসোত্তীর্ণ বলা যায় না। তবুও জাতীয়তা-বোধ উন্মীলনের প্রথম যুগের এই কাব্য দেশের জন-জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই কাব্যটির একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে।

একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নবীনচন্দ্র আপন জীবনদর্শন এবং আধ্যাত্মিক ধারণা রূপায়নের জন্য **রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস** কৃষ্ণের আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা অবলম্বনে এই ত্রয়ী-কাব্য রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণ চরিত্রকে পৌরাণিক অলৌকিক কাহিনীর জটিলতা থেকে মুক্ত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবর্তনধারার

পটভূমিতে তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটির প্রভাবেই সম্ভবত নবীনচন্দ্র এই চরিত্রটিকে পুনর্গঠিত করতে অনুপ্রাণিত হন। কৃষ্ণচরিত্রকে আর্য-অনার্যের মিলনে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ রচনার নায়করূপে যেভাবে নবীনচন্দ্র চিত্রিত করেছেন—তাতে কবির নিজস্ব জাতীয়তাবাদী প্রেরণাই প্রকাশিত। রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহাভারত আদর্শ ব্যাখ্যা তারই প্রতিফলন :

"একধর্ম এক জাতি, এক মাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।"

এই তিনখানি কাব্য রচনার জন্য নবীনচন্দ্র প্রভূত পরিশ্রমে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। কিন্তু রচনা-নৈপুণ্যের অভাবে তিনি কৃষ্ণচরিত্র যে বিরাট আদর্শের প্রতিভূরূপে গড়তে চেয়েছেন তার যোগ্য ব্যক্তিত্ব চরিত্রটিতে পরিস্ফুট হয় নি। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই যান্ত্রিক এবং প্রাণহীন মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজ কবি বায়রনের তুলনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশ বাৎসল্যের লক্ষণ হয়, তবে সেই দেশ-বাৎসল্য নবীনবাবুর···।" কোন ব্যক্তির পক্ষে এইগুলি নিশ্চয়ই দেশ-বাৎসল্যের লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন এবং কাতরোক্তিকেই কবিতা বলা যায় না। কবিতা সৃষ্টির জন্য কল্পনার সংযম প্রয়োজন। নবীনচন্দ্রে এই সংযমের নিতান্ত অভাব ছিল। এই কারণেই সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে কবি হিসেবে উচ্চ আসন দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কলার তুলনায় নবীনচন্দ্রের রচনাসমূহ উচ্চ আসন দাবি করতে পারে না। তবুও এই দুই মহাকবির মধ্যবর্তী সময়ে হেমচন্দ্রের মতোই নবীনচন্দ্রও যুগচেতনার প্রতিফলনে তাঁর সৃষ্ট কাব্যের প্রতি সাধারণ পাঠকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নবীচন্দ্রের প্রভাব মন্দীভূত হয়ে আসে।

• [আঠার] বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত গীতি-কবিতার ধারাটির পরিচয় দাও এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিভায় কিভাবে বাংলা গীতিকাব্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। রঙ্গলাল থেকে কাহিনী-আশ্রিত আখ্যায়িকা কাব্য রচনার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সকল প্রধান কবি সেই জাতীয় আখ্যায়িকা কাব্য এবং মহাকাব্য রচনায় উৎসাহ বোধ করেছেন। কিন্তু এই কাহিনী-আশ্রিত কাব্যধারার পাশে খণ্ড গীতি-কবিতা রচনার প্রয়াসেরও একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত খণ্ড গীতি-কবিতা রচনার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু খণ্ড কবিতামাত্রই গীতি-কবিতা কিনা—এ বিষয়ে প্রথমেই একটা স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। যথার্থ লিরিক কবিতা বা গীতি-কবিতা কাকে বলে? আকারে ছোট হওয়াটাই গীতি-কবিতার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। "The essence of lyrical poetry is personality." গীতি-কবিতায় কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশই প্রধান হয়ে উঠতে দেখি। বিশ্বচরাচর সম্পর্কে একজন অনুভূতিশীল, কল্পনা-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর্জগতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যে আবেগ আন্দোলিত হয়ে ওঠে—তারই নির্যাসিত রূপ বাণীমূর্তি লাভ করে সার্থক গীতি-কবিতার নিটোল অবয়বে। রচনার বিষয় যাই হোক, গীতি-কবি আপন ব্যক্তি-স্বরূপকেই প্রকাশ করেন তাঁর রচনায়। আবেগের একমুখিতা ভাবসংহতি এবং উপলব্ধির গভীরতা ভিন্ন গীতি-কবিতা রসোত্তীর্ণ হতে পাবে না। এই সূত্রটি মনে রেখে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারায় গীতি-কবিতার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য

বিচিত্র বিষয় নিয়ে খণ্ড কবিতা বচনা ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু হয়েছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বাস্তব জীবন সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। বস্তুনিষ্ঠতা এবং ব্যঙ্গপরায়ণতা তাঁর মননভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্রুত রূপান্তরশীল সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনবাদের দোটানায় সংশয়ে দোলায়িত ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন, তাঁর কৌতুকাবহ ভঙ্গিতে খাদ্য বর্ণনার কবিতা লিখেছেন, কবিতার নীতি উপদেশ বিতরণ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই বিচিত্র কাব্যসৃষ্টিতে অন্তর্মুখী ভাব-প্রেরণার পরিচয় না থাকায় আকারে সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এগুলিকে যথার্থ গীতি-কবিতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা চলে না। তবে ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী ঈশ্বর গুপ্ত একান্ত নৈরাশ্যের মধ্যেও অকৃত্রিমভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে অকস্মাৎ এমন দু চারটি চরণ লিখেছেন যার মধ্যে কবির গভীর উপলব্ধি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত বিরল এইরকম কয়েকটি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত কিছু পরিমাণে গীতি-কবিতার স্বাদ সঞ্চার করতে পেরেছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, ১৮১২—১৮৫৮

ঈশ্বর গুপ্তের পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। কিন্তু রঙ্গলালের অসংযত উচ্ছ্বাসময় আখ্যানধর্মী কাব্যগুলিতে কোথাও উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার রসাস্বাদ পাওয়া যায় না। কবি মধুসূদনও প্রথম থেকে মহাকাব্য রচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মহাকাব্যের কবিরূপেই তাঁকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সতর্ক বিশ্লেষণে মনে হয় তাঁর কাব্যপ্রেরণা গীতিকাব্যের অনুকূল ছিল। মহাকাব্য রচনার জন্য যে বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাভঙ্গি প্রয়োজন, জন্ম-রোমান্টিক মধুসূদনের তা ছিল না। জগৎ ও জীবনকে নির্লিপ্তভাবে দেখা তাঁর মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মহাকাব্যের আকারে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসে যা রচনা করেছেন তার মধ্যেও কবির-নিজস্ব ব্যক্তিরূপের দ্বিধাদ্বন্দ্ব,, আশা-

আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'মেঘনাদবধ'কেও তাই কোন সমালোচক মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্যই বলেছেন। মধুসূদনের লিরিকপ্রবণতা মেঘনাদবধ কাব্য রচনার সময়ে অন্যভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে। বৈষ্ণব কাব্যের মাথুর রসপর্যায়ে রাধার তীব্র বিরহ বেদনার যে কাব্যরূপ সৃষ্ট হয়েছে মধুসূদন সেই প্রসঙ্গ অবলম্বন করে ব্রজাঙ্গনার ছন্দ-সৌন্দর্যমণ্ডিত কবিতাগুলিতে রোমান্টিক হৃদয়াবেগ অবারিত করে দিয়েছেন। একটি কাহিনীর আদল এখানেও আছে—কিন্তু তাতে কবিতাগুলির লিরিক গুণ নষ্ট হয় নি। তবে কবির উৎকৃষ্ট লিরিক রচনা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে। চতুর্দশপদী বা সনেট রচনায় একটা নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধন মেনে চলতে হয়, ফলে কবি-হৃদয়ের ভাব যথেচ্ছভাবে প্রকাশিত হতে পারে না ঠিকই। তবুও সনেট গীতি-কবিতারই একটি প্রকারভেদ। কবির ব্যক্তিত্বই লিরিকের প্রধান বিষয়, মধুসূদনের সনেটের বিষয়ও তাঁরই ব্যক্তিত্বের বিশ্ব। জীবনে কবি যা কিছু সঞ্চয় করেছেন, যাতে আনন্দ পেয়েছেন, তাঁর প্রীতি ও ভালোবাসা যে সব ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে উদ্দীপিত হয়েছে—সেই একান্ত আপন জিনিসগুলিই প্রীতি ও সৌন্দর্যরসে আবিষ্ট করে সনেটগুলিতে প্রকাশ করেছেন। কবি মধুসূদনের বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতির বিচিত্রতার স্বাদ গ্রহণ ভিন্ন সনেটগুলির আর কোন আকর্ষণ নেই। লিরিক কবিতায় প্রার্থিত কবি ব্যক্তিত্বের আসঙ্গরস বাংলা কাব্যে মধুসূদনেই পাওয়া যায়। এর সঙ্গে তাঁর 'আত্মবিলাপ' এবং অনুরূপ আরও দুই একটি উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। 'আত্মবিলাপ' কবিতায় কবির সমগ্র জীবনের নিহিত বেদনা নির্যাসিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতার ধর্মই এই কবিতায় পরিস্ফুট :

মধুসূদন দত্ত, ১৮২৪—১৮৭২

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে?"

আধুনিক বাংলা কাব্যে এইটিই আদিতম সার্থক লিরিক কবিতা।

মধুসূদন-পরবর্তীকালের দুজন প্রধান কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রচুর খণ্ড গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' গ্রন্থের দু খণ্ড 'বিবিধ কবিতা' ও 'চিত্তবিকাশ' নামক দুটি সংকলন এবং নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী' দু খণ্ড উনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। হেমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে 'ভারত সঙ্গীত', 'পদ্মের মৃণাল', 'প্রভু 'কি দশা হবে আমার' প্রভৃতি কবিতায় উচ্ছ্বসিত দেশাত্মবোধক ও ব্যক্তি-জীবনের তীব্র দুঃখবোধ গীতি-কাব্য রচনারই যোগ্য বিষয়। বাইরের বিচারে তাঁর কবিতাকে গীতিকবিতাই বলতে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০২), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

হয়, কারণ এসব খণ্ডকাব্যে কবির ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির প্রকাশই মুখ্য প্রেরণা। কিন্তু হেমচন্দ্র আবেগ-সংহতির অভাবে কবিতার রসসিদ্ধি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলি গীতিকবিতারই নিদর্শন, কিন্তু শিথিলবন্ধ রচনাভঙ্গি ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য রচনাগুলি কবিতা হিসেবে রসোত্তীর্ণ হয় নি। নবীনচন্দ্র সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। আকৈশোর তিনি উদ্দীপ্ত ভাবাবেগ নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু রসস্রষ্টা হিসেবে তাঁর কৃতিত্বও প্রশ্নাতীত নয়। তাঁর প্রবল ভাবাতিরেক খণ্ডকাব্যগুলিকে গীতি-কবিতার নিটোল রসরূপে উন্মীলিত হয়ে উঠতে দেয় নি। অন্তর্বর্তী ভাবপ্রেরণার চেয়ে বহির্ঘটনা আশ্রিত উদ্দীপনাই তাব কবিতায় বেশি। অতএব দেখা যাচ্ছে উন্নততর শিল্পবোধ এবং সংযমের অভাবে এই দুই কবির গীতিকাব্য রচনার প্রয়াস অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে।

সমসাময়িক পাঠক সমাজের দ্বারা স্বীকৃত এবং জনপ্রিয় কবি হিসাবে মধুসূদনের পরেই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উল্লেখ করা হলেও বাংলা কাব্যে নতুন সুর যোজনার দিক থেকে তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য সৃষ্টির মর্যাদার অধিকারী বিহারীলাল চক্রবর্তী। তখনকার ইংরেজিনবিশ কবিদের স্বদেশানুরাগ এবং বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনার উচ্চকণ্ঠ কোলাহলের মধ্যে বিহারীলালের আত্মমনস্ক কাব্যচর্চা তেমন সমাদর লাভ করেনি। না করাই স্বাভাবিক। এই আত্মনিমগ্ন কবি আপন ভাবলোকে এমনই সমাহিত যে পাঠক সমাজ সম্পর্কে যেন অবহিতই ছিলেন না। শ্রোতা-নিরপেক্ষভাবেই তিনি আপন আনন্দবেদনার গান গেয়েছেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলী সমসাময়িক কাব্যিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থেকে পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় তিনি বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ এক নতুন সুরের স্রষ্টা। মোহিতলালের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়ঃ "বিহারীলালের কাব্য যেন আদি লিরিক জাতীয়, তাঁহার প্রেরণা একেবারে গীতাত্মক। বাহিরের বস্তুকে গীতিকবি নিজস্ব ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া যে একটি বিশেষ রূপ ও রসের সৃষ্টি করেন, ইহা তাহা হইতেও ভিন্ন,—কবি নিজের আনন্দে ধ্যানকল্পনার আবেশে, সর্বত্র নিছক ভাবের সাধনা করিয়াছেন; তাঁহার কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভাববিভোরতা। তাঁহার কল্পনা অতিমাত্রায় Subjective, তিনি যখন গান করেন, তখন সম্মুখে শ্রোতা আছে এমন কথাও ভাবেন না। ভাবকে স্পষ্টরূপ দিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার নাই। কিন্তু এই আত্মনিমগ্ন কবির স্বতঃ উৎসারিত গীতধারায় এমন সকল বাণী নিঃসৃত হয়, যাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁহার মনোভৃঙ্গ সরস্বতীর আসন-কমলের মর্মমধু পান করিয়াছে, সেই পদ্মে পরাগধূলি সর্বাঙ্গে মাখিয়া কবিজীবন সার্থক করিয়াছে।" এই গীতাত্মক কবি-প্রবৃত্তি, এই বিশুদ্ধ Subjective কল্পনা বস্তুত ইতিপূর্বে আর কোন কবির মধ্যেই দেখা যায় নি। বস্তুবিশ্বের অভিজ্ঞতা ভিন্ন কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, কিন্তু বহির্জাগতিক অভিজ্ঞতা বিহারীলালে সহজেই গীতাত্মক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়। একান্তভাবে অন্তর্মুখী ভাবকল্পনানির্ভর কবি বিহারীলালের কাব্যেই

বিহারীলাল চক্রবর্তী
(১৮৩৫-১৮৯৪)

যথার্থভাবে আধুনিক গীতিকবিতার স্থচনা হয়েছে। বিহারীলালের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯)। এই কাব্যে কবি প্রেম, প্রীতি এবং সৌন্দর্য চেতনার বিগ্রহরূপে সারদার মূর্তি কল্পনা করেছেন। সারদা দেবীর সঙ্গে কবির বিচিত্র সম্পর্কের লীলা এই কাব্যের বিষয়। এমন কাব্যবিষয় ইতিপূর্বে আর কোন কবির কাব্যে দেখা যায় না। প্রেম, প্রীতি, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি কবিমানসে এক অখণ্ড কল্পনার বৃত্তে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে—সেই অনুভূতির পূর্ণায়ত রূপটিকেই তিনি সারদা মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। কবির কল্পনার জগৎটিকেই একমাত্র কাব্যবিষয়রূপে গ্রহণ করার এই দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। সারদার উদ্দেশ্যে বিহারীলাল বলেন—

"তুমি বিশ্বের আলো তুমি বিশ্বরূপিণী।
প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলাপ্রেমিকের প্রাণ,
মানব-মনের তুমি উদার স্থষমা।"

এই সৌন্দর্য-প্রতিমার ধ্যান বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব। সৌন্দয বা কান্তিটুকু, প্রেমের পাত্র থেকে পৃথকভাবে প্রেমানুভূতি—একটা বিমূর্তভাবে কল্পনায় ধারণ করা এবং তারই বাণীমূর্তি নির্মাণের যে দৃষ্টান্ত বিহারীলালের কাব্যে দেখা গেল, তা একটা নতুন প্রেরণারূপে উত্তরকালের সকল কবিকেই প্রভাবিত করেছে। এই প্রেরণাই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

[উনিশ] "আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের স্বর শুনিলাম।"—বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর, এবং তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দাও।

অথবা,

বিহারীলালের কাব্য রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর বিশিষ্ট দানের বিচার করো। [ক. বি. ১৯৮৪]

উত্তর। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যরসে বাংলার পাঠক সমাজ যখন আবিষ্ট সেইকালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম লিরিক-কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তৎকালের প্রখ্যাত কবি হেমচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারেন নি। অন্তর্মুখী ভাবপ্রেরণায় যে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ আপন অন্তরের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের বিশ্বরচনার বেদনা বহন করে ফিরতেন—তিনি 'অবোধবন্ধু' নামক একটি স্বল্প-প্রচারিত পত্রিকায় গুরুপদে বরণের যোগ্য

একজন কবির সন্ধান লাভ করলেন। সেই কবির নাম বিহারীলাল চক্রবর্তী। হেম-নবীনের তুলনায় তাঁর কবিখ্যাতি কিছুই ছিল না। নিতান্ত বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁর পরিচিতি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার যে বিশিষ্ট ঐশ্বর্য রবীন্দ্র-প্রতিভার দানে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার পূর্বসূচনা একমাত্র বিহারীলালের কাব্যেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বগামী কবিদের মধ্যে একমাত্র বিহারীলালকেই অকুণ্ঠিত ভাষায় আপন কবিগুরু বলে উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক বাংলা কাব্যের পরিবেশে বিহারীলালের অনন্যতা নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনা সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না--তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিত।" কবি-ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অন্তর্লোক, তার সৌন্দর্য চেতনা, নিজস্ব কল্পনার জগৎ—একান্তভাবে লিরিক কবির কাব্য-বিষয়। বিহারীলালে একান্তভাবে একজন অনুপ্রাণিত কবির নিজস্ব ভাবনা-বেদনার স্বগত ভাষণ শোনা গেল। বাংলা কাব্যে সেই প্রথম একজন কবির নিজস্ব সুর রণিত হয়ে উঠল। বিহারীলালের কাব্যে ভাষা ও ছন্দ ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্রের যান্ত্রিক নিয়ম অস্বীকার করে সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতি ব্যঞ্জনায় শক্তি সমন্বিত হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের পরে বিহারীলালই বাংলা কবিতায় ভাষা এবং ছন্দপ্রয়োগ বিধির এক তাৎপর্যময় নব প্রবর্তনার সূচনা করেন।

বিহারীলালের প্রধান কাব্যগুলির নাম 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিণী (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'সারদা মঙ্গল' (১৮৭৯) এবং 'সাধের আসন' (১৮৮৯)। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতেই বাংলা রোমান্টিক গীতি-কবিতার যথার্থ সূচনা হয়েছিল। তাঁর কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে রচনাভঙ্গির একটা বিবর্তনধারা অনুভব করা যায়। প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবি অনেক পরিমাণে বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। প্রকৃতির দৃশ্যপট বা নারী সৌন্দর্যের বর্ণনায় তিনি প্রত্যক্ষত বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর। জাগতিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় কবিমানসের ভাবতরঙ্গগুলি কীভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার পরিচয় আছে বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন বা বন্ধুবিয়োগ কাব্যে। বাস্তব জীবনের আনন্দ বেদনার স্মৃতিই এইসব কাব্যের উপকরণ।

পয়ার ছন্দে লেখা বন্ধু বিয়োগের চারটি সর্গের বিষয় কবির প্রথম পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর স্মৃতি-বেদনা। রচনারীতি ঈশ্বর গুপ্তের অনুসারী। এই কাব্যে দেশের ও সাহিত্যের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পাঁচ সর্গে ও পয়ারে রচিত প্রেম প্রবাহিনীতে কবিচিত্তের প্রথম জাগরণের চিত্র পাই। সংসারে

আসল প্রেমের কোনও মূল্য নেই বুঝে কবি যখন হতাশাগ্রস্ত, তখন হঠাৎ তাঁর চিত্তে দৈবী আনন্দ দেখা দিল ঃ

আজি বিশ্বে আলো কার কিরণ-নিকরে,
হৃদয়ে জ্বলে কার জয়ধ্বনি করে,...
ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল।
ললিত বাঁশরী তান উঠিছে কেবল
মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ ভরে।

সাত সর্গে রচিত 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০)-এর রচনাকাল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। ১২৭৪ সালের কার্তিকে রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড় বয়ে গিয়েছিল তাই কাব্যটির শেষ তিন সর্গের বিষয়। প্রথম সর্গে পাই সংসারের প্রয়োজনের সঙ্গে কবির স্বাধীনচিত্ততার সঙ্ঘর্ষে তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট বিক্ষুব্ধ অবস্থার চিন্তা। দ্বিতীয় সর্গে সমুদ্র দর্শন, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে কবি রামায়ণ-কাহিনী স্মরণ করে দেশের পরাধীনতার বেদনা অনুভব করেছেন। তৃতীয় সর্গে একটি বীরাঙ্গনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ সর্গে নভোমণ্ডল সম্পর্কে কবি তাঁর চিন্তা অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। বঙ্গসুন্দরী প্রথমে ছিল নয় সর্গ, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮০) তৃতীয় সর্গ সুরবালা সংযোজনের ফলে হল দশ সর্গ। সুরবালা আসলে স্বতন্ত্র কাব্য। প্রথম সর্গ উপহারে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে কবি অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন।

সর্বদাই হু হু করে মন।
বিশ্ব যে মরতর মতন ;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃকি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন!

দ্বিতীয় সর্গ নারীবন্দনা। তৃতীয় সর্গ সুরবালা। চতুর্থ সর্গ চিরপরাধীনী গৃহকোণে বন্দী বাঙালি ঘরের নির্যাতিত বধূর মর্মবেদনার প্রকাশ। পরবর্তী সর্গগুলিতেও নারীর জীবন ও মানসের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে।

সৌন্দর্য এবং প্রেম-প্রীতি বিহারীলালের কবি হৃদয়ের জাগরণ মন্ত্র। তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা ও প্রেমবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে, এক সুতীব্র উৎকণ্ঠায় জাগতিক বন্ধনগুলি ছিন্ন করে যেন কোন এক শুদ্ধতর, পূর্ণতর উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ হতে চায়। জগতের কোলাহল শ্রুতির অগোচর হয়ে আসে। সব বিচিত্রতা একটিমাত্র সুরের প্রবাহে মিশে যায়। প্রেম-প্রবাহিনীতে আভাসিত—

"মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে
দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ ভরে।"

এই সুরলোক উত্তরণের আগ্রহ কবির পরিণত কাব্যগুলিতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে

পরিস্ফুট হয়েছে, তাঁর এই কবিস্বভাবের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় সারদামঙ্গল কাব্যে। 'সারদামঙ্গল'ই বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্য সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সংগীত রচনা করি।" সারদামঙ্গলে একটি অস্পষ্ট কাহিনীর রূপরেখা আছে, কিন্তু সেই কাহিনী বস্তুজগতের কোন ঘটনা অবলম্বনে গড়ে ওঠে নি। সারদামঙ্গলের জগৎ একান্তভাবেই কবির অন্তর্গত কল্পনার জগৎ। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তিনি সারদার মূর্তি রচনা করেছেন। এই কাব্যলক্ষ্মীর রূপ কল্পনায় কবির সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে 'বিরহিত মৈত্রী-প্রীতি'র করুণা মিশ্রিত হয়েছে। কবিহৃদয়ের সৌন্দর্যবোধ এবং প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার নির্যাসে সারদাদেবীর তনু রচিত। কাব্যের সূচনায় বাল্মীকির কবিত্বলাভের প্রসঙ্গ অবলম্বনে করুণাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারদার আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে, তারপর এই সারদার সঙ্গে কবির বিচিত্র লীলার বিবরণ বিভিন্ন সর্গে বর্ণনা করেছেন, "কখনও অভিমান কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও ভৎর্সনা, কখনও স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ ও দুঃখের শতধারে সংগীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনও তাঁহাকে পাইতেছেন কখন কখনও তাঁহাকে হারাইতেছেন—কখনও বা তাঁহার সংহার মূর্তি দেখিতেছেন। কখনও বা তিনি অভিমানিনী কখনও বিষাদিনী, কখনও আনন্দময়ী" (রবীন্দ্রনাথ)। বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানব হৃদয়ের সম্পর্কের ফলে যে সব অনুভূতি উন্মীলিত হয়, কবি সারদাকে অবলম্বন করে এমন একটি জগৎ রচনা করেছেন যেখানে তার সেইসব ব্যক্তিগত অনুভূতিপুঞ্জ শুদ্ধতরভাবে প্রকাশ করা যায়। কবির কল্পনার বিশ্ব এই কাব্যে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কারও কাব্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাই না। কবি-প্রেরণার এই ভঙ্গি বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন। বিহারীলালের কবিতার রূপ অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য। বিশ্ব সৌন্দর্য তার কল্পনাদৃষ্টির সামনে কায়ার বন্ধনযুক্ত হয়েই দেখা দেয়। সেই নিরবয়ব শুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রকাশ সারদার। সারদার বন্দনায় কবি তাই বলেন,

"কায়াহীন মহা ছায়া,
বিশ্ববিমোহিনী মায়া,
মেঘ শশী-ঢাকা রাকা রজনী-রূপিণী।
অসীম কানন তল
ব্যেপে আছে অবিরল,
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।"

এই সৌন্দর্য বস্তুবিশ্বের সৌন্দর্য নয়। বস্তু থেকে তার কান্তিটুকু নিষ্কাশিত করে নিয়ে কবি তারই তনু নির্মাণ করেছেন। কবি-প্রেরণাকে বাইরে থেকে ভেতরে ফিরিয়ে কবি-ব্যক্তির অনুভবের জগৎটিকেই একান্তভাবে কাব্য বিষয় করে তুলে বিহারীলাল বাংলা

বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন'-কে সারদামঙ্গলের পরিশিষ্ট বলা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বিনী দেবী বিহারীলালের সারদামঙ্গলের ভক্ত পাঠিকা ছিলেন। তিনি কবিকে একটি পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, তাতে সারদামঙ্গলের এই কয় ছত্র তোলা ছিল।

হে যোগেন্দ্র। যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে তাঁহারে ধেয়াও ?

ভক্ত পাঠিকা কবির কাছে এই সমস্যাপূরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কবি তার জন্য তিনটি স্তবক রচনা করে ক্ষান্ত ছিলেন। কাদম্বিনী দেবীর অকালমৃত্যুর পরে কবির সে কথা মনে পড়ে এবং 'সাধের আসন' লিখে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ করেন। কবি তাঁর বিশুদ্ধ আনন্দ রসোপলব্ধিকে এই কাব্যে কিছুটা পরিমাণে বস্তুময় ও তত্ত্বরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সারদামঙ্গলের তুলনায় রূপক এখানে অনেকটা পরিণত কিন্তু পরিস্ফুট কাহিনীতে গাথা পড়েনি।

• [কুড়ি] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা মহাকাব্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়, অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ জুড়ে কাব্যের যে বিপুল সম্ভার পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে তার প্রধান অংশ আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্য জাতীয় রচনা। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের সম্মুখে আদর্শ ছিল স্কট, বায়রন ও মিল্টনের কাব্য। ইংরেজি স্কুলে যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে বাংলা কাব্যের ধারা পরিবর্তন করতে গিয়ে এই যুগের প্রধান কবিরা বাংলাদেশের প্রাচীন কাব্যধারার ধর্মাশ্রিত অলৌকিক কাহিনীগুলির পরিবর্তে নতুন ধরনের আখ্যানবস্তু উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলিই তাঁদের অবলম্বন, কিন্তু নতুন যুগের জীবন-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের জন্য অতীতের আখ্যানগুলি এঁদের কাব্যে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিল।

আখ্যায়িকা কাব্যের প্রেরণা

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজি কাব্যের রসাস্বাদে গঠিত নতুন রস-রুচিসম্পন্ন পাঠক সমাজের পরিতৃপ্তির জন্য এই কবিবৃন্দ প্রাচীনকালের কাহিনীর মধ্যে আধুনিক মানসিকতা প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করলেন। বীররস সংস্কৃত কাব্যেও ছিল, বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এই রসের চর্চার কিছু অভাব নেই, কিন্তু দেশপ্রেমের উন্মাদনায় বীররস যে অভিনবত্ব লাভ করে এই অভিজ্ঞতা ইংরেজি কাব্যপাঠের ফলেই জন্মেছিল। রঙ্গলাল দেশাত্মবোধকে বীররসের প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে দাঁড় করিয়ে রাজপুত জাতির জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কাহিনী অবলম্বনে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করলেন। ইংরেজি শিক্ষায় কাব্যে গীতিকবিতার একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। উত্তরকালে বাংলা কাব্য এই পথেই সমৃদ্ধতর পরিণামে উপনীত হয়েছে।

শিক্ষিত পাঠক সমাজ নিজেদের ধ্যান ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন রসের কাব্য হিসাবে 'পদ্মিনী' উপাখ্যান'কে সমাদর জানিয়েছে। রঙ্গলাল বড়ো প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন না, কিন্তু যুগের রসরুচির দাবি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই কাব্য-প্রকরণের দিক থেকে কোন মৌলিক সৃষ্টি বৈচিত্র্যের সূচনা করতে না পারলেও নবযুগের পাঠকদের পক্ষে তৃপ্তিকর কাব্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ যুগের প্রথম কবি রঙ্গলাল আখ্যান কাব্যের একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। উত্তরকালে এই আদর্শ দীর্ঘদিন অনুবর্তিত হয়েছে।

মৌলিক সৃষ্টিপ্রতিভা এবং উৎকৃষ্ট শিল্পবোধ নিয়ে মধুসূদন বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রঙ্গলালের কাব্যে কাহিনীর বহিরাবরণটি দেশের ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেও সেই কাহিনীর মধ্যে তিনি স্কট-বায়রনের কাব্যাংশসমূহ প্রায় অনুবাদ করেই ব্যবহার করেছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় বিদেশী কাব্যের রস আত্মস্থ করে তাকেই আপন কবি প্রেরণায় পরিণত করার যোগ্য শক্তি রঙ্গলালের ছিল না। এই স্থূল অনুকরণবৃত্তি থেকে বাংলা কাব্যকে উদ্ধার করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্ত্য কাব্য বিষয়ে মধুসূদনের অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তৃততর। বহুভাষাবিদ্ মধুসূদন শুধু ইংরেজী কাব্যই নয়—য়ুরোপের অন্যান্য সাহিত্যের প্রাচীন এবং আধুনিক ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিশ্ব-কাব্যের ফুলবন থেকে মধু সংগ্রহের যোগ্য ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং সেই দুর্লভ সৃষ্টি ক্ষমতায় তিনি পূর্ণ ছিলেন, যে শক্তি থাকলে আহৃত উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত, মৌলিক রসবস্তু নির্মাণ করা যায়। পাশ্চাত্ত্য কাব্যের স্থূল অনুবৃত্তি নয়, সেই সমৃদ্ধ কাব্যধারার রসসামগ্রী সম্পূর্ণ আত্মীকরণের দ্বারা তিনি বাংলা কাব্যকে গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক বিশ্ব-কাব্যস্তরে উন্নীত করলেন।

মধুসূদন

হোমার-মিল্টনের কাব্যভঙ্গী, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনার বিচিত্রতায় মুগ্ধ কবি মধুসূদন—তাঁর কবিগুরুদের যে রচনাবলীকে আদর্শ করেছিলেন তার সবগুলিই আখ্যান-আশ্রিত, মহাকাব্য শ্রেণীর রচনা। তাঁর নিজেরও আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল মহাকবিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের। রঙ্গলাল প্রবর্তিত ধারার অনুবর্তনে না হলেও নিজেরই অন্তরস্থিত কাব্যদর্শনের প্রেরণায় তিনি মহাকাব্য জাতীয় রচনাতেই আপন শক্তি নিয়ে শুরু করেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' সেই পরীক্ষার প্রথম ফল। 'মেঘনাদবধ'-এ পূর্ণ সিদ্ধি। মানব সম্পর্কের নবমূল্যায়ন, জাতিপ্রীতি, দেশপ্রীতি, স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধীন কল্পনা-নির্ভর সৌন্দর্যচেতনা—প্রভৃতি আধুনিক মানসিকতার লক্ষণগুলি সবই মধুসূদন প্রতিফলিত করেছেন অতি পরিচিত রাম-রাবণের কাহিনীর ছকের মধ্যে। বাল্মীকির মহাকাব্য আধুনিক কবির হাতে রূপান্তরিত হয়ে আধুনিক মানুষের জীবনের মহাকাব্যে পরিণতি লাভ করেছে। এই কাব্যেই প্রথম নবযুগের রূপান্তরিত মূল্যবোধগুলি মূর্ত হয়ে উঠল। আখ্যান কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে বাইরের দিক থেকে আপাত সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই একটা কাহিনীর ছক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মহাকাব্যের পরিকল্পিত

গঠনশৈলী, রসসৃষ্টির উন্নত আদর্শ এবং বহু শক্তিশালী কবি প্রতিভার দানে গড়ে ওঠা আঙ্গিকগত ঐতিহ্য অনুবর্তনের বাধ্যবাধকতা আখ্যান কাব্যে নেই। মধুসূদন মহাকাব্যের যে উন্নত শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন তার অনুবর্তন পরবর্তী কাব্যধারায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। মেঘনাদবধের তুল্য কাব্য রচনার আগ্রহ পরবর্তী কবিদের মধ্যে তাই খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

মধুসূদন-প্রদর্শিত কাব্যধারার অনুবর্তনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিকবিতা এবং অন্যবিধ কাব্য রচনাতেও হেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতির প্রধান অবলম্বন 'বৃত্রসংহার কাব্য' নামক মহাকাব্য। মধুসূদনের মতোই তিনি এই কাব্য রচনায় দেশী বিদেশী উপকরণ ব্যবহারে স্বাধীন কল্পনার ওপরে নির্ভর করেছেন। বৃত্র কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার থেকে দধীচির অস্থিদ্বারা নির্মিত বজ্রাস্ত্রের আঘাতে বৃত্র সংহার পর্যন্ত এই কাহিনী ২৪টি সর্গে বিন্যস্ত। পারিবারিক সম্পর্কের সমাবেশ ও পটভূমির বিস্তারে এ কাব্য মহাকাব্য নামেরই যোগ্য। হেমচন্দ্র উপকরণ জটিলতা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবদানবের শক্তি পরীক্ষার দৃশ্য পর্যন্ত নানা বিচিত্র রসের সংগ্রহে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু যোগ্য প্রতিভার অভাবে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার'-এ উচ্চাঙ্গের কাব্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। তবুও মধুসূদনের উচ্চাঙ্গের কাব্যকলা হৃদয়ঙ্গম করা যাঁদের পক্ষে দুরূহ বোধ হত সেই পাঠক সাধারণ এই কাব্যে তাঁদের উপযোগী নতুন কাব্যরসের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং হেমচন্দ্র নিজের যুগে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

হেমচন্দ্র

কল্পনার সমুন্নতি ও বিস্তারে হেমচন্দ্র যতোটা মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণে সক্ষম হয়েছিলেন, নবীনচন্দ্র তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। আবেগের অসংযমই তাঁর প্রধান অন্তরায় হয়েছে। নবীনচন্দ্র আধুনিক যুগের মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ-চরিত্রে অবলম্বনরূপে এক বিশাল কাব্য কাহিনীর পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' নামক কাব্যত্রয়ী রচিত হয়। "রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। রৈবতক কাব্যে উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।" নবীনচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রকে আর্য-অনার্যের মিলনে এক অখণ্ড ভারত রচনায় প্রধান নায়করূপে চিত্রিত করেছেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণ-চরিত্রের এই পুনর্গঠনে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয়তার ভাবনা দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র যত বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা সফল করে তোলবার মত প্রতিভার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। উপরন্তু মহাকাব্যের আঙ্গিক বিষয়েও তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে এই কাব্যত্রয়ী পুরাণ কাহিনীর কৌতূহলাবহ রূপান্তর হলেও তাকে কোন অর্থেই মহাকাব্য বলা চলে

নবীনচন্দ্র

না। অতিশয় শিথিলবদ্ধ এই আখ্যান-কাব্যত্রয়ীর বক্তব্যগত আধুনিকতা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র এই তিনজন সচেতনভাবে মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন। রামায়ণ-মহাভারত বা ইলিয়ড-অডিসির মতো জাতীয় মহাকাব্য নয়, প্যারাডাইস লস্ট বা কুমারসম্ভবের মতো সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। মহাকাব্যের বিশাল পটভূমি এবং বলবীর্যে সমুন্নত মানব-চরিত্র পরিকল্পনার জন্য যে বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি প্রয়োজন—একমাত্র মধুসূদন ভিন্ন অন্য কারও কবিকল্পনার সেই সামর্থ্য ছিল না। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র মেঘনাদবধ ভিন্ন অন্য কোন কাব্যকেই রসোত্তীর্ণ রচনা বলা যায় না। বাঙালী প্রতিভা বিশেষভাবে গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত সাহিত্যিক মানসিকতার পক্ষে মহাকাব্য যতোই স্পৃহনীয় বোধ হোক—এই শাখায় আমাদের কবির সাফল্য অকিঞ্চিৎকর। ক্রমে মহাকাব্যের পরিবর্তে গীতিরসে উচ্ছল আখ্যায়িকা কাব্যের দিকেই আমাদের কবিরা আকৃষ্ট হয়েছেন।

ইতিমধ্যে মহাকাব্য রচনার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের পাশে বাংলা কবিতার আর এক স্বতন্ত্র সুর বেজে উঠেছে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে। এই সুর একান্তভাবে গীতিকবিতার সুর। একদিকে বৃত্রসংহার জাতীয় রীতিমত মহাকাব্য, অন্যদিকে বিহারীলালের গীতিরসাত্মক 'সারদামঙ্গল'—এই দুই সীমার মধ্যবর্তী একধরনের রোমান্টিক আখ্যান কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আবির্ভূত হয়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (১৮৮০) প্রভৃতি কাল্পনিক রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যগুলিতে মহাকাব্যের লক্ষণের চেয়ে গীতিকাব্যের লক্ষণই অধিকতর পরিস্ফুট। স্পষ্টই বোঝা যায়, মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে আসছে, মহাকাব্যিক কবিকল্পনা হাজার গীতিতে ছড়িয়ে পড়বে তারই পূর্ব লক্ষণ দেখা গেল রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে।

অপ্রধান কবি ও কাব্য

বিহারীলাল বাংলা কবিতার নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন তাঁর 'সারদামঙ্গল'-এ। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং সর্বোপরি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই গীতিকাব্যের নতুন সম্ভাবনাকে চরম পরিণতিতে বহন করে নিলেন। মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে এল গীতিকাব্যের যুগ।

[একুশ] আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার সূচনা পর্বের কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দদাস ও কামিনী রায়ের কবিপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। পুরাণ-ইতিহাস মন্থন করে তার সঙ্গে বিদেশী কাব্যের ভাববস্তুর মিশ্রণে মহাকাব্য ও আখ্যায়িকা কাব্য রচনার যে ব্যাপক প্রয়াস ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ জুড়ে চলছিল বিহারীলালের মন্ময় লিরিক কবিতায় তার অবসান সূচিত হল। অন্তর্মুখী

ভাবপ্রেরণাতেও যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যায় বিহারীলাল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করে দেন। বৃহত্তর পাঠক-সমাজে বিহারীলালের ব্যাপক পরিচিতি ছিল না ঠিকই, কিন্তু সমসাময়িক কবি-সমাজে তাঁর কবিতার নতুন সুর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই প্রভাব বিস্তৃত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদিত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম পরিণত কাব্য 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, 'সোনার তরী' ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাল বলতে যে সময়সীমার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা তারিখের হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। খুব শিথিলভাবে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের মধ্যভাগ থেকে শেষ দশকের মাঝামাঝি—অর্থাৎ 'সোনার তরী' প্রকাশ পর্যন্ত এই পর্বটির সীমা নির্দেশ করা যায়। এই সময়ে বাংলা কাব্যে এক নতুন অধ্যায়ের সুস্পষ্ট সূচনা হয়। যাঁদের কাব্যসৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা কবিতায় এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় তাঁরা বয়সের দিক থেকে সকলেই রবীন্দ্রসমসাময়িক হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কবি। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এই কালের অন্য কয়েকজন প্রধান কবির কাব্যকৃতিই এখানে আলোচিত হবে।

অক্ষয়কুমার বড়াল (**১৮৬০—১৯১৮**)-এর কাব্যগুলির নাম 'প্রদীপ' (১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২), 'ভুল' (১২৯৪), 'শঙ্খ' (১৩১৭) এবং 'এষা' (১৩১১)। তিনি বিহারীলালের কাব্যপদ্ধতিকে অনুসরণ করলেও তাঁর সাহিত্যগুরুর প্রভাব অনেকটা পরিমাণেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন ঃ 'অক্ষয়কুমারের ভাবোচ্ছ্বাস সংযত এবং বিষয়বস্তু সংহত ও স্পষ্টতর। গুরুর আনন্দমগ্নতার কোন রেশ শিষ্যের রচনায় নাই। তবে গুরুর রচনাশৈথিল্যও নাই।' বয়সে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও অক্ষয়কুমার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। প্রেমই তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়। পত্নী-প্রেম, সংসার বন্ধনের স্থূলতা থেকে মুক্ত থেকে এক স্নিগ্ধ প্রশান্ত হৃদয়ানুভূতিরূপে তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি' প্রভৃতি প্রথমদিকের কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে দেখা যায় "আপনারই হৃদ্‌গত কামনার ও তাহারই চির-অতৃপ্ত পিপাসার বিগ্রহরূপে এক মানসী-প্রতিমা তাঁহার কবিস্বপ্ন আচ্ছন্ন করিয়াছে।" কবির এই মনোভাব ভাষা পায়—

"পড়ে আছি নদ কূলে শ্যামদূর্বাদলে—
কি যেন মদিরা পানে
কি যেন প্রেমের গানে
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে।"

প্রভৃতি চরণে। এই অতি মর্ত প্রেমভাবনা কবির ব্যক্তিগত জীবনের এক শোকাবহ ঘটনায় বাস্তব জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য মিলিত হয়ে অভিনব রূপে দেখা দেয় তাঁর 'এষা' কাব্যে। 'এষা' কবি-পত্নীর মৃত্যুজনিত শোকগাথা। যে প্রেম ও সৌন্দর্য

অধরারূপে গোচরে ব্যাপ্ত দেখেছিলেন—শোকানুভূতি বিদ্ধ হৃদয়ে সেই প্রেমকেই কবি আপন স্ত্রীর ভালবাসার সীমার মধ্যে মূর্তরূপে উপলব্ধি করলেন। এই নতুন উপলব্ধির সঙ্গে মিশ্রিত হল মৃত্যুজনিত রহস্যবোধ। দুঃসহ শোকই মিলনসূত্ররূপে কবির রোমান্টিক প্রেম কল্পনাকে বাস্তব সংসারে প্রত্যক্ষতার সীমার সঙ্গে মিলিয়ে দিল। 'এ' কাব্যের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন—

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগৎ এই মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাববদ্ধ বাক্য, রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।

'এষা'ই অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা গীতিকাব্যে এই গ্রন্থ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আবেগের প্রবলতা কবিকে বাইরে চঞ্চল করেনি, হৃদয়কে গভীরভাবে ভাবমগ্ন করেছে এবং তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে নারীপ্রেমের স্নিগ্ধ শান্ত রূপ—এটাই অক্ষয়কুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য। সংলাপের একটি কবিতায় দেখা যায়, ভাবাবেগের আলোড়ন শান্ত হয়ে এলে এবং অচরিতার্থতার বেদনা জুড়িয়ে গেলে প্রশান্তির প্রলেপে নারীর মহিমা নতুন রসরূপে দেখা দেয় :

আমার পরাণ ভাসিয়া যায়, পড়ে তা উছলি।
কেন এক মহাকাব্য হয়ে ওতপ্রোত।...
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস, সখি তবে,
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে।

রবীন্দ্রনাথের মত অক্ষয়কুমারও ছিলেন ব্রাউনিঙ-এর ভক্ত পাঠক, তার কাব্যে ব্রাউনিঙের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংযত ও পরিমিত ভাষা, শব্দচরণ ও পদলালিত্যের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্যের সমন্বয় তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। ডঃ সুকুমার সেন এইভাবে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের সঙ্গে অক্ষয়কুমার বড়ালের তুলনা করেছেন: "দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গেও অক্ষয়কুমারের মিল আছে, সে হইল গার্হস্থ্য প্রেমে উভয়েরই কাব্যস্ফূর্তির উৎস বাল্যপ্রেম। তবে দেবেন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ঘরের সীমানায় ঘেরা, আর অক্ষয়কুমারের কাব্যলক্ষ্মী অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও অবরোধের বাহিরে বিচরণশীলা। ভগবদ্‌ভক্তির প্রকাশও উভয়ের কবিতার একটা সমান ধর্ম (তবে সে প্রকাশের মাত্রা বিভিন্ন)। গোবিন্দচন্দ্র দাস ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে সাধর্ম্য পাইতেছি, ভাবাবেগের তীব্রতায়। গোবিন্দচন্দ্রের আবেগ passionate বাসনাবিল ; অক্ষয়কুমারের আবেগ ইণ্টেলেক্‌চুয়াল, ভাবনা-উদ্বেল। এই কারণে একই ভাবের কবিতায় অক্ষয়কুমার যতটা সার্থক হইয়াছেন গোবিন্দচন্দ্র ততটা নন। অথচ অনুভূতির বাস্তবতা ও তীব্রতা গোবিন্দ-চন্দ্রের কবিতায় যতটা প্রত্যক্ষ অক্ষয়কুমারের কবিতায় ততটা নয়। দুইজনেই নারীরূপের উপাসক। একজন চাহেন নারীরূপকে ইন্দ্রিয়বাঁধনে ধরিয়া উপভোগ করিতে, অপরজন

চাহেন সে রূপমাধুরী ধ্যানকল্পনায় অনুভব করিতে। গোবিন্দচন্দ্র জোৎস্নায় বলেন, "আমি ভালবাসি তারে অস্থিমাংসসহ", আর অক্ষয়কুমার স্বপ্ন দেখেন, "কি ন নারীর রূপ ছেয়েছে সকলে।" দুজনেই স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁদের স্মৃতি-কাব্য লিখেছিলে।

প্রকৃতি সাথে হয় কবি চিত্ত বিনিময় ;
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন,
ওই আঁখির মিলন।"

—এই চরণ কয়েকটিতে **দেবেন্দ্রনাথ সেন** (১৮৪৫—১৯২০)-এর কবি প্রকৃতির বিশিষ্টতার পরিচয় আছে। দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে রূপ পিপাসিত কবি। বিমূর্ত সৌন্দর্যবোধের প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই, তিনি সৌন্দর্যকে পেতে চান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদ্যমান রূপে, নির্দিষ্ট আকারের সীমায় মূর্তিবদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিই তাঁর একাগ্র আকর্ষণ। তাই বার বার তাঁর কবিতায় আঁখির মিলনের কথা পাই। মোহিতলালের কথায়, তাঁহার প্রতিভা আত্মমুগ্ধ ; তিনি আপন হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভাব নির্ঝরিণীর মধ্যে আপনাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; আপনার অন্তরে যে স্পর্শমণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ জীবনকে সোনায় সোনা করিতে চাহিয়াছেন ; তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চদীপ জ্বালিয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন—কোনপ্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি সে পূজাগৃহে পদক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিহারীলালের ধ্যান ছিল, দেবেন্দ্রনাথের কেবল আরতি। এই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির সৌন্দর্যসাধনায় একটি নতুন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—নয়ন ও হৃদয়, এই দুইয়ের পরিচর্যায় সর্বেন্দ্রিয়ের উল্লাসব্যঞ্জক এক নূতন কাব্যকলার উদ্ভব হইয়াছে।" আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি —
রূপের পূজারী।"

দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রে। তাঁর কাব্য সংকলনগুলির মধ্যে বিখ্যাত 'অশোকগুচ্ছ' (১৩০৭), 'গোলাপগুচ্ছ', 'পারিজাত গুচ্ছ', 'শেফালী গুচ্ছ' এবং 'অপূর্ব নৈবেদ্য'।

কবিজীবনের প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার পরিচয় মেলে তাঁর 'উর্মিলা কাব্য' ও অসমাপ্ত 'দশানন বধ' কবিতায়। তাঁর কাব্যভাষায় শেষ পর্যন্ত এই প্রভাবের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ফুলবালা কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও চোখে পড়ে। কোনও কোনও সমালোচকের মতে, দেবেন্দ্রনাথের রচনাশৈলীতে মধুসূদনের রীতি ও বিহারীলালের রীতি সম্মিলিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ভাবুক হলেও বিহারীলালের মত আত্মহারা নন, তাঁর কবিতার বিষয়ও বিশুদ্ধ ভাবনির্ভর ও বস্তুভারবর্জিত নয়। স্বাভাবিকভাবেই নারীপ্রেমের বিচিত্র

প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে বেশি স্থান পেয়েছে। পরবর্তী কালে বাৎসল্যকেও প্রাধান্য পেতে দেখা যায়।

দাম্পত্য প্রেম, বাৎসল্যপ্রীতি ও ভগবদ্‌ভক্তি—এই তিনদিকেই দেবেন্দ্রনাথের সহজাত প্রবণতা। নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের প্রতি কবিহৃদয়ের সমবেদনা প্রবাহিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের সনেটে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও মৌলিকতার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দেবেন্দ্রনাথের যে কত প্রিয় ছিল, 'রবীন্দ্রবাবুর সনেট' কবিতায় তার প্রমাণ মেলে। 'প্রিয়তমার প্রতি' সহজ সরল আবেগে ও রস-মাধুর্যে মনোমুগ্ধকর :

'নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,
আধ গ্রাস জল যেন নিদাঘের কালে ;
চারিধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !'

সুকুমার সেনকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, নব্য রোমান্টিক কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গার্হস্থ্য-কবি, বাঙালি মেয়ের ঘরোয়া রূপ-সজ্জা, তার প্রেমসেবার সৌরভ কবিচিত্তকে সর্বদাই আবিষ্ট করে রেখেছে এবং সেইজন্য কবির কল্পনাও সর্বত্র নারীর—শৈশব সঙ্গিনীর ও প্রিয়ার সঙ্গসুখ বিচিত্রভাবে অনুভব করে ফিরেছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় ফুলের সমারোহ : দোপাটি, বনতুলসী, গুলে-কোওলি, সদা-সোহাগিন্, হর-শিঙ্গার ইত্যাদি কবিপ্রসিদ্ধিহীন ফুলগুলিকেও তিনি তাঁর কবিতায় পরম সমাদরে স্থান দিয়েছেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) জন্মগ্রহণ করেছিলেন পূর্ববঙ্গে, সেখানেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি। আধুনিক সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র কলকাতার সঙ্গেও তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবু তাঁর রচনার আধুনিক ব্যক্তিত্ববোধের প্রবল শক্তিদীপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে গোবিন্দচন্দ্র প্রভূত অশান্তি-উপদ্রব ভোগ করেছিলেন, তাঁকে প্রতিকূল অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে অবিরাম। কিন্তু তিনি অবসন্ন হয়ে কোনও শক্তির কাছেই মাথা নত করেননি, তাঁর কবিতাও তাঁর সেই পৌরুষে দীপ্ত। অবশ্য কবির নিদারুণ ক্ষোভ কোনও কোনও কবিতায় আগ্নেয় জ্বালায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাতে তাঁর কাব্য রচনা বাধাগ্রস্ত হয়নি। বরং তার ফলে তাঁর কবিতার রস ও রূপ এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রসূন' (আনুমানিক ১৮৭০ খ্রীঃ), 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'চন্দন' (১৮৯৬), 'ফুলরেণু' (১৮৯৬), 'কস্তুরী' (১৩০২ বঙ্গাব্দ), 'বৈজয়ন্তী' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। কাব্যরীতির দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য দুই-ই দেখা যায়। দুজনেরই বিষয় প্রেম, বিশেষতঃ

দাম্পত্য-প্রেম। দেবেন্দ্রনাথের কবিত্ব পত্নীপ্রেমের আদর্শ কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং প্রেমের রসমাধুর্যেই তাঁর প্রেমকবিতার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব তাঁর যৌবনসঙ্গিনী পত্নীর প্রেমকে কেন্দ্র করে যৌবন প্রেমস্বপ্নের স্মৃতিপথেই প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কবিতায় প্রেমের প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে পত্নীকেন্দ্রিক নয় এবং তাঁর মধ্যে দেহের আকর্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। গোবিন্দচন্দ্র তাঁর দেহচেতনাকে অকুণ্ঠিতভাবেই ব্যক্ত করেন :

আমি এরে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ।
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
('আমার ভালবাসা,' কস্তুরী)

এই তীব্র নিরাবরণ ইন্দ্রিয়চেতনার দৃপ্ত প্রকাশ বাংলা কাব্যসাহিত্যে অভিনব। এখানেই সমসাময়িক কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের প্রখর স্বাতন্ত্র্য। প্রেমের এই দুর্নিবার আবেগতীব্রতার কাছে সবকিছুই তুচ্ছ, অবাস্তব :

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হয় হোক স্বপ্নময়,
সে আমি অনন্ত সত্য অনাদি অব্যয়!
('অনাদি অব্যয়', ফুলরেণু)

গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রতিভা ছিল, অনুভূতিতেও গভীরতা ছিল, তাঁর কাব্যের পশ্চাদ্‌পটে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায় দুঃখদহনের প্রচণ্ডতা অনুভব করা যায়। কিন্তু কাব্যপ্রকরণে অনেক সময়ই ভাবের অসংযম ও ভাষার শিথিলতা চোখে পড়ে। সনেট রচনায় তাঁর ব্যর্থতা সবথেকে বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও অবশ্য ভাবের গভীরতা ও ভাষার লালিত্য তাঁর রচনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে :

বহিছে শীতল বায়ু—পরাণ পাতিয়া,
জানিনা, কেমন ঘুমন্তভাবে আছি দাঁড়াইয়া!
সেই চুল, সেই ফুল, সে দাড়িম্ব শির,
সেই শ্যাম-অঙ্গে বিলসিত কম্পিত সমীর!
('সেই একদিন আর এই একদিন', প্রেম ও ফুল)

পূর্ববঙ্গবাসী গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায়-পূর্ববঙ্গের বিশেষ আবহাওয়ার প্রতিফলন এবং কথনভঙ্গি বিশেষ ধরনের বাস্তবরস সৃষ্টি করেছে, যেমন এই অংশে :

ধুইয়া দিয়াছে চুল খৈল-গিলা দিয়া,
পেছন দুয়ারে বসি রউদে শুকায়,
পউষের 'নীলানীল' বাতাস আসিয়া
এলাইয়া মেলাইয়া পলাইয়া যায়।
(চুল শুকান, ফুলরেণু)

মহিলা কবিদের মধ্যে **কামিনী রায়** (১৮৫৪—১৯৩৩) সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। বালিকা বয়েস থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তিনি কাব্য রচনায় রত ছিলেন। তাঁর কাব্যসাধনার ধারা হেমচন্দ্রের যুগ থেকে রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। কামিনী রায় কবি হিসেবে প্রথমে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কামিনী রায়ই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী কাব্যধারার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। কামিনীর কবিদৃষ্টি আত্মগত হলেও বাইরের জগতের প্রতি উদাসীন, কিংবা বিহারীলালের মত আত্মভাববিভোর অথবা অক্ষয়কুমার বড়ালের মত ভাবতন্ময় নয়। তাঁর কবিতায় বিষয়নিষ্ঠা, নীতিচিন্তা ও উপদেশে পূর্বগামী কবিদের রচনাধারার সঙ্গে যোগ লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষা পরিমিত ও সংযত, ছন্দে বৈচিত্র্য ও সঙ্গীতময়তার অভাব।

কামিনী রায়ের রচনায় নারীহৃদয়ের প্রকাশ যতটা ঐকান্তিক এমনটি ইতিপূর্বে কোন মহিলা-কবির রচনায় দেখা যায় না। 'দৈব-হত অথবা প্রিয়-বিড়ম্বিত নারীপ্রেমের সশঙ্ক কুণ্ঠা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ আত্মলোপী নিঃস্বার্থতা ইঁহার কাব্যের বিশিষ্ট স্বর', এই স্বর বৈষ্ণব কবিতার মত, কিন্তু কামিনী রায়ের রচনায় আরও ব্যক্তিগত, আধুনিক জীবনবোধে অভিষিক্ত :

> হয় হোক্ প্রিয়তম,
> অনন্ত জীবনসম
> অন্ধকারময়,
> তোমার পথের পরে
> অনন্ত কালের তরে
> আলো যদি রয়। (পান্থযুগল, আলো ও ছায়া)

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলোছায়া'র অধিকাংশ কবিতায় প্রথম প্রেমের ভীরুতা ও বিচ্ছেদ-কাতরতা রূপায়িত। 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' নামে যে দুটি দীর্ঘ কবিতা আছে, তাদের মধ্যে ভাব ও রচনার গাঢ়তা পরিস্ফুট। সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র-আশ্রয়ে কাব্যরচনা এই প্রথম। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মাল্য ও নির্মাল্য'-এ (১৩২০ সাল) কবির প্রথম জীবনে লেখা কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। অধিকাংশ কবিতায় পাই 'ঔদাসীন্য প্রত্যাখ্যাত ও আশাহত নারীহৃদয়ের মৃদু অভিমান-অনুযোগ ও আত্মবিলোপের স্বর' :

> তোমার কণ্ঠের স্বর, তব দৃষ্টিখানি,
> মনে হয়, আমি যেন চিরদিন জানি ;
> আশা হ'ল তোমা হ'তে ভাল করে পাব
> আপনার পরিচয়··· (হৃতাভিজ্ঞান)

'একদিনের ছুটি'-তে কবি এই আশা প্রকাশ করেছেন, সমাজ সংস্কারের বাইরে ঈশ্বরের

স্নেহদৃষ্টির অধীনে সব অভিমান ভুল বোঝাবুঝির অবসানে প্রিয়ের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে বাধাহীন।

কামিনী রায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'পৌরাণিকী (১৩০৪ বঙ্গাব্দ), 'গুঞ্জন' (১৩১১ বঃ), 'অশোক-সঙ্গীত' (১৯১৪ খ্রীঃ), 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯) ও 'জীবনপথে' (১৯৩০)। একটি ক্ষুদ্র নাটিকা 'একলব্য' এবং দুটি কবিতা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ' ও 'রামের প্রতি অহল্যা' পৌরাণিকীতে স্থান পেয়েছে। 'অশোক সঙ্গীত' ও 'জীবনপথে' সনেট সংকলন। 'দীপ ও ধূপে'র কয়েকটি কবিতায় অসহযোগ-আন্দোলনের প্রতি কবির সহানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবনপথের প্রথমাংশে প্রণয়স্মৃতিচারণা এবং দ্বিতীয় অংশে বিরহের আশ্রয়হীনতার বিষাদ চিত্রিত। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ "কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা সরল, সংযত এবং পরিমিত। ভাবের ও ভাষার সংযম ও শালীনতা ইঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়-দ্বন্দ্বের মধ্যে নৈতিক এবং বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গীত অন্বেষণ ইঁহার কবিতার মর্মকথা। ইহাই কবির নারীহৃদয়ের আসল পরিচিতি। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কবির যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাহা পৈতৃক।'

• [বাইশ] সাহিত্যিক ইতিবৃত্তের ধারায় উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কাব্যকবিতাগুলির আলোচনা কর।

অথবা

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচিত বাঙ্‌লা দেশাত্মবোধক কাব্য ও খণ্ড কবিতার পরিচয় দাও।

উত্তর। ঈশ্বর গুপ্তের একান্ত স্নেহভাজন, সহকারী ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিয়মিত লেখক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম পাশ্চাত্ত্য কাব্যের রোমান্টিক-কল্পনায় প্রভাবিত হয়ে দেশাত্মবোধক রচনায় বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। ডাঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন ঃ "অবাস্তব কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেন… রঙ্গলালে নব-রোমান্টিক কবিত্ব প্রত্যূষান্ধকারে অকালজাগ্রত এক বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলির ন্যায় অপূর্বকণ্ঠ এবং দ্বিধাগ্রস্ত। রঙ্গলালের বাণী যাঁহাদের অন্তরের মৌন স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল সেই নবপ্রলুব্ধ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর ভবিষ্যতের আশা তখনো তেমনি অস্ফুট তেমনি সংশয়বিজড়িত ছিল। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে' শিক্ষিত বাঙালী আপনার মনের কোন কোন ভাবনাকে কতকটা বাঙ্ময় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল।

রঙ্গলালের সমকালে ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে পরাধীনতার অভিশাপ অস্থিরতা ও অতৃপ্তি জাগিয়ে তুলছিল। টডের রাজস্থান কাহিনীর রাজপুত বীরত্বের গল্প বাঙালির দেশগৌরববোধের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকেরা শিক্ষিত হিন্দুদের তোষণ নীতি ত্যাগ করে, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে

ও সমাজ-সংস্কারেও তাদের আর কোনও আগ্রহ ছিল না। বাঙলার ইংরেজি-শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদেরও ইংরেজ শাসকদের ঔদার্য এবং এদেশের উন্নয়নে তাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে সব আশা-ভরসা চূর্ণ হয়। তাঁদের মানসে দেশের পরাধীন অবস্থার জন্য ক্ষোভ বেদনা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা, রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা', ইলবার্ট-বিলবিরোধী আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-আনন্দমোহন বসুর ভারত সভা, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস (১৮৮৩), ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙলার জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ইংরেজি-শিক্ষিত প্রথম বাঙালি কবি রঙ্গলালও টডের Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে আলাউদ্দিন-কর্তৃক চিতোর অবরোধ এবং সতীত্ব রক্ষার জন্য পদ্মিনীর চিতানলে আত্মাহুতির শৌর্যবীর্যময় কাহিনীকে তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর (১৮৫৮) বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই কাব্যে রানা ভীমসিংহের ক্ষত্রিয়দের প্রতি উৎসাহবাণী প্রথমে ভারতবর্ষে মানুষের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করেছিল :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?

পদ্মিনী-উপাখ্যানের সর্বাধিক পরিচিত অংশ এই 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য' টমাস মুরের Glories of Brien the Brave ও From Life Without Freedom' কবিতার অনুসরণে লিখিত হলেও বাঙলাদেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষে বিপুল প্রেরণা দান করেছিল। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী' (১৮৬২)-তে তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ স্পষ্টতর। এই কাব্যটির কাহিনীসূত্রও রাজপুত-ইতিহাস থেকে গৃহীত। কর্মদেবীর নায়ক যশল্মীরের অন্তর্গত পুগল প্রদেশে ভাট্টিজাতির অধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর বীর ও স্বদেশনিষ্ঠ চরিত্রে দেশাত্মবোধের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। বিদেশী বণিকদের কাছে দেশের সোনা বিকিয়ে গেছে বলেই যে আমাদের দেশের এই দুর্গতি, কবি সাধুর উক্তিতে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, বাঙালির পৌরুষহীনতাকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বীরবাহু কাব্য'-এ (১৮৬৪) রঙ্গলালকে অনুসরণ করলেও দেশাত্মবোধের প্রকাশে পূর্ববর্তী কবিকে অনেকটা পরিমাণেই অতিক্রম করেছেন। "রঙ্গলালের কাব্যে স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ পশ্চাত্তাপে, এবং তাহা নিষ্ক্রিয় গোছের, দৈবনির্ভর-শীল। বীরবাহুতে স্বদেশপ্রেম সক্রিয়। নায়কের মনোবেদনার মধ্যে লেখকের মনোবেদনাই মুখরিত।" বীরবাহুর নায়কের এই স্বপ্নসাধ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত অনেক বাঙালি তরুণের হৃদয়মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল :

এবে সেই দেশমান্যাভারতবক্ষেতে,·ম্লেচ্ছকুল পদে দলে।…
লক্ষতরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসার,
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার ॥

'এডুকেশন গেজেটে' ও 'অবোধবন্ধু'তে হেমচন্দ্রের যে খণ্ডকবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি প্রথম খণ্ড 'কবিতাবলী' (১৮৭০)-তে সংকলিত হয়। এই কাব্যসংকলন গ্রন্থের 'ভারত সঙ্গীত' হেমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও জনসমাদৃত কবিতা। এই কবিতার দ্বারা জাতীয় আন্দোলন অনুপ্রাণিত হয়েছিল, দেশাত্মবোধের প্রসারে কবিতাটির ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণীয়। দেশপ্রেমের এমন আবেগোচ্ছ্বাস পূর্ণ ও উত্তেজনাতপ্ত প্রকাশ খুব কম বাঙলা কবিতায়ই দেখা যায়। ভারত সঙ্গীতে পরাধীন ভারতবাসীদের দাসমনোভাবের প্রতি কবি এই কঠিন ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন :

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে ?

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ কবিতা 'বিবিধ কবিতা'-য় (১৩০০ সাল) সংকলিত হয়েছিল। সমকালীন ঘটনামূলক, সরল ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলিতেই হেমচন্দ্রের রচনাশক্তি বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের অন্তরালে স্বদেশের জন্য কবির উৎকণ্ঠা-মমতা ও দেশবাসীদের অধোগতিতে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে :

'হায় কি হোল দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে।
পার্টি খেলা কেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে।
সবাই "লীডার"—কর্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুলছে কতো কতই-তরো সুর ॥

নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগের (১২৮৪ সাল) 'ভারত-উচ্ছ্বাস' কবিতাটি রানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভারত-আগমন উপলক্ষে রচিত, কবি তার জন্য পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। অবকাশরঞ্জিনীর প্রথম ভাগে (১৮৭১) দেখা যায়, মাতৃভূমির অতীত গৌরবের স্মৃতি কবিকে যন্ত্রণাদগ্ধ করেছে, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই, আর্য ভারতের মহিমাবোধেই কবির স্বাধীনতা-কল্পনা সীমিত। দ্বিতীয় ভাগে আমরা লক্ষ্য করি, হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা নবীনচন্দ্রকেও উদ্বেল করেছে, ভারতের আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য কবি বেদনাময় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন :

হবে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
যেই দিন দীনা ভারত তনয়
শিখি রণনীতি, করি বীরপনা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয় ?

ঐতিহাসিক গাথা কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬) জাতীয়তাবোধের উন্মেষের যুগে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের রচনায় ভারতবর্ষের পরাধীনতায় ক্ষোভ মুসলমান শাসনের পটভূমিকায় পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের কাছে বাঙালির স্বাধীনতার লোপ সেকালের শিক্ষিত তরুণদের মনে যে গ্লানিবোধ জাগিয়ে তুলছিল, বাঙলা কাব্যে তার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে'। অবশ্য তখন ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে সিরাজ-সম্পর্কিত যা-কিছু বৃত্তান্ত জানা ছিল সেই ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রকে যে কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত করা হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করার ফলে নবীনচন্দ্র সিরাজ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নিজের সরকারি চাকরির জন্য ক্লাইভের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার জন্য কবি মোহনলালকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্বদেশ-প্রেমের প্রতীকরূপে চিত্রিত করেছেন। মুসলমান নবাবের সেনাপতি মোহনলাল সিরাজের জন্যই সংগ্রাম করেছে, কিন্তু সিরাজের পরাজয়ে ভারতবর্ষ যে 'যবন' অধিকার থেকে মুক্ত হল, এই মনোভাবও সে প্রকাশ করেছে। এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও পলাশির যুদ্ধে দেশের পরাধীনতার মর্মবেদনা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতেই হয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পলাশির যুদ্ধের প্রতিটি অভিনয় জন-সংবর্ধিত হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধে যে দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তারই আর এক পরিচয় নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যত্রয়ী 'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস'-এ (১৮৯৬) রূপ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে কৃষ্ণ চরিত্রকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের ভাষ্য অনুসরণ করে মহাভারতের পটভূমিতে কৃষ্ণকে আর্যসংস্কৃতির নবউজ্জীবনে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের নায়করূপে পরিকল্পনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের মিলনে যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের রূপ কবি চিত্রিত করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই উদ্ভাসিত হয়েছে। অবশ্য নবীনচন্দ্র তাঁর প্রতিভার দুর্বলতার জন্য চরিত্র ও ঘটনায় জাতীয়তাবাদের এই আদর্শকে জীবন্তভাবে রূপায়িত করতে পারেননি।

[তেইশ] উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাব্য রচনার উপযোগ ও বিকাশ সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

উত্তর। কাব্যের মধ্যে পূর্বাপর সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতাপূর্ণ কোনও কাহিনী পরিবেষণ করলেই তাকে আখ্যায়িকা কাব্যরূপে চিহ্নিত করা হয়। আর আখ্যায়িকা কাব্য যখন কোনও মহৎ জাতীয় জীবনাদর্শের আধার হয়ে ওঠে, তার বর্ণনায়, চিত্রকল্পে ও চরিত্র-চিত্রণে সেই ভাবসমুন্নতি উদ্ভাসিত হয়, তখনই সেই রচনা মহাকাব্যের মর্যাদা অর্জন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কবিরা বায়রন, মুর, স্কট প্রভৃতির কাহিনীকাব্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আখ্যায়িকা কবিতার রোমান্টিক কল্পনা, বৈচিত্র্য, কাহিনীরস ও নাটকীয়তা প্রভৃতি তাঁরা কবিত্বের গৌরবরূপে অনুভব করেছিলেন। আখ্যায়িকা ও মহাকাব্য দেশাত্মবোধ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যমরূপেও তাঁরা অনুভব করে তাঁদের আদর্শে বাঙলা-ভাষায় আখ্যায়িকা ও মহাকাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ইংরেজি-শিক্ষিত প্রথম বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও শেক্স্‌পিয়র স্কট-বায়রণ, বিশেষতঃ টমাস মূরের অনুসরণে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবি কল্পনার প্রয়োগে বাঙলা কাব্যে আধুনিক ধারা প্রবর্তন করলেন। অবাস্তব কাল্পনিক পরিবেশে প্রণয়লীলার পরিবর্তে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশাত্মবোধক কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। টডের রাজস্থান-কাহিনী থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে রঙ্গলাল শুধু বাঙলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যানকাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) রচনা করেছিলেন। ইতিহাসলব্ধ বিষয়বস্তু, প্রকৃতি বর্ণনা ও রোমান্টিকে দেশপ্রেম গতানুগতিক কবিতার জীর্ণ আধারে নতুন রস সঞ্চারিত করেছে। রানা ভীমসিংহের ক্ষত্রিয়দের প্রতি উৎসাহবাণী 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' এদেশে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল। রঙ্গলালের দ্বিতীয় আখ্যানকাব্য 'কর্মদেবী'র (১৮৬২) চার-সর্গ-সংবলিত কাহিনীও রাজপুত-ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। নায়ক সাধুর চরিত্র পরিকল্পনায় দেশপ্রেমের আদর্শের ছবি স্পষ্টতরভাবে অঙ্কিত। তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী'র কাহিনীরও ভিত্তি রাজপুত ইতিহাস। কাব্যটি সম্পূর্ণরূপেই বর্ণনাত্মক।

রঙ্গলালের তৃতীয় আখ্যানকাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'র (১৮৭৯) বিষয়বস্তু উড়িষ্যার ইতিহাসের একটি রোমান্টিক কাহিনী। এই কাহিনীর কাঠামো কবি পেয়েছিলেন পুরুষোত্তম দাসের প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যে। কাহিনীটির আধুনিক রূপ রচনার জন্য তার একটু ঐতিহাসিক ভূমিকা দিয়েছেন এবং কাঞ্চীর যুদ্ধ রাজপুত যুদ্ধের আদর্শে বর্ণনা করেছেন। 'কাঞ্চী কাবেরী'র রোমান্টিক বিষয়বস্তুতে ভক্তিরস প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু রঙ্গলাল কাব্যপ্রকরণে প্রাচীন কাব্যধারাই অনুসরণ করেছেন, ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশকলায় তিনি কোনও মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কর্মদেবী প্রকাশের পূর্বেই বাঙলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার ফলে মধুসূদনের কবিখ্যাতি ম্লান হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তই আধুনিক বাঙলা কাব্যের রূপস্রষ্টা। তিনিই তাঁর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানে, দুঃসাহসিক কবিপ্রতিভার প্রবল শক্তিমত্তা ও আত্মবিশ্বাসে বাঙলা কবিতাকে একটি সংকীর্ণ গতি থেকে মুক্ত করে আধুনিক জীবনচেতনার বৃহত্তর জগতে ব্যাপ্তির ঐশ্বর্য দিয়েছেন। সেই জীবনবোধ ও প্রতিভার দুর্জয় শক্তিতেই নতুন জীবনাদর্শের উপযুক্ত আধার নির্মাণের তাগিদে মধুসূদন প্রচণ্ড দুঃসাহসে বাঙলা কাব্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত পয়ারের চরণান্তিক মিল এবং শ্বাসযতি ও

অর্থযতির যান্ত্রিক ঐক্যবন্ধনকে ভেঙ্গে মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্ণনাময় কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'কে মধুসূদন নিজেই Epicling বা মহাকাব্যিকা বলেছেন। কাব্যটি মধুসূদনের শিক্ষানবিশি পর্বের রচনা। ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও রচনাটিতে মধুসূদনের শক্তির পরিচয় মেলে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন তাঁর নতুন জীবনবোধের প্রকাশে রামায়ণ কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়েছেন: দুরাচারীরূপে চিরনিন্দিত রাক্ষসরাজ রাবণকে তাঁর কাব্যের নায়করূপে গ্রহণ করে তার মধ্যে সর্ববন্ধনমুক্ত, আত্মশক্তিতে বলিষ্ঠ, আত্মমর্যাদা-সচেতন আধুনিক মানুষের পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শকে রূপায়িত করেছেন। রাম তাঁর কাছে ভীরু, দুর্বল, প্রতিপদে দেবতাদের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল; বিভীষণের ধর্মবোধহীন স্বার্থপরতা ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মানবহৃদয়ের সর্বপ্রকার অনুভূতির প্রকাশে অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত। হোমরের ইলিয়দ, ভার্জিলের এনেইদ, দান্তে, তাসসো ও মিল্টনের মহাকাব্য, বাল্মীকির রামায়ণ, ইত্যাদি রচনা থেকে ভাব, বিষয়বস্তু ও প্রকাশকলা আহরণ করে মধুসূদনই বাঙলা ভাষায় যথার্থ মহাকাব্য রচনায় সফল হয়েছিলেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু কাব্য'-এর (১৮৬৪) বিষয় কাল্পনিক। কাব্যটিতে রঙ্গলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বীরবাহুর কাহিনীবিন্যাসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সংহতির অভাব, তবে কোথাও কোথাও বর্ণনার লালিত্য আছে। কাব্যকাহিনীতে রূপকথার মত অনেক অসম্ভব ঘটনা স্থান পেয়েছে। তবে বাঙলাদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সদ্যজাগ্রত দেশাত্মবোধ এই কাব্যে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হয়েছিল, সেইদিক থেকে তার মূল্য স্বীকার্য। হেমচন্দ্রের প্রধানতম ও সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনা 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭)। ইন্দ্রকে পরাজিত করে বৃত্রের স্বর্গ অধিকার, ইন্দ্র ও শচীর দুঃখদুর্গতি ভোগের পর দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রে ইন্দ্রের বৃত্রবধ ও স্বর্গ-উদ্ধার এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। কাহিনীর কাঠামোটুকুই শুধু পৌরাণিক, বেশির ভাগ অংশই কবির নিজস্ব কল্পনা, কতকটা ইংরেজি কাব্যের অনুকরণ। বৃত্রসংহারের কথাবস্তুতে ও পটভূমিতে যে মহাকাব্যোচিত বিশালতা আছে, মেঘনাদবধ-কাব্যে তা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর বয়সের সমালোচনায় মেঘনাদ বধে নয়, বৃত্রসংহারেই মহাকাব্যের ভাবসমুন্নতি নির্দেশ করেছিলেন: "স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়। কিন্তু সমগ্র কাহিনীটি শিথিল, হেমচন্দ্র তাকে মহাকাব্যের সংহতি দিতে পারেন নি। তাঁর চরিত্র-চিত্রণও অত্যন্ত দুর্বল।" ডাঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন: "বৃত্রসংহারে অনেকগুলি ভালোমানুষী চরিত্র আছে বটে কিন্তু যথার্থ মহৎচরিত্র নাই। একমাত্র মহৎ চরিত্র দধীচি কাব্যে উপেক্ষিতই রহিয়া গিয়াছে। দেবতা-চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিত্বের পরিচয় গোচর নয়। বৃত্রের ভূমিকায় বৈদিক ও পৌরাণিক ইন্দ্রশত্রু অসুরের গম্ভীর মহিমা পরিস্ফুট নয়।······বৃত্রসংহারের নায়ক শিবের বরপ্রাপ্ত ভক্তমাত্র, বৃত্রের সম্বল চন্দ্রশেখরের

দয়া'। ভাগ্যের উপর তাহার অপরিসীম বিশ্বাস।...এইখানে হেমচন্দ্রের বৃত্র মধুসূদনের রাবণের তুলনায় নিষ্প্রভ। ঐন্দ্রিলার ভূমিকায় অসুর মহিষীর দৃপ্ত তেজ ফুটে নাই, ফুটিয়াছে রূপকার সুয়োরাণীর হিংসা ও অভিমান।"

নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক গাথাকাব্য। ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে সিরাজ-চরিত্র কলঙ্কের কালিমালেপনে আচ্ছন্ন। নবীনচন্দ্র তার ওপরে নির্ভর করে সিরাজকে নায়কত্বের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর কাব্যে মোহনলালই প্রাধান্য পেয়েছে, তার মধ্য দিয়েই দেশাত্মবোধ অভিব্যক্ত। নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে অনেক স্থানেই বায়রনের Childe Harold-এর যুদ্ধ বর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, এমন কি কোথাও কোথাও তার আক্ষরিক অনুবাদ পর্যন্ত করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের কাব্যমূল্য বিশেষ কিছু নেই, তবে তার দেশপ্রেমের ভাবোচ্ছ্বাস সমকালীন পাঠকদের প্রভাবিত করেছিল। নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতামাত্র, কবি দ্বিচারিণী ক্লিওপেট্রার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন, রচনাটির বিশেষত্ব মাত্র এইটুকুই। 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) স্কটের আদর্শে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য, কাল্পনিক কাহিনীর পটভূমি চট্টগ্রামের রাঙামাটি অঞ্চল, শিবাজীর প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট করে কবি রচনাটিকে স্বাদেশিকতার গৌরব দিতে চেয়েছেন। এই রচনাটির কাব্যমূল্যও অকিঞ্চিৎকর।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর ত্রয়ী কাব্যে—রৈবতক, (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)-এ ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয়তার আদর্শের মূর্তি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। বিষয়বস্তুতে মহাকাব্যোচিত বিশালতা লক্ষণীয়। তিনটি কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা যথাক্রমে সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যুবধ ও যদুবংশ ধ্বংস। নিষ্কাম ধর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের সূত্রে আর্য-অনার্যের ঐক্যবন্ধন এবং অখণ্ড হিন্দুসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য-সাধনেই নায়ক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর সহায় ছিল অর্জুনের বীরত্ব, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বেদব্যাসের মনীষা, সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলজার প্রেম। দুর্বাসার অকারণ প্রতিহিংসা ও অভিমান এবং বাসুকির সংশয় ছিল তাঁর বিরোধী শক্তি। কল্পনা ও আবেগের মাত্রাহীন অসংযম, রচনারীতিতে শৈথিল্য, সুলোচনার অসংযত কৌতুকচাপল্য ও লঘুতা, চরিত্র-চিত্রণে দুর্বলতা প্রভৃতি ত্রয়ী-কাব্যের মহাকাব্যের গৌরব অর্জনে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিছক আখ্যায়িকা কাব্য হিসেবেও ঘটনা ও চরিত্রের টানাপোড়েন তাদের সংহত রূপ দিতে কবি ব্যর্থ হয়েছেন। নবীনচন্দ্র অবতার-মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে কয়েকটি আখ্যায়িকা-কাব্য লিখেছিলেন : যীশুখৃষ্টের জীবনী নিয়ে 'খৃষ্ট' (১২৯৭), বুদ্ধের জীবনী 'অমিতাভ' (১৩০২) ও শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলাকাহিনী 'অমৃতাভ' (১৩১৬)। কোনওটির কাব্যমূল্যই উল্লেখযোগ্য নয়।

[এক] বাংলা নাট্য রচনার প্রারম্ভ কাল হইতে দীনবন্ধু-মধুসূদনের কাল পর্যন্ত ইহার বিকাশের পরিচয় দাও। [ক. বি. ১৯৮৩]

অথবা

প্রারম্ভকাল থেকে মধুসূদন-দীনবন্ধু পর্যন্ত বাংলা নাটকের বিকাশের পরিচয় দাও। [ক. বি. ১৯৮৫]

উত্তর। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের নতুন রাজধানী এবং বাংলার নতুন সংস্কৃতি কেন্দ্ররূপে কলিকাতা নগরী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকেই সুগঠিত হয়ে ওঠে। ক্রমে কলিকাতার য়ুরোপীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, আমোদপ্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির প্রভাবে কলিকাতার জনসমাজে রুচি পরিবর্তনের সূচনা হয়। য়ুরোপীয় পাড়াগুলিতে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হত—প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসে এরূপ তথ্য পাওয়া যায়। তখনকার দিনে শহরের অভিজাত পরিবারগুলির সঙ্গে এখানকার ইংরেজদের সামাজিক সম্পর্ক এবং মেলামেশার সুযোগ ছিল। ইংরেজদের নাট্যানুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদে বাঙালি ভদ্রলোকেরা আমন্ত্রিত হতেন। এইসব অনুষ্ঠান দেখেই যে শহরের সমৃদ্ধ বাঙালি নাগরিকদের মনে পাশ্চাত্ত্য ধরনের নাট্যকলা এবং অভিনয় রীতির প্রতি আগ্রহ জেগেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্ত্য প্রথায় স্টেজ বেঁধে নাটক অভিনয়ের প্রচেষ্টা থেকে ধীরে ধীরে নতুন যুগের নাট্য সাহিত্যের শাখাটি বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই বাংলা রঙ্গমঞ্চের কাহিনী এবং নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রঙ্গমঞ্চের চাহিদাই লেখকদের নাটক রচনার প্রধান প্রেরণা।

কিন্তু এ বিষয়ে বাঙালিদের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হবার বহুপূর্বে একজন বিদেশী বাংলা রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর নাম গেরাসিম লেবেডফ। লেবেডফ ছিলেন রুশ দেশের মানুষ। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শেখেন। তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সহায়তায় লেবেডফ 'দি ডিসগাইস' এবং 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে দুটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে লেবেডফ অভিনয়ের জন্য বিপুল পরিশ্রমে ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীট) একটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলেন। দেশী

গেরাসিম লেবেডফ

অভিনেতৃবৃন্দের সহায়তায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে নাটক দুটি অভিনীত হয়। লেবেডফ-এর অস্থায়ী থিয়েটারটির নাম ছিল 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায়, এই অভিনয় বিপুল জনসমাদর লাভ করেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ধরনের অভিনয় দেখার আগ্রহ তখনই কি রকম তীব্রভাবে জেগে উঠেছিল লেবেডফের থিয়েটারের ব্যবসায়িক সাফল্যে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কোন বাঙালি নাট্যকলারসিক লেবেডফকে অনুসরণ করতে এগিয়ে আসেন নি। ফলে তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা আমাদের নাট্য সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ সংগঠনের ইতিহাসে ধারাবাহিকতাহীন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। সবসাধারণের জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছে এই ঘটনার বহু পরে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারই বাঙালিদের উদ্যোগে সংগঠিত প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে নাট্যচর্চা প্রধানতঃ শহরের ধনী-অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারিকেলডাঙার বাগান-বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করান। ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজার অঞ্চলে নবীন বসু একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৭), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়' (১৭৬৫) এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালার কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবীন বসুর থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের আয়োজন হয় এবং কতকটা নিয়মিতভাবেই এখানে অভিনয় হত। অন্যান্য থিয়েটারগুলিতে নিয়মিতভাবে অভিনয় না হলেও আমাদের অভিনয় চর্চার প্রথম যুগে এই থিয়েটারগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এইসব থিয়েটারে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না, অভিজাত পরিবার-গুলির আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র ছিল এই সখের থিয়েটারগুলি। কিন্তু সখের থিয়েটারের উদ্যোক্তারাই লেখকদের অনুপ্রেরিত করে নাটক রচনা করাতেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা দেশে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পকলার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন বা দীনবন্ধুর মতো নাট্যকার—সকলেই এইসব সৌখীন অভিনয়চর্চার সঙ্গে যুক্ত থেকে নাট্যকাররূপে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

সখের থিয়েটার

মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস প্রধানতঃ অনুবাদমূলক রচনার ইতিহাস। এই পর্বের অধিকাংশ নাটকই সংস্কৃত বা ইংরেজী নাটকের দ্বারা স্থূলভাবে প্রভাবিত। হরচন্দ্র ঘোষ প্রথম শেক্সপীয়রের নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর অনুবাদ এবং 'চারুমুখ চিত্তহরা' 'রোমিও জুলিএট'-এর অনুবাদ। সংস্কৃত নাটক প্রথম অনুবাদ করেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক এই নাটকের রচনাকাল ১২৪৬ বঙ্গাব্দ।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। অর্জুন-কর্তৃক সুভদ্রা হরণের আখ্যান এই নাটকের বিষয়বস্তু। তারাচরণ সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করলেও তিনি পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক অনুসরণ করতেই চেষ্টা করেছেন। এই নাটকের প্রস্তাবনা বা ভূমিকা অংশে তিনি আঙ্গিক সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা থেকে নাট্য-আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভদ্রার্জুন' প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসরেই প্রকাশিত হয় **যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের** 'কীর্তিবিলাস' নাটক। তারাচরণ পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন বাইরের গঠনের দিক থেকে, আর যোগেন্দ্রচন্দ্র পাশ্চাত্যের অনুসরণে নাটকের রসবস্তুতে অভিনবত্ব আনলেন। ভারতবর্ষে ট্রাজিডি বা বিয়োগান্ত কাহিনী রচনা নিষিদ্ধ ছিল। সংস্কৃত কাব্য-নাটক বা কথাসাহিত্যে কোথাও বিয়োগান্ত কাহিনী নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্যে নিয়তি পীড়িত, দুঃখাহত মানুষের দৃপ্ত পৌরুষকে ট্রাজিডিগুলিতে বিষাদ ও করুণ রসে সিঞ্চিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতবর্ষীয় প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে যোগেন্দ্রচন্দ্র 'কীর্তিবিলাস' নাটকে একটি বিয়োগান্ত আখ্যানকেই নাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি বাইরের রূপায়ণের দিক থেকে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুযায়ী নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি নাটকে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু করুণ রসাত্মক বিয়োগান্ত নাট্যকাহিনী রচনা করে নতুন রসবস্তু সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তারাচরণ বা যোগেন্দ্রচন্দ্র কেউই খুব বড়ো শিল্পী ছিলেন না, তাঁদের রচনাকে যথার্থতঃ রসোত্তীর্ণও বলা চলে না। কিন্তু বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য রীতি প্রবর্তনের দিক থেকে তাঁদের কাজের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

প্রাক মধুসূদন যুগের সর্বাধিক খ্যাতিমান এবং শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার **রামনারায়ণ তর্করত্ন** (১৮২২-৮৬)। সৌখীন অভিনয় চর্চায় আমাদের দেশে যে নতুন একটি শিল্প-শাখার প্রবর্তন হয়েছিল তা পরিপুষ্ট হয়েছে রামনারায়ণের নাটকগুলির দ্বারা। তিনি প্রথম যুগের রঙ্গমঞ্চগুলির চাহিদা অনুযায়ী নাটক রচনা করে দিয়ে অভিনয় কলার বিকাশে সর্বাধিক সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রধান রচনাবলীর তালিকাটি নিম্নরূপঃ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'নবনাটক' (১৮৬৬), 'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫), 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) এবং অনুবাদমূলক রচনা বেণী সংহার' (১৮৫৭), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০), 'মালতী মাধব' (১৮৬৭)। মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং প্রকাশকালের বিচারে একমাত্র 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে 'বেণীসংহার' ও 'রত্নাবলী' ভিন্ন রামনারায়ণের সব নাটকই মধুসূদনের আবির্ভাবের পরবর্তী রচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটকের রিহার্সাল দেখেই মধুসূদন বাংলা নাটকের দৈন্য

নাট্যকে রামনারায়ণ

সম্পর্কে অবহিত হন এবং ক্ষুব্ধচিত্তে বাংলা নাটকের দৈন্য-মোচনের প্রতিজ্ঞা করেন। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়েই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেন। রামনারায়ণ এবং মধুসূদনের মধ্যে সঠিকভাবে কোন কালগত সীমারেখা টানা যায় না। সময়ের হিসাবে দুজন সমসাময়িক। কিন্তু মধুসূদন নাটক রচনা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত রামনারায়ণই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার। তাঁর রচনাবলীর দ্বারাই নাট্য-রসিকদের রসরুচি নিয়ন্ত্রিত হত। মধুসূদনের আবির্ভাবের পরেও বেশ কিছুদিন রামনারায়ণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা পরিচালকদের অনুরোধেই তিনি বহুবিবাহ প্রথা সম্পর্কে 'নবনাটক' রচনা করেন।

রামনারায়ণের রচনাবলীর তালিকাটির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রথমেই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কথা মনে হয়। বিশেষভাবে তাঁর প্রথম মৌলিক রচনা কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে তিনি একটি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকে নাট্যবিষয়রূপে গ্রহণ করে বাংলা নাটককে বাঙালী জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেন ও অনুবাদ নির্ভরতা বা পৌরাণিক কাহিনীর অনুবৃত্তি থেকে বাংলা নাটককে উদ্ধার করেন। কৌলিন্য প্রথা এবং বহুবিবাহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করা এবং তার কুফল দেখানোই ছিল এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য। রঙ্গপুরের কুণ্ডী গ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কৌলিন্য প্রথায় নারীর দুর্গতি সম্বন্ধে যিনি কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামে সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনা করতে পারবেন, তাঁকে তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার দেবেন। এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ীই রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচনা করেন। সংস্কৃত নাটকের ধরনে প্রথমে নান্দী প্রস্তাবনা আছে, কাহিনী সাধারণ নাটকের মত ধারাবাহিক রূপে উপস্থাপিত হয়নি। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত প্লট নেই, শুধু ক্ষীণ-সূত্রে কয়েকটি কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র গ্রথিত হয়েছে। নায়ক নায়িকারূপেও কাউকে চিহ্নিত করা যায় না। মৃচ্ছকটিকের শকারের অনুকরণে অভব্যচন্দ্রের ভূমিকা পরিকল্পিত। নাটকটির বিভিন্ন দৃশ্যে এক একটি কৌতুকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র নাটকটি আদ্যন্তযুক্ত অখণ্ড আকার লাভ করে নি। নাট্য আঙ্গিক সম্পর্কে রামনারায়ণের বিশেষ কিছু ধারণা ছিল না। রচনাটিকে একটি অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ নাটক না বলে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যসমষ্টি বা নকৃশা জাতীয় রচনা বলাই সমীচীন।

রামনারায়ণের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নব নাটক' (১৮৬৬) সম্পূর্ণ নাম 'বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক' জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রধান কর্মকর্তা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষিত পুরস্কার পেয়েছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঈর্ষায় এক জমিদারের প্রথম স্ত্রীর ও তার গর্ভজাত পুত্রের ওপর অত্যাচার এবং ওষুধ খাইয়ে জমিদার প্রথম স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা নাটকটির বিষয়বস্তু। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে বহুবার অভিনীত হয়েছে। নবনাটক কুলীনকুলসর্বস্বের মত প্লটহীন না হলেও তার গ্রন্থনা নাট্যগুণবর্জিত, উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত প্রকট করতে গিয়ে

স্বাভাবিকতা ও সঙ্গতিকে নষ্ট করা হয়েছে। রামনারায়ণ কয়েকটি ছোট প্রহসনও রচনা করেছিলেন। যেমন কর্ম তেমনি ফল, উভয় সঙ্কট ও চক্ষুদান। উভয় সঙ্কটে বহু বিবাহের দোষ এবং চক্ষুদানে স্ত্রীর কৌশলে স্বামীর লাম্পট্যব্যাধির চিকিৎসা প্রদর্শিত হয়েছে।

রামনারায়ণ পর্যন্ত নাটক রচনার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে উন্নত শিল্পগুণ-সমন্বিত রচনার নিদর্শন একটিও নেই, প্রত্যক্ষ ঘটনা আশ্রিত এবং ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সংযোগে সংহত নাট্যকাহিনী নির্মাণের শিল্পকৌশল এই নাট্যকারেরা জানতেন না। বাংলা নাটকের নির্মীয়মান পর্বে এই নাট্যকারেরা নিজেদের সাধ্যমত নাটক রচনা করে অভিনয় কলা বিকাশে সহায়তা করেছেন এবং এই কারণে তাঁদের রচনাবলীর ঐতিহাসিক মর্যাদা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু মধুসূদনের আগে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সত্যকার সৃষ্টিশীল প্রতিভার আবির্ভাব হয় নি। মধুসূদনই সব অক্ষম চেষ্টার অবসান ঘটিয়ে বাংলা নাটকে উন্নত শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

মধুসূদন তাঁর শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), কৃষ্ণ কুমারী নাটক (১৮৬১) এবং দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রভৃতি রচনায় প্রথম বাঙলা নাটকের শিল্পরূপ উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেন। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য যোজনায় একটি সামগ্রিক কাহিনীর পটভূমিতে চরিত্রগুলির ক্রম পরিণতির যুক্তিসঙ্গত চিত্রণ এবং সমগ্র নাটকে দ্বন্দ্ব সংঘাতে আবর্তিত জীবনাবেগ ফুটিয়ে তোলার সক্ষমতায় মধুসূদনই প্রথম বাঙলা ভাষায় ইয়োরোপীয় নাট্য শিল্পের সকল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 'কৃষ্ণ কুমারী নাটক' বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। তাঁর প্রহসনগুলিতে সমকালীন বাস্তব জীবনের রূপ যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তা তুলনাহীন। দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদনকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর নীল দর্পণং নাটকং (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী নাটক (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৩), জামাই বারিক (১৮৭৫) ইত্যাদি নাটক ও প্রহসনে জীবনকে তিনি যেরূপ প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই বাঙলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নীলদর্পণের তোরাপ, ক্ষেত্রমণি এবং সধবার একাদশীর নিমচাঁদ অবিস্মরণীয় চরিত্র। তবে দীনবন্ধু জীবনের অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করেছেন, তার মর্মরহস্য উন্মোচনের প্রতিভা ও শিল্পদক্ষতা তাঁর ছিল না। নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব দান কিছু নেই, মধুসূদনের পথেই অগ্রসর হয়েছেন।

[দুই] মধুসূদন থেকে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা নাটকের বিকাশ-ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। পাশ্চাত্ত্য অভিনয়কলার আদর্শ অনুসরণে বাংলায় থিয়েটার গড়ে তুলবার উদ্যম দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে

শ্যামবাজারে নবীন বসুর রঙ্গমঞ্চ এবং আরও পরবর্তীকালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৭), বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় প্রভৃতি সৌখীন রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতাদের উৎসাহেই আমাদের থিয়েটারের সূচনা এবং বিকাশ হয়। অভিনয়ের আগ্রহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন নাটকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটিয়ে মধুসূদনের পূর্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটকের রিহার্স্যাল দেখে মধুসূদন বাংলা নাটকের দৈন্যদশা ঘোচাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৭) রচনা করেন। এই নাটকের অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি দু বছরের মধ্যে পর পর 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), এই চারখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন পর্যন্ত বাংলা নাটকে কোন সুষ্ঠ শিল্পরূপ সৃষ্টি হয় নি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা শাখায় সুপণ্ডিত এবং প্রকৃত সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনই বাংলা নাটকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সংস্কৃত প্রভাব বর্জন করে পাশ্চাত্য নাট্য আঙ্গিক আয়ত্ত করে যে প্রকৃত বাংলা নাটক রচনা সম্ভব এ বিষয়ে মধুসূদন নিশ্চিত ছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা'য় এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে 'শর্মিষ্ঠা'র রচনাভঙ্গি আড়ষ্ট। প্রত্যক্ষ নাট্যক্রিয়ার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করায় শর্মিষ্ঠায় নাট্যরস সংহত হয়ে উঠতে পারে নি। মধুসূদন অনলসভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অগ্রসর হয়ে 'পদ্মাবতী'তে অপেক্ষাকৃত উন্নততর শিল্পকৃতি উপস্থাপন করেন। তৃতীয় নাটক কৃষ্ণকুমারী তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা। রাজপুতনার ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে পারিবারিক এবং রাজনৈতিক পটভূমির নানামুখী ঘটনায় এক জটিল নাট্যকাহিনী তিনি এই নাটকে রচনা করেছেন। কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজিডি। এই তিনটি নাটকে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ বাংলা সাহিত্যে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। বাংলা নাটকের আর একটি বিশিষ্ট শাখা প্রহসন। প্রহসনের আদর্শ শিল্পরূপ মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক রচনায় চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মধুসূদনের নাটক

মধুসূদন যার সূচনা করলেন সেই পথে বাংলা নাটককে বিপুলতর সৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু নাটকের বিষয়বস্তু অন্বেষণে পুরাণ ইতিহাসের মুখাপেক্ষী না হয়ে সমসাময়িক জীবনের বাস্তব পটভূমির ওপরেই নির্ভর করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে নীল-চাষ সংক্রান্ত কৃষিসমস্যা এবং কৃষকদের ওপরে নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার নিয়ে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, সেই বাস্তব জীবনের সংকট এবং বিক্ষোভকেই তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'-এর বিষয়বস্তুরূপে ব্যবহার করেন। তখনকার সাহিত্যিক পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত পাঠক-

মাত্রেরই কাছে দীনবন্ধুর এই প্রচেষ্টাকে দুঃসাহসী এবং বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচায়ক বলে বোধ হবে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের শক্তি ও দুর্বলতা, তাদের বিশিষ্ট স্বভাব নিয়ে এই নাটকের বাস্তব পটপ্রেক্ষায় নিজেদের যথাযথ স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশ, বাঙালী জনসমাজ এবং বাংলাদেশে পাশ্চাত্য প্রভাবে যে রূপান্তর সাধিত হচ্ছিল- সেই ভাঙাগড়ার পটে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চারিত্রিক বিকার বিকৃতি দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক-প্রহসনে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টিই দীনবন্ধুর প্রধান বৈশিষ্ট্য, আপন প্রতিভার ধর্ম থেকে তিনি যেখানে বিচলিত হন নি —সেই সব রচনায় তাঁর শিল্প-সাফল্য অতুলনীয়। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রভৃতি দীনবন্ধুর অবিস্মরণীয় রচনা। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে 'সধবার একাদশী' শ্রেষ্ঠতম। বাস্তবতার রসে পুষ্ট দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকগুলির জন্যই অভিজাত শ্রেণীর সৌখীন নাট্যচর্চার গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর জনসমাজের অভিনয় কলার প্রসার সম্ভব হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত কম খরচে অভিনয় করা সম্ভব হওয়ায় এই নাটকগুলি নিয়ে বিত্তহীন অথচ কলারসিক যুবকবৃন্দ বাংলার জাতীয় রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মধুসূদন-উদ্ভাবিত বাংলা নাটকের শিল্পরূপ দীনবন্ধুই জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দিনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধুর পরে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিভাধররূপে আবির্ভূত হন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁদের মধ্যবর্তীকালে আরও কয়েকজন লেখক বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করেছেন। এই লেখকদের মধ্যে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মনোমোহন বসুর (**১৮৩১-১৯১২**) 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক সমসাময়িক কালে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মনোমোহন মধুসূদন-দীনবন্ধু-রচিত নাটকের শিল্পগত আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তিনি নাটকে একান্তভাবে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণের পক্ষপাতীও ছিলেন না। তিনি রঙ্গমঞ্চে দেশী যাত্রার অভিনয় প্রবর্তনের চেষ্টা করেন এবং তাঁর এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। নিজের আদর্শ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে মনোমোহন বলেছেন, "আমরা মধ্যস্থ মানুষ ; আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।" যাত্রাগানের ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধন করে তিনি গীতিবহুল, ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে এক ধরনের পালাগান প্রবর্তন করেন। এটি গীতাভিনয় নামে খ্যাত। মনোমোহনকে আধুনিক নাট্যকলার ধারায় যাত্রাওয়ালাদের শেষ উত্তরাধিকারী এবং প্রগতি-বিরোধী লেখক বলা যায়। অবশ্য তাঁর রচনা পদ্ধতি দ্বারা গিরিশচন্দ্রও অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি

মনোমোহন বসু

'প্রণয় পরীক্ষা', 'আনন্দময়' প্রভৃতি কয়েকটি সামাজিক নাটকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু এগুলি বৈশিষ্ট্যবর্জিত রচনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৫-১৯২৫) বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যাঁদের চেষ্টায় অভিনয় চর্চার একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনে করতেন—দেশের জনমানসে স্বাদেশিকতা বোধ জাগ্রত করে তোলবার শক্তিশালী মাধ্যম রঙ্গমঞ্চ। তিনি এই উদ্দেশ্য এবং আদর্শ নিয়েই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এইসব নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেছেন। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত 'সরোজিনী' নাটকে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ঐতিহাসিক নাটক ভিন্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গীতিনাট্য এবং প্রহসনও রচনা করেছেন। তাঁর গীতিনাট্যের মধ্যে 'বসন্তলীলা' এবং 'ধ্যানভঙ্গ' উল্লেখযোগ্য। অনুজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা চালাতেন এইসব গীতিনাট্যকে তারই ফল বলা যায়। তার কোন কোন গান রবীন্দ্রনাথের রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যে বিখ্যাত 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' এবং 'অলীকবাবু' বিখ্যাত রচনা। এইসব মৌলিক রচনা ভিন্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা থেকে বহু নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর দুই-তৃতীয়াংশই অনুবাদ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রায় সবগুলি নাটক তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। এটি তাঁর সাহিত্যিক কীর্তি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৫-১৮৯৪) 'বীণা' নামক সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচালকরূপে দক্ষতার পরিচয় দেন এবং রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। ফারসী সাহিত্যের বিষয় নিয়ে রচিত 'লয়লা মজনু', 'বেনজীর বদরে-মু'নি'র নাটকে তিনি বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার হেতু 'পতিব্রতা', 'অনলে বিজলী', 'প্রহ্লাদ মহিমা' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক। চিতোরের রাণা সঙ্গ সিংহের কাহিনী নিয়ে রচিত 'লৌহ কারাগার' এবং ধাত্রীপান্নার কাহিনী নিয়ে রচিত 'বনবীর' নামক ঐতিহাসিক নাটক দুটিও উল্লেখযোগ্য। রাজকৃষ্ণ রায়ের কোন নাটকেই বিশিষ্টতা বা শিল্পগত উৎকর্ষের পরিচয় নেই। তাঁর রচনায় মনোমোহন বসুর প্রভাবই অনুভব করা যায়।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এইসব লেখকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অসাধারণ শক্তিশালী নট এবং নাট্য পরিচালক গিরিশচন্দ্র সাধারণ

রঙ্গমঞ্চে ক্রমে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করেন। গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের সংখ্যা প্রায় শত সংখ্যক। এইসব রচনার সাহিত্যিক গুণ যেমনই হোক, তাঁর অভিনয় এবং পরিচালনা নৈপুণ্যে প্রতিটি নাটকই মঞ্চসাফল্য অর্জন করত। একাদিক্রমে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের অবিশ্রান্ত ধারায় তিনি অন্য সকলের রচনাকে আচ্ছন্ন করেছেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা', ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল' শ্রেষ্ঠ রচনা। এই নাটকগুলির অভিনয় সাফল্যও অসাধারণ। 'সিরাজদ্দৌলা' রাজরোষে পড়ায় দীর্ঘকাল সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত অবস্থায় থাকে। সাহিত্যিক প্রতিভায় গিরিশচন্দ্র খুব বড়ো ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে সব নাটক রচনা করেছেন উপযুক্ত অভিনেতৃগোষ্ঠীর সহায়তায় তার অভিনয় করে প্রভূত জনসমাদর অর্জন করেছেন। এইভাবে দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত থেকে তিনি নাট্যকলাকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। মধুসূদন থেকে যে নাট্যচর্চার সূচনা হয়েছিল গিরিশচন্দ্রে তা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র

[তিন] বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের অবদানের মূল্যায়ন কর।

অথবা,

"মধুসূদন শুধু বাঙলা কাব্যের পথিকৃৎ নহেন, বাঙলা নাটকেরও তিনিই প্রথম শিল্পী।" মধুসূদনের প্রহসন ও নাটকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন কর।

উত্তর। মধুসূদন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক। সাহিত্যক্ষেত্রে রুচির পরিবর্তন তাঁর পূর্বেই সূচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মৌলিক শিল্প-বস্তু সৃষ্টির শক্তি তাঁর পূর্ববর্তী অপর কোন লেখকের ছিল না। মধুসূদন বিশেষভাবে কবিতা এবং নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার শক্তি প্রয়োগ করেন। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন তিনি আধুনিক কাব্যধারার সার্থক সূচনা করেছিলেন, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমন তাঁরই রচনায় বাংলা নাটকের উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকাশের কালানুক্রমে তাঁর নাটকগুলির নাম—'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। জীবনের শেষ অধ্যায়ে অসুস্থ ও অর্থাভাবে পীড়িত মধুসূদন বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে দুটি নাটক রচনায় হাত দেন। 'মায়াকানন' তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, অপর নাটক 'বিষ না ধনর্গুণ' অসমাপ্ত থেকে যায়। মায়াকানন কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই রচনায় নাট্যকার মধুসূদনের শক্তির কোনও পরিচয়ই নেই। শ্রেণী

মধুসূদনের নাট্যগ্রন্থাবলী

বিচারে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-কে ঠিক নাটক বলা চলে না, এই দুটি প্রহসনজাতীয় রচনা। মাত্র তিন বছরে মধুসূদন তিনখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং দুখানি প্রহসন রচনা করেন।

মধুসূদনের পূর্বে খ্যাতিমান নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। রামনারায়ণের অধিকাংশ রচনাই সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামের মৌলিক নাটকটির জন্যই তিনি প্রচুর জনসমাদর পান। এই নাটক বা যোগেন গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'—মধুসূদনের পূর্বে রচিত। এর যে কোন নাটক বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই মনে হয় নাটকের গঠনশৈলী সম্পর্কে ঐসব লেখকদের কোন পরিচ্ছন্ন ধারণাই ছিল না। পূর্বাপর অসম্বন্ধভাবে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং আকস্মিকভাবে আবির্ভূত কতকগুলি চরিত্রের সংলাপ সমষ্টিই তাঁরা রচনা করেছেন।

মধুসূদনের পূর্বে নাটক রচনার প্রয়াস

মধুসূদন বাংলা নাটকের এই হীনদশা দেখে পীড়িত মন নিয়েই নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য নাটকের উন্নত আদর্শ অনুসরণই যে বাংলা নাটকের উন্নতির একমাত্র উপায়—এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত ধারণা পোষণ করতেন। সমসাময়িক কালে বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা চিঠিতে মধুসূদন বহু স্থানে বাংলা নাটকের সম্ভাব্য রূপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় নাট্যশিল্প বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

নাটক রচনার প্রধান সমস্যা বর্ণনীয় বিষয়কে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলা। এক-একটি নাট্য-পরিস্থিতির পটে নানামুখী প্রবণতাসম্পন্ন চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করে dramatic action সৃষ্টি ভিন্ন রচনায় নাটকীয়তা পরিস্ফুট হয় না। পরোক্ষ বিবৃতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ নাট্যক্রিয়া বা action-ই নাট্যরসের প্রধান অবলম্বন। মধুসূদনেই প্রথম এই শিল্পকৌশল বিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তিনি প্রথম নাটকেই

মধুসূদনের প্রথম নাটক —শর্মিষ্ঠা

পূর্ণসিদ্ধি অর্জন করতে পারেন নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথেই তাঁকে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। মধুসূদনের প্রথম নাটক **শর্মিষ্ঠাকে** পরীক্ষামূলক রচনাই বলা যায়। 'শর্মিষ্ঠা'য় মহাভারতের আদিপর্বের শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর প্রেমের কাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। এই ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী ঈর্ষা ও কাম-বৃত্তির বিরোধে নাট্যরসের প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এর রূপায়ণে মধুসূদন সর্বত্র বলিষ্ঠ নাট্যকল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নি। মনে হয় তখনকার প্রথা অনুযায়ী এবং রঙ্গমঞ্চের কর্তাদের রুচির মান রক্ষার জন্যই তিনি এই নাটকে মুখ্যত সংস্কৃত নাট্যরীতিই অনুসরণ করেছেন। এই নাটকের মূল ঘটনার কোনটিই প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়নি, নেপথ্যে সংঘটিত ঘটনাগুলি রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ণনাত্মক সংলাপে বিবৃত হয়েছে। সংলাপ রচনাতেও মধুসূদন এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক **পদ্মাবতী** অপেক্ষাকৃত উন্নত রচনা। এই নাটকটির ভিত্তি গ্রীক পুরাণের একটি বিখ্যাত গল্প। সেই কাহিনীতে হেরা, আথেনে এবং আফ্রোদিতে—এই তিন দেবীর মধ্যে একটি সোনার আপেলের অধিকার নিয়ে বিরোধ এবং পারিস-এর মধ্যস্থতায় আফ্রোদিতের জয়লাভ ও পরবর্তী স্তরে তিন দেবীর মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের যে জটিলতা দেখা যায়, মধুসূদন কৌশলে সেই কাহিনী ভারতীয় পুরাণের দেবদেবী চরিত্র অবলম্বনে বিবৃত করেছেন। গ্রীক পুরাণের দেবীত্রয় মধুসূদনের রচনায় শচী, রতি ও মুরজার রূপ ধারণ করেছে। পারিস ও হেলেন হয়েছে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী। 'পদ্মাবতী' নাটকে 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং নাট্যক্রিয়া অনেক বেশী, অবশ্য সমস্ত ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নেপথ্যের দৈবশক্তি দ্বারা। অনেক সমালোচকের মতে এর ফলে নাট্যকাহিনী স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় 'পদ্মাবতী' গঠনের দিক থেকে অনেক শিথিলবদ্ধ এবং অবিন্যস্ত। কিন্তু এই নাটকে সংলাপের ভাষা অনেক স্বচ্ছন্দ এবং নাটকীয় গুণসম্পন্ন। এই নাটকেই মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। Dramatic action সৃষ্টিই নাটকের প্রধানতম গুণ, এইদিক থেকে বহু ত্রুটি সত্ত্বেও 'পদ্মাবতী'কে 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় উন্নততর রচনা বলা যায়। ঘটনার পরোক্ষ বিবৃতি মধুসূদন 'পদ্মাবতী'তে সতর্কভাবে পরিহার করেছেন।

পদ্মাবতী

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক **কৃষ্ণকুমারী**। কৃষ্ণকুমারী উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা। অপরূপ সুন্দরী কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব আসে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের কাছ থেকে। জগৎসিংহের রক্ষিতা বিলাসবতী এই বিয়ে বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। বিলাসবতীর দূতী মদনিকার কৌশলে কৃষ্ণকুমারী মানসিংহের প্রতি আকৃষ্টা হলেন। ভীমসিংহ স্থির করেছিলেন জগৎসিংহের হাতেই কন্যা সমর্পণ করবেন, কিন্তু মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করতে আগ্রহী জেনে তিনি মহাসঙ্কটে পড়লেন। উদয়পুরের শত্রু মহারাষ্ট্রপতি এবং মোগল শক্তি মানসিংহের সমর্থক। জয়সিংহ এবং মানসিংহ—উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই স্থির করলেন কৃষ্ণকুমারীকে না পেলে উদয়পুর আক্রমণ করবেন। ভীমসিংহের মন্ত্রী কৃষ্ণাকে হত্যা করতে পরামর্শ দিলেন, কৃষ্ণার মৃত্যুই এই সঙ্কট হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। দুঃসহ মানসিক দ্বন্দ্বে ভীমসিংহ উন্মাদগ্রস্ত হলেন। ভীমসিংহের ভ্রাতা বলেন্দ্র কৃষ্ণাকে হত্যা করবেন স্থির করলেন, কিন্তু তার আগে কৃষ্ণা আত্মহত্যা করল। এই কাহিনী রাজস্থানের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। ইতিহাস অবলম্বনে এই-ই প্রথম বাঙলায় নাটক লেখা হল। পৌরাণিক কাহিনীর অলৌকিক, দৈবশাসিত বাতাবরণের পরিবর্তে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন দ্বন্দ্বময় বাস্তবতার উপরে নির্ভর করেছেন। শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতীর তুলনায় এ কাহিনী অনেক বলিষ্ঠ। কৃষ্ণকুমারী, ভীমসিংহ এবং সমগ্র উদয়পুর বাইরের দুই প্রবল শক্তির আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে—সমস্ত নাটকে এই অসহায়তাবোধ এবং বিপদের ছায়া বিস্তারিত। স্বদেশের

কৃষ্ণকুমারী

বিপদ দূর করবার জন্য কৃষ্ণার আত্মহত্যার ঘটনায় নাটকটিতে ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হয়। এই বিষাদান্ত পরিণাম কৃষ্ণার নিজের কোন দুর্বলতার জন্য না ঘটায় হয়তো বা কিছুটা আকস্মিক যুক্তিক্রম বিবর্জিত, তবুও দেশরক্ষার জন্য এই আত্মোৎসর্গে কৃষ্ণকুমারী যথার্থ ট্র্যাজেডির নায়িকার মর্যাদা লাভ করে। গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস্-এর ইফিগেনিয়ার কিছু প্রভাব কৃষ্ণকুমারীর বলিদানে অনুভব করা যায়। নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে মদনিকা উল্লেখযোগ্য। ধনদাসের নিগ্রহের পর তার প্রতি করুণা এই নারীভূমিকাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিলাসবতী মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার অনুকরণ হলেও একেবারে বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়। গ্রীক নাটকের অনুকরণে অশরীরী পদ্মিনীর আবির্ভাব নাট্যরসকে ঘনীভূত হতে দেয়নি। কৃষ্ণকুমারী নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের দেশাত্মবোধের প্রকাশ। ভীমসিংহের এই আক্ষেপে আমরা যেন সে যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির মনের কথা প্রতিধ্বনিত হতে শুনি : ('দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবত, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এদেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না।' 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজিডি। 'কৃষ্ণকুমারী'তে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে যথার্থ নাটকীয় রসবস্তু সৃষ্টিতে প্রশ্নাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন মধুসূদন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা প্রহসন। বাংলা প্রহসন বাংলাদেশের লেখকদের নিজস্ব সৃষ্টি, এই জাতীয় রচনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দেখা যায় না। নানাবিধ সামাজিক সমস্যা এবং প্রাচীনপন্থী ও নব্য সমাজের মানুষদের চারিত্রিক অসঙ্গতিই প্রহসনের বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যসাহিত্যে যে ব্যঙ্গাত্মক নক্শা জাতীয় রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, মনে হয় নাটকের আঙ্গিকে সেই জাতীয় বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা থেকেই প্রহসনের জন্ম হয়েছে। মধুসূদন নব্য বাংলার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের চারিত্রিক ভ্রষ্টতার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন **একেই কি বলে সভ্যতা** প্রহসনে। এই প্রহসনের নায়ক নববাবু এবং নববাবুর ইয়ারবন্ধুদের জ্ঞানতরঙ্গিনীর সভার কৌতুককর ব্যঙ্গচিত্রে সংস্কার-মুক্তির নামে নব্যবঙ্গের পাশ্চাত্ত্য প্রেমিকদের উৎকট ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন **বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ**-তে আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মের ভেকধারী প্রাচীন পন্থীদের লাম্পট্য। অত্যাচারী, কৃপণ জমিদার ভক্তপ্রসাদ সর্বদা ধর্মনিষ্ঠার বুলি আওড়ান, কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তির বেলায় জাতি বিচার করেন না। মুসলমান প্রজা হানিফের সুন্দরী স্ত্রী ফতেমার প্রতি ভক্তপ্রসাদের আসক্তি এবং শেষ পর্যন্ত হানিফের হাতে প্রহার ভোগ ও অর্থদণ্ড দ্বারা অব্যাহতি লাভের এই কাহিনীতে মধুসূদন উৎকৃষ্ট হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। এই প্রহসনে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় চরিত্র অঙ্কনের অসামান্য দক্ষতা। হানিফ, ফতেমা, গদাধর প্রভৃতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের চরিত্র মধুসূদনের হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ রচনার দক্ষতাই এই সাফল্যের হেতু। গ্রামের

মধুসূদনের প্রহসন নাটক

হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মুখের ভাষা মধুসূদন অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন এই প্রসঙ্গে চরিত্রগুলির মুখে কাব্যিক আলংকারিক ভাষার পরিবর্তে স্বাভাবিক তথ্য দেবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন : I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry। পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধুর রচনাতেই এর সঙ্গে তুলনাযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'একেই কি বলে সভ্যতা'র তুলনায় অনেক পরিণত রচনা। অর্থলোভ, কৃপণতা ও লালসা নায়ক ভক্তপ্রসাদের মনে যে বিচিত্র দ্বিধাতরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, ভূমিকাটিতে তার বাস্তব রসোজ্জ্বল চিত্রণ আমাদের মুগ্ধ করে। প্রহসন হলেও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে কাহিনী এবং চরিত্রের পরিকল্পনার অখণ্ডতা এবং হাস্যকরুণ পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের অসহায়তার চিত্র হাস্যরসকেও গভীর করে তুলেছে।

মধুসূদনের নাট্যরচনার কাল নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মৌলিক প্রতিভার শক্তি ছিল বলেই তিনি এই সামান্য দু-তিন বছরের মধ্যে বাংলা নাটক-প্রহসনের ক্ষেত্রে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পৌরাণিক প্রসঙ্গের ব্যবহার বা বাস্তব জীবন-সমস্যা নির্ভরতা—নাট্যকারের প্রবণতা যেরকমই হোক না কেন রচনাশৈলী বিষয়ে উন্নততর শিল্পচেতনা না থাকলে কোন বিষয়ই রসপরিণাম লাভ করতে পারে না। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত রচনাশৈলী উদ্ভাবনই মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব। বাংলা নাটক-প্রহসনের পরবর্তী ধারা মধুসূদন নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়েই শিল্পগত সিদ্ধিতে পৌঁছেছে। পরবর্তীকালের সমস্ত প্রহসন এবং কোনও কোনও নাটক মধুসূদনের প্রহসন দুটির প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

[চার] দীনবন্ধু মিত্র নাট্য রচনায় সে-যুগে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ বীজ কোথায় কোথায় ছিল তা আলোচনা করে নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা নাটকের সার্থক সূচনা মধুসূদনে, কিন্তু এই নতুন শিল্প মাধ্যমটিকে আমাদের জাতীয় জীবনে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা দান করেন দীনবন্ধু। নাটক সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের প্রয়োগনৈপুণ্যেই নাটকের রসবস্তু আস্বাদনযোগ্য হয়ে ওঠে। মধুসূদন পর্যন্ত বাংলা নাটক সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতার অভিজাত পরিবারগুলির সৌখীন নাট্যচর্চার গণ্ডিতে। দীনবন্ধুর নাটক নিয়েই ব্যাপক জনসাধারণের সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসাবে অভিনয় কলার নতুন পর্ব সূচিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিলেন, "বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক (ন্যাশান্যাল থিয়েটারের উদ্যোগিবৃন্দ) মিলিয়া ন্যাশান্যাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" বাংলা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু সত্যই নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

নাট্য-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত নাট্যকার আমাদের সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক দিক থেকে দীনবন্ধুকে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখক বলে মনে হয়। পূর্বতন ঐতিহ্যের অনুবর্তন তিনি অনেকক্ষেত্রেই করেছেন, বিভিন্ন উৎস থেকে নিজের রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু আপন প্রতিভার শক্তিতে সেইসব আহৃত উপকরণ দ্বারা তিনি অভিনব রসবস্তু সৃষ্টি করেছেন। দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলা যায়, কিন্তু তাঁর রচনায় গ্রামীণ সংস্কৃতির, দেশজ ভাষারীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। তিনি আধুনিকতার মোহে স্বদেশের মৃত্তিকার আশ্রয় ত্যাগ করতে সম্মত হন নি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ভাষা-প্রয়োগের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখা যায়। দীনবন্ধুর নাটকে সংলাপের ভাষায় ঈশ্বর গুপ্তের সেই ভাষা-ভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে মধুসূদনের রচনার দ্বারা, বিশেষভাবে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনটির দ্বারা দীনবন্ধু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর 'নীলদর্পণ'-এর তোরাপ এবং অন্যান্য গ্রাম্য মানুষের চরিত্র রূপায়ণে এইসব চরিত্রের সংলাপ রচনায় মধুসূদন-সৃষ্ট হানিফ, গদাধর প্রভৃতি চরিত্র-কল্পনার স্পষ্ট প্রভাব আছে। 'নীলদর্পণ' নাটকই দীনবন্ধুকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নাটকে যে সমস্যা কেন্দ্রীয় বিষয় সেই নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ব্যবহার করেছিলেন। সমসাময়িক কালে বিপুলভাবে সমাদৃত এই উপন্যাসের দ্বারা দীনবন্ধু প্রভাবিত হয়েছেন—এরূপ অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। প্যারীচাঁদের আর একখানি গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'-এ আগরভমসেন নামে একটি চরিত্র আছে। দীনবন্ধু 'নবীন-তপস্বিনী' নাটকে হোঁদলকুৎকুতের পরিকল্পনায় প্যারীচাঁদের এই চরিত্রটিকেই অনুকরণ করেছেন। প্রয়োজনবোধে কখনও রূপকথা থেকে, কখনও ইংরেজী বা সংস্কৃত থেকে তিনি রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহারের ভঙ্গিটি দীনবন্ধুর নিজস্ব। চরিত্র এবং ঘটনার বিন্যাসে তিনি সহজেই বাস্তবতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও বিভিন্ন চরিত্র অবিকল আপন রচনায় তুলে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পদে দীনবন্ধু বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিলেন। 'বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈহিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই।...বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন।"

দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যপ্রতিভা

পূর্বগামী দেশী এবং বিদেশী লেখকদের রচনাবলী এবং প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত উপকরণ নিয়ে দীনবন্ধু তাঁর নাট্যাবলীতে বিচিত্র মানুষের মূর্তি রচনা

করেছেন। প্রবল সহানুভূতির বশে সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি তাদের চারিত্রিক বিকার-বিকৃতি, দুঃখ-বেদনা নিখুঁত এবং জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধু তাঁর কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের অধীন করে যথাপ্রাপ্ত জগৎ এবং জীবনের রূপ তাঁর নাটকগুলিতে পরিস্ফুট করেছেন। কোন কল্পিত ভাবব্যাখ্যা দ্বারা তিনি বাস্তবের নিজস্ব রূপকে আবৃত করেন নি। "জীবনের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতিগোচর তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে আপনারই নিয়মে, একটি সুসমঞ্জস রসমূর্তি পরিগ্রহ করে—যাহা আছে তাহাকে তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয়—এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যাভিমান-বর্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথ দেখাইয়া বস্তু সকলের সুগভীর রহস্য নিকেতনে লইয়া যায়, তখন এই যথাপ্রাপ্ত জগৎই অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যে রসের আস্বাদন করায়, নাট্যকার সেই রসের রসিক। কল্পনার এই objectivity উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ, আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" (মোহিতলাল)

ছাত্রজীবন থেকে দীনবন্ধু 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। তাঁর কোন কোন কবিতা সমসাময়িক পাঠক সমাজে সমাদৃতও হয়েছিল। কিন্তু **নীলদর্পণ-ই** (১৮৬০) সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠার কারণ। দীনবন্ধুর এই প্রথম নাটকটি 'নীলদর্পণং নাম নাটকম্' গ্রন্থকারের নাম ছাড়াই প্রকাশিত করছিল। "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্।" দীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে ইংরেজ নীলকরদের অন্যায় উপদ্রব চলছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই নীলচাষের সমস্যা দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে এক সঙ্কট সৃষ্টি করে। গ্রাম্য চাষীদের ওপর নীলকরেরা নানাভাবে উৎপীড়ন চালাত। ধানের জমিতে জোর করে নীলচাষ করতে বাধ্য করে এই ইংরেজ ব্যবসায়িবৃন্দ চাষীদের সারা বছরে ক্ষুধার অন্ন উৎপাদনের পথ বন্ধ করত।

নীলদর্পণ, ১৮৬০

আগ্রিম টাকা বা দাদন নিতে বাধ্য করে তারা চাষীদের চিরস্থায়ী ঋণের জালে জড়িয়ে পুরুষানুক্রমে শোষণ করত। নীলচাষে অনিচ্ছুক কৃষকদের জোর করে আটক রাখা, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রহার এবং বিভিন্ন প্রকারের উৎকট শাস্তির ব্যবস্থা এমন কি মহিলাদের ওপরেও অত্যাচার করতে তারা দ্বিধা করত না। নিম্নবঙ্গের সবগুলি জেলায় ক্রমে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে, কলিকাতার শিক্ষিত সমাজেও কৃষকদের এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন দেখা দেয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করতে থাকেন। সরকারী মহলে এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মধ্যে অনেক নীলকরদের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। দেশ যখন এই সমস্যায় আলোড়িত হচ্ছিল সেই সময়ে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়। পাদ্রী লঙ্ মধুসূদনকে দিয়ে নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করান এবং নিজে প্রকাশ করেন। নীলকরেরা লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। লঙ্ সাহেবকে এজন্য

দণ্ডভোগ করতে হয়। আর কোন বাঙালী লেখকের রচনা নিয়ে এত ব্যাপক আলোড়ন কখনো দেখা যায় নি। এইসব কারণে 'নীলদর্পণ' একটি ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন রচনা। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন: 'দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম শাসক-শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ, সভ্য-নামক মানুষের বর্বর অন্তর উদ্‌ঘাটিত হইল। নীলদর্পণে সমগ্র দেশের মর্মবেদনার প্রকাশ তাহাতে দেশে যেমন সাড়া পড়িয়াছিল তেমনটি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই।' 'নীলদর্পণ' প্রকাশের ফলেই কৃষকদের ওপরে অত্যাচার রোধকল্পে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় এবং সরকারী মহল সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডের এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্রমে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায় এবং বাংলার কৃষক-কুল বহুদিনের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পায়।

নাটকটি গড়ে উঠেছে গোলকচন্দ্র বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সম্পন্ন গৃহস্থ গোলক বসু, তার পরিবার পরিজন এবং তার প্রজাবৃন্দ এই নাট্যকাহিনীর প্রধান চরিত্র। গোলক বসুর পুত্র নবীনমাধব এই কাহিনীর নায়ক। কৃষকদের ওপরে অত্যাচার রোধ করতে গিয়ে নবীন বসু এবং গোলক বসুকে বিপন্ন হতে হয়েছে। গোলক বসুর আত্মহত্যা, নবীনমাধবের এবং সরলার মৃত্যু, সাবিত্রীর উন্মাদদশা এবং মৃত্যু—ইত্যাকার শোচনীয় ঘটনায় নাটকটি শেষ হয়। এই বিষাদকে ঘনীভূত করে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু। শিল্পের বিচারে 'নীলদর্পণ' নাটককে

নীলদর্পণের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য

রসোত্তীর্ণ বলা যায় না। ভদ্রচরিত্রগুলি ব্যর্থ, নিষ্প্রাণ। 'গোলকচন্দ্র-নবীনমাধব-বিন্দুমাধব সাবিত্রী সৈরিন্ধ্রী-সরলা এমনকি সাধুচরণও—সংলাপের কৃত্রিমতায় ও পুথিগত ভাষের আড়ষ্ঠতায় স্বাভাবিক মানুষের মত হয় নাই' (সুকুমার সেন)। ঘটনায় কার্যকারণ পারম্পর্যের অভাব, একের পর এক মৃত্যু-দৃশ্য নাটকটিকে একটি মেলোড্রামায় পর্যবসিত করেছে। কিন্তু এ নাটকের চাষী চরিত্রগুলি রূপায়ণে, সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক জীবন-সঙ্কট চিত্রণে দীনবন্ধু অসামান্য নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সাধুচরণ, রাইচরণ, রেবতী ক্ষেত্রমণি, আদুরী, পদী বা আমিন প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধু যে বাস্তবতাবোধ এবং মানব-চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের সাহিত্যে তুলনারহিত। 'নীলদর্পণ' নাটক সম্পর্কে সমালোচকেরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে একদিকে যেমন ঘটনা গ্রন্থনে এবং গঠনে নাটকটিতে অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে আবার চরিত্র-সৃষ্টির দিক থেকে দীনবন্ধু এই নাটকে প্রায় শেক্সপীয়রের তুল্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। দীনবন্ধুর প্রতিভার শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় তা এই রচনাতেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক **নবীন তপস্বিনী** (১৮৬৩), **বিয়েপাগলা বুড়ো** (১৮৬৬), **সধবার একাদশী** (১৮৬৬) **লীলাবতী** (১৮৬৭), **জামাই বারিক** (১৮৭২) এবং **কমেল কামিনী** (১৮৭৩)। তার মধ্যে 'সধবার একাদশী'ই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠতম রচনা। মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নব্যশিক্ষিত

যুবকদের চারিত্রিক ভ্রষ্টতার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। দীনবন্ধুও অনুরূপ বিষয়বস্তুই ব্যবহার করেছেন 'সধবার একাদশী' নাটকে। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনা প্রহসনের পরিহাস রসিকতার স্তর থেকে সিরিয়াস নাটকের পর্যায়ে উন্নীত। 'সধবার একাদশী'র নায়ক নিমে দত্ত চরিত্রে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের প্রতিচ্ছায়া আছে, কিন্তু তাকে টাইপ চরিত্র বলা যায় না। নিমচাঁদের প্রখর আত্মসচেতনতা, দুর্মর প্রবৃত্তির মত মদ্যাসক্তির জন্য জীবনের সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়ায় দুঃখবোধ এবং বিশুদ্ধ জীবন সুখ বিফলীকৃত শিক্ষার জন্য আক্ষেপ—তাকে একটি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত চরিত্রে পরিণত করেছে। নিমচাঁদকে কখনোই প্রহসনের টাইপ চরিত্র মনে হয় না, বরং মনে হয় শিক্ষা-দীক্ষায় পরিমার্জিত, জীবনের শুভাশুভ বিষয়ে প্রখর চেতনাসম্পন্ন একটি মানুষ প্রবৃত্তির দুশ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যে নিজেকে ক্ষয় করছে। নিমচাঁদ চরিত্র ট্র্যাজিডিরই নায়ক চরিত্র। এই চরিত্রটির জন্যই 'সধবার একাদশী' প্রহসনের সীমা অতিক্রম করে গভীর রসাত্মক নাটকে পরিণত হয়েছে।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক

নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী এবং লীলাবতীতে অংশত রোমান্টিক প্রেম-কাহিনী রচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু এদের মধ্যে যেখানে কৌতুকরসের আয়োজন করেছেন সেইসব অংশ অবিস্মরণীয়। নাটক তিনটি সামগ্রিকভাবে সফল রচনা না হলেও 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর বা 'লীলাবতী'র নদেরচাঁদ হেমচাঁদ চরিত্র-সৃষ্টির দুর্লভ শক্তিতে দীনবন্ধুর অনায়াস অধিকারের পরিচয় দেয়। এই নাটক তিনটির তুলনায় 'বিয়েপাগলা বুড়ো' এবং 'জামাই বারিক' অনেক উপভোগ্য রচনা। বিয়ে-বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজীবের বিড়ম্বনা 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র কয়েকটি কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। এই রাজীবই প্রহসনের শেষ পর্বে এক করুণ চরিত্র হয়ে ওঠে। 'জামাই বারিক'-এর ঘরজামাই-এর দল যে বিচিত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তারই চিত্র হাস্যরসের প্রধান অংশ, কিন্তু এর সঙ্গে দুটি উপকাহিনী যুক্ত হওয়ায় হাস্যরসের বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। এর কাহিনী অংশ অপেক্ষাকৃত জটিল এবং অভয়কুমার ও কামিনীর উপকাহিনীতে কামিনী চরিত্রে আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন নতুন ধরনের নারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তে সমসাময়িক সমাজের সচল প্রবাহ থেকে রচনার বিষয় গ্রহণ করে দীনবন্ধু নাট্যসাহিত্যকে আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। সামাজিক নাটকে সাজসজ্জার ব্যয় না থাকায় মধ্যবিত্ত যুবকবৃন্দ এই নাটকগুলির সহজেই অভিনয়ের আয়োজন করতে সক্ষম হন এবং বিত্তবান অভিজাত শ্রেণীর সৌখীন নাট্যচর্চার সীমার বাইরে বাংলা নাটক বৃহত্তর জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দীনবন্ধুর নাটক নিয়েই কয়েকজন উৎসাহী যুবক প্রথম জাতীয় রঙ্গালয় ন্যাশন্যাল থিয়েটার (১৮৭২) প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন এবং অভিনয় কলার বিকাশে দীনবন্ধুর দান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

[পাঁচ] বাংলা নাট্যসাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চ সংগঠনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের দান বিষয়ে আলোচনা কর।

অথবা

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা

কোন শ্রেণীর নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন? গিরিশচন্দ্রের নাট্য রচনার সেই অংশ অবলম্বনে তাঁর প্রতিভার শক্তি ও দুর্বলতা দেখাও।

অথবা

বিষয় বিভাগ অনুসারে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৃতির পরিচয় দিয়া যে বিভাগে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বিচারপূর্বক নির্ণয় কর।

উত্তর। বাংলাদেশে আধুনিক অভিনয়-কলার সূচনা হয়েছিল অভিজাত পরিবারকেন্দ্রিক সৌখীন নাট্যচর্চায়। সখের থিয়েটারের অভিনয় দেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মধুসূদন পর্যন্ত এইসব সখের থিয়েটারই নাটক রচনায় সাহিত্যিকদের একমাত্র প্রেরণা ছিল। দীনবন্ধু নতুন ধরনের সামাজিক নাটক রচনা করে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অভিনয় অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দিলেন। দীনবন্ধুর রচনাবলী নিয়ে কলিকাতার মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে নতুনভাবে নাট্য আন্দোলনে গড়ে উঠল। পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বেঁধে দীনবন্ধুর নাটকগুলি বহুবার অভিনয় করা হয়েছে। তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিনয় কলা সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন উদ্যোগী অভিনয়-কলা-রসিক যুবকের চেষ্টায় বাংলার প্রথম জাতীয় রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১১) ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী পুরুষ। প্রথমদিকে সহযোগীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য দূরে সরে থাকলেও কিছুদিনের মধ্যে তিনিই জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এবং নতুন নাট্য-আন্দোলনের প্রধান নায়ক হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের কলারসিকদের বিচারে আজ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের তুল্য প্রতিভাসম্পন্ন নট এবং নাট্য পরিচালক এদেশে আবির্ভূত হন নি। আচার্য শিশিরকুমার এইরূপ ধারণা পোষণ করতেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করে গিরিশচন্দ্র জীবনের সবটুকু সময় রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য এবং অভিনয় কলা চর্চায় নিয়োজিত করে গিয়েছেন। সে যুগের প্রায় সকল খ্যাতিমান অভিনেতা অভিনেত্রী গিরিশচন্দ্রের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরই অভিভাবকত্বে শিল্পীজীবন অতিবাহিত

নট ও রঙ্গমঞ্চ সংগঠক গিরিশচন্দ্র

করেছেন। শিল্পকলার একটি নতুন এবং শক্তিশালী শাখা স্থায়ীভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা গিরিশচন্দ্রের এক ঐতিহাসিক কীর্তি। আমাদের নাটকের ইতিহাসে, রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এবং অভিনয় কলার ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র এক মহৎ মর্যাদার অধিকারী। এইদিক থেকে রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আর কারও সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের তুলনা চলে না। বিভিন্ন নাটকে তাঁর অভিনয়ের কথা এবং বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা বাংলাদেশে লোকশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।

নিত্যনতুন নাটক অভিনয়ের দ্বারা রঙ্গমঞ্চের প্রতি মানুষের আগ্রহ সজাগ রাখবার জন্য গিরিশচন্দ্রকে নিয়মিত নাটক রচনা করতে হত। এইভাবে সারাজীবনে তিনি নাটক প্রহসন মিলিয়ে প্রায় শত সংখ্যক নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের প্রথম-দিকের রচনার মধ্যে 'আগমনী' (১৮৭৭), 'অকালবোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' প্রভৃতি গীতি-নাট্য উল্লেখযোগ্য। গীতিনাট্যগুলি দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য। নাট্যকার রূপে গিরিশচন্দ্র প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন 'অভিমন্যু বধ' (১৮৮১), 'জনা' (১৮৯৪), 'পাণ্ডব-গৌরব' (১৯০০) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকে। এইসব নাটকের ভক্তিরস এবং আদর্শ চরিত্র-চিত্র সহজেই জনচিত্ত হরণ করেছিল। বাংলাদেশে জনমানসে পৌরাণিক কাহিনীর অলৌকিক মহাপুরুষ এবং দেবদেবীর আখ্যান, তার অন্তর্নিহিত ভক্তিভাবের ধারা এবং নিয়তিবাদ একটা স্থায়ী সংস্কাররূপে বিদ্যমান। রঙ্গমঞ্চের সূচনার পূর্বে যাত্রা-অভিনয়ে এই পৌরাণিক কাহিনীগুলিই নাট্যবিষয়রূপে ব্যবহৃত হত। গিরিশচন্দ্রের আগে মনোমোহন বসু যাত্রা ধরনের গীতাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত করেন। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়াবার উদ্দেশ্যে এই সহজ পন্থাটি অনুসরণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য গিরিশচন্দ্রের মানসিক গঠনে অধ্যাত্মবোধ একটি প্রধান উপকরণ ছিল। তাঁর পৌরাণিক নাটকে এই অধ্যাত্মবোধ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে অলৌকিক বিশ্বাস অনেক পরিমাণে শিথিল হয়েছিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই প্রগতিশীল চিন্তাধারার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সংস্কার এবং ধ্যান-ধারণাকে নতুনভাবে জনমানসে সঞ্চারিত করেছেন। "অবশ্য আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে এগুলি সম্পূর্ণ নাটক নহে, নাটকাকারে সংরক্ষিত অলৌকিক রসের আত্মবিস্তার ও যথাসম্ভব গাঢ় পরিণতি মাত্র। যেখানে দেব-মহিমা ও ভক্তের আত্মনিবেদনই নাটকের উপাদান, সেখানে জাগতিক নিয়ম বা কার্য-কারণ শৃঙ্খলার বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকিতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাতে বা দুই বিরোধী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছুটা নাটকীয় উত্তাপ সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাদের পিছনে সদা-সক্রিয় যে দৈবলীলা সমস্ত ঘটনার রশ্মি ধারণ করিয়া আছে তাহারই অপ্রতিহত প্রভাবে মানসিক দ্বন্দ্বের উত্তেজনা মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া পড়ে। তথাপি এই জাতীয় নাটকই বাঙালির সার্থকতম,

পৌরাণিক নাটক

তাহার মনোধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কান্বিত নাট্যরস বিকাশের দৃষ্টান্ত" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

আধুনিক দৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি যত গুরুতর বলেই মনে হোক, নাটকের এই শাখায়ই তাঁর নাট্য-প্রতিভার উন্মেষ ও পরিণতি হয়েছে এবং তিনি সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটকে তাঁর প্রতিভা তার বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্রটি পায় নি। তিনি নিজেই তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' নিবন্ধে বলেছেন : 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' গিরিশচন্দ্রের কালে বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মপ্রধান জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণের মন তখন হিন্দুধর্ম ও পুরাণ এবং পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর দেশবাসীদের সেই প্রবণতাকে নিজের সহজাত চেতনায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'রাবণ বধ' (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮২) প্রভৃতি নাটকে গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছিলেন। অভিমন্যু বধ (১৮৮১) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক, বীররস ও করুণরসের স্ফূরণে নাটকটি বিশিষ্ট। বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮) গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসপ্রধান পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকটির মধ্যে রামকৃষ্ণ-দেবের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, তবে তার নাট্যগুণ বিশেষ কিছু নেই। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'জনা'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। জনা ও প্রবীর চরিত্রের অবলম্বনে নাট্যকার জীবনের বাস্তব আবেগ ও ঘাতপ্রতিঘাতসঞ্জাত লৌকিক নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন, বীরধর্ম, স্বাদেশিকতা, মাতৃভক্তি, প্রেমমোহ প্রভৃতি বিচিত্র গুণের সমাবেশে প্রবীর চরিত্রটি লৌকিকরসের আধাররূপে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে তিনি নীলধ্বজ, বিদূষক, অগ্নি, বৃষকেতু প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অলৌকিক ভক্তিরস নাটকের মধ্যে প্রবাহিত করেছেন। জনা তার প্রতিহিংসা জ্বালা নিয়ে নাটকের মধ্যে বহ্নিশিখার মতই দীপ্ত। প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গভীর বেদনা ও অনির্বাণ প্রতিহিংসা জনাকে ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত করেছে। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য সমস্ত নাটকের মধ্যে 'জনা' অনন্য। এই প্রসঙ্গে বাঙলা নাট্যভাষায় গিরিশচন্দ্রের বিশেষ দান গৈরিশ ছন্দের কথাও স্মরণীয়। তাঁর পূর্বে কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাচার নকশা'য়, ব্রজমোহন রায় 'দানববিজয়' এবং রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর কাব্যে এই ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তার সংস্কার করে তাকে নাট্যোপযোগী করে তোলেন। দীনবন্ধু ব্যবহৃত পয়ার ও মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাটকের উপযোগী নয়। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে নাট্যক্রিয়া ও চরিত্রচিত্রণ গতিশীলতা লাভ করে। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকীয় ছন্দের জন্যই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

তৃতীয় পর্বে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য স্বাদেশিকতার ভাবধারায় তখন দেশের চিত্ত প্রবলভাবে আলোড়িত হচ্ছিল। রঙ্গমঞ্চে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব দেখা যায়। দেশাত্মবোধ এবং

পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার উদ্দীপনা সঞ্চারের দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬) এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত রচনার শিল্পগত উৎকর্ষের বিচার করতে গেলে দেখতে হয় লেখক রচনায় সামগ্রিকভাবে 'ইতিহাস রস' সৃষ্টিতে কতটা সফল হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র এইসব নাটকে এক একটি ঐতিহাসিক যুগের সমুন্নত মহিমা পরিস্ফুট করে তুলতে আদৌ সচেষ্ট ছিলেন বলেই মনে হয় না। তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু ঘটনাধারায় যুক্তিক্রমটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। ঘটনাগতিতে সঙ্কট দেখা দিলে দ্বিধাহীনভাবে কাল্পনিক ঘটনা সন্নিবেশ করে মূল সমস্যাকে পাশ কেটে গিয়েছেন। "অহেতুক স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থান-কাল-পাত্রের কালানৌচিত্য দোষ, নাটকীয় বাস্তব ঘটনাকে মেলোড্রামাটিক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সীমাকে অবহেলাভরে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার অনুচিত ঝোঁক গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে আধুনিক পাঠক ও দর্শকের রুচির প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছে" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। একমাত্র 'সিরাজদ্দৌলা'-কেই অপেক্ষাকৃত উন্নত রচনা বলা যায়।

ঐতিহাসিক নাটক

গিরীশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'বলিদান' (১৯০৪) এবং 'শাস্তি কি শান্তি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য শ্রেণীর নাটকের প্রধান দোষ অতিমাত্রার দৈবনির্ভরতা, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং ঘটনা-পরিণতিতে যুক্তিসঙ্গতির একান্ত অভাব। সামাজিক নাটকগুলো অবশ্য এসব ত্রুটি থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। সামাজিক নাটকে বাস্তবতার বন্ধন স্বীকার করা বাধ্যতামূলক, এসব নাটকে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অতিবাস্তব সমস্যার প্রতিই গিরিশচন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। কলিকাতার নাগরিক জীবনের নিচ্‌তলার বিকৃত জীবনযাত্রা, পাপাচার এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙ্গন 'প্রফুল্ল' নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। যৌথ পরিবারের জটিল বিন্যাসের মধ্যে ভিন্নমুখী প্রবণতাসম্পন্ন কয়েকটি চরিত্র নিয়ে গিরিশচন্দ্র এই নাটকে যে ট্রাজিডি রচনা করতে চেষ্টা করেছেন অতিনাটকীয়তার ঝোঁক সত্ত্বেও তা মোটামুটি সফল হয়েছে। কূটবুদ্ধি রমেশের অপ্রতিহত পাপাচার, আবেগপ্রবণ যোগেশের চারিত্রিক শৈথিল্য, সুরেশের পদস্খলন, কাঙ্গালী জগমণির নারকীয় প্রবৃত্তি এই নাটকের কাহিনীধারাকে জটিলতর করে যোগেশের পরিবারটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তার মধ্যে যৌথ পরিবারের প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশের প্রতীকরূপে মধ্যম ভ্রাতা রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল বিষণ্ন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়। স্বামীর হাতে তার মৃত্যুতেই নাটকের জটিল কাহিনীর গ্রন্থিমোচন হয়। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের জন্য 'প্রফুল্ল' নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় যোগ করেছে।

সামাজিক নাটক

গিরিশচন্দ্র স্থায়িভাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় এবং অভিনয়-কলার উন্নতিসাধনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচার করলে বলতে

হয় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা খুব উন্নত ছিল না। মধুসূদন-দীনবন্ধু পাশ্চাত্ত্য নাট্য-শিল্পের আঙ্গিক আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র সেই উত্তরাধিকার বহন করবার দায়িত্ব বোধ করেন নি। তিনি নাটকের প্রগতিধারাকে ব্যাহত করে তার গতিমুখ ফিরিয়ে দেন যাত্রা ধরনের রচনারীতির দিকে। অভিনেতা এবং প্রয়োগবিদ্ হিসেবে তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ; তাই সাহিত্যিক গুণাগুণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিতভাবে তিনি অবিশ্রান্ত রচনায় এবং সেইসব নাটকের অভিনয়ে জনরুচিকে যে পথে পরিচালিত করেছেন তা নাট্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। জনরুচির দাবি পূরণ করে তিনি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু জনরুচিকে উন্নত করবার দায়িত্ব পালনে উৎসাহ বোধ করেন নি। সাহিত্যিক গুণের অভাবের জন্যই তাঁর প্রায় একশটি নাটকের মধ্যে 'জনা' এবং 'প্রফুল্ল'-র মত দু-একখানি নাটক ভিন্ন অপর রচনা সমসাময়িক কালের পরে বিশেষ সমাদর লাভ করেনি।

• [ছয়] মধুসূদন হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের বিবর্তনের পরিচয় দাও।

উত্তর। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে সাধারণভাবে বিষয়বস্তুর অন্বেষণে বাঙালী লেখকবৃন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ওপরে নির্ভর করেছেন দেখা যায়। এ বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যে টডের 'Annals a d Antiquities of Rajasthan'-নামক গ্রন্থ থেকে দেশের স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদার জন্য রাজপুতদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী ব্যবহার করেন। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের প্রভাবে যে-সব ভাববস্তু সেকালের লেখকদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করত দেশপ্রেমের ভাব তার মধ্যে অন্যতম। যদিও বাস্তবে তখনও বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অস্তিত্ব কোথাও ছিল না, তথাপি সাহিত্যে দেশপ্রেমের উল্লাসপূর্ণ বর্ণনা সহজেই সমাদৃত হত। হয়তো সমসাময়িক কালের কোন ঘটনা বা দেশপ্রেমিক কোন চরিত্রকে এই জাতীয় রচনার অবলম্বনরূপে পাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই স্বাধীনচেতা রাজপুত জাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনীগুলোই আমাদের সাহিত্যে একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের এই ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ব্যবহারের ধারা উত্তরকালেও অনুবর্তিত হয়। যখন দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতার চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল তখনও আমাদের ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারের সুদূর কালের ঘটনাবলীর মধ্যে নিজেদের আবেগ অনুভূতি প্রক্ষিপ্ত করে দেখিয়েছেন।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণা

বাংলা নাটকে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ব্যবহারের প্রথম এবং সফল দৃষ্টান্ত মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটক। এই নাটকের বিষয় রানা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণার

আত্মহত্যার কাহিনী। মানসিংহ এবং জয়সিংহ উভয়েই কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী। কৃষ্ণাকে না পেলে উভয়েই ভীমসিংহের রাজ্য আক্রমণ করবেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব এবং কন্যার প্রতি স্নেহ ভীমসিংহ চরিত্রে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। দেশকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণা আত্মহত্যা করে এবং ভীমসিংহ শোকে উন্মাদ হয়ে যান। মধুসূদন নাট্য-কাহিনীর মধ্যে কৌশলে এইভাবে দেশপ্রীতিকেই জয়ী করেছেন এবং দেশের জন্য কৃষ্ণার আত্মোৎসর্গে একটা মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের নাটকগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা এবং সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে একখানি সফল ট্র্যাজিডি। ঐতিহাসিক পটভূমির মধ্যে দেশাত্মবোধের আদর্শ প্রতিফলিত করবার যে দৃষ্টান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন প্রতিষ্ঠিত করেন, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে অন্যান্য লেখকরা সেই দৃষ্টান্তই অনুবর্তন করেছেন। মধুসূদনের পরেই দীনবন্ধুর নাম করতে হয়। কিন্তু দীনবন্ধু কোন নাটকেই ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করেন নি। মনোমোহন বসুও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ব্যবহারে আগ্রহ বোধ করেন নি। উত্তরকালে নাটকে সুপরিকল্পিত-ভাবে ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবিষয়ে নিজেই লিখেছেন, "হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পরে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।" এই প্রেরণা থেকেই তাঁর 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক নাটকগুলো রচিত হয়। 'পুরুবিক্রম'-এ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুষ সংঘর্ষ, 'সরোজিনী' নাটকে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ এবং 'অশ্রুমতী'তে প্রতাপসিংহের ও মানসিংহের বিরোধের কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকে বাংলা দেশের শোভাসিং-এর বিদ্রোহ কাহিনী বিষয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুমেলার যুগ থেকে জাতীয় মানসে স্বদেশের প্রতি ভালবাসার যে নতুন আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, এসব নাটকে সেই আবেগ ও উদ্দীপনা প্রতিফলিত হওয়ায় স্বাদেশিকতাবোধ প্রসারের দিক থেকে নাটকগুলোর প্রভাব বিশেষ কার্যকর হয়েছিল।

মধুসূদন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা নাটক এবং বাঙ্গালীদের অভিনয় চর্চা শখের থিয়েটারের গণ্ডির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এর পরে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রসার এবং বৃহত্তর জাতীয় জীবনে নাট্যশিল্প স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের নাটক ও থিয়েটারের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ফলে জনজীবনের ওপরে নাটকের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জনজীবনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার শক্তিশালী মাধ্যমরূপে নাটকের

সম্ভাবনার কথা মনে রেখে যেভাবে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় গিরিশচন্দ্রও 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশেম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র অবশ্য ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা এবং স্থান-কাল-পাত্রের কালানুক্রম বজায় রেখে কাহিনী গ্রন্থনের দায়িত্ব বোধ করেন নি। উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, শিল্পের বিচারে তাই রচনাগুলিতে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়গুণে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকগুলি জনমানসে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল—এটুকুই কৃতিত্বের কথা।

গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্রের পরে ঐতিহাসিক নাটকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দেওয়াকেই দ্বিজেন্দ্রলাল একমাত্র লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করেন নি। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনা উচ্চতর শিল্পাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্র আশ্রয়ে তিনি মানসিক অনুভূতির বৈচিত্র্য এবং মানস-দ্বন্দ্বের জটিলতা সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য নাট্যকারদের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসবোধ এবং ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাও অনেক উন্নত, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন এবং চন্দ্রগুপ্ত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। "ইতিহাসের অস্ত্র ঝন্‌ঝনা ও নাট্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে, নাট্যকার এই সমস্ত নাটকে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। 'সাজাহানে' পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে সম্রাট সত্তার দ্বন্দ্ব এবং 'নূরজাহানে' নারী প্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সার সংঘর্ষ চমৎকার ফুটিয়াছে।......জীবনের এমন বিপুল গতিবেগ, স্বাদেশিকতার এমন বলিষ্ঠতা এবং মহত্তর আদর্শের এরূপ বিচিত্র সমাবেশ বাংলা নাটকে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে" (অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়)।

দ্বিজেন্দ্রলাল

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও এই ধারায় কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। সেই রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'প্রতাপাদিত্য' এবং 'আলমগীর'। ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার চেয়ে পূর্বকল্পিত আদর্শের রূপায়ণের দিকেই মনোযোগী। ফলে তাঁর প্রতাপ চরিত্র ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং এক আদর্শ জাতীয় বীর। আলমগীরে তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের আদর্শকে জয়ী করতে গিয়ে স্পষ্টতই ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য এই নাটকে তিনি ঔরঙ্গজেব চরিত্র চিত্রণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ

পরিশেষে সাধারণভাবে বলা যায় যে কোথাও আংশিকভাবে শিল্পসিদ্ধি অর্জিত হলেও যথার্থ কোন নাট্যকারই ইতিহাস রসে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সফলতা লাভ করেন নি। "এই সমস্ত নাটক আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে, যে দেশপ্রেম একটা সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র এবং জাতীয় চরিত্রে অত্যাজ্য ভাব সংস্কার

রূপে পরিণতি লাভ করে নাই, যাহা অপরিস্ফুট মুক্তি-কামনা হইতে স্থির অন্তর সাধনায় উন্নীত হয় নাই তাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রেরণা দিতে পারে না। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবন হইতে নাটকে সংক্রামিত হয় নাই, বরং নাট্যকল্পনার বাস্তবাভিসারী মহনীয়তা অপ্রস্তুত জাতীয় জীবনে এক ক্ষণিক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

[সাত] বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর রচনাবলীর মূল্য বিচার কর এবং তাঁহার প্রধান কয়েকটি নাটকের পরিচয় দাও।

অথবা

বিষয়বিভাগ অনুসারে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকৃতির পরিচয় দিয়ে কোন বিভাগে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নির্দেশ কর।

অথবা

কোন্ শ্রেণীর নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিছেন? আলোচনা কর।

উত্তর। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩) বয়সে প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমান, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন অনেক দেরীতে। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন রবীন্দ্র-প্রতিভা পূর্ণশক্তিতে বিকাশলাভ করে বাংলা সাহিত্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। রঙ্গমঞ্চে তখন গিরিশচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। সুতরাং সাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে যে খুব সহজসাধ্য হয় নি, তা সহজেই অনুমান করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ। নিজের রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি স্বকীয় আদর্শ উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করতেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাপ্রসঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট ভাব-পরিমণ্ডলের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিকতার কোন সামঞ্জস্য ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এক্ষেত্রে নিজের পথে অগ্রসর হয়েছেন। রঙ্গমঞ্চের প্রতি যখন তিনি আকৃষ্ট হলেন তখনও নির্বিবাদে গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত নাট্যরীতি স্বীকার করে নিতে পারেন নি। মধুসূদন থেকে বাংলায় পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা আত্মীকরণের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল গিরিশচন্দ্রে তা খণ্ডিত হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্র লোকরুচির তৃপ্তি সাধন এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ধরনের অভিনয় পদ্ধতি অনেক পরিমাণে প্রশ্রয় দেন। দ্বিজেন্দ্রলালে দেখা গেল তার প্রতিক্রিয়া। পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অনুসরণই যে বাংলা নাটকের মুক্তির পথ এই নিশ্চিত ধারণা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক রচনায় অগ্রসর হন।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব

প্রথমদিকে তিনি কয়েকটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় প্রহসন রচনা করেছিলেন। 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ'—প্রভৃতি এই লঘুরসের নাটকের স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নেই। 'পরপারে' এবং 'বঙ্গনারী' নামে যে ছুটি সামাজিক নাটক রচনা করেন তাতে তিনি গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। এই রচনা ছুটিও বৈশিষ্ট্যবর্জিত। নাট্যকার হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব নির্ভর করছে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ওপরে। নাট্য বিষয়রূপে পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা আমাদের নাট্যকারদের মধ্যে কোনদিন কমে নি। মধুসূদন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে সার্থকভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা করেছিলেন। একমাত্র দীনবন্ধু ছাড়া প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে সকলেই বিষয়বস্তুর জন্য পৌরাণিক কাহিনীর ওপরে কমবেশি নির্ভর করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করেও সেই প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী মায়াময় জগতের বাতাবরণের যে মানবিক আবেগ-অনুভূতি সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তা প্রমাণ করেছেন 'পাষাণী', 'সীতা' এবং 'ভীষ্ম' নাটকে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলো অলৌকিকতা এবং দৈবের শক্তি প্রমাণ করবার মাধ্যমস্বরূপ হয়ে উঠত। পৌরাণিক চরিত্রগুলো অবলম্বনে তিনি যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যার অতীত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে নাটক পূর্ণ করে তুলতেন। এভাবে ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস জাগানো সহজ হলেও প্রকৃত নাট্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হত। অন্যপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক কাহিনীর বাতাবরণে পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনে ও মুখ্যত মানবিক প্রবৃত্তি এবং মানবিক হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'পাষাণীর' (১৯০০) অহল্যার যৌবনের নিষ্ফলতা, কামনার ব্যর্থতা ও ইন্দ্রের প্রতি লালসাময় আকর্ষণ নাট্যকার সহানুভূতির সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন। তার থেকে অধিকতর দোষী শঠ প্রতারক ও লম্পট পুরুষজাতির, ইন্দ্র যার প্রতিনিধি, নাটকে এটাই প্রদর্শিত হয়েছে। 'সীতা' (১৯০৮) রামায়ণ ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অনুসরণে লিখিত। নাট্যকার তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ও আশা দিয়ে সীতা চরিত্র অঙ্কিত করেছেন। 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকে প্রাচীন ভারতবর্ষের এবং ভীষ্মের ব্যক্তিত্বের চিত্র উজ্জ্বল ও জীবন্ত। কিন্তু শেষের দিকে নাটকটি শিথিলবিন্যস্ত এবং বৃদ্ধ পিতামহরূপে ভীষ্মের চিত্রও মহিমাবর্জিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক

পুরাণ কাহিনীর মতোই দেশের প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষভাবে মোগল রাজপুত ইতিহাস বাঙালী নাট্যকারদের কাছে বিষয়বস্তুর অফুরন্ত উৎসরূপে সমাদৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য আরও প্রাচীন ইতিহাস থেকে নাট্য বিষয় সংগ্রহ করেছেন তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'সিংহল বিজয়' নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলালের মঞ্চসফল জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' অন্যতম। তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে প্রসিদ্ধ রচনা 'প্রতাপসিংহ', দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান' প্রভৃতি। বাঙালী নাট্যকারেরা সাধারণ দেশপ্রেমের ভাব পরিস্ফুট করবার জন্যই ঐতিহাসিক কাহিনী

অবলম্বন করতেন। 'নূরজাহান' বা 'সাজাহান'-এর মতো নাটকে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা কোথাও নেই। ভারতবর্ষের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে নানামুখী স্বার্থ সংঘাত এবং ক্ষমতাদ্বন্দ্বের যে বিচিত্র ইতিহাস মুসলমান আমলে গড়ে উঠেছে এবং সেই পটভূমির মধ্যে মানবিক প্রবৃত্তির যে বেদনামিশ্রিত পরিণতি দেখা গিয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তারই আলেখ্য রচনা করেছেন। এই নাটকগুলোতে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্ররূপায়ণে একান্তভাবে শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। প্রধান চরিত্রগুলো পরিস্ফুট হয়েছে অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে, প্রবৃত্তিবেগতাড়িত তাদের জীবন ট্র্যাজিক পরিণতিতে শেষ হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটকে অবশ্য দেশপ্রেমের আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা আছে। 'মেবার পতন' নাটকে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের উর্ধ্বে উঠে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেছেন। গঠনের দিক থেকে এবং নাট্যগুণের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকগুলিই শ্রেষ্ঠ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনায় বিশেষ সফল হন নি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করতে গিয়েও তিনি অস্বস্তি অনুভব করেছেন। গদ্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়েই তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভার বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্রটি খুঁজে পান। 'তারাবাই' (১৯০৩) তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, বিষয় রাজস্থান কাহিনী থেকে সংগৃহীত। নাটকটি ত্রুটিবিচ্যুতিতে পূর্ণ। 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতার ভাবোদ্দীপনাময় নাট্যরচনাধারার সূত্রপাত। স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা প্রতাপের দুর্দমনীয় বীরত্ব, অতুলনীয় দেশপ্রেম ও সহনীয় আত্মহত্যার জ্বলন্ত চিত্র নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘটনার মাত্রাতিরিক্ত বাহুল্যে, বহুসংখ্যক চরিত্রের উপস্থাপনায়, ঘটনার বিভিন্ন সুনিশ্চয়তায় সুগভীর রসে 'দুর্গাদাস'-এ (১৯০৬) নাট্যগুণ দানা বাঁধতে পারে নি। দুর্গাদাস সমগ্র মানবীয় দোষ-দুর্বলতার অতীত বিশুদ্ধ আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কিত হওয়ায় নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। 'নূরজাহান' (১৯০৮) ঐতিহাসিক ট্র্যাজিকরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সাজাহানে'র-ট্র্যাজেডির ভিত্তি সাজাহান, ঔরংজীব, দারা, সুজা, মহম্মদ, সোলেমান প্রভৃতি চরিত্র ; কিন্তু 'নূরজাহানে'র ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণরূপেই নূরজাহানকেন্দ্রিক। নায়িকার নামিত অন্যান্য বাঙলা নাটকে কৃষ্ণকুমারী, অশ্রুমতী ইত্যাদিতে নায়িকারা শুধু দুঃখভোগ করেছে, তাদের ট্র্যাজেডির মূল তাদের চরিত্রে নয়, বাইরে নিহিত। নূরজাহানেই সর্বপ্রথম বাঙলা নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজিক নারীচরিত্রের উদাহরণ দেখা গেল। নূরজাহান ক্ষমতালোভে বাসনাকামনায়, প্রচণ্ড আবেগ ও বিবেকের নির্মম সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত ট্র্যাজিক নারীচরিত্র। সাজাহান (১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। বহু চরিত্র ও বিভিন্ন উপকাহিনীকে নাট্যকার মূল কাহিনীর সঙ্গে নিপুণভাবে যুক্ত করেছেন। সাজাহানের মধ্যে সেক্সপীয়রের লিয়রের ছায়া স্পষ্ট। মুখ্য চরিত্রে ঔরংজীব কুটিল, নিষ্ঠুর, কিন্তু তার মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। জাহানারার ব্যক্তিত্বও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। পিয়ারার আপাতচপল কৌতুকপরিহাসের-

অন্তরালে দুঃখবেদনায় জলভারাবনত মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে বলে অনুভব করা যায় ভাবব্যঞ্জনাময় সংলাপও সাজাহানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

নাটকের রচনার একটি প্রধান সমস্যা সংলাপের ভাষা ব্যবহারের সমস্যা। নাটকের রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সংলাপের ভাষা নিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি বলেছেন, "বাঙলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাববোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" দ্বিজেন্দ্রলাল অতি সচেতনভাবে নাট্য-সংলাপে কাব্যগুণান্বিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কবিতার প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকায় তিনি গদ্যভাষাকে কবিতার আসনে বসাবার প্রলোভন পরিত্যাগ করতে পারেন নি। ফলে তাঁর নাটকের দীর্ঘ সংলাপগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসপূর্ণ। এই ধরনের সংলাপ যে সব সময়ে নাট্যরস ও স্ফূর্তির পক্ষে সহায়ক হয়েছে তা নয়। নাট্যসংলাপের ভাষা সংস্কার করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক ক্ষেত্রে নাটকের পরিস্থিতি এবং নাট্য-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কাব্যাক্রান্ত গদ্যে বর্ণনাত্মক সংলাপ রচনা করে নাটককে দুর্বলই করেছেন। তবুও এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেখক হিসাবে তাঁর প্রখর আত্মসচেতনতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন বাংলার নাট্যজগতে তিনি সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে বাংলা নাটকের সাহিত্যিক মান উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপ

[এক] বাংলা উপন্যাসে প্যারিচাঁদ মিত্রের দানের মূল্য নির্ণয় কর।

অথবা,

বাংলা উপন্যাসে আলালের ঘরের দুলালের স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের পূর্বে বা সমকালে যে সব কাহিনী বাংলা গদ্যে রচিত হয়েছিল তাদের বেশির ভাগই অনুবাদাশ্রয়ী, রোমান্স উপাখ্যান কিংবা উপকথামূলক। আরব্য উপন্যাস, হাতেমতাই, লায়লা মজনু, চাহার-দরবেশ, গোলে-বকাওলি প্রভৃতি নিম্নমানের কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকদের গল্পতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করত। তাই সমস্ত রচনা ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবসঞ্জাত আধুনিক সাহিত্যরুচি ও রসবোধের সংস্পর্শবর্জিত। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে রচিত। তারাশংকরের আর একটি আখ্যায়িকা 'রাসেলাস' (১৮৫৭) ইংরেজির অনুবাদ। হানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স-এর 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণে' (১৮৫২) উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সর্বগ্রাসী প্রাধান্য দেওয়ার ফলে রচনাটির সমস্ত উপন্যাসোচিত গুণ গৌণ হয়ে গেছে। তাছাড়া 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে কোনও প্রভাবই ফেলেনি।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাসে'র (১৮২৩ খ্রীঃ) ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক সামাজিক নক্শায়ই বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাবের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় বিশেষভাবে নারীসমাজের শিক্ষার জন্য ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা কথ্যভাষার রীতিতে বাক্য রচনা, প্রচুর তদ্ভব ও চলিত ফারসী শব্দের ব্যবহারে বাংলা গদ্যভাষার দুঃসাহসিক পরীক্ষার উদাহরণ স্থাপন করলেন। 'আলালের ঘরের দুলালে'র কিছু অংশ প্রথমে মাসিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্যারিচাঁদের অন্যান্য রচনার মত এই রচনাটিও টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ধনী বিষয়ী বাবুরামবাবুর পুত্র মতিলালের কুসঙ্গে পড়ে এবং তার শিক্ষা বিষয়ে পিতার অবহেলার জন্যও অধঃপাতে যায়, পিতার মৃত্যুর পর সে বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় সমস্তই নষ্ট করে। তারপর দুঃখে পড়ে তার হৃদয় মন পরিবর্তিত হয়, সততা ও ধর্মনিষ্ঠার মূল্য বোঝে, আলালের ঘরের দুলালের মূল কাহিনী এই। উপন্যাসে

সে যুগের সামাজিক পরিবেশ বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে উপন্যাসে কাহিনীর সুসম্বন্ধ রূপ ফোটেনি, এমন অনেক ঘটনা স্থান পেয়েছে যারা মূল বিষয়বস্তুর বিকাশে ও চরিত্রের পরিণতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। নায়কের ব্যক্তিত্বও পূর্ণরূপে চিত্রিত হয় নি, নারী চরিত্রগুলি কাহিনীর পক্ষে অনেকটাই অবাস্তব। ঔপন্যাসিক যে চরিত্রের সাহায্যে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, সেই বরদাপ্রসাদ ও তাঁর শিষ্য ও মতিলালের ছোটভাই রামলাল নিষ্প্রাণ, তাদের মধ্যে রক্ত-মাংসের মানুষের বাস্তবতা বিন্দুমাত্র আভাসিত হয় নি। মতিলালের পরিবর্তনও বিশ্বাসযোগ্যভাবে রূপায়িত হয় নি। আলালের ঘরের দুলালের কোনও চরিত্রেরই অন্তর্লোকের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

ধুরন্ধর উকিল বটলর এবং তার কর্মচারী অসৎ কুটিল ও অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, ধনী সন্তানদের তোষামোদকারী বক্রেশ্বর—এই চরিত্রগুলি বাস্তব ও জীবন্ত। মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচাই 'আলালের ঘরের দুলালে'র অবিস্মরণীয় চরিত্র। ঠকচাচা তার ধূর্ততা ও বৈষয়িক বুদ্ধি নিয়ে প্রাণময় বাস্তবতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রতারক মিথ্যাচারপটু মানুষটি তার বৈষয়িক জীবননীতিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করে: 'দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?' জাল করার অপরাধে ঠকচাচা ও তার কুকর্মের সঙ্গী বাহুল্যের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, জাহাজ করে যাবার সময় সে এই আক্ষেপ করে: "মোদের নসিব বড় বুরা, মোরা একেবারে মেটি হলুম, ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে, মোকান বিগেল, বিবির সাতেবি মোলাকৎ হল না, মোর বড় ডর তেনা বি পেল্টে সাদি করে'। আমরা অনুভব করি, তার এই আক্ষেপ একদিকে যেমন কৌতুকাবহ, অন্যদিকে তেমনি লেখকের সহানুভূতিসিক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, প্যারীচাঁদই প্রথম ইংরেজি বা সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর নির্ভর না করে বাস্তবজীবনের পরিবেশ থেকেই বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে বাংলা উপন্যাসে নতুন পথ প্রবর্তন করেছেন। তাঁর বর্ণনা ও ভাষাও বাস্তবনিষ্ঠ। বাংলা সামাজিক উপন্যাসে 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজিতে নভেল বা উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, আলালের ঘরের দুলাল তার আদর্শকে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের লেখক ও পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছিল।

[দুই] বঙ্কিম উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তার ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস কয়টির পরিচয় দাও এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসগুলির সাহিত্যমূল্যও নিরূপণ কর।

অথবা,

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিরূপ আদর্শ স্থিরীকৃত হয়েছে তা নির্ণয় কর।

উত্তর। বাংলা উপন্যাসের যথার্থ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে

গল্পের কাহিনী ছিল, কিন্তু উপন্যাস ছিল না অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণময় বাস্তবধর্মী কাহিনী একেবারেই ছিল না। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের একটি পটভূমিকা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু চরিত্রগুলোর মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ নেই বলেই তার মধ্যে উপন্যাসধর্মিতা আসে নি। বঙ্কিম-উপন্যাসে এই গুণগুলো সর্বপ্রথম পুরোপুরিভাবেই এসেছে এবং সেইজন্যেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

উপন্যাসের স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন: "বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্যলাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে যে প্রাচীনতা, কল্পনাদৈন্য ও ভাবগভীরতার পরিচয় পাই, বঙ্কিমের উপন্যাস সেই সমস্ত ত্রুটি হইতে মুক্ত। তাঁহার সবকয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে। জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মর্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে।"

শিল্পী বঙ্কিমের হৃদয়াবেগ চিরদিনই রোমান্স রসকে গ্রহণ করেছে। রোমান্স লেখকের অতীতের প্রতি যেমন একটি স্বাভাবিক মানসপ্রবণতা থাকে, তেমনি একটি অতিপ্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাসও থাকে। কিন্তু তা হলেও রোমান্সের মধ্যে একটি বাস্তবধর্মিতার সূত্রও একেবারে অলক্ষিতভাবে থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুদূরপ্রসারী কল্পনার দ্বারা বহমান জীবনের তুচ্ছতা ও দীপ্তিহীনতা থেকে অতীত ইতিহাসের ঘটনাবহুল পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বেশির ভাগ কাহিনীর মূলকেন্দ্র স্থাপন করেছেন; এর মধ্যে হয়তো আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব-ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাদের মানসকে জাগ্রত করবার একটি অভিপ্রায় লুকানো ছিল। ইতিহাসের কথাবস্তুতে কল্পনারস মিশিয়ে তিনি মানব মনের নিগূঢ়তম সত্যকে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসে কেবল ঘটনার বর্ণচ্ছটাই নেই, মানবজীবনের চিত্তলোকের অত্যুজ্জ্বল প্রকাশও আছে। তাঁর উপন্যাসে যে অতলস্পর্শী জীবনজিজ্ঞাসার অপরূপত্ব এসেছে তা বাংলা সাহিত্যে সত্যই অপূর্ব। সাহিত্যরসের এক দুর্লভ আভিজাত্যে তাঁর উপন্যাসগুলো তাই এক চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বঙ্কিম-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের দিক আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসের প্রধান ভাবগ্রন্থি দাম্পত্য প্রেম।

রোমান্স কাকে বলে

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'; ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই উপন্যাস প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র সাতাশ বছরের যুবক। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই রোমান্টিক উপন্যাসে জীবন-জিজ্ঞাসার ততটা গভীরতা আসেনি এবং চরিত্রচিত্রণের শিল্পমূল্যও খুব বেশী নেই, কিন্তু তৎকালীন বাংলা গল্প সাহিত্যের দৈন্যের দিকটা বিচার করে দেখলে এটি একটি বিরাট সৃষ্টি-

দুর্গেশনন্দিনী

প্রতিভার যথার্থ ফসল বলেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানব-মানবীর অন্তরলোকের নিগূঢ় কথার উন্মোচনে, বর্ণনার মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় এবং কাহিনী গঠনের মনোহারিত্বে এই রোমান্টিক উপন্যাসটি বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকার সামনে একটি নতুন রসলোকের দ্বার খুলে দিল। বাংলা দেশের পাঠান যুগের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা এই গ্রন্থের কাহিনী-বস্তুর মূল প্রেরণা সঞ্চার করেছে; এবং এই কাহিনী গঠনের পেছনে উড়িষ্যা ও বঙ্গাধিপতি পাঠান কতলু খাঁ ও মোগল সেনাপতি মানসিংহের রাজকীয় সংঘর্ষ একটি উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে রেখেছে। বীরেন্দ্রসিংহ ছিলেন গড় মান্দারণ দুর্গের অধিপতি, কতলু খাঁ তাঁকে নিজের পক্ষভুক্ত করবার জন্য বীরেন্দ্র সিংহকে পত্র দিলে বীরেন্দ্র সিংহ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলে বীরেন্দ্র সিংহ বন্দী ও নিহত হন। কিন্তু কাহিনীর কেন্দ্রমূলে রয়েছেন মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ; তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হল কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা ও বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা। কিন্তু আয়েষা তাঁর নারী-হৃদয়ের প্রেমগভীরতাকে বহন করেও নিজের আত্মসংযমের দ্বারা তিলোত্তমাকে তার প্রেমজগতে প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করে দিয়েছে। বিমলার অতীত জীবন কাহিনী দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনা-বয়নে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তার জীবন কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিক উপাদান যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু সমাজ সমস্যার দিকটাও উপেক্ষিত হয় নি। ব্যক্তিত্বময়ী নারী-চরিত্র মহিমার সঙ্গে সামাজিক পরিচিতিমূলক একটি নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার দ্বারা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাত্র এক বছর পরে লিখিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে যে সকল ত্রুটি দেখা দিয়েছিল তা যেন একটি বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শে এই উপন্যাসের অঙ্গ থেকে একেবারে মুছে গেছে। এই উপন্যাসটির গঠন-কৌশলে গ্রীক ট্র্যাজিডির মত সরল রেখায়িত যে একটি সংহত রূপ এসেছে তার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। এই গ্রন্থ রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়তো এই প্রশ্নটি জেগেছিল যে কোন নারী যদি মনুষ্য লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন সমুদ্রতটবর্তী অরণ্যে বাস করে এবং তার পরে বিবাহিত হয়ে কোন গৃহস্থ-ঘরে ফিরে আসে, তবে তার বন্য-প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হবে কি না। কপালকুণ্ডলার চরিত্রকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম-মানসের এই প্রশ্নটিই আবর্ত রচনা করেছে। কপালকুণ্ডলার সবচেয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, অন্তরে তার আদিম নারীর মত করুণা আছে। বিবাহিত জীবনেও তার অন্তরের গভীরে কোনরূপ প্রণয়ের আবেশ জাগল না।

কপালকুণ্ডলা

প্রণয়ের এই অভাব এবং অপরিসীম ভবানী-শক্তি এবং দৈবী-শক্তিতে বিশ্বাস তার জীবনকে বিষাদময় পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তার জীবনের এই ট্র্যাজিডির সঙ্গে নবকুমারের জীবনের ট্র্যাজিডি এসেছে। এই নারী প্রকৃতির মতই অপরূপা ও রহস্যময়ী। নবকুমার তার রূপে মুগ্ধ হল বটে, কিন্তু তাকে পেল না; এজন্যেই নবকুমারের সারাটি হৃদয় এক গভীর আর্তিতে ভরে উঠল এবং

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার জীবনাবসান হল। এখানেই নায়ক নবকুমারের জীবনেও ট্র্যাজিডি এসেছে। কাহিনীর মধ্যে জটিলতা এনেছে নবকুমারের পূর্বপত্নী পদ্মাবতী বা মতিবিবির কাহিনী। সে যেমন রূপবতী তার সমগ্র জীবনও তেমনি রোমান্স-এ পূর্ণ। তাকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আগ্রার রাজনৈতিক চিত্রটিকে যেমন উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, তেমনি তার দ্বারাই আদিম সৌন্দর্য ও সারল্যের ওপর ঐশ্বর্য, ঈর্ষা ও ভোগপ্রবৃত্তির ওপর বিপুল এক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চারও করেছেন। তার চরিত্রকে এইভাবে গড়ে তোলবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই উপন্যাসে ইতিহাসের অবতারণা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের রস খুব একটা ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। মতিবিবি চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি ও জীবন্ত চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর উপন্যাস হল 'মৃণালিনী' (১৮৬৯); ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঠিক সূচনাতেই বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাসের পটভূমিকা গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার প্রায় সবগুলো চরিত্রই অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের একটি সংকট মুহূর্তকে বঙ্কিম পটভূমি করেছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর রোমান্স-রসপূর্ণ প্রেমকাহিনী। ঐ উপন্যাসের ঘটনাসূত্রের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে পশুপতি ও মনোরমার কাহিনী। সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বঙ্গ বিজয়ের যে অসম্ভাব্য কাহিনী বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে এবং তার মূলে যে একটি বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতি চরিত্রের মাধ্যমেই পরিস্ফুট করে তুলেছেন; এবং এইসঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগমনের পূর্ণ চিত্র যদিও তিনি দিতে পারেন নি—তবুও এর পেছনে যে গ্লানি ও সুগভীর বেদনা আছে তার একটি মর্মান্তিক ভাষারূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাসে মনোরমা কপালকুণ্ডলার মতই রহস্যময়ী। তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য একটি জটিলতা ও অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। হেমচন্দ্র চরিত্রটি উপন্যাসের নায়ক হলেও বীরত্ব বা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আমাদের শ্রদ্ধা একেবারেই আকর্ষণ করতে পারে না, মৃণালিনী-চরিত্রটির মধ্যেও কোনরূপ নারী-ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মৃণালিনী

এর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) আকারে ছোট, কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভাসুলভ রোমান্স-রস এর মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্তের জীবন এর উপজীব্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির পরিবেশ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সুবিপুল কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা এক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। যুগলাঙ্গুরীয়কে এককথায় সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বলা চলে।

যুগলাঙ্গুরীয়

তার পরে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)। এই উপন্যাসটির মধ্যে বঙ্কিম-প্রতিভাসুলভ রোমান্স-রস যথেষ্ট আছে, কিন্তু তা হলেও এর মধ্যে তৎকালীন যে-সমাজ জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়েছে তাই-ই তার অন্যান্য উপন্যাস

থেকে একে একটি পৃথক মহিমায় চিহ্নিত করেছে। এই উপন্যাসটির পটভূমিকা রচনা করেছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসিমের যুগ। মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ উপন্যাসের ঘটনায় প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই উপন্যাসে বাংলার ইতিহাস ও সমাজজীবন যেন একসূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা হলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। আখ্যায়িকার মূলকেন্দ্রে আছে প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমকাহিনী। এই প্রধান কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মীরকাসিম-দলনীর কাহিনী। এই দুটি কাহিনীর মধ্যে যোগবন্ধন রচনা করেছেন উপন্যাসের নায়ক চন্দ্রশেখর। একটি অপরূপ কল্পনাশক্তির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র একটি উপেক্ষিত গ্রামের তিনটি নরনারীর জীবন-কাহিনীকে তৎকালীন রাজনৈতিক আবর্তনের মধ্যে টেনে এনে নবাব-পরিবারের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন; শৈবলিনী নিজের দুর্দম আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে কিশোরকালের প্রেমাস্পদ প্রতাপের সন্ধানে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, আর দলনী বেগমের দুর্ভাগ্যের গতি নির্ণীত হয়েছে ইতিহাসের দ্বারা। গুরগণ খাঁর এবং তকি খাঁর ষড়যন্ত্র ও হীন-মন্যতাই তাকে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ফেলে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। শৈবলিনীর প্রবৃত্তিবেগও চন্দ্রশেখরের জীবনে ট্রাজেডি ঘনীভূত করে তুলেছে; শৈবলিনীর হৃদয়লোকের অগ্নিশিখাই চন্দ্রশেখরের গৃহ পুড়িয়ে দিয়েছে, তাঁর অতি সাধের গ্রন্থগুলিকেও দগ্ধ করবার পরিবেশ রচনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এজন্যেই জাগতিক নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে নরকের বিভীষিকার মধ্যে শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন। তাতে শিল্পী বঙ্কিম নীতিবাদী বঙ্কিমের কাছে পরাজিত হয়েছেন। রোমান্সরস ঘনীভূত হয়েছে সবচেয়ে বেশী প্রতাপকে মুক্ত করার পর গঙ্গার বুকে উচ্ছল চন্দ্রালোকে দুজনের সাঁতারের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসে প্রতাপের প্রেম ও ত্যাগ গভীরতায় একটি অপরূপ মহিমা লাভ করেছে।

চন্দ্রশেখর

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রখ্যাত উপন্যাস 'রাজসিংহ'-এর (১৮৮২) নাম করতে হয়। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে কাহিনী পরিবেশন ও চরিত্রগুলো অঙ্কিত করেছেন। কাহিনীর কেন্দ্রভূমিতে আছে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি চরিত্রগুলো শিল্পী বঙ্কিমের হাতে অপরূপভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাহিনীধারা একটি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে গেছে এবং সেই গতি পাঠক-মনকেও মুগ্ধ বিস্ময়ে টেনে নিয়ে যায়। জেবউন্নিসা ও মোবারকের যে প্রণয়-কাহিনী উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করেছে তার মধ্যে ইতিহাসরস একেবারেই নেই, কিন্তু মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিজীবনের রসেই শিল্পগুণের দ্বারা ইতিহাসের মধ্যেও গতি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঐশ্বর্যময় মানবজীবন ও দূরদৃষ্টতার মাধ্যমে একটি সুগভীর জীবনোপলব্ধির কথাও তিনি পরিবেশন

রাজসিংহ

করেছেন। বঙ্কিম-প্রতিভায় যেন এই উপন্যাসে ইতিহাসের কয়েকটি জীর্ণ পাতা সজীব ও মুখর হয়ে উঠেছে। 'রাজসিংহ'ই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এর পর বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবিশ্রুত ত্রয়ী উপন্যাস—'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম'-এর (১৮৮৬) কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এই তিনটি উপন্যাসই ইতিহাসে গৌণ; তত্ত্ব পরিবেশনই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

'আনন্দমঠ'-এর পটভূমিকা রচনা করেছে বাংলা দেশের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কাহিনী; এই বিদ্রোহের ঘটনাই উপন্যাসটিতে একটি সুগভীর রোমান্সরস সঞ্চারিত করে দিয়েছে। "ঘটনা ও সমাজ শৃঙ্খলচ্যুত, বিপর্যস্ত জনসংঘের মনে বাস্তব প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্বপ্নছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাই উপন্যাসের একমাত্র অবলম্বন। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভক্তি সাধনের আকুল প্রশ্ন যে দৈববাণী-রূপ উত্তর মিলিয়াছে তাহাই উপন্যাসের মর্মকথা। উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রী এই সাধনার অঙ্গ ও উপকরণ মাত্র; তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। সন্তান ধর্মের দীক্ষা তাহাদের পূর্বনামের ন্যায় তাহাদের ব্যক্তিসত্তাকেও গ্রাস করিয়াছে।"

আনন্দমঠ

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে সন্তান ধর্মে দীক্ষিত জীবানন্দ-ভবানন্দের মধ্যে মানব-সুলভ রূপমোহ ও প্রণয়বৃত্তিকে জাগ্রত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের বেশ কিছুটা রক্তমাংসের মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই জীবানন্দ, মহেন্দ্র, শান্তি, কল্যাণী উপন্যাসের ভূমিকায় জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থের মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-সাধনারই প্রতীক বলে মনে হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা যেমন সজীব তেমনি মর্মস্পর্শী। এই উপন্যাসটি 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের দ্বারা বাংলাদেশের অন্তরকে একটি জাতীয়তার মন্ত্রবাণীতে দীক্ষিত করেছিল।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) নিষ্কাম কর্মের গৌরব মহিমা নিয়েই কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। এই উপন্যাসেও তৎকালীন রাষ্ট্রগত বিশৃঙ্খলার পটভূমিকায় কাহিনীর গঠনকর্মটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পন্ন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের একটি মূলকথা এই উপন্যাসে উচ্চারিত হয়েছে। হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, রঙ্গলাল, ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর বৌ, নয়ান বৌ—তারা আমাদের একান্ত পরিচিত বলেই মনে হয়। এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, নায়িকা প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবানের অবতারস্বরূপা বলে বর্ণনা করতে চাইলেও তার ভিতরে যে একটি শাশ্বত নারীত্ব ছিল তা মাটির পৃথিবীকেই ধরে রয়েছে; দেবীত্বের মধ্যে নিজের রক্তমাংসগত প্রাণ-স্পন্দনটিকে হারিয়ে ফেলেনি। তাই প্রফুল্লকে কোন অবস্থাতেই যেন বাংলার সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

দেবীচৌধুরাণী

'সীতারাম' (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে শেষতম উপন্যাস। তার পরে বঙ্কিমচন্দ্র কোন উপন্যাস রচনা করেন নি। এই উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর

আবরণে ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তার পটভূমিকা রচনা করেছে সীতারাম-নামক একজন হিন্দু রাজার মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাহিনী। সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এই হিন্দু রাজার উত্থানপতনের কাহিনী তো আছেই, তা ছাড়া জীবন-সংকটের বেদনাময় পরিস্থিতি এই উপন্যাসটিকেও মাটির পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সীতারামের তিনজন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা ও রমা। শ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল বিয়ের ঠিক পরেই। কিন্তু এই শ্রীই ফিরে এলে সীতারাম তাঁর রূপে উন্মাদ হয়ে গেলেন এবং তাঁর অধঃপতনের মূলে এই শ্রীর রূপই কাজ করে গিয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাই সীতারামের অধঃপতনের মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত রূপতৃষ্ণার সে সংযমহীনতা তা একান্তই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সীতারামের পতনের মধ্যেও চিরন্তন মানবিক দিকটা বঙ্কিমের মহতী কল্পনায় এই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয় নি। রমার বিচার দৃশ্যটি এই উপন্যাসে একান্তভাবেই সজীব ও বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাশক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ধর্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য হলেও জীবনবোধের যে গভীরতা এই উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে তা উপন্যাস রীতিকেই সার্থকতা দান করেছে।

সীতারাম

[তিন] বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির বিস্তৃত আলোচনা করে সেই সঙ্গে একটি সাহিত্যিক মূল্যও নিরূপণ কর। এই উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের যে জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তারও উল্লেখ কর।

উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক বা গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমপ্রতিভার উজ্জ্বলতম দিকটিকে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৬৮) প্রসিদ্ধ। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) ও 'রাধারাণী'ও (১৮৬৬) গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস ; কিন্তু এই দুটিতে বঙ্কিম প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর তেমন নেই।

সামাজিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাস রচনার পেছনে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তলোকে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ-চেতনার দিক সবচেয়ে বেশি কাজ করে গিয়েছে। যখন তিনি 'বিষবৃক্ষ' রচনা করেন তাঁর পূর্বে তিনখানি রোমান্টিক উপন্যাসের রচনাকর্ম তিনি সমাধা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। তখনকার সমাজ সমস্যাই যেন তাঁকে সামাজিক উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করল, কিন্তু সামাজিক উপন্যাস হলেও বিষবৃক্ষের মধ্যে তাঁর রোমান্টিক মনোভাবের একটা স্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বছর কালই তিনি সামাজিক উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি 'চন্দ্রশেখর' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' নামে দুটি রোমান্স রচনা করেছিলেন। কিন্তু

তখন মনের কেন্দ্রমূলে যে কাজ করে গেছে পারিবারিক জীবনের সংঘাত-সমস্যা, তা স্পষ্ট বোঝা যায়, যখন দেখি চন্দ্রশেখরের মূল উপাদান রোমান্টিক হলেও পারিবারিক জীবনের বেদনাতুর সংকট মুহূর্তের কথাই সেখানে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গতঃ এটাও মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসও অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকের স্পর্শ থেকে মুক্ত নয়। শুধু 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই স্পর্শের প্রভাব থেকে বহু পরিমাণে মুক্ত।

বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসেও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ

'ইন্দিরা' আকারে ছোট এবং প্রকারে একটা বড় গল্প। উপন্যাস-সুলভ কাহিনীর জটিলতার ও কল্পনার সুগভীর ঐশ্বর্য এর মধ্যে নেই। পরিহাসরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতুকরসের সৃষ্টির দক্ষতাই এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। দাম্পত্য-জীবনের একটা রসসন্ধানী দৃষ্টিই যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে এই রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ; কিন্তু কাহিনীর ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষরও লক্ষ্য করা যায়। এর নায়িকা ইন্দিরাও নিজের জীবন-কাহিনীর মধ্যে নিজস্ব বুদ্ধির একটা অম্লান পরিচয় রেখে গেছে। শ্বশুরালয়ের পথে যাত্রা করে দস্যু-কর্তৃক অপহৃতা ইন্দিরা কি করে একমাত্র নিজের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের দ্বারা কলকাতায় এসে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল, সেই ঘটনাই এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির উপজীব্য। গ্রন্থের নায়িকার মুখেই কাহিনী বিবৃত হয়েছে, এবং মনে হয়, ইন্দিরার রমণীহৃদয়ের সমস্ত মাধুর্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যেন অনুভব করে তার শিল্পে গেঁথে তুলেছেন। এতে জীবনের কোনো সমস্যা নেই বটে, কিন্তু জীবনের এক সুন্দর চিত্র আছে। আঙ্গিক রীতিতে এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটা অভিনবত্বের গৌরব নিয়ে এসেছিল।

ইন্দিরা

'বিষবৃক্ষ'কেই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। এই উপন্যাসে তিনি যেমন প্রেমের একটা সমস্যাজটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তেমনি তার সঙ্গে একটি নীতিবাদের প্রশ্ন জড়িয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের নায়ক নগেন্দ্র দত্ত এবং তার পত্নী সূর্যমুখী রূপে ও গুণে বহু নারীর অগ্রগণ্যা। কিন্তু দৈববশে কুন্দকে দেখে রূপমুগ্ধ নগেন্দ্র দত্ত তাকে বিয়ে করেই নিজেই নিজের সংসারে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করলেন। সেই বৃক্ষের মূলদেশে আরও বিষ সঞ্চারিত করে দিল হীরা ও দেবেন্দ্র। কাহিনীব মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এই হীরা-দেবেন্দ্রের উপস্থিতিতে। সূর্যমুখী স্বামীকে সুখী করবার জন্য নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিয়ে দিয়ে গৃহত্যাগিনী হলেন। তাঁর এই গৃহত্যাগের দুঃসহ শূন্যতাকে সহ্য করতে না পেরে নগেন্দ্র দত্ত তারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পরে যখন তাঁদের মিলন হল, তার ঠিক পরেই কুন্দ হীরার দেওয়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। নীতিবাদী বঙ্কিম জীবনশিল্পের প্রভাবে কুন্দের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও কুন্দকে অবৈধ প্রেমের শাস্তি-স্বরূপে মৃত্যুর অন্ধকারে ঠেলে দিলেন। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ'-এর মধ্যে শিল্পী বঙ্কিমের সাক্ষাৎ

বিষবৃক্ষ

লাভ করি সেইখানে, যেখানে তিনি পুরুষ-নারীর প্রেমমাধুর্যপূর্ণ হৃদয়বৃত্তির ছবিগুলোকে উজ্জ্বল বর্ণে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম বলেছেন, "বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। নগেন্দ্রনাথে যে বিষফল ফলিল, তাহা মানসিক, দেবেন্দ্রনাথে যে ফল ফলিল, তাহা প্রধানত শারীরিক। অসংযম সকল ক্ষেত্রেই যে দেহে ফল ফলায় তাহা নয়। দেবেন্দ্রনাথে উহা দেহেই ফলাইয়াছিল।"

'রজনী' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'রজনী'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে, ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন-রচিত 'লাষ্ট ডেস্ অব পম্পি' নামক উপন্যাসের নিদিয়া নাম্নী ফুলওয়ালীর চরিত্রটিকে অনুসরণ করে তিনি এই উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র রচনা করেছেন। তার সঙ্গে যোগ করেছেন একটা মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব। বঙ্কিম নিজে এই গ্রন্থটিকে উদ্দেশ্যমূলক বললেও শিল্পসৃষ্টির অপরূপত্বে এটি একটি চিরন্তন মর্যাদা অর্জন করেছে। বঙ্কিম এই উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন যে, রূপ দেখতে না পারলেও যেন রূপের তৃষ্ণা মানব মনে স্বাভাবিক, তেমনি রূপের মত স্পর্শও মানব-মানবীর মনে প্রেমবৃত্তির উজ্জীবন ঘটায়। অন্ধের কাছে কোমল সস্নেহ স্পর্শ 'নবনীত সুকুমার পুষ্পগন্ধময়বীণাধ্বনিবৎ'। রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র, লবঙ্গলতা প্রভৃতি আত্মকথার মাধ্যমে এই উপন্যাসটির কাহিনীবিন্যাস ঘটেছে এবং চরিত্রগুলির ক্রমানুসারে অন্ধতা, দার্শনিকসুলভ চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও স্নেহবৃত্তির প্রখরতা একটি গভীর জীবনদর্শনের দিগন্তকে আমাদের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছে। অন্ধ যুবতীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্কিমপ্রতিভার একটি কালজয়ী রূপ এই উপন্যাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। রজনীর প্রেমমধুর হৃদয় মাধুর্য, লবঙ্গলতার প্রেম-জগতের তীব্রগভীর দ্বন্দ্ব, অমরনাথের ত্যাগদীপ্ত পৌরুষ বঙ্কিম প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই উপন্যাসে প্রেমের তীব্রতার সঙ্গে সমাজনীতির সংঘর্ষের একটি শিল্পসুন্দর অতুলনীয় চিত্রকেই আমরা লাভ করি। তেজস্বিনী লবঙ্গলতার সমাজ অনুমোদিত সহজ পথেই অমরনাথকে চেয়েছিল, চোরের কলঙ্কিত রূপে সে অমরনাথকে চায় নি। তার প্রেমের এই বলিষ্ঠতাই আমাদের মুগ্ধ করে।

রজনী

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সমাজ জীবনের একটি সমস্যাই এই উপন্যাসের উপজীব্য। বাংলা সাহিত্যে সার্থক সামাজিক উপন্যাসের ভিত্তিপত্তনও হয় এই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিম স্বপ্নজগৎ ত্যাগ করে সত্যের সংসারে অবতরণ করেছেন, দেশকালের দূরদর্শিতার সুযোগ ছেড়ে তিনি চারপাশের জগতের জটিলতাকে গ্রহণ করেছেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-সুলভ অতিপ্রাকৃতের উপস্থাপনা একেবারেই নেই, অধিকন্তু মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বজটিল রূপ এমন একটা শৈল্পিক সিদ্ধিতে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে যে, তা বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রমণীর রূপ পুরুষ-জীবনে নিয়তিরূপিণী, কিভাবে তা অনতিক্রম্য ট্র্যাজেডির পথে পুরুষকে টেনে নেয় এবং সর্বধ্বংসী শূন্যতার কি প্রচণ্ড

কৃষ্ণকান্তের উইল

হাহাকারে পুরুষজীবন ভরে ওঠে, তা এই উপন্যাসের উপজীব্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রার এক আশ্বাসময় প্রশান্তিকে রূপময় করে তুলেছেন। সর্বরিক্ততার পরেও নায়ক গোবিন্দলাল 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর'কে লাভ করেছেন। নারীব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে ভ্রমর বাংলা সাহিত্যে একটা চিরস্মরণীয় চরিত্র। বাস্তব জীবনের বাসনা-কামনার সত্যতার দিক দিয়ে রোহিণী চরিত্রের তুলনা হয় না। সামাজিক নীতিগত দৃষ্টিকোণ দিয়ে বঙ্কিম রোহিণীকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করালেন বটে, কিন্তু তার প্রাণপ্রাচুর্যটুকু রোহিণী-চরিত্রে সঞ্চার করিয়ে শিল্পী বঙ্কিম অমর হলেন। কাহিনীর নাট্যগুণসমৃদ্ধ বিকাশ, বাইরের শক্তি ও চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর বিশ্লেষণ, দৃশ্যগুলির সাংকেতিক ব্যঞ্জনা, বর্ণনার তীক্ষ্ণ বাস্তবতা—ইত্যাদি দিক থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে এখনও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

'রাধারাণী'তে জীবন সমস্যার কোন চিত্র নেই, যা আছে সে শুধু সাধারণ জগতের সহজ সরল একটা প্রেমের কাহিনী। বঙ্কিম প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই তাতে দেখা যায় না। বাংলা দেশের সামাজিক ভিত্তিতে এর কাহিনী স্থাপিত হলেও বঙ্কিম-স্বভাবসুলভ রোমান্সের রং তাতে লেগেছে।

রাধারাণী

সামাজিক উপন্যাসের আলোচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচেতনাকে আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে একটা সহানুভূতিশীল শিল্পীমন ছিল এবং সেই সঙ্গে সুগভীর জীবনবোধের অধিকারী তিনি ছিলেন তা বোঝা যায়, যখন তিনি মানব-মানবীর প্রেমকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন এবং চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রসপিপাসু হৃদয়গুলোর কাছে অন্তর জগতের শাশ্বত সত্যের বার্তা শোনালেন। পুরুষ ও নারীর এই চিরন্তন প্রেমবৃত্তিকে অবলম্বন করেই তিনি সামাজিক সমস্যারও অবতারণা করেছেন। প্রেমের দুর্দম শক্তিকে তিনি যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন তেমনি বৈধব্য জীবনের অপরিতৃপ্ত প্রেম-পিপাসাকেও বাস্তবরূপ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এখানেই তিনি জীবনের সার্থক রূপকার। কিন্তু তাঁর নীতিবাদী-মন শিল্পী-মনের কাছে মাঝে-মাঝে পরাজয় স্বীকার করেছে। রোহিণীর প্রতি পুরোপুরি সহানুভূতিশীল থেকেও কেবল সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য নির্মমভাবে তার মৃত্যু বিধান করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু তা হলেও বলতে হয় যে তাঁর মনে সমাজবৃত্তির গুণে রক্ষণশীলতা থাকলেও, এবং তার প্রভাব মাঝে মাঝে তাঁর উপন্যাসের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন করলেও, তিনি মূলতঃ শিল্পী। এবং যথার্থ শিল্পী বলে পুরুষ ও নারীর প্রেমকে পরিপূর্ণ জীবনবোধ দিয়ে উপলব্ধি করে তাকেই চিরকালের সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচেতনা

[চার] বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে-একটি যুগ সৃষ্টি করে গেলেন, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য কি তা আলোচনা করে পরবর্তী বাংলা

সাহিত্যে তাঁর প্রভাব কিভাবে কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে তার উপর আলোকপাত কর।

উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্র যুগস্রষ্টা ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক; যুগসৃষ্টির দুর্লভ প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর প্রতিভার বিপুল সৃষ্টিতে তিনি বাংলা উপন্যাসকে যে সমৃদ্ধি দিয়ে গেলেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর আগেও বাংলা সাহিত্য জগতে উপন্যাস রচনার যে স্বল্প প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তা উপন্যাসের সৃষ্টি ও কল্পনাকে খুব বেশী সঞ্জীবিত করতে পারে নি; উপন্যাসের উজ্জ্বল দিগন্ত প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের যুগন্ধর প্রতিভার প্রাণস্পর্শে। বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মানসলোকে উপন্যাস সৃষ্টির যে বাসনা সংগোপনে লুকিয়ে ছিল, তা বঙ্কিম-উপন্যাসের সঞ্জীবনী মন্ত্রে অল্পদিনের মধ্যেই উজ্জীবিত হয়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুগভীর জীবনবোধ ও তাঁর কল্পনার বিশালতা দিয়ে যে উপন্যাসগুলো রচনা করলেন, তা বাঙালী লেখকদের উপন্যাসের স্বরূপ লক্ষণটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বাংলা সাহিত্যে যা ছিল না, তারই একটা সত্যকার রূপ প্রতিষ্ঠিত হল। উপন্যাসের ভাষা সৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। জীবন সমস্যার বিশ্লেষণের সঙ্গে নিজস্ব জীবনদৃষ্টির মায়া রং মিশিয়ে সাহিত্যলোকে যে সৃষ্টি হবে, তার ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত তাও নির্ধারণ করে দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের ভাষার আদর্শটাকে তিনি প্রথম জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা রসমধুর স্বচ্ছ প্রবাহ বইয়ে দিলেন যা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব। বর্ণনার সাবলীলতা ও মিতভাষণের সংকেতধর্মিতায় তাঁর সৃষ্টি হল অপূর্ব। নতুন ভাষারূপের সৌধ নির্মিত হল, বাংলা সাহিত্যলোকে প্রতিটি কক্ষেই যার বিস্ময় ও সৃষ্টিমাধুর্যের অপরূপত্ব। বাংলাদেশে রেনেসাঁসের যুগে নতুন মানবরসের সঙ্গে জেগে উঠল গভীরতম জীবন জিজ্ঞাসা, এই জীবন জিজ্ঞাসারই সৃষ্টিরূপ দেখা দিল উপন্যাসে। এটাই সেদিনকার অন্যতম যুগ বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম ও সার্থক যুগস্রষ্টা, আর এই যুগ সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর প্রভাব সঞ্চার করল বহু হৃদয়ে একটা সৃষ্টিকারী রসপ্রেরণা।

যুগস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই যুগের বৈশিষ্ট্য

বঙ্কিমচন্দ্র এই সৃষ্টি প্রেরণা ও জীবন জিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু ঔপন্যাসিক উপন্যাস-রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। সকলের সৃষ্টিই যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠল তা নয়, কিন্তু সেই যুগের সৃষ্টিকর্মের ঐতিহ্যে তাঁদেরও একটা মর্যাদার আসন আছে। উনিশ শতকের ঔপন্যাকিসদের মধ্যে বঙ্কিমের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। আরও অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল না বলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের মনে আজ তাঁদের স্মৃতিটুকু মুছে গিয়েছে।

বঙ্কিম-প্রভাবিত ঔপন্যাসিকগণ

বঙ্কিম উপন্যাসের প্রধানতঃ দুটো ধারা। একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রোমান্স

সৃষ্টির ধারা, অন্যটা সামাজিক উপন্যাসের ধারা। এই দুটা ধারাকেই অনুসরণ করে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেউ কেউ বা দুটা ধারাকেই সৃষ্টি-কুশলতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। তবে এটা স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স রসসৃষ্টিকে একেবারে বাদ দিয়ে বড় একটা কেউই উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসেও যে রোমান্টিক কল্পনার প্রশ্রয় আছে, তা সেই যুগের শক্তিধর ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পূর্ণ পরিহার করে চলেছিলেন। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। গার্হস্থ্য জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে একটা অশ্রুসজল করুণ কাহিনীই তাঁর উপজীব্য, করুণার বর্ণবিলাস একেবারে নেই। কিন্তু করুণার একটু গভীরতর স্পর্শ না থাকলে জীবন জিজ্ঞাসার গভীরতার দিক কোনো মতে আসতে পারে নি। তাই তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য় গভীর কোনো জীবন জিজ্ঞাসার প্রকাশ নেই। সেইজন্য পরবর্তী যুগে এই উপন্যাসের কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাবও স্বীকৃত হয় না। তবে রমেশচন্দ্রের মধ্যে এই একই প্রকার রোমান্স ব্যঞ্জনাহীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্রয় দেখা যায়। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের দুটি ধারাকেই অনুবর্তন করেছেন এবং রোমান্স-রসাশ্রিত প্রণয় কাহিনী সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকা তাঁর অনেক উপন্যাসেরই অঙ্গসৌষ্ঠব দিয়েছে। সামাজিক উপন্যাস রচনার পথে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক পদক্ষেপ করেছেন তাঁরা বঙ্কিমের অনুসরণেই সমাজসংস্কারমূলক ভাবধারাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের সৃষ্টিতে সমাজজিজ্ঞাসা জীবনদৃষ্টির গভীরতা নিয়ে একটা অপরূপ শিল্পকর্মে পরিণতি লাভ করেছে, তা তাঁর অনুবর্তী ঔপন্যাসিকদের কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না।

বঙ্কিম উপন্যাসের দুই ধারা ও তার প্রভাব

বঙ্কিমের এই দুটো ধারাকেই অতিক্রম করে উপন্যাস রচনা করতে চেয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। তাঁর **বঙ্গাধিপ পরাজয়** দুটো খণ্ডে বিভক্ত এবং বিপুলকায় ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপাদিত্যের জীবনকাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। লেখক ছিলেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক; বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনাকে উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে একেবারেই গ্রহণ করেন নি। কেবল তথ্যমূলক বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে গিয়ে কাহিনী-কার উপন্যাসের শিল্পরূপকে একেবারে মাটি করে দিয়েছেন। কাজেই যে প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল বঙ্কিম-প্রভাবকে অতিক্রম করে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্যে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

বঙ্কিম প্রভাবকে অতিক্রম করবার ব্যর্থ চেষ্টা

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের গঠন কৌশলে ও চরিত্র চিত্রণের বিশ্লেষণ-ভঙ্গীতে যে-শিল্পমাধুর্য সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিকেরা সেই রীতিকেই অনুসরণ করে চললেন। তাঁরই অনুসরণে কাহিনী চয়নের ক্ষেত্রে সমাজ সমস্যার সঙ্গে জীবন-জিজ্ঞাসাকে মিশিয়ে কাহিনীর মধ্যে যেমন জটিলতা সৃষ্টির রীতিকে গ্রহণ করলেন, তেমনি

বঙ্কিম-উপন্যাসের গঠন রীতির অনুসৃতি

সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে উপন্যাসের বিশিষ্ট গুণ বলে স্বীকার করে নিলেন। এটা শুধু উনিশ শতকের নয় বিংশ শতকেও ঠিক তাই হয়েছে। উপন্যাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অপরাজেয়।

ব্যঙ্গরসাশ্রিত উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল উনিশ শতকেই এবং তা হয়েছিল বঙ্কিম-প্রতিভার স্পর্শ না পেয়েই। যোগেন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে এর ধারাটার সূচনা করলেন তাতে তাঁদের নিজস্ব প্রতিভাই কাজ করে গেছে। ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' নামে ব্যঙ্গ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার আগেই বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

উনিশ শতকে ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস বঙ্কিম-প্রভাবিত নয়

[পাঁচ] আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের স্থান নির্ণয় কর।

উত্তর। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাস যাঁদের মনীষায় উজ্জ্বল হয়েছে রমেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। সভ্যতার বিভিন্ন শাখায়ই তাঁর নিরলস পরিশ্রমনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণাই তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্কিমের মত রমেশচন্দ্রও ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের অনুরাগী। এই সুগভীর ইতিহাস প্রীতির জন্যই রমেশচন্দ্র বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাটিকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর পরই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস রচনার প্রেরণা

রমেশচন্দ্র সর্বসমেত চারখানা ঐতিহাসিক এবং দুটো সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' (১৮ ৪) ও 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'জীবনপ্রভাত' (১৮০৮) ও 'জীবনসন্ধ্যা'র উপজীব্য হল যথাক্রমে, আকবর, শাহ্‌জাহান, আওরঙ্গজেব ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ঘটনা। মুঘল সাম্রাজ্যের শতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনাবলী এই চারটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলে সেগুলি একত্রে 'শতবর্ষ' নামে সংকলিত হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। এই চারটি উপন্যাসে পরিণতির দুটো স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকের রচনা 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ'-এ ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কল্পনার প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা বেশী, এখানে বর্ণনীয় বিষয় ও প্রধান চরিত্রগুলো মূলতঃ তাদের ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে মাত্র। আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের শাসনকর্তা টোডরমল্লের বিরুদ্ধে জমিদার অমরসিংহের বিদ্রোহই 'বঙ্গবিজেতা'র ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক অংশে অবশ্যই লেখকদের ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় আছে, কিন্তু মানব জীবন ও মানবহৃদয়ের গূঢ় অন্তর্লীন সম্বন্ধে ইতিহাস এখানে সজীব হয়ে উঠতে পারে নি, সেই প্রাণময় সম্বন্ধের অভাবে নীরস, শুষ্ক তথ্য সমাবেশে পর্যবসিত হয়েছে। রাজা টোডরমল্লের মত ঐতিহাসিক চরিত্র যেমন, তেমনি

রমেশচন্দ্রের রচনাবলী

ইন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, বিমলা প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রগুলোও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রাণময়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। আকবর টোডরমল্লের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে নায়ক ইন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধ ক্ষীণ, অস্পষ্ট। 'মাধবীকঙ্কণ'-এ ঐতিহাসিক তথ্যবিলাস অপেক্ষাকৃত পরিণত। তার কাহিনীর পটভূমি সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল। এই উপন্যাসটিতে আমরা দেখি, জমিদারপুত্র নরেন্দ্রনাথ কর্মচারীর চক্রান্তের ফলে জমিদারি হারিয়ে কর্মচারী-কন্যা হেমলতার সঙ্গে প্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে গৃহত্যাগী হয়, অবশেষে সে রাজমহলে সুজার দরবারে উপস্থিত হয় এবং সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষভাগে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে তুমুল-কলহ বাধে, তার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। 'মাধবীকঙ্কণ' মূলতঃ পারিবারিক উপন্যাস হলেও তার ঐতিহাসিক পরিবেশ বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ'

'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কল্পনা এখানে ইতিহাসকে আচ্ছন্ন বা অতিক্রম না করে তার শূন্য স্থানগুলোকে পূর্ণ করে তাকে সঞ্জীবিত করেছে। ঔরংজেবের রাজত্বকালে শিবাজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবনের জাগরণ এবং জাহাঙ্গীরের সময় অস্তোন্মুখ রাজপুত জাতির শেষ গৌরবময় দিনগুলোর বিষাদময় বিবরণ এই দুটো উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' বিশেষ করে 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় আমরা রমেশচন্দ্রের দেশাত্মবোধের আবেগকে অনুভব করি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "মহারাষ্ট্রের উত্থান ও রাজপুতের পতন ভারতেতিহাসে দুইটি কীর্তিভাস্বর পৃষ্ঠা; এই দুইটি পৃষ্ঠাতে যত অনুপম বীরত্ব, যত উচ্চ ও পবিত্র হৃদয়াবেগ, যত গৌরবময় অনুভূতি লইয়া ইতিহাসের তুষারশীতল পাষাণফলকে নিশ্চল হইয়া ছিল, রমেশচন্দ্র সেগুলিকে কল্পনার শিখায় দ্রবীভূত করিয়া মানবমনের সজীব ভাব-প্রবাহের সহিত তাহাদের পুনর্মিলন সাধন করিয়া দিয়াছেন। শিবাজীর কর্মব্রত ও মহত্ত্বদীপ্ত চরিত্র, তাঁহার রাজনৈতিক কুশলতা, লোমহর্ষক সংগ্রাম, নবজাগত মহারাষ্ট্রীয় জাতির বিপুল উদ্দীপনা—এ সমস্তই মহারাষ্ট্রীয় জীবনপ্রভাতে এক একটি বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।" 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য়ও রাঠোর চন্দাবতের মধ্যে চিরকালীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই দ্বন্দ্ব স্থগিত রেখে বীরত্ব ধর্ম পালন, বীরদের গৌরবময় জীবনাচরণ, প্রতাপসিংহের দেশরক্ষায় অটল সংকল্প, তাঁর সামন্তগণের অবিচলিত দেশভক্তি, পার্বত্য ভীল জাতির আচার ও জীবন-চেতনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এখানেও ইতিহাসের পটে কোনও গভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম, জটিল দিক পাই না, বহির্জগতের নিগূঢ় সমন্বয়ের দিক থেকে আলোচ্য রচনা দুটোর কল্পনাদৈন্য আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত'
'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা'

'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস, বিধবা

বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনের উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সচেতনতা উপন্যাস দুটোর শিল্পশ্রীকে একেবারে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। দুটো উপন্যাসই বর্ণনাপ্রধান, দুটোতে, বিশেষতঃ 'সংসার-'-এর পল্লী অঞ্চলের পারিবারিক ও প্রাত্যহিক জীবনের সুখ- দুঃখের হাসিকান্নার সহানুভূতি-সিঞ্চিত, প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও সরস চিত্র লেখক পরিবেশন করেছেন। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলোর গভীরতা ও জটিলতা না থাকলেও সহজ বাস্তবতায় স্বাভাবিকত্বে তারা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। লেখকের সমাজ সংস্কারের উৎসাহ 'সমাজ'-এর শিল্পমূল্যকে কিছুটা পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে।

রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস

আমরা এইবার সামগ্রিকভাবে রমেশচন্দ্র দত্তের শিল্পকর্মের মূল্য নিরূপণ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থানটি নির্দেশ করতে পারি। সামাজিক ও ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের গভীর ও জটিল সম্পর্কের চিত্রণ—ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই বিশেষ গুণটা তাঁর রচনায় না থাকলেও বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের রস পরিবেষণে তাঁর কৃতিত্ব আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য, যুগের পটভূমির বিস্তৃত চিত্রণে সমুন্নত ভাবাদর্শের বিকাশে এবং বীররসের স্ফুরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস আমাদের সম্মুখে এক বিচিত্র সৌন্দর্যের জগৎ উদ্ঘাটিত করে: "অন্য সাহিত্যের পক্ষে যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে এক বিচিত্র রসের আস্বাদ দেয়; এবং রমেশচন্দ্র এই রস আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন, এক শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন।" রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সমালোচকের ভাষায় বলিতে পারা যায়: "ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার 'জীবনপ্রভাত' ও জীবনসন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।...সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্পরূপ

[ছয়] আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দানের মূল্য নির্ণয় কর।

অথবা

বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার ধারায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা

ছোটগল্প রচয়িতা রূপে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩—১৯৩২) একটা বিশেষ স্থান আছে। এই শিল্পী অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করলেও মূলতঃ ছোটগল্প রচয়িতারূপেই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, অন্তর্লোকচারী গভীর আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত, জীবনের বিপুল বিস্তার প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের এই সমস্ত লক্ষণ তাঁর উপন্যাসে আমরা পাই না, জীবনের দুরবগাহ ও জটিল দিকগুলোর মর্মোদ্‌ঘাটনে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নি। সে ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনের যে ক্ষুদ্র নদীটা আমাদের কুটির প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে প্রবাহিত, তার শান্ত, স্তিমিত ধারা, সুখ দুঃখের দুই-একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ লঘু চপল ফেনোচ্ছ্বাস-এর চিত্রণে প্রভাতকুমার বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। নিজস্ব সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল পরিচয় রেখে গেছেন। "লঘু, হাস্যতরল ভাবকল্পনা, জীবনের সরল, স্বচ্ছন্দ বিকাশ, শেষ পর্যন্ত অনুকূল দৈবের দাক্ষিণ্যে সমস্ত স্বল্পস্থায়ী দুর্ভাগ্যের মধুর পরিণতি, ঘটনার আবর্তহীন একটানা প্রবাহ—এগুলিই তাঁহার উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ। তাঁহার চরিত্রসমূহ বাঙলার সাধারণ নরনারী। ইহারা ঘটনা-স্রোতের সহিত ভাসিয়া চলে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা বা মনস্তত্ত্বের দুর্বোধ্যতা নাই" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

প্রভাতকুমারের রচনার বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৭) ও 'সিন্দুর-কৌটা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' ১৩০৯ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৩১৪ সালে। ঘটনাবৈচিত্র্য ও ভ্রমণরসকে প্রাধান্য দেবার ফলে উপন্যাসটির নায়িকা রমাসুন্দরীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্বাপর সঙ্গতিতে চিত্রিত হতে পারেনি। 'জীবনের মূল্য' (১৩২৩) উপন্যাসে প্রভাতকুমার ট্র্যাজেডি রচনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগ গভীরতার অভাবে সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। 'মনের মানুষে' প্রধান চরিত্র কুঞ্জের শিশুসুলভ সরসচিত্ততা, কুসংস্কার ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস, ইন্দুবালার প্রতি তার প্রেমের কৌতুকাবহ অসঙ্গতি এবং অবশেষে আদর্শবাদের উচ্চ চূড়া থেকে সাংসারিকতার নিম্নভূমিতে তাদের মিলন অত্যন্ত উপভোগ্য। 'নবীন সন্ন্যাসী'তে নায়ক মোহিত ধর্মপরায়ণ, উচ্চশিক্ষিত; সংসারে বিতৃষ্ণায় এক ভদ্রলোকের গৃহে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে অবশেষে পীড়িত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। লেখক নায়কের কৃচ্ছ্রতাসাধনকে নিয়ে স্নিগ্ধ বিদ্রূপ মিশ্রিত কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন। এই উপন্যাসের কূটচক্রী গদাই পাত্র একটা অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। 'রত্নদীপ'ই প্রভাতকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এখানে কাহিনী আকস্মিক দৈবসংঘটনের ওপর নির্ভরশীল হলেও দ্বন্দ্বময় বেদনায় ও আবেগ গভীরতায় চরিত্র চিত্রণ সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই। নায়ক রাখালের চরিত্র-সংযম ও আত্মোৎসর্জনোন্মুখ গূঢ় প্রণয়াবেগ, বৌরানীর তীব্র বেদনা ও রাখালের সত্যিকারের পরিচয় লাভের পর

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

আত্মধিক্কারের যন্ত্রণায় পরিস্ফুট চারিত্রিক শুচিতা পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। কূটচক্রী, জুয়াচোর খগেন, অভিনেত্রী কনক প্রভৃতির চরিত্রও উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত। শ্রীকুমারবাবু 'রত্নদীপ' সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন: "অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা, আবেগের অন্তর্ভেদী শক্তি ও জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশমান রহস্যময়তা এই উপন্যাসে স্মরণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।" 'সিন্দুরকৌটা' সাধারণ স্তরের উপন্যাস। এখানে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যুবতী সুশীর আগের বিয়ে যেভাবে অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, বিনয়ের প্রথমা পত্নী স্বামীর সঙ্গে সুশীর বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে, বিনয় ও সুশীর মিলনের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়েছে, তাতে নিছক গল্পরস ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ ছোটগল্প রচনাতেই প্রভাতকুমার সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে আমাদের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ বাঙালী জীবন ছোটগল্পের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পবীথি' (১৯১৩), 'হতাশ প্রেমিক' (১৯১৩), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'যুবকের প্রেম' (১৯২৮), 'নূতন বউ' (১৯২৯) এবং 'জামাতা বাবাজী'। প্রভাতকুমারের গল্পগুলোর মধ্যে উচ্চাঙ্গের কল্পনা, অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা বা আবেগের গভীর ঘাত-প্রতিঘাত পাই না, বাঙালীর জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখের, অসঙ্গতির, পারিবারিক বিরোধের স্নিগ্ধ, সহানুভূতিরস রূপায়ণে বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্রণে ও লঘু কৌতুকরসে এরা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমারের কয়েকটি ছোটগল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলেই তাঁর সহজ সরল জীবন রসরসিকতার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। 'বলবান জামাতা' গল্পে নামের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসমঞ্জস পালোয়ানী চেহারা নিয়ে দীর্ঘকাল পরে জামাই শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত হলে তাকে চিনতে না পারার দরুন যে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে, নির্মল কৌতুকরসেই তার মনোরম উপসংহার ঘটেছে। 'ভুল শিক্ষার বিপদ' গল্পে ট্রেনের সহযাত্রী যুবকের প্রতি এক বৃদ্ধের অশিষ্ট, উৎকেন্দ্রিক আচরণের মাধ্যমে তার জীবনের এক করুণ অভিজ্ঞতা মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। রসময়ীর 'রসিকতা'য় নিজের মৃত্যুর পর স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে রসময়ীর চক্রান্ত এক বিচিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। আমাদের কুসংস্কারের মৃদু কৌতুকমণ্ডিত ব্যঙ্গে, পরিকল্পনার অভিনবত্বে, প্রথমদিকে অলৌকিকতার রহস্যসৃজনে এই কৌতুকরসোজ্জ্বল গল্পটি সত্যই অভিনব। 'কাশীবাসিনী'-তে এক পতিতা নারীর করুণ অপত্যস্নেহের কাহিনী গল্পটির মধ্যে এক গভীরতার সুর সঞ্চার করেছে। প্রভাতকুমারের গল্পে ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগের বাঙালীর জীবনধারা বাস্তবরসোজ্জ্বলতায় ফুটে উঠেছে।

ছোটগল্পে প্রভাতকুমার

'বাবু পরিবর্তনে' দু একটি তুলির আঁচড়েই হরিধনের পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ ও নীচ চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। হরিধনের দ্বারা প্রতারিত তার ভাবী শ্বশুর যখন ঔদার্যবশত তাকে গাড়িভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা দেন তখন আমাদের মনে হয়, লেখক তাঁর ক্ষমাস্নিগ্ধ প্রসন্ন জীবনদৃষ্টিতে এই চরিত্রটিকেও ক্ষমা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পে দেখিয়েছেন, গ্রামের পোস্টমাস্টার বর্ষার নির্জন সন্ধ্যায় এক অনাথা বালিকার সঙ্গে নিজের প্রীতিমধুর সম্পর্ক রচনা করেছিল। আর প্রভাতকুমারের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের নায়ক পোস্টমাস্টার অপরের প্রেমপত্র চুরি করে নিজের বিকৃত রোমান্স বাসনা তৃপ্ত করে। চুরি করা পত্রের সংকেত অনুসারে তার প্রেমভিক্ষার হাস্যকর ও কিছুটা পরিমাণে শোকাবহ পরিণতিতে শেষ হয়েছে। গল্পের শেষ অংশে সে অপরের চিঠি ও সরকারি টাকা চুরি করেও স্বদেশী ডাকাতির অজুহাত দিয়ে ইন্‌স্পেক্টর-এর পদ লাভ করেছে, এই চরিত্রটিও লেখকের ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়নি। 'খোকার কাণ্ড' গল্পে গোড়া ব্রাহ্ম হরসুন্দরবাবুর স্ত্রী হিন্দু, প্রাচীন সংস্কার বিশ্বাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, স্বামীর আরোগ্য কামনায় শিবপূজা করতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে, খোকার পিতৃসম্বোধন তার আত্মগোপন চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। 'খুড়া মহাশয়'-এ খুড়ার ভূতের ভয়ের সুযোগ নিয়ে একটা ঘোরতর সাংসারিক অবিচারের প্রতিকার প্রদর্শিত হয়েছে। 'আদরিণী'তে মোক্তার জয়রামের বলিষ্ঠ অথচ স্নেহপরায়ণ চরিত্র এবং একটি হাতির প্রতি তাঁর স্নেহ আমাদের মুগ্ধ করে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনার শিল্পকুশলতা সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: "জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তাঁর ছোটখাটো বৈষম্য অসংগতির উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে, আলোচনার লঘু-কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি কৌশলে—এই সমস্ত দিক দিয়েই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন।···ছোটগল্পের আর্ট ও রচনা কৌশল, ইহার পরিমাণবোধ ও সমাপ্তি বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ।" সমালোচকেরা ছোটগল্প-রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রভাতকুমারের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন।

[সাত] বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাঙালীর সাধারণ প্রাত্যহিক জীবন প্রতিফলিত হয় নি, এইক্ষেত্রে **তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (১৮৪৩-১৮৯১) উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। বঙ্কিমযুগে আবির্ভূত হয়েও তিনি রোমান্সের চর্চায় আগ্রহী না হয়ে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

ছোট-বড় সুখ-দুঃখের জালবোনা পরিচিত দিন রজনীর সংসারে অতি সাধারণ নরনারীকে অহরহ যে কঠিন নিষ্ঠুর রূঢ়তার সম্মুখীন হতে হয় তারই একটা ছোট কাহিনী নিয়ে তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) রচনা করেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না, "শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত"—শুধু এই উল্লেখটুকু ছিল। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন : "এই উপন্যাসে ত্রিবিধ আকর্ষণ সূত্র অনেকটা শিথিল গ্রন্থনে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। প্রথম পারিবারিক জীবনে ভ্রাতৃ-বিরোধ ও দাম্পত্য সম্পর্কের বিপরীতমুখী প্রকাশ ; দ্বিতীয়, পথিক জীবনের বিচিত্র আকস্মিকতা ও উদ্ভট অভিজ্ঞতা ; তৃতীয়, অনুকূল দৈব-সংঘটনের সহায়তায় পাপের শাস্তি ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং উপন্যাসখানি একদিকে বস্তুধর্মী, অপরদিকে নীতিতে আস্থাশীল ও রোমান্স-কৌতূহলী।" তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি তাঁর বিরূপতাকে গোপন রাখতে পারেননি, কিন্তু নিজের রচনায় রোমান্সসুলভ আকস্মিক যোগাযোগ ও 'দৈবানুগ্রহভিত্তিক অপ্রত্যাশিত সংঘটন'-কে স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। গোপাল ও স্বর্ণলতার আকস্মিক পরিচয় ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, শশাঙ্কর স্বর্ণলতাকে জোর করে বিয়ে দেবার চেষ্টা এবং তার ঘরে হঠাৎ আগুন লাগায় তার উদ্ধার, শশিভূষণের অবস্থা বিপর্যয়—এ সমস্তই রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। স্বর্ণলতার নামে উপন্যাসের নামকরণ করা হলেও কাহিনীতে তার কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই, তার চরিত্রও অপরিস্ফুট। উপন্যাসে সরলারই প্রাধান্য, তাই তার নাট্যরূপ 'সরলা' নয়, সে নায়িকারূপেই উপস্থাপিত।

এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও 'স্বর্ণলতা'র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। "প্রণয়মূলক রোমান্টিক আবেষ্টনের বাহিরে সাংসারিক সুখ-দুঃখময় প্রত্যহিক জীবনযাত্রা-পরায়ণ নরনারীকে অহরহ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেরূপ একটি সমস্যা অবলম্বন করিয়া লেখা সর্বপ্রথম বাঙ্গালী গার্হস্থ্য উপন্যাস হইতেছে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের মতো স্বর্ণলতাও যথাসম্ভব বঙ্কিম-প্রভাববর্জিত, তার দুইটি উপন্যাসের মধ্যে সাদৃশ্য এই পর্যন্তই" (সুকুমার সেন)। এই উপন্যাসে স্বার্থের সংঘাতে নির্মমতাও চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালী পাঠক কাব্যের সৌন্দর্যজগতের বিচিত্র ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিল, আর স্বর্ণলতায় পেল অশ্রুলবণাক্ত স্নেহমমতায় অভিষিক্ত প্রাত্যহিক বাঙালী জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্বাদ। 'স্বর্ণলতা'র চরিত্রগুলি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত। এর ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল। 'স্বর্ণলতা'র ভাষাভঙ্গি সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন : "বঙ্কিমের ভাষাসৌভাগ্য তারকনাথের ছিল না। তবে বঙ্কিমের রচনার মতো সরসতা এবং কাব্যশ্রী না থাকিলেও স্বর্ণলতার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ উপযোগী। ভাষার আভরণহীনতা বিষয়বস্তুর পক্ষে নিরতিশয় শোভন হইয়াছে। এই সকল কারণেই উপন্যাসটি তৎকালে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

শশিভূষণের বৈষয়িকতা ও স্ত্রৈণতা স্বাভাবিকভাবে ফুটেছে। বিধুভূষণ সরল, বিষয়-বুদ্ধিহীন, ক্রোধপরায়ণ ও হুজুগমত্ত চরিত্রটিও বাস্তব। শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার কুটিল ও নীচ এবং বিধুভূষণের স্ত্রী সরলার সরল ও সহিষ্ণু প্রকৃতির আলেখ্য বাস্তব ও জীবন্ত। দাসী শ্যামার আনুগত্য ও স্নেহের চিত্রও বাস্তব। গদাধরচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতা, স্থূলতা ও অসততার মিশ্রণ যেমন, তেমনি নীলকমলের উৎকেন্দ্রিকতাও স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

। অবশ্য গদাধর উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নীলকমলের সঙ্গে কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই।

অবশ্য চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্রমবিকাশ, গভীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, জগৎ ও জীবন মূল্যবোধ স্বর্ণলতায় নেই, তাতে আকস্মিকতার বাহুল্য ও বহির্ঘটনার প্রাধান্য চরিত্রগুলোকে আচ্ছন্ন করেছে, কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে মূল পটভূমির কোনও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের মর্যাদা 'স্বর্ণলতা'র প্রাপ্য নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ে এবং বাঙালীর সহজ আবেগ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাসধারার সূত্রপাত হল, স্বর্ণলতার লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই তার পথিকৃৎ, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হইবে।

[এক] রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখপূর্বক উহার বিবর্তনের ইতিহাস দাও।

উত্তর। কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তির বিস্তারে ও বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ তুলনাহীন। এমন কোনও শাখা নেই যা তাঁর প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ হয় নি। আমরা যদি শুধু তাঁর কাব্য সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাসটিই স্মরণ করি, তা হলেও তাঁর সৃষ্টিপ্রাচুর্যে, নতুন নতুন পরীক্ষায় নিজেকে অতিক্রম করবার ক্লান্তিহীন প্রয়াসে, চৈতন্যের নব নব বিচিত্র দিগন্তের প্রকাশে বিস্মিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারি না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা তার নিজস্ব বিপুল প্রাণশক্তিতে বিভিন্ন ভাবগত স্তর ও ভাবপরিবর্তনানুযায়ী ছন্দোরীতি ও বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর পথ বেয়ে পরিণতির ঐশ্বর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভূমিকা

এই পরিণতির বিভিন্ন স্তরগুলোর ভিত্তিতে আমরা রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্বে পাই 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২)। তাকে কোনও কোনও সমালোচক 'উন্মেষ পর্ব'রূপে চিহ্নিত করেছেন, কেউ কেউ 'হৃদয়-অরণ্য' নাম দিয়েছেন। এই যুগে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কবি নিজের নিভৃতচারী হৃদয়ের রোমান্টিক বিষাদ, অনির্দেশ্য ভাবব্যাকুলতা, একাকিত্বের অরণ্যে ঘুরে মরেছেন, আত্মকেন্দ্রিক দুঃখবেদনাতেই নিমজ্জিত হতে চেয়েছেন :

রবীন্দ্র কাব্যের প্রথম পর্যায় : উন্মেষ পর্ব

> আর কিছু নয়।
> নিরালায় এ হৃদয়
> শুধু এক সহচর চায়।
> তুই দুঃখে তুই কাছে আয়।

তবু এই বিষাদমন্থর, হৃদয়-অরণ্যে ব্যাকুল পথান্বেষণের মধ্যেই তাঁর শিল্পব্যক্তিত্বের কৈশোর-কল্পনা যে ক্রমশ অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা থেকে আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা আমরা লক্ষ্য করি। 'সন্ধ্যাসংগীতে'-এর গোধূলি ছায়াচ্ছন্ন বিষাদের জগৎ থেকে কবি 'প্রভাত সংগীত'-এর আলোকজ্জ্বল জগতে এসে নিজের হৃদয় বিস্তারের আনন্দে গেয়ে উঠলেন :

সন্ধ্যাসংগীত

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
> ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
> আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি

'প্রভাত সংগীত'-এর পর্যায়ে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভিজ্ঞতার সংঘাতে যেভাবে কবি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর হৃদয়-অরণ্য থেকে মুক্ত প্রাণের উল্লাসময় জগতে উত্তীর্ণ হলেন, 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন ; তিনি তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদর স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতেন, সেখানেই—"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তর হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্র তরঙ্গিত আমাদের হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোকে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বাহিয়া চলিল।" 'প্রভাত সংগীত'-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি ত কবির কাব্যজীবনের নতুন জাগরণেরই রূপক।

'প্রভাত সংগীত

'ছবি ও গান'-এর কবিতাগুলির বিভিন্ন খণ্ডচিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বাতায়নবাসী কবিমনের নিজের পূজার বর্ণসম্ভার নিয়ে দূর থেকে জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য দেখতে ও তাদের এক-একটা তুলির আঁচড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে। "এমনি…করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত।" 'কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন : "এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে—

'ছবি ও গান', কড়ি ও কোমল

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা 'নৈবেদ্য'-এ আর একভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

'কড়ি ও কোমল'-এ ইন্দ্রিয়চেতনায় বর্ণাঢ্য প্রেম, প্রকৃতিচেতনা এবং বাইরের জগতের রূপৈশ্বর্যের প্রতি কবিহৃদয়ের প্রবল অনুরাগ অনেকটা পরিমাণেই রসনিটোল সংহত রূপ লাভ করেছে ; নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলোতে 'কড়ি কোমল'-এর সৌন্দর্যচেতনা যেভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করতে পারি :

ফেলো গো বসন ফেলো—ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর-বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,

জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা
বিচিত্র বিশ্বের মতো দাঁড়াও একেলা।

(বিবসনা : 'কড়ি ও কোমল')

এই পর্ব সম্বন্ধে সমালোচকের ভাষায় বলতে পারা যায়,—"'সন্ধ্যাসংগীত'-এ 'গোধুলি-বিষাদ' 'প্রভাত সংগীত'-এ নবজাগণের আনন্দ-কাকলী, 'ছবি ও গান'-এ গভীর অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক রঙ ও সুরের খেলা এবং 'কড়ি ও কোমল'-এ প্রধানতঃ রূপবিহ্বলতার মধ্য দিয়া সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবি-মানসের অগ্রগতির স্তরগুলিকে সূচিত করে।"

রবীন্দ্র কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্বের 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের 'নিঃসন্দিগ্ধ স্বরূপ বিকাশ', 'পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পদক্ষেপ' লক্ষণীয়। 'মানসী'র কোনও কোনও কবিতাতে দেখি, কবিচেতনা দ্বিধা ও সংশয়ে এখনও কুণ্ঠিত, প্রকৃতি ও প্রেমে তাঁর অন্বিষ্ট পূর্ণতার আদর্শকে খুঁজে না পেয়ে কবিচিত্ত বিষাদ ব্যাকুল :

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে—
হৃদয় বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।
শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা।
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করি, কবিহৃদয় জীবন ও জগতের পূর্ণতার আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে : 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটিতে কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের প্রেমানুভূতিতে নিখিল বিশ্বচেতনা এসে মিলিত হয়েছে।

'মানসী'র কবিতাগুলির শব্দযোজনায়, ছন্দোবিন্যাসে পরিণতির চিহ্ন স্পষ্ট ; তার ছন্দশিল্পকলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নতুন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিল।"

অতঃপর পদ্মার উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির সাহচর্যে, পদ্মালালিত মানবজীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে কবিমানস সমৃদ্ধ হল, এক বৃহত্তর জীবনবোধে তিনি স্থিত হলেন। একটা পত্রে তিনি তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন "আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যকাল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।" জীবনের

পূর্ণতার উপলব্ধিতে উদ্দীপিত কবিহৃদয় মানবজীবনের সকল খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে বৃহত্তর অখণ্ড প্রাণলীলা অনুভব করল, 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কবিতাগুলোতে সেই জীবনোপলব্ধির ঐশ্বর্যই সঞ্চিত হয়েছে। জীবন ও প্রকৃতির গভীর সম্বন্ধ চেতনার ঐশ্বর্যে এদের কবিতাগুলো সমৃদ্ধ। সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতা কবির মৃত্তিকামমতা, ছন্দ ও চিত্রকরের সম্পদে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'চিত্রা'র প্রথম কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার বৈশিষ্ট্য চিত্র ও সঙ্গীতের অপরূপ ঐশ্বর্যে অভিব্যক্ত : যে সৌন্দর্য জগতের বহু বিচিত্ররূপে বিলসিত—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।

এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীই আবার :

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

বাহির-অন্তরের এই নিগূঢ় সমন্বয়ে অন্তরের সৌন্দর্যধ্যান ও বাইরের সৌন্দর্যদৃষ্টি সম্মিলিত হয়েই 'চিত্রা'র কবিতাগুলোতে গীতিকবিতার অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা বিরাট সত্তার অনুভূতি থেকেই জীবনদেবতার পরিকল্পনার উদ্ভব, চিত্রার 'অন্তর্যামী' কবিতাটিতে আমরা তাই লক্ষ্য করি। 'চিত্রা'র 'বিজয়িনী' কবিতাটিতে দেহগত রূপ বর্ণনার মধ্যে দেহাতীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের যে ব্যঞ্জনা ফুটেছে তার কোন তুলনা মিলবে না। এই পর্বের শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাব্য 'চৈতালি'তেই কবির একটা যুগের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস শেষ হয়। এই কাব্যটির নামকরণও খুব তাৎপর্যপূর্ণ, 'চৈতালি', অর্থাৎ চৈত্রমাসে সংগৃহীত বছরের শেষ ফসল। এর সনেট জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে যৌবন ও সৌন্দর্যের বসন্তচঞ্চল জীবন থেকে বিদায় গ্রহণের প্রস্তুতির বিষাদ, আর একদিকে কবিমানসে অধ্যাত্ম চেতনার আসন্ন আবির্ভাবের আভাস অভিব্যক্তি।

জীবনদেবতার অনুভূতি

রোমান্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনাকুতি, জীবনদেবতার লীলাচেতনা, প্রেমভাবনার 'উন্নয়ন'-এ 'স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল' 'সোনার তরী-চিত্রা' পর্বের কবিতাগুলি আর 'নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মভাবপূর্ণ কবিতার মধ্যে অন্তর্বর্তী পর্বের রচনা হিসাবে 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী (১৯০০), 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' (১৯০০) প্রভৃতি কাব্যগুলিকে গ্রহণ করতে পারি। 'কথা ও কাহিনী'তে কবির দেশের ইতিহাসের মানস পরিক্রমা, প্রাচীন ঐতিহ্য-কীর্তির উদাত্ত প্রশস্তি কাহিনীর

দ্রুতচারিতায় এক বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি লাভ করেছে। 'কল্পনা'র কোনও কোনও কবিতায় কালিদাসের অপূর্ব চিত্রসৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে —

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রনাথের একটা বিচিত্র অভিনব সৃষ্টি। কথ্যভাষার প্রয়োগে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষাভঙ্গি স্বচ্ছতোয়া নদীর মতই গতি পেয়ে সজীব হয়ে উঠেছে।

অতঃপর চতুর্থ পর্বে কবি আধ্যাত্মিক ভাবনার জগতে এক বিচিত্র মুক্তির স্বাদ পেলেন। তাঁর জীবনদেবতা কল্পনার মধ্যে যে অন্তরের আভাষ ছিল, তাই এবার প্রত্যক্ষ প্রেরণারূপে এই পর্বের কাব্য 'খেয়া' (১৯০৬), 'নৈবেদ্য' (১৯০৯), 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল, জীবনদেবতা এই পর্বে বিশ্বদেবতায় রূপান্তরিত হলেন। 'সোনার তরী-চিত্রা'য় প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ থেকে এই পর্যায়ে অপরূপ অসীমের নিকট আত্মনিবেদনের আধ্যাত্মিক আকুতির জগতে এসে উত্তীর্ণ হলেন। 'নৈবেদ্য'র প্রথম কবিতাটিতে কবি বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মার নম্র নিবেদনকে জানিয়েছেন ঃ

চতুর্থ পর্ব ঃ রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিকতা

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

'নৈবেদ্য'র স্তবকবন্ধে রচিত এই গানগুলোতে বিশ্বদেবতাকে আবাহন করবার আকুতি রূপ পেয়েছে, আর সনেটগুলোতে প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র ঋষিদের তপস্যালব্ধ জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণায় বর্তমানের সকল কলুষ ভীরুতা ক্ষুদ্রতা হীনতায় গ্লানি দগ্ধ করে জাতি যাতে আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ হতে পারে, সেই ঐকান্তিক প্রার্থনাই কবি প্রকাশ করেছেন।

'খেয়া'য় 'গীতাঞ্জলি'র অধ্যাত্মচিন্তার আভাস আরও পরিস্ফুট। 'খেয়া' নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঃ খেয়া নৌকা নদীর এক তটপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পাড়ি দেয়। তেমনি কবির 'চিত্রা-সোনার তরী'র প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মজগতে যাত্রা 'খেয়া'র বিভিন্ন কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ চিত্রকল্পগুলোর মধ্যে একটা বিষাদ ও উদাস ভাবের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় ঃ বেচাকেনা, হাটের শেষ,

দিনান্তের দৃশ্য, কাশের বন, শূন্য নদীর তীর, নদীর ঘাট, সন্ধ্যাপ্রদীপ, স্তব্ধ অন্ধকার, শূন্যঘর। কবি যে বাইরের বিচিত্র সৌন্দর্যজগৎ থেকে ঘুরে সরে এসেছেন, তার পরিচয় তাঁর আকাঙ্ক্ষাতেই মেলে : তিনি 'খেয়া'র কবিতাগুলোতে বারবার বলেছেন 'এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি' একতারার একটি তার ফুলবনের একটি কুসুমই তাঁর প্রয়োজন, এখন তাঁকে আবার ক্ষীণ আলোকে মাঠের পথে একাকী চলতে হবে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চলতে হবে মাঠের পথে একা--
গিরি কানন পড়বে কি আর চোখে,
কুটিরগুলি যাবে কি আর দেখা।

অবশ্য দু-একটি কবিতায় 'সোনার তরী-চিত্রা' যুগের ভাবের অনুকরণ মেলে। 'গীতাঞ্জলি'তে কবির এই আধ্যাত্মচেতনার আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হল, ঈশ্বর চেতনায় কবির হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে উঠল :

প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

'বলাকা' (১৮১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) 'মহুয়া' (১৯২৫)—পঞ্চম পর্বের এই কাব্যগুলিতে কবিমানসের নতুন দিক্‌-পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'বলাকা'র কবিতাগুলি রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র কবিতাগুলিতে গতিতত্ত্বকেই কাব্যসত্য করে তুলেছেন। কবি তাঁর নতুন উপলব্ধি অনুযায়ী তাঁর প্রকাশের ভাষা ও ছন্দকেও নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। 'বলাকা'র ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চরণ বিন্যাসের অসমতা : আঠার মাত্রার পয়ারের একটি চরণের পর্বগুলো ভেঙ্গে কখনও একটিমাত্র পর্বেও একটি চরণ গঠিত হয়েছে। আবেগের তরঙ্গোচ্ছ্বাস এবং সংকোচনই চরণগুলোর পরিমাপকে নিয়ন্ত্রিত করে : "বলাকা'র অনিয়মিত, অসম ছন্দবিন্যাসে, ঝড়-খাওয়া মনের বিসর্পিত আন্দোলনে, উহার চিন্তাধারার তট হইতে তটান্তরে প্রহত ভাবতরঙ্গের অস্থির গতি ও দূরব্যাপী বিস্তার, উহার সমাধান-অন্বেষণ ও আত্মানুসন্ধানের সংশয়াকুল পদক্ষেপ যেন আপন প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়াছে।"

বলাকার যুগ : রবীন্দ্রকাব্যের পর্বান্তর

'বলাকা' এবং পূরবী'র মধ্যবর্তীকালে রচিত 'পলাতকা'য় কবির মর্মপ্রীতি সহজ সরল কথনভঙ্গিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'পূরবী'তে সৌন্দর্যবোধ ও যৌবন-স্মৃতিচারণার আবেগের সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের করুণ সুর ও পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা মিলিত হয়ে গীতিকবিতার অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। 'পূরবী'তে একদিকে পাই মৃত্তিকামমতার আবেগ—

পলাতকায় কবির মর্তপ্রীতি

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তিসুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে ;
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।

অন্যদিকে জীবনের আসন্ন অন্তিম লগ্নটির পটভূমিতে কবির বিদায় গ্রহণের প্রস্তুতির বিষাদ :

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ ;

* * * *

যদি রাত্রি তার
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেত ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগর সংগমতীর্থতীরে,
সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাকে তারই;
মানসরসে যাহা শেষ বর্ষ, শেষ নমস্কার।

কবির প্রৌঢ় বয়সের রচনা 'মহুয়া'য় আমরা এক অপূর্ব, দ্বিতীয় যৌবনের রক্তরাগ লক্ষ্য করি : এখানে প্রেমের প্রবল প্রাণশক্তি সংকীর্ণ প্রাত্যহিকতায়, আরামের পঙ্কশয্যায় মলিন ও কলুষ নয়, তা বীর্যে, মহৎ কর্তব্যবোধে, বিশ্বচেতনায় ও অনন্ত গতিপ্রেরণায় উদ্দীপিত এবং উজ্জ্বল।

ষষ্ঠ পর্বের 'পুনশ্চ' (১৯৩২)', 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৭) প্রভৃতি কাব্যগুলিকে এক নতুন দুঃসাহসিক কাব্যকলার পরীক্ষায় রবীন্দ্র-কবিমানসের দীপ্ত আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। নিজের তৃপ্তিবিহীন কবিত্বের দুর্নিবার প্রেরণায় কবি বার বার নিজের কীর্তিকেই অতিক্রম করেছেন। তার আগে 'বলাকা'য় তিনি প্রবহমান পয়ার ছন্দের নতুন পরীক্ষা করেছিলেন, আর এই পর্বে গদ্য-ছন্দের অভিনব প্রকরণে আধুনিক বাংলা কবিতার বিপুল সম্ভাবনাই উন্মোচিত হল। 'পুনশ্চ'-য় এই গদ্য কবিতার প্রথম সূত্রপাত হল, এখানেই কবি গদ্যছন্দের আঙ্গিকটি প্রথম সুস্পষ্টভাবে নির্মাণ করেন।

গদ্যছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস : 'পুনশ্চ'

সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতাটির পৃথিবীকে জীবনের গভীরে আবাহন করে নেবার আবেগের উচ্ছ্বলতায় তুলনায় পত্রপুটের এই অংশের পৃথিবী বন্দনার শান্ত, গভীর সুর, আবেগোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে দার্শনিকতার স্বাতন্ত্র্য সহজেই কাব্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সপ্তম বা অন্ত্যপর্বের কাব্যধারায় পাই 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'সেঁজুতি', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়' (১৯৪১), 'আরোগ্য' (১৯৪১) ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। প্রান্তিকে 'অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়', মৃত্যুর পটভূমিতে কবি জীবনের পরম সত্য অন্বেষণ করেছেন ; নিজের দেহের ব্যাধিযন্ত্রণা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানব সভ্যতার শোচনীয় দুর্গতির পটে কবির জীবনের গভীর মূল্যবোধ 'রোগশয্যা', 'আরোগ্য' প্রভৃতির কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো শ্লোকের মত কঠিন, সংহত রূপে হীরকদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। রোগজীর্ণ দেহের যন্ত্রণার দহনের মধ্য দিয়েই তার শুচি জীবনপ্রত্যয়ে স্থিত হন।

রবীন্দ্রনাটকের অন্ত্যপর্ব

তাঁর বার্ধক্য, জীবনের শেষ লগ্নে কৃপণা প্রকৃতি তাকে ইন্দ্রিয়শক্তিগুলো থেকে বঞ্চিত করেছে, তবু কবি তাঁর রোগজীর্ণ বার্ধক্যগ্রস্ত দেহের সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সবরকম অলংকারবর্জিত, নিরাভরণ ভঙ্গিতে, মন্ত্রোচ্চারণের গাম্ভীর্যে, গভীরতম চৈতন্যের উপলব্ধির কঠিন শুচিতায় মানবাত্মার অপরাজেয় মহিমাকে ঘোষণা করে যান :

> যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধ প্রায়,
> যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
> বাঁধ বার্ধক্য জালে, তবু ভাঙা মন্দির বেদিতে
> প্রতিমা অক্ষুণ্ন রবে সগৌরবে তারে কেড়ে নিতে
> শক্তি নাই তব। (আরোগ্য)

উপনিষদের অসীমের চেতনা কবির স্বকীয় জীবনোপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই পর্যায়ে চৈতন্যভাস্বর, প্রজ্ঞাগম্ভীর আধুনিক গীতিকবিতার চরম উৎকর্ষকেই প্রকাশিত করেছে, মৃত্যুর পূর্বে রচিত তার শেষ দুটি কবিতায়ও আমরা তা দেখি।

রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘদিনের কাব্য সাধনায়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, ছন্দ, প্রকাশভঙ্গি তথা আঙ্গিকের বিভিন্ন পরীক্ষায় আধুনিক বাংলা কবিতার গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

[দুই] রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশপূর্বক উহার ইতিহাস দাও এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যে তাঁহার দানের মূল্য নির্ণয় কর।

উত্তর। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজের নাট্যাভিনয় প্রবণতার কথা উল্লেখ করে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁকে নাটক রচনা এবং অভিনয় চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আর কবির অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তি বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে মোটামুটিভাবে ছ'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নেওয়া যায়। প্রথম, গীতিনাট্য : 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮৮), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) এর অন্তর্গত ; দ্বিতীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রচলিত রীতিসম্মত নাটক : 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

রবীন্দ্র নাটকের শ্রেণীবিভাগ

(১৮৮৪), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'তপতী' (১৮২৯) ; তৃতীয়, কাব্যপ্রধান নাটক : 'সতী' (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯৭), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭), 'নরকবাস' (১৮৯৭). 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৮৯৭), 'কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ' (১৯০০) ; চতুর্থ, নৃত্যনাট্য : 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯০৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮), 'শ্যামা' (১৯৩৯) ; পঞ্চম, রূপক ও সাংকেতিক নাটক : 'রাজা' (১৯১৭),'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'অরূপরতন' (১৯২০), 'শারদোৎসব' (১৯২৪), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'ডাকঘর' (১৯৩২), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) ; পঞ্চম কৌতুকরসপ্রধান নাটক : 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)—পরবর্তী সংস্করণে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮)। এই বিভাগ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রকরণ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা নাটক ছিল বাহ্যিক সংঘাত এবং ঘটনাড়ম্বরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যরীতির অনুসরণে নিজের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। স্বকীয় জীবনচেতনার উপযুক্ত নাটকীয় আঙ্গিক নির্মাণের পরীক্ষায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন এবং দুঃসাহসিক, ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের সাফল্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। নাটক রচনার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকের শিল্পমাধ্যম হিসেবে সঙ্গীতের সার্থকতা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কবির প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি রচনায় পাত্রপাত্রীদের সংলাপ, ভাব পরিবর্তন, চরিত্রবৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ, ঘটনার পরিণতি ইত্যাদি সকল কিছুর অবলম্বন সঙ্গীতপ্রবাহ ; এই গীতিসর্বস্বতায় নাটকের একটা ক্ষীণ, অস্পষ্ট সুদূর ছায়া লক্ষিত হয় মাত্র।

সঙ্গীত-প্রধান নাটক

দ্বিতীয় স্তরের নাটকগুলোতে প্রচলিত নাটকীয় আঙ্গিকের অনুসরণে মানসদ্বন্দ্বের রূপায়ণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের নাটক রচনায় সঙ্গীতের মাধুর্য এবং গীতিকবিতাসুলভ আবেগোচ্ছ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানস সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হলেও তিনি প্রচলিত নাটকের গঠনকৌশলকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এটি এমন একটি নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর নায়ক সন্ন্যাসী শুষ্ক, কঠোর বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রতার সাধনায় সংসারের স্নেহ-প্রেমের বন্ধনকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে, জীবন মমতার উৎসরূপিণী একটি বালিকাকে প্রত্যাখ্যান ও পরিত্যাগ করে অন্তর্দ্বন্দ্বে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ হয়েছে, অবশেষে স্নেহের আকর্ষণের মধ্যেই সে জীবনের চরম অর্থকে খুঁজে পেয়েছে। 'সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি', এই তত্ত্বটিকেই কবি সন্ন্যাসীর হৃদয়াবেগের সংঘাতে ও অন্তর্ঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন। এই নাটকের লিরিক উচ্ছ্বাস ও

মনস্তাত্ত্বিক ও প্রচলিত ধারার নাটক

তত্ত্বগত প্রাধান্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের সমস্যার নাট্যরূপায়ণে আগ্রহী, তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। "রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' শেক্সপীয়রীয় পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির আদর্শে রচিত। 'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিক্রমদেব ও সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই নাটকের মূল উপজীব্য : রাজার কর্তব্যবিমুখ, আত্মবিস্মৃত সর্বনাশা কামনার ক্ষুধা থেকে স্বামীকে, নিজেকে এবং রাজ্যের নিরাপত্তাকে রক্ষা করবার জন্য সুমিত্রা রাজার কাছে নিজেকে অপসারিত করে নেয় এবং পরিশেষে মর্মান্তিক আঘাত-বেদনার মধ্যে তার আত্মদানে নাটকের সমাপ্তি হয়। কিন্তু নাটকটিতে সংঘাত গভীর হয় নি, তা কিছুটা পরিমাণে কৃত্রিম ও অতিরঞ্জিত এবং নাটকীয় তাৎপর্যহীন এবং ঘটনাড়ম্বরের আয়োজনে মেলোড্রামায় পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'রাজা ও রানী'র দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তিনি তার সংস্কার সাধন করে গদ্যে 'তপতী' (১৯২৯) নাটক রচনা করেন। কিন্তু এই রচনায়ও ভাববিলাস এবং মেলোড্রামার উপাদানগুলোকে বর্জন করা সত্ত্বেও নাটকীয় ভারসাম্য ঠিক রক্ষিত হয়নি। 'তপতী' অনেকটা পরিমাণেই তত্ত্বপ্রধান নাটক হয়ে উঠেছে। রাজর্ষি উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিসর্জন'-এও নাটকের পঞ্চাঙ্ক রীতি অবলম্বিত হয়েছে। এই নাটকটিতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং প্রেমের শক্তির সঙ্গে রঘুপতি ও আচারসর্বস্ব হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ্য পৌরহিত্যের দ্বন্দ্ব রূপায়িত। একান্ত স্নেহভাজন ও পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মোৎসর্জনে প্রেম ও কল্যাণের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা এবং সেই রক্তাক্ত, বিদ্বেষ-কুটিল বিরোধের অবসান। ঘটনাবিন্যাসে দুর্বলতা এবং কাব্যধর্মিতার আপেক্ষিক প্রাধান্য সত্ত্বেও গোবিন্দমাণিক্যের ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য, জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রঘুপতির আহত অভিমান ও জয়সিংহের মৃত্যুতে তার শোকোচ্ছ্বাস নাটকীয় তীব্রতায় চিত্রিত হয়ে 'বিসর্জন'কে বিশিষ্ট করে তুলেছে। 'মালিনী'তে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মবিরোধ বিশেষ নাটকীয় সংহতি লাভ করেনি।

স্বকীয় গীতিপ্রাণতা এবং তত্ত্ব, ভাবাদর্শ রূপায়ণের ঝোঁকের জন্য কবি আর শেক্সপীয়রের নাট্যরীতি অনুসরণে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেননি, পরবর্তীকালের নাটকগুলোতে তিনি কাহিনীর ঘটনাগত বিন্যাসটাকে বর্জন করে প্রত্যয় ও হৃদয়ানুভূতিগত দ্বন্দ্বের ছকেই তাঁর জীবনসত্য উপলব্ধিকে রূপদান করেছেন। স্বরূপ বৈশিষ্ট্যে মূলত কাব্যধর্মী তৃতীয় শ্রেণীর নাটকগুলোতে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ নাটকীয় নয়, তা কাব্যের সৌন্দর্য, সঙ্গীত ও বিশিষ্ট অলংকরণেই অভিব্যক্ত। 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত উক্তিটাতেই এই জাতীয় নাটকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বোঝা যায় : "চিত্রাঙ্গদা মদনদেবের নিকট রূপ ঋণ লইয়া যে অর্জুনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার জন্য তাহার মনে অনুতাপ ও আত্মধিক্কার জাগিয়াছে। অর্জুনেরও চিত্রাঙ্গদার প্রতি ভাব পরিবর্তন করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উপস্থাপনা হইয়াছে নাটকীয় রীতিতে নহে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণ ও প্রেমনিবেদনের দ্বারা। মনস্তত্ত্ব ও

কাব্যধর্মী নাটক

হৃদয়-সংঘাতের ইঙ্গিত এই কাব্যপ্লাবনের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরাত্মা কাব্যের।" 'গান্ধারীর আবেদন'-এও আখ্যানবস্তু ও নীতিপ্রতিষ্ঠারই প্রাধান্য, চরিত্রগুলো স্বকীয় পরিবর্তনহীন আবেগে স্থির, নাটকীয়তা গৌণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী নাটকগুলোর মধ্যে 'কর্ণ ও কুন্তী'র মধ্যেই কাব্য ও নাট্যগুণের সর্বাপেক্ষা সার্থক সমন্বয় ঘটেছে বলে কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন। কর্ণের জীবনের নিষ্ফলতার বেদনা, কুন্তীর আত্মপরিচয়দানের মুহূর্তে তার আবেগের তরঙ্গোচ্ছ্বাস অবশেষে নিজের জীবনের অনিবার্য রিক্ততাকেই শান্ত অথচ কঠিন ভঙ্গিতে বরণ—এ সমস্তই এক গভীর ট্র্যাজিক বিষাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ শ্রেণীর রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকগুলোতেই তাঁর নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়েছে। রূপক সাহিত্যে বিশুদ্ধ, নির্বিশেষ ভাব, চিন্তা প্রত্যয়কে রূপকের বন্ধনে, বস্তুরূপ ও তার অন্তরালবর্তী মূল সত্যের একাত্মায় মূর্ত করে তোলা হয়। সাঙ্কেতিক রচনায় রূপকের মধ্যস্থতারও কোন প্রয়োজন হয় না। সেখানে নিগূঢ় রহস্যময় ব্যঞ্জনা নাট্যবস্তু থেকে উৎসারিত হয়ে তাকে রহস্যময় করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের অধিকাংশ নাটকের রূপক ও সংকেত মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায়। কবি তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোতে ঘটনার সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতায় চরিত্রসৃষ্টির প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণের পরিবর্তে গভীরতম সত্যোপলব্ধিতে তত্ত্বভাবনাকে আভাযে, ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন। দৃশ্যবিন্যাসে, আবহে, পাত্র-পাত্রীদের অর্থগূঢ় সংলাপে অমূর্ত ভাবই ব্যঞ্জিত হয় এবং তা-ই এই জাতীয় নাটকের বস্তুদেহকে নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত করে। বৌদ্ধ কুশজাতকের কাহিনী-অবলম্বনে রচিত 'রাজা' এবং তার রূপান্তরিত সংস্করণ 'অরূপরতন' কবির শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটকগুলোর অন্যতম। 'রাজা'র নায়িকা সুদর্শনা নিজের অন্ধ মোহে অন্ধকারের রাজা, এই সৃষ্টি-রহস্যের আধার মূল শক্তিকে প্রত্যক্ষরূপে, স্বকীয় আসক্তির সীমায় দেখতে চেয়েছিল; অবশেষে দুঃখবিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হলে রাজাকে সে নিজের দুঃখস্নাত অন্তরের মধ্যে পেল। 'ডাকঘর'-এও আমরা ঈশ্বরের, অসীম, অনন্তের উদ্দেশ্যে মানবাত্মার বেদনাময় অভিসারকে দেখি: "এক মৃত্যুপথযাত্রী বালকের মুক্তিপিপাসা, ভগবানপ্রেরিত চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চিকিৎসার নানা বাধা-নিষেধ-মুক্ত, অবারিত স্বাধীনতায় তাহার ভগবৎ-সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি ডাকঘরের রূপক-আবরণ রচনা করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের ওপর স্ট্রীণ্ডবার্গ, মেটারলিংক প্রভৃতি ইয়োরোপীয় নাট্যকারদের প্রতীক নাটকগুলির প্রভাবের কথা বলা হয়। প্রভাব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা যৎসামান্য, ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভায় ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার পটভূমিতে সাংকেতিক নাটকের যে রূপ রচনা করেছেন, সেটি সম্পূর্ণরূপেই তাঁর নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' দুটি নাটকেই একজন রাজাকে বার বার উল্লিখিত হতে দেখি, প্রথম

রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটক

নাটকটির নায়িকা সুদর্শনা রাজাকে প্রত্যক্ষরূপে পাবার জন্য সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে, আর দ্বিতীয়টির মুখ্য চরিত্র অমল রাজার কাছ থেকে চিঠি পাবার জন্য প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো নাটকেই রাজাকে মঞ্চে শরীরিরূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায় না। নাটকের আবহে এই সত্যই

'রাজা' ও 'ডাকঘর'

ব্যঞ্জিত হয় যে বিশ্বের অন্তরালে যে শক্তি বিরাজমান, তাকে ঈশ্বর বা অন্য যে কোনও নাম বা রূপ দেওয়া হোক, কোনো নাম বা রূপের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায় না তাঁকে পেতে হয় অন্তরের মধ্যে। দুটি নাটকে এই সত্য বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। ডাকঘর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গাঢ়বদ্ধ গীতি কবিতার মত, বস্তুজগতের স্থূলতা-বর্জিত, প্রতিটি সংলাপে চেতনার গভীরতম অনুভূতিগুলি সার্থকভাবেই ব্যঞ্জিত।

'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'তে কবি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার সংকট এবং সেই সংকট থেকে মানবমনের মুক্তিতে রূপকায়িত করেছেন। মানুষ তার বিজ্ঞান সাধনার শক্তিতে মানবকল্যাণের জন্য যে যন্ত্রকে উদ্ভাবন করেছে, সাম্রাজ্যবাদ তাকেই আয়ত্ত করে তারই সাহায্যে মানুষের তৃষ্ণার জল রোধ করবার অপপ্রয়াসে মত্ত হয়, রাজকুমার অভিজিৎ

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'
আধুনিক যুগ-যন্ত্রণার প্রতিফলন

নিজের প্রাণকে বলি দিয়ে ঝর্ণার যান্ত্রিক বাঁধকে ভেঙ্গে দিয়ে যন্ত্রের অপেক্ষা মানুষ ও মানুষের শুভবুদ্ধিই যে বড় সেই সত্যের ইঙ্গিতকে স্পর্শ করে। এই কাহিনীর মধ্যে আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে যান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমান ইয়োরোপীয় জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণের ঘটনাই আভাসিত। 'মুক্তধারা'র রূপক বিন্যাস বিশেষ সার্থক হতে পারেনি। তার তুলনায় 'রক্তকরবী'র সাঙ্কেতিক তাৎপর্য অনেক সার্থকভাবে অভিব্যঞ্জিত। আধুনিক বাণিজ্যিক সভ্যতার লোভ ক্ষুধা, বঞ্চনা নিষ্ফলতার যন্ত্রণা এবং আত্মবিড়ম্বনার পটে মানবাত্মার সত্য অন্বেষণই এই নাটকটির রূপকের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর লৌহজালের অন্তরালস্থিত রাজা নিজের প্রচণ্ড শক্তির ব্যর্থতায় নিজেই যন্ত্রণাজর্জরিত—তার সৃষ্টিক্ষমতা, শক্তি ও ঐশ্বর্য কেবল বস্তুপিণ্ডের সঞ্চয়েই বিড়ম্বিত। ধনতান্ত্রিক সমাজের যান্ত্রিকতায় ও মনুষ্যত্ববিনাশী শোষণে সম্পদ আহরণের ব্যবস্থায় ব্যক্তি হিসেবে কারো কোনও স্বতন্ত্র মূল্য নেই, প্রতিটি মানুষের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট। 'রক্তকরবী'র নায়িকা কঙ্কণপরিহিত প্রাণময় সত্তার প্রতীক নন্দিনী যক্ষপুরীর অতৃপ্ত-কলুষিত, সংঘর্ষপ্রীড়িত, স্বাভাবিক ও নির্মল আত্মবিকাশ বঞ্চিত জগতে অবারিত প্রাণের ঐশ্বর্যকে বহন করে আনে, রাজাও নিজের জীবনের ব্যর্থতার আবর্জনা থেকে মুক্তি পেয়ে ঐশ্বর্য ও শক্তির বাধাকে নিজ হাতে চূর্ণ করে প্রেমের শুচিতাকে উপলব্ধি করে ধন্য হলেন। নন্দিনীর দয়িত, যৌবনশক্তির প্রতীক রঞ্জনের মৃত্যুতেই এই পরিণতি সম্ভব হয়। যৌবনকে হত্যা করে রাজা যৌবনের ও প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করেছেন। পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুর শোষণব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির সংগ্রামের বাস্তব-সত্যকেই কবি রক্তকরবীর রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শারদোৎসব' এবং 'ফাল্গুনী' সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত হলেও স্বতন্ত্র ধরনের রচনা। নাটকীয় সংঘাতবর্জিত এই

রচনাগুলোতে অবকাশের ঋতু শরৎ এবং যৌবনের ঋতু বসন্তের সৌন্দর্য ও ভাবনাগুলোকে ক্ষীণসূত্রসংবলিত সঙ্গীত-মালায় প্রকাশ করা হয়েছে। 'অচলায়তন'-এ কবি ধর্মীয় প্রথা এবং তৎসম্পর্কিত আচার-আচরণের অমানুষিকতা উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। "আচরণই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না, এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন"—এই ভাবসত্যই নাটকটিতে রূপকায়িত। দেশে [illegible] সংস্কারের জড়তা মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে চলেছিল ; তাকে সচেতনভাবে [illegible] উদ্দেশ্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখানে [illegible] উদ্দেশ্যপরায়ণতায় রূপকের আবরণ কিছুটা পরিমাণে স্থূল ও প্রকট হয়ে পড়েছে. গভীর, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার সৌন্দর্য তত ফোটে নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা' (নৃত্যনাট্যের সংস্করণ), 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে ভাববস্তুকে রূপায়িত করেছেন। এই নাটকগুলোও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সৃজনবৈচিত্র্যের নিদর্শন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি রচনাগুলোতে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য রচনার দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে। কৌতুককর নাট্য পরিস্থিতি, মানসিক ভারসাম্যহীন খেয়ালী মানুষের স্বভাবগত অসঙ্গতিই রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যের হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান। [illegible] বাংলা স্থূল, অমার্জিত রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ প্রহসনগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মার্জিত, শুভ্র হাস্যরস এক স্বস্তিদায়ক ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকগুলোর পরিচিতি দানের পর সামগ্রিকভাবে তাঁর এই শিল্পকর্মের মূল্য নিরূপণ করা যেতে পারে। কবির নাটক সম্বন্ধে টম্‌সন মন্তব্য করেছেন : "His drama ic work is the vehicle of ideas rather than the expression o action." কোনও কোনও সমালোচক রবীন্দ্রনাটকের প্রচলিত নাট্যরীতিসম্মত সংঘাতের স্বভাব, গীতি-প্রবণতা, তত্ত্বপ্রাধান্যকে তার ত্রুটিরূপে উপস্থাপিত করতে চান। কিন্তু আধুনিক কালের য়ুরোপীয় নাটকের দৃষ্টান্তেই আমরা জানি, নাটকের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রচলিত নাট্যরীতির বন্ধনকে স্বীকার করে নেয় নি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের সংশয়-দ্বন্দ্বের পটে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিশিষ্ট মূল্যবোধ, অধ্যাত্মবিশ্বাসের রূপায়ণের জন্যে নতুন নাট্য-আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে বহুলাংশে সফলও হয়েছেন। তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলো আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মেটারলিংক, ইয়েটস, স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি বিদেশী নাট্যকারদের সাংকেতিক ও কাব্য-নাটকগুলো তাঁকে এই জাতীয় নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা সে আলোচনায় কোনও লাভ নেই। তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলোতে বিদেশী নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কোনও চিহ্ন নেই, বরং তারা তাদের স্বাতন্ত্র্যই দেদীপ্যমান। য়ুরোপীয় সাংকেতিক নাটকে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রাধান্যই আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে সকল সংশয় দ্বিধার

রবীন্দ্র নাটকের শিল্পরূপ

অবসানে সত্যের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব সূচিত হয়েছে ; তাঁর ভারতীয় মন য়ুরোপীয় নাটকের সংকেতের রহস্যাবৃত, কুহেলিকাময়, অতীত বিস্ময়ের শিহরণময় জগৎটাকে গ্রহণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলো তাঁর প্রতিভার মৌলিকতায় ভাস্বর। এটি সত্য যে কবির সমসাময়িক কালে সাধারণ দর্শক ও শ্রোতা তাঁর মূল ঘটনাড়ম্বরবর্জিত সূক্ষ্মরুচির নাটককে গ্রহণ করেনি, রঙ্গমঞ্চের নাট্যকারেরাও তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। কিন্তু আধুনিক কালে তাঁর নাটক-গুলোর প্রতি নাট্যরসিকদের দৃষ্টি পড়েছে। তাঁর কয়েকটা নাটক মঞ্চে সাফল্যলাভ করেছে এবং আধুনিক গদ্য নাটকে এবং কাব্য নাটকে, তাদের তীক্ষ্ণ মার্জিত সংলাপে ভাবগত দ্বন্দ্বের বিকাশে, ইঙ্গিতময়তায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর নাটকগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যের নতুন দিগন্তকেই উন্মোচিত করেছে।

[তিন] রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকসমূহের বিষয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া আলোচনা কর।

উত্তর। সাংকেতিক নাটক-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য দুই সংখ্যক প্রশ্নোত্তরের রূপক-সাংকেতিক নাটকের আলোচনা ও তার শেষে কৌতুকনাট্যের অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি (রবীন্দ্র নাটকের শিল্পরূপ) পর্যন্ত লেখ।

[চার] রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ-করে তার ইতিহাস দাও এবং প্রাবন্ধিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা লক্ষ্য করি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যে যে গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়, তা ছিল সম্পূর্ণরূপেই প্রয়োজনধর্মী, বিষয়বস্তু-নির্ভর। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন লেখকদের চর্চার ফলে প্রয়োজনের স্থূলতাকে অতিক্রম করে বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে সাহিত্যের শিল্পলাবণ্য ধীরে ধীরে ফুটতে থাকে। প্রবন্ধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন', প্রকৃষ্টবন্ধনযুক্ত অথবা যুক্তিশৃঙ্খলাসংবলিত গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা যায়। বঙ্কিম-পূর্ববর্তী যুগের অধিকাংশ গদ্য লেখকদের রচনাই ছিল এইরূপ প্রবন্ধ। "যখন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব এমন এক পর্যায়ে পৌছে, যখন কি বলা হইল অপেক্ষা কেমন করিয়া বলা হইল এই প্রশ্নই আমাদের নিকট বড় হইয়া দেখা যায়, তখনই প্রবন্ধের সাহিত্যরস সঞ্চিত হইবার অনুকূল সময় আসে।" বঙ্কিমের পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের রচনায় সাহিত্যের শ্রী কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা গদ্যের প্রথম শিল্পী, প্রবন্ধের কায়ায় তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। আর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে প্রকাশভঙ্গির অতুলনীয় ঐশ্বর্যে প্রবন্ধ সাহিত্য তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির মতই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র পনের বৎসর বয়সে

বাংলা প্রবন্ধে সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় কবি প্রথম প্রাবন্ধিকরূপে আবির্ভূত হন এবং মৃত্যুর পূর্বে ১৯৪১ সালের বৈশাখ মাসে 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন; এই দীর্ঘ প্রায় পঁয়ষট্টি বছর ধরে শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি মানব সভ্যতার প্রতিটি শাখা সম্বন্ধেই তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, মনন ও কল্পনার গভীরতায়, মর্মসঞ্চারী আবেগে, উপমা উপমান ও চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগে প্রকাশকলার ঐশ্বর্যে তাঁর প্রবন্ধগুলি সত্যই তুলনাহীন। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক মিডলটন মারেকে অনুসরণ করে বলা যায়, শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনাশৈলীতে লেখকের ব্যক্তিত্বই প্রাণময় রূপ পরিগ্রহ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁর ব্যক্তিত্বের অনন্যতার স্পর্শে দীপ্ত, তাঁর যে সকল প্রবন্ধ বিষয়ধর্মী, সেখানেও তাঁর শিল্পব্যক্তিত্বই সাহিত্যের লাবণ্য ও শ্রী ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বরূপবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেন যথার্থভাবেই নির্দেশ করেছেন: "রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার অলংকৃতি বিভূষণ-ভার নয়। তাহা স্বাভাবিক ও সহজাত সৌন্দর্য। এইখানেই গদ্যলেখকরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথের স্টাইল তাঁহার চিন্তার ও চেতনার সুগভীর উৎস হইতে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্ববর্তী গদ্যলেখকের কাছে বিষয় ছিল বাহ্যবস্তু; লেখক দূর কিংবা নিকট হইতে আগ্রহ বা অনাগ্রহের সহিত সে বস্তু ব্যবহার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়ীভূত বস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার স্বকীয় ভাবনার ও চেতনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া যায়। তিনি যাহা বর্ণনা করেন তাহা যেন নিজেরই বৃহৎ চেতনা ও ব্যাপক অনুভূতির সীমাবস্থিত।"

ব্যক্তিত্বই রবীন্দ্র-প্রবন্ধের মূল কথা

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোকে আমরা মোটামুটিভাবে এই কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি: সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন, ভ্রমণ সাহিত্য, পত্র সাহিত্য এবং আবেগধর্মী রচনা।

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায়ই রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়, পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যপ্রসঙ্গ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন পর্বে সমালোচনা তত্ত্ব এবং সাহিত্য বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলো 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯১১) এবং সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩) প্রভৃতি গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টারূপ তাঁর সমালোচনা সাহিত্যেও উদ্ভাসিত। বাংলা সাহিত্যে সার্থক সমালোচনার সূত্রপাত প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিদৃষ্টি ও গভীর রসোপলব্ধির দ্বারা তার দিগন্তটিকে আরও বিস্তৃত করে তাকে এক অভিনব সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। 'সাহিত্য', আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি গ্রন্থগুলোতে আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিচার স্বকীয় অনুভূতির আলোকে

সমালোচনা-সাহিত্য

সমুজ্জ্বল। ভারতীয় অধ্যাত্মবিশ্বাসের সত্য সুন্দর ও শিবের সম্মিলনের আদর্শকেই সাহিত্যের প্রাণবস্তুরূপে গ্রহণ করে তারই আলোকে সাহিত্যকর্মের মূল্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর সর্ববিধ সাহিত্যালোচনাতেই একটা সামগ্রিক রসদৃষ্টি উদ্ভাসিত। প্রাচীন আধুনিক বা লোকসাহিত্য—যে সকল ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সমালোচনা তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন, তা নিছক শুষ্ক বিচার-বিশ্লেষণে পর্যবসিত না হয়ে নতুন সৃষ্টির ভাস্বরতায় দীপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে রাষ্ট্রনীতি, সমাজ শিক্ষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়েও চিন্তা ভাবনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলো তারই স্বর্ণফসল: 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'সঞ্চয়' (১৯০৬) 'পরিচয়' (১৯০৫), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯০৭), 'শিক্ষার ধারা' 'কালান্তর' (১৯০৭), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'সমূহ' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'সমাজ' (১৯০৮), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) এবং 'শান্তিনিকেতন' (১৯৩৫)। তিনি এই প্রবন্ধগুলোতে মূলনীতি যেমন তেমনি বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলো সম্বন্ধেও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি উদার, সর্বজনীন মানবতার আদর্শকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন, সমস্ত প্রবন্ধগুলোতেই তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি এক নির্মল, শুচি আলোকে বিকীর্ণ করেছে। কবির ব্যক্তিহৃদয়ের নিবিড় উপলব্ধিতে, সত্যের ধ্যানের গাম্ভীর্যে, মননশীলতায় সার্বভৌম মানবধর্মের শুচিতা যেমন তেমনি নিজের দেশ ও সভ্যতা সম্বন্ধে বেদনাময় উৎকণ্ঠায় তাঁর তাত্ত্বিক ও সমস্যামূলক প্রবন্ধগুলো এক অপূর্ব ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছে।

বিবিধ মানববিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের পরিচয় লাভ ছিল রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধির সাধনারই এক অঙ্গ, তাই ব্যাকুল জীবনাগ্রহে আত্মবিস্তারের আকুতিতে বার বার তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। দু একবার বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হলেও তিনি বিদেশের সভ্যতার প্রাণ সম্পদের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের চেষ্টা থেকে বিরত হননি। পত্রাকারে বা দিনলিপিকার ধাঁচে লেখা তাঁর 'য়ুরোপে প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (১৮৯১-৯৩), 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'জাপানে', 'পারস্যে' (১৯৩৬) প্রভৃতি গ্রন্থগুলো গতানুগতিক ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, তারা কবির বিশ্বসভ্যতা পরিক্রমার উজ্জ্বল পরিচিতি। কবির ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম দুটি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি'তে তিনি প্রথম চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন।

ভ্রমণ সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট দান। পত্রসাহিত্যের আদর্শ হল একটি সহজ, অন্তরঙ্গ সুর, লেখকের পরিবারস্থ ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁর মনের এমন একটা অকপট প্রকাশ, তাঁর রুচি, অভ্যাস, আত্মীয়মণ্ডলীর প্রতি প্রীতি ভালবাসা কৌতুকরসের, এক কথায় তাঁর লৌকিক জীবনের, এমন একটা স্বচ্ছ

প্রতিফলন যা অন্য কোনরূপ সাহিত্যিক ভঙ্গিতে অলভ্য—পত্রসাহিত্যের শিল্পী সমালোচক নির্দেশিত হৃদয়ের এই অন্তরঙ্গতার আস্বাদ রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলিতে যে বিশেষ মেলে না তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য কবির পত্রগুলিতে জীবন সম্বন্ধে যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি, গভীর সৌন্দর্য চেতনা, প্রকৃতির কবিত্বময় বর্ণনা, নিজের কাব্য বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণমূলক আলোচনা পাওয়া যায়, তা আমাদের গদ্য সাহিত্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্য। তাঁর চিঠিপত্রের সংকলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র'-এর যে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও নিভৃত মানসের নেপথ্যলোক অনেকটা পরিমাণেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির একটা স্বর্ণযুগের পশ্চাৎপটের মানস ইতিহাস 'ছিন্নপত্র'-এর কবিহৃদয়ের আবেগে উষ্ণ সজীব, চিত্র ও সঙ্গীতের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ অপূর্ব ভাষায় বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রসংকলনের মধ্যে 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯) উল্লেখযোগ্য।

পত্র সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আবেগধর্মী প্রবন্ধগুলোর সার্থকতা বিষয়বস্তুর মহিমায় নয়, এক গভীর রসব্যঞ্জনায়ই নিহিত। এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'লিপিকা' (১৯২২) প্রভৃতি। 'পঞ্চভূত' বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ কোনও নির্দিষ্ট বক্তব্য বা প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে কবি এক-একটি প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে ভাবনা ও কল্পনার বর্ণসুষমাময় বিচিত্র সৌন্দর্য রচনা করেছেন। 'পঞ্চভূত'-এ পাঁচটা কাল্পনিক চরিত্র ও তাদের বৈঠকের সভাপতি স্বয়ং লেখকের কথোপকথনে আলাপচারিতার সূত্রে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় এক অপূর্ব রসসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চভূতের 'মন', 'পল্লীগ্রাম' প্রভৃতি রচনাগুলোতে এই বৈঠকী আলাপের রীতি অবলম্বিত হয়নি, এগুলো ডায়েরী জাতীয় আত্মনিষ্ঠ রচনা। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'পাগল', 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা' 'রুদ্ধগৃহ', 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রভৃতি রচনাগুলো সম্পূর্ণরূপেই আবেগধর্মী মন্ময়তাপ্রধান রচনা, তাদের মধ্যে "কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যানদৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাতুর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।" 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তাঁর নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করেন নি, নিজের ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটা ঘটনা ও দিক স্মৃতিচারণায়, আবেগোপলব্ধির বর্ণনানুরঞ্জনে পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

গদ্য তার প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যকে কিছুমাত্র না হারিয়ে যে কিভাবে কবিতার ছন্দ ও চিত্রসম্পদে মণ্ডিত হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।" প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য, নিঃসঙ্গ, একাকী বিরাট জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান।

[পাঁচ] রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর স্থান নির্ণয় কর।

উত্তর। ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, বাহির ও ভিতরের দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সমবায়ে কোনও জীবনসত্যের সামগ্রিক রূপায়ণই উপন্যাসের লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যঙ্গাত্মক নকশা রচনায় প্রথম উপন্যাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। আর বাংলা উপন্যাসের প্রথম শিল্পী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সামাজিক সমস্যার তীক্ষ্ণ উপস্থাপনে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর উপন্যাসগুলো আমাদের দেশে সাহিত্যের এই শাখার বিপুল সম্ভাবনাটি উন্মুক্ত করে। কিন্তু রোমান্স ও বহির্জীবনের ঘটনাশ্রয়ী সংঘাতের প্রাধান্য, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জটিলতার অভাব এবং কঠোর নৈতিক শাসনের মনোভাব বঙ্কিমের উপন্যাস-গুলোর সঙ্গে আধুনিক রুচির একটা গুরুতর ব্যবধান রচনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিক উপন্যাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মৌলিকত্ব

বঙ্কিম-প্রবর্তিত রোমান্স ও ঘটনাড়ম্বরপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ বর্জনে এবং সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাসে 'এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার' প্রবর্তনেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই যুগ পরিবর্তন সূচিত হয়। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মত সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাসেও রোমান্সের বাহ্যবৈচিত্র্য, চমকপ্রদ সংঘটনের আকস্মিকতা আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, আমাদের উপন্যাস ঐ জাতীয় রোমান্সের সার্থকতা নিঃশেষিত হয়েছে, ঘটনাবৈচিত্র্যহীন, নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনে রোমান্সের অসাধারণত্ব আরোপের চেষ্টা তাৎপর্যহীন হবে। সেইজন্যই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণে জীবনের মর্মোদ্ঘাটনে, অন্তরের নিভৃতচারী আবেগ-অনুভূতির সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও সংঘাত চিত্রণে উপন্যাসের নতুন শিল্পপ্রকরণের পরীক্ষায়ই ব্রতী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উপন্যাসের অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। ষোল বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'করুণা' (১৮৭৭-৭৮) নামে একটা উপন্যাস রচনা করেছিলেন, এটি ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাগারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) রোমান্স-আশ্রিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শেই রচিত। রবীন্দ্রনাথ

প্রথম পর্যায় : রোমান্সধর্মী উপন্যাস

তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে বলেছেন : "প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তাঁর লেখনী গল্পরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলো। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বৌঠাকুরাণীর হাট' গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারেও, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।" 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর

ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ অপরিণত ও জটিলতাবর্জিত, প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, বসন্ত রায় প্রভৃতি চরিত্রগুলো এক একটা অবিমিশ্র গুণ ও ভাবের প্রতিমূর্তি। আসলে সংসারের নির্মম, কুটিল ক্রূরতায় মানবজীবনের মধুর, কোমল, সুন্দর আবেগ অনুভূতিগুলো নিষ্পেষিত হয় এবং সেই লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাদের সৌন্দর্য ও মহিমাই বিষাদের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এই ভাবকল্পনাকেই তিনি উপন্যাসের কাঠামোয় 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাস দুটিতে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও আমরা দেখি, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো চরিত্র যেন দুটো বিপরীত ভাবের প্রতিমূর্তি : গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে বাস্তব সংগ্রামবিমুখ স্থির আদর্শবাদ আর কালিমন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারান্ধ আচারনিষ্ঠার ক্রূরতা ও দম্ভই অভিব্যক্ত। একমাত্র জয়সিংহের মধ্যেই দুটো বিপরীত ভাবাদর্শের সংঘর্ষজনিত মানসদ্বন্দ্বের সজীবতার কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়।

এর পর আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনসমস্যা ও দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস পাই। 'রাজর্ষি' (১৮৮৫) রচনার প্রায় সতের বছর পরে কবি 'চোখের বালি' (১৯০২) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) রচনা করেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসটাতেই রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মৌলিক বিশেষত্ব যেমনি, তেমনি বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হয়েছে। 'চোখের বালি'র মহেশ, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী এই চারটি চরিত্রের সম্পর্কের মনস্তত্ত্বঘটিত টানাপোড়েন, চরিত্রের গভীরতম উৎস থেকেই প্রবাহিত ঘটনা পরিবর্তনের নিপুণ বিন্যাস, সর্বোপরি বাস্তব পারিবারিক জীবনের পটভূমিতে নায়িকা বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে বাস্তব জীবন সমস্যা রূপায়ণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। 'নৌকাডুবি'র জীবন চিত্রণে সম্পূর্ণরূপেই একটি আকস্মিক দৈব-সংঘটন ও বহির্ঘটনার ওপর নির্ভরশীল, চরিত্রচিত্রণ নিষ্প্রাণ, ঘটনাবিন্যাসের মত পাত্রপাত্রীদের চরিত্রেও মনস্তত্ত্বের অতিমাত্রায় সরলীকরণ লক্ষ্যণীয়। 'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতম উপন্যাস।

সমাজসমস্যামূলক উপন্যাস

পারিবারিক ঐতিহ্যঘটিত দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস হিসাবে 'যোগাযোগ' (১৯২৩) উল্লেখযোগ্য। ধনী, ব্যবসায়ী, অর্থ ও ক্ষমতার কুরুচিপূর্ণ অহংকারে উদ্ধত অমার্জিত স্থূল প্রবৃত্তিসর্বস্ব মধুসূদন ও আভিজাত্যের শালীনতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যরুচির আবহে লালিত কুমুদিনীর দাম্পত্যজীবনের দ্বন্দ্ববিক্ষোভ এবং কুমুর সন্তান সম্ভাবনায় তার অবসানই এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। মধুসূদন-কুমুদিনীর স্বভাবগত পার্থক্য ও তাদের দ্বন্দ্বের চিত্রণ কোথায়ও উচ্চাঙ্গের হলেও ভাবগত ও গঠনগত ঐক্যের অভাব, পরিণতির অসংলগ্নতা ও আকস্মিকতা উপন্যাসটির সম্ভাবনাকে খণ্ডিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) প্রভৃতি উপন্যাসগুলো বৃহত্তর জীবনসমস্যামূলক : আমাদের সমাজজীবনের জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার পটে ব্যক্তিজীবনের সমস্যা তাদের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। বাংলা

সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'য় আমরা দেখি, মহাকাব্যোচিত বিশাল পঠভূমিকায় নায়ক গোরার আত্মঅন্বেষণের ব্যাকুলতা ও পরিশেষে যন্ত্রণাদীর্ণ আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে আচারগত ধর্মবিশ্বাসের সংকীর্ণতা জয় করে ভারতীয় জীবন ও সাধনার যথার্থ মানবিক সার্বজনীন আদর্শে নায়ক কিভাবে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল, তারই এক মহিমাদীপ্ত আলেখ্য রচনা করা হয়েছে। 'গোরা' বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহৎ উপন্যাস: "ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতি ও ধর্মাদর্শের এক নিবিড়, সুসমঞ্জস মিলন, ব্যক্তি-মানসের শাখা-প্রশাখায় সমস্ত সমাজদেহে প্রবাহিত প্রাণধারার এরূপ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত গোরার পর বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাস দুটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রমত্ততায় নয়, দুঃখের স্থির অটল তপস্যায় আত্মশক্তির উদ্বোধনেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি লভ্য, এই ভাবগত সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটিতে আইডিয়ার প্রাধান্য বিস্তারে প্রধান দুটি চরিত্র নিখিলেশ এবং সন্দীপকে কেবল দুটি বিপরীত ভাবাদর্শের প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়, তাদের ভাবগত সংঘর্ষ, তাদের গতিশীল দন্দ্বময় ব্যক্তিত্বের পটভূমির আশ্রয় পায় নি বলেই জীবন্ত হতে পারে নি। কেবল বিমলার সজীব, সচল চরিত্রের চিত্রণে এবং কলাগত সামঞ্জস্য ও ভাবগত সুসঙ্গতিতেই উপন্যাসটি মূলবান হয়েছে। উপন্যাস হিসাবে 'চার অধ্যায়' আরও অসম্পূর্ণ ও শিথিল, তাতে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের পরিবেশ বাস্তবানুগামী নয়, এলার দ্বন্দ্ব বিমলার মত উজ্জ্বল ও বিশ্বাসযোগ্য হয় নি।

জীবনসমস্যামূলক উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনা 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) এবং 'শেষের কবিতা' (১৯ ৬) রোমান্টিক, কাব্যধর্মী উপন্যাসের বিচিত্র আঙ্গিকে সমুজ্জ্বল। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত উপন্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অভিনব রচনারীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, এই দুটি উপন্যাসে তারই উজ্জ্বল পরিচয় পাই। 'চতুরঙ্গে'-এ শচীশের আত্মোপলব্ধির সমস্যা, তার সঙ্গে দামিনীর মনস্তত্ত্বঘটিত সম্পর্কের জটিল ঘাতপ্রতিঘাত, শ্রীবিলাসের ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধতা এক বিচিত্র কবিমণ্ডিত সাংকেতিকতার ভঙ্গীতে, তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতময়তায়, উপন্যাসের অভিনব প্রকাশকলায় রূপায়িত হয়েছে। 'শেষের কবিতা'ও রবীন্দ্রনাথের একটা অভিনব সৃষ্টি, এখানে প্রচলিত উপন্যাসের আঙ্গিক অনুসৃত হয়নি। সাংসারিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ মিলনের উর্ধ্বে এক বিচিত্র, বন্ধনাতীত মানসবিস্তারে, অসীমতার উপলব্ধিতে যে নরনারীর প্রেম একটি বৃহত্তর চরিতার্থতা লাভ করতে পারে, 'শেষের কবিতা'য় সেই প্রেমতত্ত্বটিকেই অতুলনীয় কাব্যধর্মী বর্ণনায়, বুদ্ধিদীপ্ত, তির্যক সংহত ভাষণভঙ্গির চাতুর্যে, কল্পনার বর্ণবিস্তারে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। 'শেষের কবিতা' বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যধর্মী উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ

রোমান্টিক উপন্যাস 'শেষের কবিতা', 'চতুরঙ্গ'

উদাহরণ। 'দুই বোন' (১৯৩৩) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস। প্রিয়া এবং জননী এই দুটি রূপগত ভূমিকায় নারী পুরুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। 'দুইবোন'-এর কাহিনীর মধ্যে এই তত্ত্বটিই রূপায়িত। তাতে চরিত্র বিশ্লেষণের কোনও গভীরতাই পাওয়া যায় না, শুধু ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ, অর্থগূঢ় উজ্জ্বল মন্তব্যগুলো, কবিত্বসুরভিত বর্ণনাই আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। 'মালঞ্চ'-এর অসুস্থ রুগ্ন নারীর ক্ষুদ্র ও তাৎপর্যহীন মনোবিচারের চিত্রণেও কোনও গভীরতা নেই।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছেন, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের অধিকাংশ বাঙালী ঔপন্যাসিকই তাঁর নিকট ঋণী। একদিক থেকে 'চোখের বালি'তে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জটিল প্রক্রিয়ায় অবৈধ প্রেম ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিত্রণে তিনি শরৎচন্দ্রের পথ প্রদর্শন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'চতুরঙ্গ' ও 'শেষের কবিতা'র মত কাব্যধর্মী, সাংকেতিকতার ব্যঞ্জনাপূর্ণ উপন্যাস রচনা করে অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের নিকট উপন্যাসের নতুন আঙ্গিক পরীক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে। আধুনিক বঙ্গ উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে।"

পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

[ছয়] রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

উত্তর। ছোটগল্প, কথাসাহিত্যের এই বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমটি, আধুনিকতম উপন্যাসের পরেই তার আবির্ভাব। সুদূর প্রাচীনকালেও সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইতালীয়, ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় টেল বা আখ্যান রচিত হয়েছে। মানুষের গল্প শোনবার আগ্রহ তো চিরন্তন। কিন্তু প্রাচীন আখ্যান আর আধুনিক কালের ছোটগল্প স্বরূপধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। উপন্যাসের বিকাশ একটা নির্দিষ্ট পরিণতির স্তরে পৌঁছবার পরেই ছোটগল্পের উদ্ভব হয় এবং এডগার এ্যালান পো, মোপাসাঁ, চেখভ, ও. হেনরী প্রভৃতি শিল্পীদের চর্চায় এটি আঙ্গিকগত উৎকর্ষ লাভ করে। আয়তনের ক্ষুদ্রতাই ছোটগল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। গীতিকবিতার মতো ছোটগল্পের সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত সংঘাতরূপে একটি নির্দিষ্ট সুনির্বাচিত সীমায় জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা যন্ত্রণার একটিমাত্র দিক, জীবনের খণ্ডাংশই বিদ্যুতের মতই মুহূর্তে জীবন্ত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ; বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদের মতই জীবনের একাংশের চকিত স্ফুরণেই মানবজীবনের অপরিমেয়তা আভাসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কাব্যপঙ্‌-ক্তিগুলোতে ছোটগল্পের প্রাণধর্ম আশ্চর্য সুন্দরভাবে দ্যোতিত হয়েছে :

আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পরূপ

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ ॥

আমাদের বৈচিত্র্যহীন ঘটনাসংঘাতবর্জিত, শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন ছোটগল্প রচনার বিশেষ উপযোগী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার কোনও সার্থক প্রয়াস আমরা পাই না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের শিল্পকলার সূত্রপাত করেন এবং তিনিই তার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ১৮৯১ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘাটের কথা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প এবং তাতেই বাংলা সাহিত্যে এই শিল্পমাধ্যমটির আবির্ভাব সূচিত। এরপর কবি 'হিতবাদী' (১৮৯১) সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে ছোটগল্প রচনা করেছেন। জমিদারি তত্ত্বাবধানের সূত্রে পল্লীজনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র ও বহুমুখী ধারার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, কবির শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলো তারই স্বর্ণফসল। পল্লীজীবনের যে অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্প সৃষ্টিপ্রেরণাকে উদ্বোধিত ও তার মূলে প্রাণরস সিঞ্চিত করেছে, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন : "বাংলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি ; এর নতুনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয় অপরিচয়ে মেলা মেশা করছিল মনের মধ্যে।···ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করছিল মনের অন্দর মহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এসেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়।"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পটভূমি

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অফুরন্ত বিষয় বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কিছুসংখ্যক গল্পে সাধারণ সুখদুঃখের ধারায় পল্লীর জীবনযাত্রা ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আবেগস্বচ্ছতা চিত্রিত হয়েছে, 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'শাস্তি', 'দিদি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দান-প্রতিদান', 'ছুটি', 'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি এই জাতীয় গল্প। 'হালদার গোষ্ঠী', 'ঠাকুরদা', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'স্বর্ণমৃগ' প্রভৃতি গল্পে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রম ঘটলে যে বিপর্যয় ও বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্ট হয়, তারই আলেখ্য পাই। কতকগুলো গল্পে সমাজ-সমালোচনা কারুণ্য

সাধারণ সুখ দুঃখের কাহিনী

ও শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় প্রকাশিত : দেনাপাওনা, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর ও পাত্র পাত্রী ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। প্রেমের বিভিন্ন নিগূঢ় আবেগ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাত, তার বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ, প্রতিহত প্রেমের গভীর বিপদ, প্রেমের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার আকুতির ব্যঞ্জনা, প্রেমের সংকীর্ণ, জটিল, স্বার্থপরতার দিক এ-সমস্তই তাঁর একরাত্রি, মহামায়া, সমাপ্তি, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মানভঞ্জন, দুরাশা, অধ্যাপক, শেষের রাত্রি প্রভৃতি গল্পগুলোতে আশ্চর্য কাব্যব্যঞ্জনায় প্রাকৃতিক প্রতিবেশের অর্থগূঢ় চিত্রণে, ইঙ্গিতময়তায় রূপায়িত হয়েছে।

প্রেমের গল্প

শুভা, অতিথি, আপদ প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ চিত্রিত হয়েছে। "নিতান্ত অনায়াসে, সামান্য দুটি একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন—তাঁহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীগুলিরও প্রকৃতির সূর্য-চন্দ্র-খচিত চন্দ্রাতপের তলে, তাহার অভাস-ইঙ্গিত-আহ্বান-বিজড়িত রহস্যময় আঁকাশ-বাতাসের মধ্যে এক অপরূপ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।" বিশেষত তাঁর অবিস্মরণীয় গল্প 'অতিথি'তে প্রকৃতির প্রাণলীলা মানবজীবনে ছন্দায়িত হওয়ার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যেই তার তুলনা মেলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত রসাশ্রিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি এই সকল রচনার নিপুণ কৌশলে ব্যঞ্জনাময় বর্ণনায়, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে, কল্পনার বিচিত্র বর্ণবিলাসে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অতি-প্রাকৃতের বিচিত্র সমন্বয় সাধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা 'রবিবার', 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পের আধুনিক জীবন সমস্যার উপস্থাপনায় কোথায়ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও বাগ্‌ভঙ্গির শাণিত দীপ্তি বিস্ময়কর হলেও সেখানে সজীব প্রাণের কোনও স্পর্শ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের রসনিটোল ছোটগল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যে এই শিল্পকলার গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তিটা নির্মাণ করে যান, পরবর্তী কালের ছোটগল্প লেখকেরা তাঁর পদচিহ্নিত পথই অনুসরণ করেছেন। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় কবির ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন : 'আমাদের এই ব্যাহত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন।... আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া, বাহ্যবিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোটগল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া অবসর দিয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ১। বৈদিক হইতে প্রাচীন স্তরের বাঙলা পর্যন্ত ভারতীয় আর্য-ভাষা-বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক বিবরণী লিখ।

অথবা

প্রশ্ন ২। "সংস্কৃত ভাষা বাঙলা ভাষার জননী"—এই উক্তিটি ভাষা-তত্ত্বের দিক হইতে কতটুকু যথাযথ বিচার কর।

অথবা

প্রশ্ন ৩। বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ-বিষয়ে আলোচনা কর।

উত্তর। 'সংস্কৃত ভাষা বাঙ্‌লা ভাষার জননী'—বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ে গবেষণা-ভিত্তিক সিদ্ধান্তের পূর্বে এটিই ছিল প্রায় সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ। বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের আধিক্য এবং খাঁটি বাঙলা তথা তদ্‌ভব শব্দগুলির সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের নিকট সম্বন্ধহেতু বিবেচনা করা হ'তো যে সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্‌লা ভাষার জননী। ভাষাতাত্ত্বিক অনুশীলনে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্‌লা ভাষার একটা অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হ'লেও সরাসরি সংস্কৃত থেকেই যে বাঙলা ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছে, এমন কথা মেনে নেওয়া চলে না, তবে সংস্কৃত ভাষাই যে ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে কালক্রমে বিবিধ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় তথা বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হ'য়েছে, এই বিজ্ঞানসম্মত অভিমতটিই সর্বজনমান্যতা লাভ করেছে। ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে বলা চলে যে সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাকৃতের তথা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ততঃ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তিত হ'তে হ'তে আনুমানিক খ্রীঃ দশম শতকের দিকে বাঙলা এবং অপরাপর আঞ্চলিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈদিক স্তর থেকে কীভাবে কোন্ স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রম-পরিবর্তন-সূত্রে বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে, নিম্নে তার বিস্তৃত বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হ'লো।

আনুঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের দিকে আর্য-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভারত আগমন শুরু হয়। এই আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ভারতে আগত আর্যগণ যে ভাষায় কথা বলতেন, তাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা' (Old Indo Aryan বা O. I. A.) নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। এই ভাষারই একটা শিষ্টজনসম্মত সাহিত্যিক রূপ আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে। বেদে ব্যবহৃত ভাষাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'বৈদিক

ভাষা বা 'বৈদিক সংস্কৃত'। সপ্তসিন্ধুর কূলেই প্রথম আর্য-উপনিবেশ গড়ে উঠলেও কালক্রমে আর্যরা ক্রমশঃ গঙ্গাযমুনার দুই কূল ধরে অগ্রসর হ'য়ে আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের দিকে গোটা মধ্যভারত পর্যন্ত অধিকার করে ক্রমশই পূর্বদিকেই সরে আসছিলেন। এই দীর্ঘকাল তাঁরা বিভিন্ন অনার্যজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে তাঁদের ভাষায় দেখা দিয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। তখন তাঁরা এই ভাষার সংস্কার সাধন করেন—ফলতঃ সংস্কার-কৃত এই ভাষার নাম হয় 'সংস্কৃত' তথা 'লৌকিক সংস্কৃত'।

অতএব প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি মার্জিত সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে—একটি 'বৈদিক সংস্কৃত' অপরটি 'লৌকিক সংস্কৃত'। অতিশয় শিথিলভাবে দুটিকেই আমরা সাধারণতঃ 'সংস্কৃত' নামেই অভিহিত করে থাকি। অনুমান করা হয়, সেকালে এ দুটির বাইরে আরো একটি ভাষা লোকসাহিত্য রচনার কাজে ব্যবহৃত হ'তো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দু'চারটি শব্দ পাওয়া গেলেও ঐ ভাষায় লিখিত কোন সাহিত্য একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার এই তিনটি রূপের অতিরিক্ত যে আর একটি কথ্যরূপ ছিল, তা কিন্তু অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে লোকের মুখে মুখে ক্রমবিবর্তিত হ'তে হ'তে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছিল।

ভাষা নদীস্রোতের মতই চিরপ্রবাহমানা। এর গতিপথে যেমন ভিন্ন ভাষার স্রোত এসে এর সঙ্গে উপনদীর মতো মিশ্রিত হয় তেমনি এর ভিন্নতর শাখারূপেও অনেক স্রোতধারার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। কখন বা নদীতে বাঁধ বেঁধে তার কিছু জলকে হ্রদের মতো আবদ্ধ করে রাখা হয়, কিন্তু কোন বিপর্যয় না ঘটলে নদীর মূল ধারা শুধু এগিয়েই চলে—এর গতিপথ সরল না হ'তে পারে, কোথাও বাঁক ফিরতে পারে,—অঞ্চল-বিশেষে এই স্রোতোধারা ভিন্ন নামেও পরিচিত হ'তে পারে,—কিন্তু মূল নদীটি অখণ্ডপ্রবাহেই আপনার গতিপথ করে চলে। ভারতীয় আর্যভাষাও এই নদীর মতোই অখণ্ডপ্রবাহে ব'য়ে চলছে—যেখানে সে বাঁক ফিরেছে সেখানে ভিন্ন নামে পরিচিত হ'লেও ধারাটি কিন্তু অবিচ্ছিন্ন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তাই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় যখন রূপান্তরিত হ'লো, কালের বিচারে সে সময়টা আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক, নামের বিচারে তাকে বলা হয় 'প্রাকৃত'।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রী. পূঃ ৬ষ্ঠ শতক—এই সহস্রাব্দকালবিস্তৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত তথা মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হবার পর তার স্থিতিকাল ছিল আরো দ্ব্যর্ধসহস্রাব্দকাল অর্থাৎ অন্ততঃ দেড় হাজার বছর। এই সুদীর্ঘ-কালের ব্যবধানে ভাষাদেহে অনেক নতুন লক্ষণ প্রকটিত হওয়াতে প্রাকৃত তথা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo Aryan বা M. I. A) অন্ততঃ তিনটি স্তরে বিবর্তিত হয়েছিল,বলা যেতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত 'আদিস্তর', খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় থেকে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত 'ক্রান্তিকাল', খ্রীঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত 'মধ্যস্তর' এবং খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ দশম শতক পর্যন্ত 'অন্ত্যস্তর'।

প্রাকৃতের আদিস্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধদের পালিভাষায় রচিত

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও কাহিনীতে এবং অশোক ও সমসাময়িক কালে রচিত বিভিন্ন শিলা-লিপিতে। অশোকের সমকালেই যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন শিলালিপিগুলির ভাষা-বিচারে। উত্তর প্রদেশের যোগীমারা গুহায় 'শুতনুক।' (সুতনুকা) নামে যে শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভাষাকে বলা হয়েছে 'পূর্বীপ্রাচ্যাপ্রাকৃত'। এ ছাড়া অন্যান্য শিলালিপিতে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষারূপ বিধৃত রয়েছে।

আদিস্তরের প্রাকৃতের বিবর্তিত রূপের পরিচয় পাই মধ্যস্তরের প্রাকৃতে। মধ্যস্তরের প্রাকৃতের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন নাটকে এবং প্রাকৃত কাব্য-মহাকাব্যে। সংস্কৃত নাটকের মহিলাচরিত্রের এবং অশিক্ষিত পুরুষচরিত্রের মুখে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে মধ্যস্তরের এই প্রাকৃত ভাষাকে বলা হয় 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'। নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃতগুলির মধ্যে রয়েছে—নারীমুখের ভাষায় ব্যবহৃত 'শৌরসেনী প্রাকৃত', গীতের ভাষায় ব্যবহৃত 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত' এবং অশিক্ষিত পুরুষের মুখে 'মাগধী প্রাকৃত'। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে স্বাধীনভাবে কাব্য-মহাকাব্যাদি রচিত হ'লেও অপর দুটি প্রাকৃতে রচিত কোন সাহিত্য পাওয়া যায় না। জৈনধর্মাবলম্বীগণ 'অর্ধমাগধী' প্রাকৃতে তাঁদের বহু শাস্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করে গেছেন। 'পৈশাচী' প্রাকৃতে গুণাঢ্য বড্ড কহা (বৃহৎ কথা) রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়—কিন্তু গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি। এই মধ্যস্তরের প্রাকৃতই আবার ক্রম বিবর্তিত হয়ে অন্ত্যস্তরে পরিণত হয়েছে।

অন্ত্যস্তরের প্রাকৃতের সাধারণ প্রচলিত নাম 'অপভ্রংশ' এবং অপভ্রংশের-অর্বাচীন রূপকে বলা হয় 'অবহট্ট' (অপভ্রষ্ট)। তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রতিটি প্রাকৃতেরই অপভ্রষ্ট রূপ স্বীকার করা হয় বলে 'শৌরসেনী অপভ্রংশ', 'মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ' ও 'মাগধী অপভ্রংশে'র কথা বলা হয়, কিন্তু কার্যতঃ শৌরসেনী ছাড়া অপর কোন অপভ্রংশ বা অবহট্ট ভাষার নিদর্শন বাস্তবে পাওয়া যায় না। শৌরসেনী অবহট্ট এক সময় সমগ্র উত্তর ভারতে শিষ্টজনসম্মত সাহিত্য ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। এই অবহট্ট ভাষা থেকেই আনুঃ খ্রীঃ দশম শতকের দিকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটে থাকে। আচার্য সুকুমার সেন বলেন, "নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভবের সময়ে ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য। এই কাল্পনিক ধাত্রী ভাষাটিকে বলা হইল প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য (Proto-New Indo-Aryan)। অপভ্রষ্টের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর হইল এই প্রত্ন নব্য ভারতীয়।"

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্য রূপটি খ্রীঃ পূর্ব শতাব্দীতে যে সকল আঞ্চলিক প্রাকৃতে পরিণতি লাভ করে তাদের মধ্যে একটি ছিল 'শুতনুকা লিপি'তে প্রাপ্ত 'পূর্বীপ্রাচ্যা'। লক্ষণ-বিচারে দেখা যায় এই পূর্বীপ্রাচ্যাই মাগধী-প্রাকৃত নামে সাহিত্যিক প্রাকৃতে রূপ লাভ করে। অনুমিত হয়, এই মাগধীপ্রাকৃতই কালক্রমে মাগধী অপভ্রংশ ও তা থেকে

মাগধী অবহট্টে পরিণত হয়। মাগধী অবহট্ট যে প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হয়, সেটিই মালবে প্রাপ্ত শিলালিপির 'গৌড়ী' ভাষা। এটি থেকেই পূর্ব ভারতীয় বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং মৈথিলি, মগহী, ভোজপুরিয়া-আদি বিহারী ভাষাগুলির উদ্ভব ঘটে।

বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'—আনুমানিক খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়। এই কালটিকে বলা হয় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের 'আদিযুগ'। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সদ্য-উদ্ভূত বাঙলা ভাষায় তাঁদের সাধন-ভজন-বিষয়ক তত্ত্বাদি এই গ্রন্থে বিভিন্ন পদের আকারে রচনা করেছিলেন। চর্যাপদ ধর্মীয় সাহিত্য। খ্রীঃ ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর অর্ধাংশ পর্যন্ত ছিল ক্রান্তিকাল এরপর ১৩৫০খ্রীঃ থেকে ১৪০০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগ। এর মধ্যে আবার ১৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত আদিমধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ। এই যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিদ্যাপতির 'বৈষ্ণবপদাবলী', কিছু অনুবাদ সাহিত্য এবং কয়টি প্রধান মনসামঙ্গল কাব্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙলার সাহিত্যে ও সমাজে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল অনেকখানি। অন্ত্যমধ্যযুগে তথা চৈতন্যোত্তর যুগে জীবনীসাহিত্য, পদাবলীসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য ও নানাজাতীয় লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব এবং তার পরই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকেই বলা হয় 'আধুনিকযুগ'।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিক যুগের কথ্যভাষা কীভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙলায় উপনীত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুটি পদ অবলম্বন করে তার সুন্দর দৃষ্টান্ত নির্মাণ করেছেন।

(১) বৈদিক যুগের কথ্যভাষা (অনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ) পাত্রং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা রুক আবিসতি পারধি। দৃক্ষিত্বা যদৃশং মনোধি ভবতি চিহ্ন্যতে অমুখ (+বৃতে)।

(২) প্রাচ্য প্রাকৃত (আঃ খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ অব্দ) :—গানং গাথেত্বা নাবং বাহেত্বা ককে আবিশতি পালধি। দেকৃখিত্বা যদিশনং মনধি হোতি চিন্‌হিয়তি অমুশ্‌শ কলধি।

(৩) মাগধীপ্রাকৃত (আঃ ২০০ খ্রীঃ) :—

গাণং গাধিত্যা নাবং বাহিত্য কগে আবিশদি পারধি। দেকৃখিঅ যাদিশণ মনধি ভোদি চিন্‌হিঅদি অমুশ্‌শ কলধি ।

(৪) মাগধী অপভ্রংশ (আঃ ৭০০ খ্রীঃ):—
গাঁন গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই আবিশই পারহি।
দেকৃখিঅ জইহণ মনহি হোই চিণহিঅই ওহঅলহি।

(৫) প্রাচীন বাঙলা (প্রাচীন গৌড়ীয় ভাষা-আঃ ১১০০ খ্রীঃ) : গান গাহিআ নাও বাহিআ কে আইশই পারহি। দেখিআ জৈহণ মনে হোই চিণহিঅই ওহারহি ॥

(৬) মধ্যযুগের বাঙলা (আঃ ১৫০০ খ্রীঃ):—

গান গায়া নাও বায়্যা কে আশ্যে পারে।

দেখ্যা জেন্অ মনে হোএ চিনী ওআরে।

(৭) আধুনিক যুগের বাঙলা (রবীন্দ্রনাথের রচনা) :—

গান গেয়ে না বেয়ে কে আসে পারে—

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

(৮) সাম্প্রতিক উচ্চারণে—

গান গেয়ে নাও বেয়ে কে আশে পারে —

দেখে জ্যানো মোনে হয়, চিনি ওরে।

বৈদিকযুগ থেকে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ভাষাস্রোত একাল পর্যন্ত চলে এসেছে—মাঝে মাঝে শুধু এর রূপান্তর লাভের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও পরিবর্তন ঘটেছে

আনুঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকেই প্রথম আর্যদের একটি শাখা ঈরান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতবর্ষে যে ভাষা ব্যবহার করতো, তাকে বলা হয় ভারতীয় আর্যভাষা (Indo-Aryan Language)। এই ভাষা মূল ইন্দো-ঈরাণীয় ভাষার (Indo-Iranian Language) তথা আর্যভাষার (Arayan Language) একটি প্রধান শাখা।

ভারতীয় আর্যভাষা সুদীর্ঘ সাড়ে তিন হাজার বছরের পথ-পরিক্রমায় অন্ততঃ তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত হ'য়েছে। ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের প্রথম দিককার রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতক। ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন যুগের শুরু এ থেকেই। অতএব প্রথম যুগ—(১) প্রাচীন যুগ বা 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা' (খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ—খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) (২) দ্বিতীয় যুগ বা 'মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা' (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক—খ্রীঃ দশম শতক) এবং (৩) তৃতীয় যুগ বা 'নব্যভারতীয় আর্যভাষা' (খ্রী দশম শতক থেকে অদ্যাবধি)।

প্রাচীন ভারতে প্রায় হাজার বছর কাল যে সারা দেশে ভাষার একটি মাত্র রূপই প্রচলিত ছিল তা নয়,—দেশ-কাল-ভেদে তার মধ্যে যথেষ্ট রূপান্তর দেখা দিয়েছিল, এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'বৈদিক ভাষা' অর্থাৎ যে ভাষায় বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এই 'বৈদিক ভাষা' বা 'বৈদিক সংস্কৃত' ছিল কথ্যভাষারই একটি মার্জিত রূপ। বৈদিক ভাষা ছাড়াও সব-সময়ে সম্ভবতঃ আর একটি ভাষা প্রচলিত ছিল যার সাহায্যে 'লৌকিক সাহিত্য' রচিত হ'তো। এই 'লৌকিক সাহিত্যের ভাষা' দুর্ভাগ্যক্রমে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। ঐ যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কথ্যভাষার মধ্যেও যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল, তা' প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কথ্য ভাষার অন্ততঃ তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়,—'উদীচ্যা' বা উত্তরাঞ্চলীয় কথ্য ভাষা, 'মধ্যদেশীয়া' বা মধ্যাঞ্চলের কথ্যভাষা এবং 'প্রাচ্যা' বা পূর্বাঞ্চলের কথ্য ভাষা। পূর্বোক্ত লৌকিক সাহিত্যের ভাষার সংস্কার সাধন ক'রে অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে কিংবা তার পূর্বেই সৃষ্টি করা হ'য়েছিল 'সংস্কৃত' তথা লৌকিক সংস্কৃত ভাষার। এই ভাষা প্রধানতঃ সাহিত্য রচনার কাজেই ব্যবহৃত হ'তো এবং ধর্মীয়সাহিত্য এবং ধর্মীয়কৃত্যে এখনও সর্বভারতে এই ভাষা ব্যবহৃত হ'য়ে চলছে। মহামুনি পাণিনি-কর্তৃক সংস্কার-পূত. এই সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এই ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদিও রচিত হ'য়েছে। এগুলি ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয়

আর্যভাষার আর একটি ধারার স্রষ্টা ছিলেন সেকালের মহাযানপন্থী বৌদ্ধাচার্যগণ। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতভাষার মিশেল দিয়ে কালোপযোগী সহজবোধ্য যে ভাষা সৃষ্টি করেন, তাকে বলা হয় 'বৌদ্ধসংস্কৃত' বা 'মিশ্র সংস্কৃত'। বৌদ্ধগণ এই ভাষায় অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও কাহিনী রচনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার এতগুলি রূপভেদ বর্তমান থাকলেও এদের মধ্যে প্রধান 'বৈদিক সংস্কৃত' ও 'লৌকিক সংস্কৃত'।

প্রশ্ন ৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পরিচয় দাও।

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ:

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম রূপটি বর্তমান রয়েছে বেদে এবং তার সর্বাধিক প্রচলিত অর্বাচীন রূপ 'লৌকিক 'সংস্কৃত' ভাষার নিদর্শন রামায়ণ-মহাভারতাদি মহাকাব্য, অষ্টাদশ পুরাণ এবং সংখ্যাতীত কাব্য, নাটক, গদ্য-প্রবন্ধাদি বিভিন্ন গ্রন্থে। প্রায় হাজার বছর স্থিতিকালের মধ্যে ভাষায় নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হ'লেও এতে যে সাধারণ লক্ষণসমূহ বর্তমান রয়েছে নিম্নে তার পরিচয় দেওয়া হ'লো।

১। ইন্দো-ঈরাণীয় তথা আর্যভাষা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত ভাষা যখন স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তাতে স্বরবর্ণের সংখ্যা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অতি হ্রস্ব 'অ' এবং হ্রস্ব 'এ' 'ও' সংস্কৃতে নেই। ইন্দো-ঈরাণীয় 'অই' এবং 'অউ' সংস্কৃতে যথাক্রমে দীর্ঘ 'এ' দীর্ঘ 'ও' কারে পরিণত হয়।

২। আদি আর্যভাষার কণ্ঠাশ্রিত ধ্বনি ছিল তিন প্রকার, সংস্কৃতে একপ্রকার রূপ লাভ করে—ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

৩। বৈদিক 'চ' বর্গের উচ্চারণ ছিল 'তালব্য', পরবর্তীকালে লৌকিক সংস্কৃতে তার উচ্চারণ হয় 'ঘৃষ্ট'।

৪। আর্যভাষার কয়েকটি ঘৃষ্টধ্বনি (খ., খ., ক.) এবং উষ্মধ্বনি (জ,. জ´, ঝ. ঝ´.) সংস্কৃতে বর্জিত হয়েছে।

৫। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবে সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির আগম ঘটে— ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

৬। সংস্কৃতে প্রতি বর্গেরই একটি অনুনাসিক ধ্বনি বর্তমান ছিল—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

৭। সংস্কৃতে চারটি উষ্মধ্বনিরই বাহুল্য ব্যবহার বর্তমান ছিল, এদের মধ্যে তিনটি শিসধ্বনি শ, ষ, স, এবং হ।

৮। বৈদিক যুগে স্বরের (Pitch accent) ব্যবহার ছিল আবশ্যিক—ফলতঃ বৈদিক সাহিত্য ছিল সঙ্গীতাত্মক ; পরবর্তীকালে স্বরের ব্যবহার বিলুপ্ত হয়।

৯। অপশ্রুতি (Ablant) অর্থাৎ স্বরবর্ণের গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ সংস্কৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১০। সংস্কৃতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার ছিল যথেষ্ট।

১১। শব্দে ধাতুর অর্থ গোড়ার দিকে মোটামুটি অবিকৃত থাকলেও পরবর্তীকালে অর্থ পরিবর্তন দেখা যায়।

১৩। সংস্কৃতে শব্দরূপে ছিল যথেষ্ট বৈচিত্র্য—তিন লিঙ্গ, তিন বচন এবং ৮ প্রকার কারক-অনুযায়ী শব্দের রূপভেদ হয়।

১৩। সংস্কৃতে ধাতুরূপেও ছিল অনুরূপ বৈচিত্র্য—উত্তম, মধ্যম ও নাম তিন প্রকার পুরুষ, আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ এই দুই প্রকার পদ, কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য এবং পাঁচপ্রকার কাল ও পাঁচপ্রকার ভাব (mood) বর্তমান ছিল।

১৪। শব্দ ও ধাতুর আদিতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হ'লেও উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

১৫। সন্ধির ব্যবহার ছিল যথেষ্ট, পরবর্তীকালে তা' প্রায় আবশ্যিক হ'য়ে দাঁড়ায়।

১৬। সমাসেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল।

১৭। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ-সৃষ্টির ছিল যথেচ্ছ ব্যবহার।

১৮। বাক্যে পদবিন্যাসের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

১৯। ছন্দঃপ্রকৃতি ছিল প্রধানতঃ অক্ষরমূলক, পরের দিকে অবশ্য মাত্রামূলক ছন্দও প্রচলিত হয়।

(খ) বৈদিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য :

'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা' বলতে 'বৈদিক' এবং 'সংস্কৃত'—উভয় ভাষাকেই বোঝালেও এ দু'য়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর্যগণ ভারতের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকালেই বেদ রচনা করেছিলেন বলে বৈদিক ভাষায় উদীচী অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাণিনির জন্ম হ'লেও তিনি পাটলীপুত্রবাসী ছিলেন বলে তাঁর ব্যাকরণে এবং ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে মধ্যদেশীয় ভাষার প্রভাবই ছিল অধিকতর। বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্যের এটা একটা বড় কারণ।

১. ধ্বনির দিক্ থেকে বৈদিক এবং সংস্কৃতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। মনে হয় বৈদিকে একটা মূর্ধন্য (ল) ধ্বনি ছিল, যা সংস্কৃতে বর্জিত হ'য়েছে। তৎপরিবর্তে কোথাও 'ল', কোথাও 'ড়' ব্যবহৃত হয়। তাই ঋগ্‌বেদের প্রথম ঋক্‌টির দু'রকম পাঠ পাওয়া যায়—'অগ্নিমীলে', 'অগ্নিমীড়ে'।

২. বৈদিকে, বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদে স্বর (Pitch accent) ছিল অপরিহার্য ; স্বরের পরিবর্তনও ঘটতে পারতো কিন্তু সংস্কৃতে স্বরের কোন স্থান নেই।

৩. সংস্কৃতে শব্দরূপ যেমন আছে, বৈদিকে তার অতিরিক্ত কিছু পদ ছিল, অন্য বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বৈদিকে ১মা বহুবচনে অতিরিক্ত পদ 'নরাসঃ'।

৪. সংস্কৃতে ভাব (mood) ছিল দু'টি—অনুজ্ঞা (লোট্) ও সম্ভাবক বা বিধি (লিঙ) ; বৈদিকে অতিরিক্ত ভাব—অভিপ্রায় (লিট্) এবং নির্বন্ধ (Injunctive)। সংস্কৃতে নির্বন্ধভাবের প্রয়োগ শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্রেই বিহিত ছিল—'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগে।

৫. বৈদিকে বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং ভবিষ্যৎ—এই চার কালের বিভিন্ন ভাবের রূপ হতে পারতো, কিন্তু সংস্কৃতে শুধু বর্তমান কাল এবং কখনো কখনো সামান্য অতীতের ভাবান্তর হয়।

৬. বৈদিকে ক্ত্বাচ-ল্যপ্, তুম্-তবৈ,-ত্বায়,-ত্বী,-ত্বানম্,-ত্বীনম্ প্রভৃতি অসমাপিকা পদের এবং শতৃ-শানচ, ক্বসু-কানচ্, স্যতৃ-স্যমান প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বিশেষণের বহুল প্রয়োগ ছিল, সংস্কৃতে এই বাহুল্য কমে গিয়ে অল্প কয়েকটিতে পর্যবসিত হ'য়েছে।

৭. বৈদিকে কয়েকটি উপসর্গের স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ব্যবহার ছিল, সংস্কৃতে এদের প্রায় সব কটিই শব্দের আগে যুক্ত হয়, শুধু 'আ, অনু, প্রতি' প্রভৃতি ক্বচিৎ পরসর্গ-রূপে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

৮. বৈদিকে দু'য়ের অধিক পদে সমাস হ'তো না, সংস্কৃতে বহুপদী সমাসের ব্যবহার যথেষ্ট।

৯. অতীতকালে সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের প্রয়োগ সংস্কৃতে নতুন এসেছে, বৈদিকে ছিল না।

১০. বৈদিকে ছিল না এমন বহু শব্দ এবং ধাতু সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে, এবং বৈদিকের বিপুল শব্দভাণ্ডারের একটা বড় অংশ সংস্কৃতে পরিত্যক্ত হ'য়েছে।"

('ভাষাবিদ্যা-পরিচয় :—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

প্রশ্ন ৫। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ-বিভাগসহ সাধারণ লক্ষণ-সমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকে আর্যগণ ভারতে আগমন করেন। তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাকে বলা হয় 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'। এই ভাষারূপ মোটামুটি একই ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। এর পর থেকেই ভাষা-দেহে পৃথক্ লক্ষণসমূহ ফুটে ওঠায় ভাষাকে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়—এর নাম 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা' (Middle Indo Aryan Language)—সাধারণ ভাবে এই যুগের ভাষার অতি প্রচলিত নাম 'প্রাকৃত'। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টোত্তর দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত এই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃতকে তিন যুগে (একটি ক্রান্তিকালসহ) বিভক্ত করা হয়।—(১) আদিযুগ বা প্রাচীন প্রাকৃতের কাল—আঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে আঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ ; (২) যুগসন্ধিকাল বা ক্রান্তিকাল—আঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে আঃ ২০০ খ্রীষ্টাব্দ ; (৩) মধ্যযুগ বা সাহিত্যিক প্রাকৃতের কাল—আঃ ২০০ খ্রীঃ থেকে ৬০০ খ্রীঃ ; (৪) অন্ত্যযুগ বা অপভ্রংশের কাল—৬০০ খ্রীঃ থেকে ১০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই তিন যুগের ভাষায় বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকায় এগুলিকেই প্রাকৃতের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা হয়।

প্রাকৃতের সাধারণ লক্ষণ :—

প্রাকৃতের সাধারণ লক্ষণগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—(ক) ধ্বনিগত, (খ) রূপগত ও (গ) পদগত।

(ক) ধ্বনিগত লক্ষণ :—

১. প্রাকৃতে 'ঋ', 'ঌ', 'ঐ' এবং 'ঔ'-কারের ব্যবহার ছিল না। 'ঋ'-কার স্থলে আর কোন স্বর বা 'র'-যুক্ত স্বর, 'ঐ' স্থলে 'এ' এবং 'ঔ'- স্থলে 'ও' ব্যবহৃত হ'তো—এটিই সাধারণ নিয়ম, তবে ব্যতিক্রমও ছিল। যথা—মৃগ>মগ, মিগ, মুগ, ম্রিগ, ম্রুগ। বৃক্ষ>রুক্খ, লুচ্ছ, ব্রচ্ছ। ঋষি>হসি। তৈল>তেল, তেল্ল। পৌর>পোর।

২. প্রাকৃতে 'অয়'>'এ' এবং 'অব'>'ও' হতো,, যথা-কথয়তু>কথেতু। ভবতি>হোদি।

৩. পদান্তে 'ম্'-জাত ও ক্বচিৎ 'ন্'-জাত অনুস্বার ছাড়া অপর সকল ব্যঞ্জন লুপ্ত হ'তো। যথা—পুত্রাৎ>পুত্তা, মনস্>মন।

৪. তিনটি শিস্ ধ্বনির মধ্যে মাগধীপ্রাকৃতে শুধু 'শ' এবং অন্যত্র শুধু 'স' হতো। যথা—সুতনুকা>শুতনুকা, শেল>সেল্ল।

৫. পদের আদি যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে বিশ্লিষ্ট অথবা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে এবং পদমধ্যে যুক্তব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে ও পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। যথা—ত্রীনি> তিন্নি। কার্য>কজ্জ। স্নান>সিনান। কল্যাণ>কল্লাণ।

৬. স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লুপ্ত হয়েছে ও মহাপ্রাণ হলে 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে : যথা—শৃগাল>সিআল, মধু>মহু, সখী>সহী, লোক>লোঅ ;

(খ) রূপগত লক্ষণ :—

১. পদের অন্তে স্থিত ব্যঞ্জনলোপের ফলে অধিকাংশ ব্যঞ্জনান্ত শব্দই স্বরান্ত শব্দে পরিণত হয়। প্রাকৃতে 'আ-'কারান্ত, ই-কারান্ত প্রভৃতি শব্দরূপ থাকলেও অধিকাংশ শব্দের রূপ হতো 'অ-'কারান্ত শব্দের মতো। যথা-কর্মণে>কম্মায়, লতায়াঃ > লতাস্স।

২. প্রাকৃতে দ্বিবচন ছিল না, তৎ-পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহৃত হতো।

৩. প্রাকৃতে শব্দরূপে অনেক সরলতা এসে গেলো। ১ম ও ২য়ার বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের রূপে কোন পার্থক্য রইলো না। পঞ্চমীর একবচনে 'তস্' এবং সপ্তমীর একবচনে 'স্মিন'-এর ব্যবহার অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। এছাড়াও সর্বনামের প্রথমার বহুবচনে 'এ' বিভক্তি দ্বিতীয়ার বহুবচনে এবং তৃতীয়ার 'হি' বিভক্তি চতুর্থী ও পঞ্চমীতেও ব্যবহৃত হতো।

৪. প্রাকৃতে ধাতুরূপও অনেক সহজ সরল হয়ে গেল। সংস্কৃতের বৈচিত্র্য আর প্রাকৃতে রইলো না। সংস্কৃতের দশটি গণের মধ্যে শুধু ভ্বাদি-গণই প্রাকৃতে অবশিষ্ট রইলো। প্রাকৃতে আর আত্মনেপদও রইলো না, সবই পরস্মৈপদে পরিণত হলো। লিট্ লোপ পেলো, লঙ্ এবং লুঙ্-ও একসঙ্গে মিশে গেল। অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য প্রাকৃতে অনেক কমে গেল, ক্রিয়ার মধ্যে শুধু রইলো—বর্তমান কালের নির্দেশক (লট্), অনুজ্ঞা (লোট্), সম্ভাবক (বিধিলিঙ) এবং ভবিষ্যৎকাল (লৃট্) ; অতীত কালের অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হতো 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত (শিষ্টান্ত) পদ।

(গ) পদগত লক্ষণ :—

১. প্রাকৃতে পদ-গঠন ছিল নাম-মূলক (nominal)

২. প্রাকৃতে অধিকাংশ বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত হয়ে-যাবার ফলে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপে ব্যবহার করে বিভক্তির অভাব পূরণ করা হতো।

৩. বিভক্তিযুক্ত পদের সংখ্যা কমে যাওয়াতে পদস্থাপন রীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলো।

প্রশ্ন ৬। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বিভিন্ন যুগে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার পরিচয় দাও।

উত্তর। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্থায়িত্ব কাল ছিল মোটামুটি দেড় হাজার বছর, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টোত্তর দশম শতক পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মধ্য-

ভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতভাষা তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। (ক) আদিযুগ বা প্রাচীন প্রাকৃত (খ) মধ্যযুগ বা সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং (গ) অন্ত্যযুগ বা অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ।

(ক) **আদিযুগের প্রাচীন প্রাকৃত:** আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি কাল। হীনযানপন্থী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পালি-ভাষায় লিখিত বিভিন্ন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে এবং মহামতি অশোকের অনুশাসন ও সমসাময়িক অপর কিছু কিছু শিলালিপিতে আদিযুগের প্রাচীন প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের নির্দেশেই তাঁর শিষ্যগণ সকায় নিরুত্তিয়া বা নিজস্ব মাতৃভাষায় বুদ্ধদেবের নির্দেশাদি এবং ধর্মীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই ভাষাকে বলা হয় 'পালিভাষা'। এই পালিভাষা কোন সমকালীন কথ্য ভাষা না হ'লেও কোন কথ্য প্রাকৃতের আধারে গঠিত একটি মার্জিত সাহিত্যিক ভাষা। হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণ তাঁদের ধর্মীয় ব্যবহারে এই পালিভাষাই ব্যবহার করতেন। জাতকাদি-কাহিনী গ্রন্থে পালিভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

পালিভাষা ছাড়া প্রাচীন প্রাকৃতের অপর নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপিতে, এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) অশোক অনুশাসন (খ) খারবেল অনুশাসন, (গ) সুতনুকা প্রত্নলেখ এবং (ঘ) হেলিওদোরের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গিরিগাত্রে বা স্তম্ভে খোদিত অশোকের অনুশাসনে সমকালীন ভারতে প্রচলিত কিছু আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ভারতবর্ষে প্রাচীন প্রাকৃতের অন্ততঃ নিম্নোক্ত আঞ্চলিক রূপগুলি যে প্রচলিত ছিল, সমকালীন বিভিন্ন শিলালিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়:—উত্তর পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা ও প্রাচ্যা। অশোকের গিরিলিপি ও প্রস্তরলিপি (Mojar Rock Edict), ক্ষুদ্র গিরিলিপি (Minor Rock Edict), স্তম্ভলিপি (Pillar Inscription) এবং গুহালিপিতে (Cave Inscription) এই কয়টি আঞ্চলিক ভাষারূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে উড়িষ্যায় যে খারবেল-কৃত অনুশাসন পাওয়া যায় তার ভাষার সঙ্গে অশোক-অনুশাসনের প্রাচ্যা ভাষার সাদৃশ্য কম, বরং দক্ষিণা-পশ্চিমা ভাষার সঙ্গেই মিল বেশি।

উত্তর প্রদেশের রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় তিন পংক্তির একটি প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে—'সুতনুক নাম দেবদশিক্যি।

তং কময়িথ বলনশেয়ে

দেবদিনে নম লুপদখে।'

অর্থাৎ সুতনুকা নামে দেবদাসী-তাকে কামনা করেছিল বারাণসীবাসী দেবদিন্ন (দেবদত্ত?) নামে রূপদক্ষ। এটিকে 'সুতনুকা প্রত্নলিপি' নামে অভিহিত করা হয়. এর

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এটিকে বলা হয় 'পূর্বীপ্রাচ্য'—যার সঙ্গে পরবর্তীকালের 'মাগধী প্রাকৃতে'র যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাচীন প্রাকৃত ছাড়াও এযুগে 'গাথা ভাষা' নামে একটা মিশ্র ভাষা গড়ে উঠেছিল এ যুগেই—মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃত মিশিয়ে এই ভাষা (এরই নামান্তর 'মিশ্রসংস্কৃত 'বা' বৌদ্ধ সংস্কৃত') সৃষ্টি করে তাঁদের শাস্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন।

(খ) মধ্যস্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃত : আচার্য সুকুমার সেন খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে পৃথক ক্রান্তিকাল বলে স্বীকার না করে এটিকেও মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত ক'রে থাকেন। ফলতঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০ থেকে ৬০০ খ্রীঃ কালকেই আমরা প্রাকৃতের মধ্যযুগ তথা 'সাহিত্যিক প্রাকৃতে'র যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। এই যুগের ভাষাও প্রাচীন প্রাকৃতের মতই বহুধা বিভক্ত ছিল। প্রধানতঃ সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখে এ জাতীয় প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায় বলেই য়ুরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীরা একে Dramat c Prakrit নামে আখ্যায়িত করেছিলেন —আমরা এটিকেই বলি 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'।

প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ সাহিত্যিক প্রাকৃতের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ করেছেন—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী ও অপভ্রংশ। একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা অবশ্য অপভ্রংশকে সাহিত্যিক প্রাকৃত না বলে সর্বপ্রকার প্রাকৃতের শেষ পরিণতি বলে গ্রহণ ক'রে থাকেন।

(১) **'মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত' :**—বৈয়াকরণগণ মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকেই আদর্শ প্রাকৃত-রূপে গ্রহণ করলেও এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালেই। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম নাট্যকার অশ্বঘোষের নাটকে অন্যান্য প্রাকৃত থাকলেও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যবহার নেই। পরবর্তী সংস্কৃত নাটকে গানের ভাষা মাহারাষ্ট্রী। এ ছাড়া মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে বহু স্বাধীন কাব্য-মহাকাব্য-নাটকও রচিত হ'য়েছে—অপর কোন প্রাকৃতের এ সৌভাগ্য হয় নি।

(২) **শৌরসেনী প্রাকৃত :**—সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ নারীর মুখের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত। এই প্রাকৃতটি শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলে উদ্ভূত হ'য়েছিল বলে অনুমান করা চলে। দু' একটি স্থল ছাড়া মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সঙ্গে এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারো কারো মতে শৌরসেনী প্রাকৃত থেকেই মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের উদ্ভব ঘটে। সংস্কৃত ভাষার প্রভাব শৌরসেনী প্রাকৃতেই সর্বাধিক লক্ষিত হয়।

(৩) **মাগধী প্রাকৃত :**—নাম থেকে অনুমিত হয় যে মাগধী প্রাকৃতের উদ্ভবস্থল মগধ। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী প্রাকৃত কোন অঞ্চলেরই কথ্য ভাষা ছিল না। সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ অশিক্ষিত নীচজাতীয় পাত্রের মুখে ব্যবহৃত এই মাগধী প্রাকৃত নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষারূপেই উদ্ভূত হ'য়েছিল বলে অনুমান করা হয়। সুতনুকা প্রত্নলিপিতে যে সকল ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেই সমস্ত লক্ষণ মাগধী প্রাকৃততেও উপস্থিত, যথা—তিনটি শিস্‌ধ্বনির মধ্যে শুধু

'শ'-এর ব্যবহার, 'র'-স্থলে 'ল' এবং পদান্তে বিসর্গ-যুক্ত 'অ'-স্থলে 'এ'-র ব্যবহার। এ থেকে অনুমান করা চলে যে প্রাচীন প্রাকৃতের পূর্বীপ্রাচ্যাই ক্রমবিবর্তনের ফলে মাগধীপ্রাকৃতে রূপান্তরিত হ'য়েছে। সংস্কৃত নাটকের বাইরে মাগধী প্রাকৃতের কোন ব্যবহার পাওয়া যায় নি। 'চাণ্ডালী' শাবরী, শাকারী' প্রভৃতিকে মাগধী প্রাকৃতের বিভাষা বলে উল্লেখ করেছেন বৈয়াকরণরা।

(৪) **অর্ধমাগধী** :—জৈন সাধুগণ তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে অর্ধমাগধী প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন, এর নামান্তর 'আর্যপ্রাকৃত' বা 'জৈনপ্রাকৃত'। অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর ব্যবহার রয়েছে। এই প্রাকৃতে যেমন মাগধীর লক্ষণ বর্তমান, তেমনি রয়েছে শৌরসেনী এবং মাহারাষ্ট্রীরও কিছু কিছু লক্ষণ। ফলতঃ অর্ধমাগধীকে একটি মিশ্রপ্রাকৃত বলেই গ্রহণ করা চলে। এতে সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই ভাষায় বহু জৈনগ্রন্থাদি রচিত হয়েছে।

(৫) **পৈশাচী প্রাকৃত** :—প্রাচীন বৈয়াকরণগণ পৈশাচী প্রাকৃতের নাম উল্লেখ করলেও কার্যতঃ এর কোন ব্যবহার পাওয়া যায় না। তবে গুণাঢ্য পৈশাচী প্রাকৃতেই তাঁর 'বড্ড্ কহা' (বৃহৎকথা) গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন বলে জানা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থটির বিলুপ্তির জন্য এই ভাষার নিদর্শন দুর্লভ। কেহ কেহ মনে করেন, পৈশাচী প্রাকৃত মূলতঃ ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়, এটি করদীয় ভাষার একটি শাখা। আবার গান্ধারী প্রাকৃতের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

(৬) **অপভ্রংশ** :—প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রাকৃতের শেষ পরিণতিই অপভ্রংশ। এটি পৃথক্ কোন সাহিত্যিক প্রাকৃত নয়। ((পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)

(গ) অন্ত্য যুগের অপভ্রংশ :

প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ অন্যতম প্রাকৃত-রূপেই অপভ্রংশের কথা উল্লেখ করেছেন এবং 'প্রাকৃত' শব্দটির পূর্বেই পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'অপভ্রংশ' শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রতিটি সাহিত্যিক প্রাকৃতেরই অন্ত্যস্তর ছিল তত্তৎ নামীয় অপভ্রংশ। সংস্কৃতে রচিত মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকেই সর্বপ্রথম অপভ্রংশের ব্যবহার পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ 'নাগরক অপভ্রংশ'কেই শ্রেষ্ঠ অপভ্রংশ রূপে অভিহিত করেছেন এবং 'ব্রাচড়ক, উপনাগরক, বৈদর্ভী, লাটী, গৌড়ী, ঢক্কী, পাঞ্চালী, সিংহলী প্রভৃতি অপভ্রংশকে বলেছেন 'বিভাষা'। কার্যতঃ আমরা 'শৌরসেনী অপভ্রংশেরই সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। সম্ভবতঃ এটিই প্রাকৃত বৈয়াকরণ-কথিত 'নাগরক অপভ্রংশ'। শৌরসেনী-প্রাকৃতের ক্রমবিবর্তনে শৌরসেনী অপভ্রংশের উদ্ভব,—এই সূত্র-অবলম্বনে আমরা 'মাগধী অপভ্রংশ' এবং 'মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশে'র সম্ভাব্যতার কথা অনুমান ক'রে থাকি। কার্যতঃ এই সমস্ত অপভ্রংশের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অপভ্রংশের স্থিতিকাল ৬০০ খ্রীঃ—১০০০ খ্রীঃ, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, সংস্কৃত এবং নবোদ্ভূত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অপভ্রংশ এবং তার অর্বাচীন

রূপ 'অবহট্‌ঠ' (| অপভ্রষ্ট) অন্ততঃ চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতক অবধি অব্যাহতভাবেই বর্তমান ছিল। নব্যভারতীয় আর্যভাষার একজন প্রধান কবি বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় দু'খানি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

'সক্কঅ বাণী বহুজন ভাবই।
পাউঅ রসক মম্ম ন পাবই॥
দেসিল বঅণা সবসন মিট্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা॥'

অর্থাৎ সংস্কৃত বাণী পণ্ডিতজন ভাবেন, প্রাকৃত রসের মর্ম পাওয়া যায় না, দেশি বচনই সবচেয়ে মিষ্ট, অতএব অবহট্‌ঠ ভাষাতেই কল্পনা করি।'

অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠ ভাষায় জৈনগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার ধর্মভাবমুক্ত বহু সাহিত্যও এই ভাষাতেই রচিত হ'য়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :— ধনপালের 'ভবিসত্ত কহা', আব্দুর রহমানের 'সংনেহয় রাসক', চান্দ বরদাই-রচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ', পিঙ্গলাচার্য-রচিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' এবং বিদ্যাপতি-রচিত 'কীর্তিলতা'।

অবহট্‌ঠ ভাষা থেকেই 'প্রত্ন নব্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে আনুঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে 'নব্য ভারতীয় আর্য' তথা আধুনিক ভারতবর্ষে প্রচলিত বাঙলা, অসমীয়া; হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠি প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাগুলির উদ্ভব ঘটেছে। লক্ষণীয় এই যে এই সকল নব্য ভারতীয় আর্যভাষা যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত, তখনও কিন্তু সমগ্র উত্তর-ভারতে সাধুভাষা-রূপে অবহট্‌ঠ ভাষা প্রচলিত ছিল। এমনকি, একই ব্যক্তি একই সঙ্গে অবহট্‌ঠ ভাষা এবং নব্য ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা ক'রেছেন, এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। সরহপাদ বাঙলা ভাষায় 'চর্যাপদ' রচনা করেছেন, আবার অবহট্‌ঠ ভাষায় 'দোহা' রচনা করেছেন।

আনুঃ খ্রীঃ দশম শতকের দিকেই মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃত ভাষার অন্ত্যস্তর অপভ্রংশ অবহট্টের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে 'নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা' তথা আধুনিক ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলি। আমরা দেখেছি বৈদিক যুগেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার কিছু কিছু আঞ্চলিক লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম যুগে অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃতেও যে ভাষা-বৈচিত্র্য বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অশোকের অনুশাসন এবং অন্য সকল শিলালিপিতে। প্রাকৃতের মধ্যস্তরে যে সাহিত্যিক প্রাকৃত গড়ে উঠেছিল, মাগধী, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি নাম থেকে তাদের আঞ্চলিক রূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। ঐ আঞ্চলিক প্রাকৃতই কালক্রমে বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম দান করেছিল বলেই তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষাই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল।

প্রশ্ন ৭। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বর্গীকরণ কর।

অথবা

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা ভৌগোলিক অঞ্চল-ভেদে যে বিশেষ বিশেষ রূপ লাভ করেছিল তাদের পরিচয় দাও।

উত্তর। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক দিক থেকে প্রাচীন এবং মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার মতো নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারও বর্গীকরণ সম্ভবপর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাষা যেমন উত্তরদেশীয়া বা 'উদীচ্যা', দক্ষিণদেশীয়া বা 'অবাচ্যা', 'পূর্বদেশীয়া বা 'প্রাচ্যা', পশ্চিমদেশীয়া বা 'প্রতীচ্যা' এবং মধ্যদেশীয়া—এই প্রধান পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাও এই প্রধান পাঁচটি ধারাতেই বিন্যস্ত হ'য়েছে। এই প্রতিটি প্রধান শ্রেণীতেই একাধিক আঞ্চলিক ভাষা স্থান লাভ করেছে। নিম্নে তাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হলো।

(ক) **উত্তরদেশীয়া / উদীচ্যা :** উদীচ্যা ভাষাগোষ্ঠীতে দু'টি প্রধান শ্রেণী—একটিতে আছে সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষাগুচ্ছ, অপরটিতে কুমায়ুন, গাড়োয়ালী, নেপালী প্রভৃতি পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ।

কচ্ছ এবং বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাই সিন্ধী ভাষা। সিন্ধী ভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্য রচিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এ ভাষার উচ্চারণে ত-বর্গ স্থলে ট-বর্গের প্রবণতা এবং সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্ঠনালীয় উচ্চারণ লক্ষ্য করা

যায়। সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মুসলমান বলে সিন্ধী ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাধান্য বর্তমান। সিন্ধী ভাষাও লেখা হয় আরবী অক্ষরে।

পাঞ্জাবী ভাষার দুটি প্রধান শাখা—একটি পশ্চিমা পাঞ্জাবী বা লহন্দী এবং অপরটি পূর্বী পাঞ্জাবী বা হিন্দকী। লহন্দী ফারসী লিপিতে লিখিত হয়। গ্রামগীতির অতিরিক্ত কোন সাহিত্য এ ভাষায় রচিত হয়নি। হিন্দকী লিখিতে হয় গুরুমুখী লিপিতে। ষোড়শ শতকে শিখ ধর্মগুরুদের রচিত 'আদি গ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেব' এ ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য। পাঞ্জাবী ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—স্বর মধ্যবর্তী যুগ্ম ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয় নি।

হিমালয়ের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগুলি সাধারণভাবে 'পাহাড়ী ভাষা' নামে পরিচিত। এর প্রধান তিনটি শাখা—পূর্বাঞ্চলীয়, মধ্যদেশীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয়। পূর্বী পাহাড়ী ভাষা নেপালী—গুরখালি বা খুশ্‌কুরা নামেও এটি প্রচলিত। আধুনিক কালে নেপালী ভাষায় সাহিত্য রচিত হচ্ছে। মধ্যপাহাড়ী কুমায়ুনি এবং গাড়োয়ালি ভাষাতেও কিছু কিছু সাহিত্য রচিত হচ্ছে। চম্বলী, জৌনসারি প্রভৃতি ৩০টি ভাষা উপভাষা পশ্চিমা পাহাড়ীর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) **দক্ষিণী / অবাচ্যা :** দক্ষিণী ভাষাগোষ্ঠীতে একটিই উল্লেখযোগ্য ভাষা—মরাঠী। মরাঠী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ১২৯১ খ্রীঃ রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতার টীকা। মরাঠীর অন্যতম উপভাষা 'কোঙ্কণী' প্রায় স্বতন্ত্র ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। গোয়ার খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই এই ভাষার চর্চা শুরু করেন।

(গ) **পূর্বদেশীয়া / প্রাচ্যা :** মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত বলে অনুমিত প্রাচ্যা ভাষাগোষ্ঠী দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। পূর্বী প্রাচ্যা শাখায় রয়েছে 'বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ভাষা'। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার আদিযুগে অর্থাৎ খ্রীঃ দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এই পূর্বী প্রাচ্যার প্রধান শাখা বাঙলা ভাষায় রচিত হ'য়েছিল 'চর্যাপদ'। অবশ্য তখনও পর্যন্ত ওড়িয়া ভাষা এবং অসমীয়া ভাষা স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেনি বলেই অনুমিত হয়। দ্বাদশ শতকের তাম্র শাসনে ওড়িয়া ভাষার নিজস্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্বনি-পরিবর্তনের দিক থেকে ওড়িয়া ভাষা এই গোষ্ঠীর অপর ভাষাগুলি অপেক্ষা রক্ষণশীল। খ্রীঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের দিকে অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অসমীয়া ভাষার গৌরব—নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে এই ভাষাতেই সর্বপ্রথম নাটক ও গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। বাঙলা ভাষায় রচিত 'চর্যাপদ' নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্য। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙলা ভাষায় রচিত সাহিত্যই সর্বাধিক উন্নত।

প্রাচ্যার পশ্চিমী শাখায় রয়েছে বিহারী ভাষাগুলি—মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়া। মৈথিলী সাহিত্যের সৃষ্টি চতুর্দশ শতকে। মহান্ কবি বিদ্যাপতি মিথিলারই কবি। বিহারের প্রাচীন ও প্রধান সাহিত্য মৈথিলী ভাষাতে রচিত হ'লেও হিন্দীর আওতায়

তার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হ'তে বসেছিল। সম্প্রতি মৈথিলী সাহিত্যে নব জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মগহী ভাষায় কোন লিখিত সাহিত্য রচিত হয়নি। কবীর সম্ভবতঃ ভোজপুরিয়া ভাষাতেই তাঁর দোহা রচনা করেছিলেন।

(ঘ) **পশ্চিমী/প্রতীচ্যা :** প্রতীচ্যা ভাষাগোষ্ঠীর এক শাখায় রয়েছে গুজরাতি ভাষা, অপর শাখায় রাজস্থানী ভাষাগুচ্ছ। গুজরাতের প্রাচীনতম সাহিত্য রচিত হয়েছিল খ্রীঃ চতুর্দশ শতকে। ভীলী গুজরাতির একটি উপভাষা। রাজস্থানী ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে জয়পুরী, মারোয়াড়ি, মেবারি, মালবী প্রভৃতি। মারোয়াড়ি ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য বর্তমান থাকলেও এই গোষ্ঠীর কোন ভাষাতেই উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। রাজস্থানীর একটি উপভাষা খান্দেশীতে প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(ঙ) **মধ্যদেশীয়া :** সাধারণভাবে মধ্যদেশীয়া ভাষা হিন্দী রূপেই পরিচিত হ'লেও এর কয়েকটি শাখার পৃথক স্বীকৃতি রয়েছে। প্রকৃত 'হিন্দী' বা 'হিন্দুস্থানী' ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিক দিক্ থেকে 'পশ্চিমা হিন্দী' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। এর দুটি প্রধান শাখার একটি খড়ীবোলি, অপরটি ব্রজভাষা ('ব্রজবুলির' সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই)। খড়ীবোলিই প্রকৃত হিন্দী, ফারসি অক্ষরে লিখিত এই ভাষাই 'উর্দু'। মধ্যযুগে ব্রজভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হলেও এখন আর এর কোন পৃথক মর্যাদা নেই। হরিয়ানী, বুন্দেলী প্রভৃতি পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষা।

মধ্যদেশীয়া তথা হিন্দী ভাষার পূর্বাঞ্চলের রূপটিকে 'পূর্বীহিন্দী' বা 'কোশলী' নামে অভিহিত করা হয়। এই ভাষাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত অওধী, বাঘেলী ও ছত্রিশগড়ী। খ্রীঃ দ্বাদশ শতক থেকেই অওধী ভাষায় সাহিত্য রচিত হ'য়ে আসছে। দীর্ঘকাল অওধী ভাষাই মধ্য ভারতের সাহিত্যের প্রধান বাহনরূপে পরিচিত থাকলেও পরবর্তীকালে হিন্দীর প্রভুত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'য়েছে, ফলে পূর্বী হিন্দীর আর কোন স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় না।

প্রশ্ন ৮। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর। আনুঃ খ্রীঃ দশম শতকের দিকেই উত্তর ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত বিভিন্ন অবহট্‌ঠ ভাষা থেকে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যসহ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। অঞ্চল ভেদে ভাষার রূপান্তর ঘটেছিল, এটি যেমন একটি বাস্তব তথ্য, তেমনি সামগ্রিক-ভাবে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার দেহেও যে কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তাও সমান সত্য। এই কারণেই খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত ভাষাগুলি অঞ্চলভেদে বাঙলা-হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রচলিত হ'লেও সামগ্রিকভাবে এগুলি 'নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা' (New Indo Aryan Language) নামে পরিচিত। নিম্নে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণগুলি বিবৃত হ'লো।

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা তথা সংস্কৃত ভাষা ছিল একান্তভাবেই

সংশ্লেষাত্মক ; পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃত স্তরে ক্রমিক পর্যায়ে বিভক্তি-চিহ্ন লোপ পেতে আরম্ভ করে ; ফলে নব্য ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বাঙলা-আদি ভাষায় বিভক্তিস্থলে অনুসর্গের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং বাক্য মধ্যে পদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয় ও ভাষা বিশ্লেষাত্মক রূপ লাভ করে।

২. পদমধ্যস্থ যুগ্ম ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'লো এবং তৎ পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হ'লো—এটিকে বলা হয় 'ক্ষতিপূরণ-জনিত দীর্ঘতা' (Compensatory Lengthening)। যথা—কার্য > কজ্জ > কাজ; হস্থ > হাথ > হাত।

৩. নাসিক্য ধ্বনি-সহ-যুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্যধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক ধ্বনিতে পরিণত করেছে। যথা—দন্ত > দাঁত, বংশ > বাঁশ, সন্ধ্যা > সঞ্ঝ > সাঁঝ।

৪. পদান্তস্থিত দ্বিস্বর ধ্বনির শেষটি 'অ' বা 'আ' হ'লে সেটি লোপ পেয়েছে। যথা—পুস্তিকা > পোথিআ > পুথি।

৫. মারাঠী-গুজরাতি-ভিন্ন অপর সকল ভাষা থেকে ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেল। অনেক ভাষায় নামত ক্লীবলিঙ্গ বজায় থাকলেও তার কোন পৃথক্ রূপ ছিল না। হিন্দী ভাষায় বিদেশী শব্দ-মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ।

৬. প্রাচীন বিভক্তি চিহ্নগুলোর মধ্যে প্রথমার '-ই,-উ,-এ', তৃতীয়ার '-এ,-এঁ' এবং সপ্তমীর '-ই,-এ' ছাড়া অপর সকল বিভক্তি চিহ্ন লোপ পেয়েছে। তৎ স্থলে নতুন প্রত্যয় বিভক্তি কিংবা শব্দ সহযোগে বা অনুসর্গের দ্বারা কারক-বিভক্তি প্রকাশ করা হয়। যথা—'রামেন' রাবণো হতঃ' > 'রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হলো' কিংবা 'রামের হাতে রাবণ মারা পড়লো।'

৭. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রধান কারক দাঁড়ালো মাত্র দুটি—একটি 'কর্তা' বা মুখ্য কারক, এবং অপরটি 'তির্যক' বা গৌণ কারক। করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি গৌণ কারক। সাধারণতঃ কোন অনুসর্গের দ্বারাই এই কারকের বোধ জন্মানো হয়।

৮. সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় বহু বচনের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পেয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু হিন্দী, মরাঠী এবং সিন্ধী ভাষা। সম্বন্ধ-পদের সাহায্যে (যেমন, বাংলায়—'লোকেরা') কিংবা বহুত্ব-বাচক শব্দ যোগে ('পাখি সব') বহুবচন প্রকাশ করা হয়।

৯. কাল (Tense) এবং ভাবের (mood) মধ্যে কর্তৃবাচ্য এবং কর্ম ভাববাচ্যে বর্তমানের রূপ অনুজ্ঞা এবং ক্বচিৎ ভবিষ্যৎকালের রূপ বর্তমান রয়েছে। অতীত কালের জন্য 'নিষ্ঠা' প্রত্যয় ('-ক্ত') এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য 'কৃত্য' ('-তব্য) ও 'শতৃ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। একমাত্র গুজরাতি এবং পশ্চিমা পাঞ্জাবী ভাষায়ই ভবিষ্যৎকালের প্রাচীন রূপ বর্তমান আছে।

১০. 'শতৃ' বা 'নিষ্ঠা'—প্রত্যয়জাত 'মূল ধাতুর অসমাপিকার সঙ্গে 'অস্, ভূ' বা 'স্থা' ধাতু যোগ করে যৌগিক সম্পন্ন ও অসম্পন্ন কাল সৃষ্টি হ'লো। যথা—গত(>গঅ) অস্ (আছ্) গিয়াছে।

১১: 'ঋ'-কারের উচ্চারণ কোথাও 'রি', কোথাও 'রু', এবং 'ষ'-এর উচ্চারণ কোথাও 'শ', কোথাও 'খ' হয়েছে।

১২. উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য 'য়'-শ্রুতি ও 'র'-শ্রুতির আগম ঘটেছে। সাগর> সাঅর > সায়র।

১৩. প্রচুর পরিমাণ বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রত্যেক ভাষাতেই।

১৪. বিদেশি ধ্বনির আগমনে এবং প্রভাবে বিভিন্ন ভাষায় বহু নতুন ধ্বনির সৃষ্টি ঘটেছে। যথা,—'ক, খ, গ, জ, ফ' প্রভৃতি

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃত/অবহট্‌ঠ ভাষা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অনুমান করা হয়, মাগধীপ্রাকৃত ভাষা মারাঠী অপভ্রংশের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাসমূহে পরিণতি লাভ করে। এই ভাষাগোষ্ঠী দুটি প্রধান গুচ্ছে বিভক্ত হয়,—একটি পশ্চিমী গুচ্ছ, তাতে মৈথিলী-আদি বিহারী ভাষাগুলি স্থান পেয়েছে। অপর গুচ্ছে আছে পূর্বাঞ্চলীয় বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ভাষা। উদ্ভব কালে এই তিন ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তারপর সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের দিকে ওড়িয়া ভাষা এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের দিকে অসমীয়া ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বাঙলা ভাষার উদ্ভব কালের পশ্চাৎ-সীমা কারো কারো মতে দশম শতক না হ'য়ে অষ্টম শতক হওয়াও অসম্ভব নয়। যাহোক এই হাজার বা বারোশ' বছর যাবৎ বাঙলা ভাষা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। সুদীর্ঘকালের অবকাশে ভাষাদেহে বিভিন্ন স্তরচিহ্ন সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তারই ভিত্তিতে বাঙলা ভাষাকে তিনযুগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ—খ্রীঃ ৮ম/১০ম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তীকাল (১৩৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত ও (খ) মধ্য যুগ—১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ; এই দীর্ঘকালের মধ্যে আঃ ১৫০০ খ্রীঃ-র দিকে ভাষা একটা সুস্পষ্ট মোড় নেওয়াতে মধ্য-যুগকে (খ১) আদিমধ্য যুগ—১৩৫০ খ্রীঃ—১৫০০ খ্রীঃ ও (খ২) অন্ত্য-মধ্যযুগ-এই দু'টি পর্বে বিভক্ত করা হয় ; (গ) আধুনিক যুগের আরম্ভ মোটামুটি ১৮০০ খ্রীঃ থেকে।

(ক) বাঙলা ভাষার আদিযুগ/প্রাচীনযুগ

প্রশ্ন ৯। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায় উল্লেখ করে প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণগুলি নির্দেশ কর।

উত্তর। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার ক'রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানী মনীষিগণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে উক্ত বৌদ্ধগানগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙলা যদিচ দোহার ভাষা অবহট্‌ঠ। বৌদ্ধগানগুলি ছিল সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধসাধকদের রচিত সাধনভজন-সংক্রান্ত। কিন্তু সাঙ্কেতিক পদ—সাধারণতঃ 'চর্যাপদ' নামে এগুলি পরিচিত হ'লেও সম্ভবতঃ এদের

প্রকৃত নাম ছিল 'চর্যাগীতি'। এই চর্যাগীতিগুলি যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের জীবৎকাল ছিল খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, হয়তো বা এদের মধ্যে কেউ আরো পূর্বেই বর্তমান ছিলেন। প্রাচীন বাঙলায় রচিত চর্যাপদই একমাত্র গ্রন্থ যাকে অবলম্বন করে তার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ বিচার করা চলে।

চর্যাপদ ছাড়াও প্রাচীন বাঙলার নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন কিছু কিছু উপাদানের নাম উল্লেখ করা চলে—কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পক্ষে এদের কোনটিই যথেষ্ট নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের কোন কোন লোকসঙ্গীত প্রাচীন বাঙলায় রচিত। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক ছন্দগ্রন্থে, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে প্রকীর্ণ কবিতার সঙ্কলনগ্রন্থে, অমরকোষের সর্বানন্দ কৃত 'টীকাসর্বস্ব' নামক টীকায়, হেমচন্দ্র রচিত 'দেশী নামমালা' নামক গ্রন্থে এবং প্রাচীন তাম্রশাসনে কিছু কিছু প্রাচীন বাঙলা শব্দের সন্ধান লাভ করা যায়। 'টীকাসর্বস্ব' গ্রন্থে প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙলা শব্দ—অম্বাড় (আমড়া) উত্তারি (কাছারি বাড়ি) কালজা (কলিজা), থিরিসা, চিড়া, টের, পগার, বাদিয়া, মাল, হাতইড়া প্রভৃতি। প্রাচীন তাম্রশাসন বা ভূমি দানপত্রে প্রাচীন কিছু গ্রামনামের ও বাঙলা শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রাম নামের মধ্যে—অম্বয়িল্লা, বাল্লহিট্টা, চেতডড প্রভৃতি এবং বাঙলা শব্দের মধ্যে—আঢ়া, পিল, জোল, বরজ প্রভৃতি।

এ-সমস্ত উপাদান থাকলেও প্রাচীন বাঙলা ভাষার লক্ষণ নির্ণয় করবার জন্য আমাদের পক্ষে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ 'চর্যাপদ'। প্রাচীন বাঙলার ধ্বনিগত, রূপগত এবং বাক্যগত—এই ত্রিবিধ লক্ষণ একমাত্র চর্যাপদেই লভ্য। কাজেই চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমরা প্রাচীন বা আদিযুগের বাঙলা ভাষারই যথার্থ পরিচয় লাভ করবো।

(১) **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :** নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রাচীন বাঙলা ভাষাতেও উপস্থিত ছিল। প্রাকৃতের যুগ্ম ব্যঞ্জন প্রাচীন বাঙলায় একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয় এবং তৎপূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের পরিপূরক দীর্ঘীকরণ (Compensatory lengthening) ঘটে। যথা—জন্ম > জম্ম > জম, ধর্ম > ধম্ম > ধাম ; দর্পণ > দপ্পণ > দাপন। অবশ্য কখন কখন যুগ্ম ব্যঞ্জনও বর্তমান ছিল, যেমন—'মিচ্ছা' এবং 'মিছা' চর্যাপদে এই দ্বিবিধ রূপই পাওয়া যায়। স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের ফলে উদ্বৃত্তস্বর কখনও বর্তমান রয়েছে (যেমন—সকল > সঅল), কখনও লোপ পেয়েছে (ছাড়িঅ > ছাড়ি), কখনো একস্বরে পরিণত হয়েছে (অন্ধআর > অন্ধার) কখনও বা শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটেছে (নিকটে > নিঅডি > নিয়ডি)। শব্দের আদিতে 'য'-এর 'জ'—ধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছিল (জাই, জায়) ; 'ন' এবং 'ণ'-র উচ্চারণে পার্থক্য বিলুপ্ত হ'য়েছিল (নাবী/ণাবী), শিস্ ধ্বনির বানানে যথেচ্ছাচার থেকে অনুমিত হয় যে তখন 'শ'-র উচ্চারণই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (ষহজে / সহজে, শূন / সুন)।

শ্বাসাঘাত রীতিতে বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আদি যুগে দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল, তাই বাঙলায় আদ্যক্ষর অনেক সময়ই দীর্ঘ হতো (অলো / আলো, অকট / আকট)।

অবশ্য 'আ'-কারের আর একটা সম্ভাব্য কারণ এই হ'তে পারে যে 'অ'-কারের যে বিবৃত উচ্চারণ অর্থাৎ 'হ্রস্ব আ' সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, তা হয়তো প্রাচীন বাঙলাতেও বর্তমান ছিল। এছাড়া তৎকালে বাঙলায় হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-পার্থক্যও প্রায় লোপ পেয়েছিল। তাই বানানে দেখা যায় নির্বিচারত্ব (দিসই / দীসই, শবরি / সবরী)।

২. **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :** চর্যাপদের রূপতত্ত্ব বিচারে বাঙলার স্বরূপ লক্ষণ স্পষ্টতরভাবে প্রতীয়মান হয়। নাম শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন '-র',-এর (হরিণার, রুখের); কচিৎ '-ক' বিভক্তিও দেখা যায় (ছান্দক বান্ধ)। কর্ম-সম্প্রদানের বিভক্তি প্রধানতঃ '-রে' এবং কচিৎ '-ক' বা '-কে' (তোহোরে, ঠাকুরক)। অধিকরণ কারকে '-ত' বিভক্তি বাঙলার নিজস্ব (টালত, সাক্ষত), অবশ্য '-এ' বিভক্তিও রয়েছে (ঘরে)। করণ কারকে প্রধান বিভক্তি '-তে' এবং '-তেঁ' (সুখ দুঃখতেঁ)। কর্তৃকারকে '-এ, -এঁ' (কাহ্নে, গাইউ), অপাদানে '-এ' (জামে কাম); অধিকরণ কারকে '-ই -হি' বিভক্তিও বর্তমান ছিল (নিয়ড়ি, হিঅহি)। বিভিন্ন কারকে বিভক্তিহীনতাও চর্যাপদে অপ্রাপ্য নয় (সরহ ভণই, গুরু পুচ্ছিঅ জান)।

বাঙলা ভাষার আদি যুগেই অনুসর্গের ব্যবহার দেখা দিয়েছিল (তোত্র সম, তঁই বিনু); অনুসর্গ অসমাপিকার সাহায্যেও প্রকাশিত হ'তো (দিয় করিঅ)।

বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অতীতকালে '-ইল' এবং ভবিষ্যৎকালে '-ইব' আদি যুগেই সূচিত হয়েছিল (রুন্ধেলা, জাইবেঁ)। 'ইআ'-যুক্ত অসমাপিকা বাঙলা ভাষার আদি যুগেই দেখা দিয়েছিল (আখি বুজিঅ); '-ইলে, -অন্তে'-যুক্ত অসমাপিকার ব্যবহারও এই যুগেই শুরু হ'য়েছিল (সাক্ষত চড়িলে, চিন্তা চিন্তন্তে)।

বহুবচন-জাত 'আহ্মে, তুহ্মে'র সঙ্গে 'হউঁ, তু'-ও একবচনে ব্যবহৃত হ'তো (তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী, আহ্মে সাণে দিঠা)।

আদি যুগে বিশেষ্য-অনুযায়ী ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ হ'তো (লাগেলি আগি); বহুবচন বোঝানোর জন্য বহুত্ববাচক শব্দ বা সংখ্যাশব্দ ব্যবহৃত হ'তো (পারগামি লোঅ, পঞ্চবি ডাল)।

ক্রিয়াপদের একবচনে ও বহুবচনে পৃথক রূপ থাকলেও ব্যবহারে কোন কড়াকড়ি ছিল না। প্রথম পুরুষে বহুবচনের পদ সম্ভবতঃ সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হ'তো. পুরুষ-ভেদে ক্রিয়া বিভক্তির পার্থক্য আদি যুগে বর্তমান ছিল।

প্রাচীন বাঙলায় কাল ছিল তিনটি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। নিত্যবৃত্ত অতীত তখনো উদ্ভূত হয়নি। যৌগিক কালের দৃষ্টান্ত চর্যাপদে পাওয়া না গেলেও যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার পাওয়া যায় (গুনিয়া লেহুঁ, উঠি গেল)। তিন কালেই কর্ম-ভাববাচ্যের বহুল ব্যবহার বর্তমান ছিল (খর ন দীসঅ, মই দিবি পিরিচ্ছা)।

৩. **পদগত বৈশিষ্ট্য :** চর্যাপদে তৎসম শব্দ-ব্যবহারের প্রবণতা প্রাকৃত/অবহট্‌ঠ অপেক্ষা বেশি ছিল। সংস্কৃত বানান বজায় রাখবার দিকে চর্যাকারদের দৃষ্টি ছিল অধিকতর সজাগ। তাই উচ্চারণগত পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রয়োজন মতো 'ন' ও 'ণ' এবং

'শ''ষ' বা 'স' ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের পাশাপাশি তাঁরা অকৃপণভাবেই অর্ধ-তৎসম শব্দও ব্যবহার করেছেন। চর্যায় ব্যবহৃত প্রবচনগুলো নিশ্চিতভাবেই বাঙলার ঐতিহ্যবাহী—'অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী, পড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী' প্রভৃতি।

(খ) বাঙলা ভাষার মধ্যযুগ

বাঙলা ভাষার মধ্যযুগ বলতে সাধারণভাবে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘকাল সীমাকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই এই সুদীর্ঘ কালের ভাষারূপে লক্ষণীয় বৈচিত্র্য দেখা দেওয়াতে মধ্যযুগকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। (১) একটি 'আদি মধ্য যুগ'—এর বিস্তার ১৩৫০ খ্রীঃ—১৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত এবং (২) অপরার্ধ 'অন্ত্য মধ্য যুগ'-এর বিস্তার ১৫০০ খ্রীঃ—১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই দুই পর্বে ভাষার সাদৃশ্যই বিশেষভাবে প্রকটিত হ'লেও কোন কোন বিষয়ে এদের মধ্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও বর্তমান রয়েছে।

প্রশ্ন ১০। বাঙলা ভাষার আদি মধ্যযুগের লক্ষণগুলি বিবৃত কর।

উত্তর। বাঙলা ভাষার আদি মধ্য যুগে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। এই যুগের অপর সকল গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলে যুগে যুগে তাদের ভাষান্তর ঘটায় মূল ভাষা রূপের পরিচয় কোন গ্রন্থেই আর পাওয়া যায় না—সর্বত্রই ভাষা বিকৃত হ'য়ে অনেকটা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনই যে-কোন-কারণে লোকলোচনের অন্তরালে থাকায় এর ভাষা রয়েছে অবিকৃত। ফলে আদি মধ্য যুগের বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়।

১. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ আদি মধ্য যুগে পদের আদি 'অ' এবং 'আ' নির্বিশেষে ব্যবহৃত হ'তো বলে মনে হয় যে তখনো 'অ'-এর প্রকৃত বিকৃত উচ্চারণ হয়তো বর্তমান ছিল (অতি/আতি, অনন্ত/আনন্ত)। পদের অন্ত্য 'অ' উচ্চারিত হ'তো, তবে পদ মধ্যস্থ 'অ'-এর সংস্কৃত উচ্চারণও শুরু হয়েছিল (কথোখন, নান্দোঘর)। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণে কোন প্রভেদ ছিল না। দ্বিস্বর ধ্বনির উচ্চারণ এই আদি মধ্য যুগেই আরম্ভ হয়েছিল (আউলাইল)। 'ন' ও 'ণ', 'জ' ও 'য' এবং 'শ' 'ষ' 'স'-এর মধ্যে উচ্চারণগত কোন পার্থক্য না থাকায় এগুলি নির্বিচারে ব্যবহৃত হ'য়েছে। পদ মধ্যে অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণ ভবনের প্রভূত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (কভোঁ, কথো)। নাসিক্যীভবন-প্রক্রিয়া ঐ যুগেই শুরু হ'লেও তা' আবশ্যিক হ'য়ে ওঠেনি। উদ্বৃত্ত স্বর কোথাও বর্তমান ছিল, কোথাও সঙ্কুচিত হ'য়েছে, কোথাও বা তৎস্থলে শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটেছে (তিয়জ, ছাওয়াল)। আদি মধ্যযুগে স্বরসঙ্গতির ব্যবহার যথেষ্ট পাওয়া গেলেও (এমুখী), অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত কম। শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত আদি মধ্যযুগেই প্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে গেছে।

২. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ আদি মধ্য যুগেই বহুবচনের বিভক্তিরূপে '-রা' যথেষ্ট ব্যবহৃত হলেও, বহুত্ববোধক বা সংখ্যাবাচক শব্দের সাহায্যে বহুবচনের প্রয়োগও

অব্যাহত ছিল (আহ্মারা. তোহ্ম সব)। প্রাচীন যুগের বিভক্তিই সাধারণভাবে আদি মধ্য যুগে বর্তমান ছিল। তির্যক বিভক্তি 'এ, এঁ' সম্বন্ধ পদ দ্বারা সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। বিভক্তি স্থলে অনুসর্গের ব্যবহার নামবাচক এবং অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক) এই যুগে বৃদ্ধি লাভ করেছে।

আদিমধ্য যুগে অতীত কালে দু'রকম বিভক্তি চিহ্নই প্রচলিত ছিল—'ল'-যুক্ত এবং 'ল'-বর্জিত। এই যুগেই নিত্যবৃত্তকাল পূর্ণ অতীত এবং সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ করে। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারও এই যুগে উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, যৌগিক কালের প্রয়োগও এই যুগেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। -ইয়া'-যুক্ত সম্পন্ন কালের প্রয়োগও এই যুগে লক্ষ্য করা যায় (শুনিয়াছ তোহ্মে। 'অল'-যুক্ত যৌগিককালের প্রয়োগে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকা সম্ভবপর (রহিলছে)।

প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষণ এবং কৃদন্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও স্ত্রীপ্রত্যয়ের যোগ প্রসারিত হয়েছিল (কোঁঅলী পাতলী বালী, উত্তরলী হয়িলী রাঢী)। এই যুগের ভাষায় 'কামান, মজুরি, বাকী' প্রভৃতি বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ১১। অন্ত্যমধ্যযুগের বাঙলা ভাষার লক্ষণসমূহ বিবৃত কর।

উত্তর। প্রায় একালের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ানো অন্ত্যমধ্যযুগের ভাষার সঙ্গে একালের ভাষার পার্থক্য বড় দরের নয়। বিশেষতঃ অন্ত্যমধ্যযুগে এত সাহিত্য রচিত হ'য়েছে এবং তাতে এত অবিকৃত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য কোন একটা বিশেষ গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন হয় না। বহু গ্রন্থেই ঐ যুগের ভাষার যথাযথ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ঐ যুগের ভাষার দু'একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :—ভাষায় আঞ্চলিকতার প্রভাব, বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার প্রাচুর্য এবং সাহিত্যে গদ্য রীতির আবির্ভাব। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে গদ্য সাহিত্যে-র উদ্ভব ঘটলো, তার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল অবশ্যই তৎ পূর্বে এই অন্ত্যমধ্যযুগে।

১. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : অন্ত্যমধ্যযুগে 'অ'-কারের সংবৃত উচ্চারণ ('ও'-কার বৎ) পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত প্রায় অনিবার্য ভাবেই উপস্থিত থাকে, তার ফলে পদের অন্ত্য স্বরধ্বনির লোপপ্রবণতা (হাত > হাৎ, অগ্গি > অগ্নি > আগি > আগ), পদমধ্যস্থ স্বরধ্বনির লোপপ্রবণতা (অমনি > অম্‌নি, গামোছা > গাম্‌ছা) এবং দ্বিমাত্রিকতা (পানিতা > পান্‌তা,) বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অ'-কারের 'ও' উচ্চারণ এবং 'অ্যা' ধ্বনির সৃষ্টিও এ যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ (পরমায়ু > পরোমাই ; বড় > বড়ো, দেয় > দ্যায়)। অপিনিহিতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল আদি মধ্যযুগেই, অন্ত্যমধ্য-যুগে ঘটে এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা (সাধু > সাউধ, কন্যা > কইন্যা, বসিয়া > বইস্যা)। এই অন্ত্যমধ্য-যুগেই রাঢ়ী উপভাষায় এবং আশ্রিত শিষ্ট ভাষায় অভিশ্রুতি এবং স্বরসঙ্গতিরও আবির্ভাব ঘটে (আসিয়া > আইস্যা > এসে, লইবে > লবে, কাঁচলি > কাঁচুলি, সমস্যা > সমিস্যা)। শ্রুতিধ্বনির ব্যবহারও এযুগে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল (ছাওআল > ছাওয়াল, বাহ্র > বাহ্রে)।

অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারও এযুগে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল (হৃদয়>রিদয়, বাস্ত>বাদ্ধি) ভাষায় আঞ্চলিকতার লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট (লুচি>নুচি, দংশন>ডংসন)। তৎসম শব্দ এবং বিদেশি শব্দও অন্ত্যমধ্যযুগে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে থাকে। বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবী পারশি ছাড়াও বহু পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে (বাজার, বিদায়, আনারস, তামাক)।

২. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : অন্ত্যমধ্যযুগের একেবারে গোড়ার দিকে কোন কোন গ্রন্থে প্রাচীন রীতির লিঙ্গবিধান বজায় ছিল, অর্থাৎ কৃদন্ত ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হতো, পরে তা' একেবারেই উঠে গেলো। প্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনেও -'রা' বিভক্তি যুক্ত হ'তে লাগলো, তুচ্ছার্থবোধক শব্দে যুক্ত হ'তো 'গুলি, গুলা'। সপ্তদশ শতকে বহুবচন বোধক প্রত্যয় '-দিগ,-দের' প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়।

কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি '-এ' বিভক্তি, কর্মকারকে '-কে,-রে,-এ' বিভক্তি, করণ-কারকে '-এ,-তে' বিভক্তি অপাদান কারকে '-ত/-তে' (রাজাতে বিদায় সাঙ্গে) এবং নবোদ্ভূত'-কারে -রে' বিভক্তি (বাঙালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে') সম্বন্ধ পদে'-র' ছাড়াও '-ক,-কার, -কের' প্রভৃতি এবং অধিকরণ কারকে '-রে, -কে,-কা,-ই,-কারে' প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ অন্ত্যমধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য।

অন্ত্যমধ্যযুগে অতীতকালে -'ইস' এবং ভবিষ্যৎ কালে-ইব বিভক্তি সম্পূর্ণরূপে কর্তৃবাচ্যেই ব্যবহৃত হ'তে থাকে। নিত্যবৃত্ত অতীতকালের ব্যাপক ব্যবহার এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। '-ই' এবং 'ইতে' যুক্ত যৌগিক কালের (ঘটমান, পুরাবৃত্ত) ব্যবহার এই যুগে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারও অনেক বেড়ে যাওয়াতে অনেক মৌলিক তদ্ভব ধাতুর ব্যবহার লোপ পেয়ে যায় (জিনে>জয় করে, পিয়ে>পান করে)।

অন্ত্যমধ্যযুগে নামধাতুর ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, এমন কি বহু তৎসম শব্দও নামধাতু রূপে ব্যবহৃত হ'তে থাকে (লাফাইয়া, বাখানিছে, অনুব্রজি, সান্ধাইব)।

আদিমধ্যযুগে বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন, অন্ত্যমধ্য যুগে অসংখ্য বাঙালী কবিও বৈষ্ণবপদ রচনায় ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন ১২। আধুনিক যুগের বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর। ১৮০০ খ্রীঃ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তথায় গদ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। বস্তুতঃ এর সঙ্গে আধুনিক যুগের বাঙলা ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধ্যযুগে যে সাধু ভাষার আধারে কাব্য ভাষার দেহ নির্মিত হইয়াছিল সেই সাধু ভাষাই হ'লো আধুনিক সাহিত্যের প্রথম পর্বের বাহন। তৎকালে কলকাতাই দেশের রাজধানী এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল বলেই এই অঞ্চলে প্রচলিত রাঢ়ী উপভাষাই শিষ্ট সমাজের কথ্য ভাষায় পরিণত হয় এবং কালক্রমে এই ভাষাই মার্জিত আকারে সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। সাধু ভাষা এবং শিষ্ট কথ্যভাষা

ছাড়াও বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী ও কামরূপী এই কয়টি উপভাষাও আধুনিক বাঙলার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত ভাষা লোক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু সাহিত্যের বাহনরূপে এখনও এদের স্বীকৃতি মেলেনি বলে আধুনিক বাঙলা ভাষার সাধারণ আলোচনায় এই আঞ্চলিক উপভাষাগুলি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না।

১. **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :** অন্ত্য মধ্যযুগে বাঙলা ভাষায় যে সকল ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, তাদের প্রায় সব লক্ষণই আধুনিক বাঙলায় বর্তমান রইলো। 'অ'-কারের 'ও'-উচ্চারণ (অগ্নি > ওগ্নি, পাগল > প্যাগোল, বড় > বড়ো), 'অ্যা'-কারের বহুল ব্যবহার, স্বরান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ (আকাশ আকাশ্), পদের আদি স্বরে শ্বাসাঘাত এবং দ্বি মাত্রক প্রবণতা (যাইতেছি > যাচ্ছি) আধুনিক বাঙলার বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধুভাষা এবং শিষ্ট কথ্যরীতিতে অপিনিহিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'য়ে অভিশ্রুতিতে পরিণত হ'য়েছে (হাঁটিয়া > হাঁইট্যা > হেঁটে, কালি > কাইল > কাল)। স্বর সঙ্গতির দুর্নিবার প্রভাবে বহু শব্দের উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে বহু তৎসম শব্দও অর্ধ তৎসম শব্দে রূপান্তরিত হ'য়েছে (পূজা > পুজো, নিরামিষ > নিরিমিষ্যি)। বিদেশী ভাষার প্রভাবে কিছু কিছু নতুন ধ্বনিরও আগমন ঘটেছে (জ, ফ)।

২. **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :** মধ্যযুগোচিত বহু শব্দ-আদি সাধু ভাষার লোপ পেয়েছে। 'মোর, মোকে' প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় বর্তমান থাকলেও সাধু ভাষা এবং শিষ্ট ভাষা থেকে বর্জিত হ'য়েছে। 'যিঁহ, তিঁহ' স্থলে 'যিনি, তিনি', 'আছিল' স্থলে 'ছিল' প্রভৃতিই আধুনিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

কর্তা সাধারণতঃ বিভক্তিহীন, সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় '-এ' বিভক্তি, গৌণকর্ম সম্প্রদানে '-কে' বিভক্তি এবং করণকারকে '-এ' বিভক্তি বা অনুসর্গ যুক্ত হয়। অপাদান কারকেও অনুসর্গযুক্ত হয়। গমনার্থক বা অন্ত্যর্থক ক্রিয়া থাকলে অধিকরণ কারকে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, অন্যত্র '-এ,-তে' বিভক্তি হয়।

ক্রিয়ার ভাব দু'টি—নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। কাল চারটি—বর্তমান, অতীত, নিত্যবৃত্ত ও ভবিষ্যৎ। এদের প্রত্যেকটিরই পুরাঘটিত (সম্পন্ন) ও ঘটমান (অসম্পন্ন) রূপও বর্তমান। ক্রিয়ারূপে একবচন ও বহুবচনে কোন পার্থক্য নেই।

বাঙলা ভাষা ও অভিধানে স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু সেই প্রাকৃতিক উপায়ে নির্ধারিত হয়। বাস্তবে বাঙলা ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গ নেই বললেই চলে (মেয়েটি সুন্দর, লক্ষ্মী ছেলে)।

বাঙলা ভাষা ক্রমশঃ সরল হ'য়েছে এবং সংশ্লিষ্ট থেকে বিশ্লিষ্ট রূপে পরিণতি লাভ করেছে। তাই বাক্যে পদের অবস্থান প্রায় সুনির্দিষ্ট। প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং সর্বশেষ সমাপিকা ক্রিয়াপদ—এইটিই সাধারণ নিয়ম। '-ইয়া' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে অনেকগুলি বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যে নিয়ে আসা আধুনিক বাঙলার একটি বিশিষ্টতা।—তুমি বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে তৈরি হ'য়ে তারপর ফিরে এসো।

প্রশ্ন ১৩। বাংলা ভাষার সাধুরীতি ও চলিত রীতির মধ্যকার পার্থক্য দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও।

প্রশ্ন ১৪। সাধু ও চলিত রীতির বাক্যগঠনগত পার্থক্য দেখাও। সর্বনাম পদ ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে সাধু ও চলিতের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। আধুনিক-পূর্ব যুগে চিঠিপত্রে এবং দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও তাকে কোনক্রমেই সাহিত্যিক গদ্য বলা চলে না। আর সে-যুগের যাবতীয় সাহিত্যই তো পদ্যে রচিত। বাঙলা গদ্য একান্তভাবেই এ কালের সামগ্রী। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর কেরী সাহেবের প্রবর্তনায় কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা বাঙলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি, যদিও গদ্য রীতির বিষয়ে আমরা একটা ধারণা পেয়েছি মধ্যযুগের পদ্য সাহিত্যেই। সাধু ভাষার পদ্য রীতির সঙ্গে মধ্য যুগের পদ্য সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য ছিল শুধু পদবিন্যাসেই। যেমন,—মধ্যযুগের পদ্য ভাষা ঃ—

'হিত উপদেশ রাজা শ্রবণ করিয়া।
ধীরে ধীরে উঠিলেন শয়ন ছাড়িয়া ॥'

সাধু ভাষায় এর রূপ ঃ —

'হিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা শয়ন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।'

অতএব দেখা যায়, কাব্যে ব্যবহৃত মধ্য যুগের বাঙলা থেকেই আধুনিক সাধুভাষার ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে। এই মধ্য বাঙলা-আশ্রিত সাধু আদর্শের উপর প্রধানতঃ রাঢ়ী উপভাষার এবং অংশতঃ বঙ্গালী ও বরেন্দ্রী উপভাষার প্রভাবেই কালক্রমে বাঙলা সাধু রীতির উদ্ভব ঘটে। এই উদ্ভব যুগে সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই কার্যতঃ গদ্য সাহিত্য রচনায় ব্রতী হ'য়েছিলেন বলে সাধু ভাষায় সংস্কৃত-সুলভ সমাসবাহুল্য, জটিল বাক্য এবং তৎসম শব্দবাহুল্য দেখা দিয়েছিল। অবশ্য এই চরমপন্থী গদ্যের পাশাপাশি সাধুভাষার একটা আদর্শও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের রচনায় এই সাধু ভাষা যে বিশেষ প্রাঞ্জলতা ও শিল্পসম্মত রূপ লাভ ক'রে, এটিকেই বাঙলা সাধু ভাষার আদর্শ রূপ বলে গ্রহণ করা হয়। আবার এই সাধু ভাষার পাশাপাশি একেবারেই কথ্য ভাষায় তার অশিষ্টতাসহ রচিত হ'লো আরো একটি গদ্যভাষার সাহিত্য—যে ভাষাকে 'আলালী ভাষা' বা 'হুতোমী ভাষা' বলা হয়। এই ভাষার ছিল গতিময়তা বা প্রাণ, কিন্তু সমাজে এই ভাষা মান পেলোনা বলে এই কথ্যরীতির অনুসরণ ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ভাষা এবং আলালী ভাষার মধ্যপথ অবলম্বন করে যে গদ্যভাষার প্রবর্তন করেন, বস্তুতঃ ঐ রীতিটিই একাল পর্যন্ত আদর্শ সাধু ভাষারূপে পরিগণিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত এই সাধুভাষাই সুদীর্ঘ কাল বাঙলা গদ্য সাহিত্যের মূল বাহনরূপে

প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অধিকাংশ রচনা এই সাধুভাষাতে লিখলেও পরে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি লিখেছেন : "বাংলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা, কথ্যভাষা ; কেউ বলে চলতি ভাষা ; আমার কোন কোন লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজা ঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।"—সাধুভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রবণতা থেকে সৃষ্টি হলো 'চলিত ভাষা'। এই 'চলিত ভাষা'র কথাটা একটু স্পষ্ট করে বোঝানো আবশ্যক। আমরা সদাসর্বদা কথা বলায় যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করি, তার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য রয়েছে। কথ্যভাষা সব সময় পরিবর্তনশীল, অঞ্চল ভেদে তার পার্থক্য রয়েছে। পক্ষান্তরে চলিত ভাষা রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য ভাষারই একটা মার্জিত সাহিত্যিক রূপ, এটি শিষ্টজন-সম্মত 'স্বীকৃত কথ্য ভাষা' (Standard colloquial Language)। মুখের ভাষা তথা খাঁটি কথ্য ভাষায় কখনো সাহিত্য রচিত হয় না। অতএব বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে দুটি ভাষারীতি প্রচলিত আছে—একটি সাধুভাষার রীতি, অপরটি চলিত ভাষা তথা 'স্বীকৃত কথ্য ভাষার' রীতি। মৌখিক কথ্য ভাষার সঙ্গে সাধুভাষার যথেষ্ট ব্যবধান থাকলেও চলিত ভাষার সাদৃশ্যই প্রকট হয়ে থাকে।

সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য প্রধানতঃ শব্দগত ; বাক্যের গঠন কিংবা পদবিন্যাসের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। নিম্নে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' থেকে সাধুভাষা ও চলিতভাষার দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'লো :—

"**সাধুভাষা**—এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বলিল (বা কহিল), 'পিতঃ আপনার সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দিউন (বা দিন)।' তাহাতে তাহাদিগের (বা তাহাদের) পিতা নিজ সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া-দিলেন।"

"**চলিতভাষা**—একজন-লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে বলল, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাবো, তা আমাকে দিন।' তাতে তাদের বাপ নিজের বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ-করে। বেঁটে) দিলেন।"

উপরে সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার যে দুটি নিদর্শন উদ্ধৃত হ'লো, তুলনামূলক আলোচনায় তাদের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। দেখা যাচ্ছে—সাধুভাষার তৎসম শব্দের আধিক্য, চলিত ভাষায় তৎ-পরিবর্তে তদ্ভব ও দেশি শব্দের ব্যবহার বেশি ; সাধুভাষায় ক্রিয়ার রূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত, চলিত ভাষায় তার আকার সংক্ষিপ্ত ; এবং সাধুভাষায় সর্বনামেরও পূর্বরূপ রয়েছে, পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় সর্বনামও সংক্ষিপ্ততা লাভ করেছে। বস্তুতঃ সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য এই তিনটে ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মূলতঃ বাঙলা গদ্যভাষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণই অগ্রণী হয়েছিলেন বলে তাঁরা প্রধানতঃ সংস্কৃতকে আদর্শ ধ'রেই সাধুভাষারীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তাঁরা অত্যধিক সংস্কৃত তৎসম ও আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, কথ্যভাষা ও উপভাষার শব্দ বর্জন করেছেন এবং সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের পূর্ণরূপটিকেই গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে চলিত ভাষার সমর্থকগণ সাহিত্যের ভাষাকে মৌখিক ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসবার জন্য তৎসম শব্দ ব্যবহারে কিছুটা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছেন এবং ভাব-প্রকাশের উপযোগী তদ্ভব অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন। ভাষার ক্রমিক বিবর্তনে মধ্যযুগের অপিনিহিতি একালেও শিষ্ট ভাষায় সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে এবং অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি ভাষায় পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছে—ফলতঃ চলিত ভাষায়ও এদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তাই সাধু ভাষার 'হাঁটিয়া, হাটুয়া, আজি, করিয়া' প্রভৃতির অপিনিহিত রূপ 'হাইট্যা, হাউট্যা, আইজ, কইরা'-স্থলে অভিশ্রুত রূপ 'হেঁটে, হেটো, আজ, ক'রে' রূপ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং 'পূজা, নিরামিষ'—প্রভৃতি স্থলে স্বরসঙ্গতি জনিত রূপ 'পূজো, নিরিমিষ্যি' প্রভৃতি চলিত ভাষায় ঠাঁই পেয়ে থাকে। ঐতিহাসিক কারণে ভাষায় যে সকল ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই সকল পরিবর্তিত রূপগুলি একমাত্র চলিত ভাষাতেই প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে।

বাঙলাভাষার হ্রস্বত্ব প্রবণতার জন্য সাধুভাষার 'করিব, যাইতেছি, গামোছা' প্রভৃতি শব্দ চলিত ভাষায় 'করবো' যাচ্ছি, গামছা' প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। পদমধ্যস্থ 'হ'-কারের লোপ প্রবণতা চলিত ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য :—ফলাহার>ফলার, চাহি> চাই, তাহার>তার। স্বরভক্তির ফলে শ্রী>ছিরি, স্নান>সিনান' প্রভৃতি, সমীভবনের ফলে এতদিন>অ্যাদ্দিন, তর্ক>তক্কো' প্রভৃতি, স্বরাগমের ফলে 'স্টেশন>ইষ্টিশন,' বর্ণদ্বিত্বের ফলে বড়>বড্ড প্রভৃতি রূপ কখনো সাধুভাষায় স্থান পায় না, কিন্তু চলিত ভাষায় এগুলি বর্জনীয় নয়।

সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান এবং আবশ্যিক পার্থক্য বিধান করা হয় ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের ক্ষেত্রে, সাধুভাষায় ক্রিয়ার পূর্ণরূপ ব্যবহার আবশ্যিক, চলিত ভাষায় ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপই শুধু ব্যবহার্য। ক্রিয়া পদগুলিকে সাধারণত, দ্বিমাত্রক কিংবা দুই-য়ের গুণিতক মাত্রাতেই নিয়ে আসা হয়। ফলে—করিতেছি>করছি, কচ্ছি, করিয়াছি>করেছি, করিলাম>করলাম' প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। অসমাপিকা ক্রিয়াও এরূপ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে। যথা—'করিতে>করতে, করিয়া>করে, করিলে> করলে' প্রভৃতি। সাধুভাষায় সর্বনামেরও পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়, চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় তার সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন—'তাহার>তার, যাহাদিগকে>যাদের, ইহা>এ/এটা' এ ছাড়াও যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার চলিত ভাষায় কম, যেমন—'শ্রবণ করিয়া শুনে,' 'লম্ফপ্রদান>লাফানো,' 'গমন করত>গিয়ে' প্রভৃতি।

বর্তমানে সাধুভাষা সরল হ'তে হ'তে এবং চলিত ভাষা প্রসারিত হ'তে হ'তে এমন এক স্থানে এসে পৌছেছে যে উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও সর্বনাম ছাড়া কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন ১৫। উপভাষা কাহাকে বলে? বাঙলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষাগুলির দৃষ্টান্তসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ১৬। একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষা কিভাবে সৃষ্টি হয়? বাঙলা ভাষার রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার প্রচলনস্থান নির্দেশ কর এবং এই দুই উপভাষার বিশিষ্ট লক্ষণাবলীর পরিচয় দাও

উত্তর: ভাষা নদীস্রোতের মতই নিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীল। স্থান ও কালভেদে ভাষার নিরন্তর এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে বলেই কোন অঞ্চলে ব্যবহৃত কোন ভাষার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়ে থাকে। এই বৈচিত্র্য সাধারণতঃ ধ্বনিগত, কিছু বা শব্দগত। কখন কখন এই ভাষা-ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভাষার সহজবোধ্যতা বজায় না থাকাও সম্ভব। কিন্তু অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকাসত্ত্বেও একই ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহারকারী জনসমষ্টিকে বলা হয় 'ভাষাসম্প্রদায়' (Speech community), কোন এক ভাষাসম্প্রদায়ে লোকসংখ্যার আধিক্য ঘটে এবং তারা যদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়ানো থাকে, তবে তাদের মধ্যে ভাষাগত কিছু দলের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণতঃ এক একটা দল এক এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এরূপ বিভিন্ন দলে ব্যবহৃত ভাষাছাঁদকে বলা হয় 'উপভাষা' (Dialect)। ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা আছে তা' মাত্রাগত। একই ভাষাছাঁদ বৃহদঞ্চলে 'ভাষানামে' এবং ক্ষুদ্রাঞ্চলে 'উপভাষা' নামে পরিচিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে কোন আঞ্চলিক ভাষাধর্ম বলে কিছু গড়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়। তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাস্রোত যে বিভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছিল তার দৃষ্টান্ত অন্ত্যমধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ নয়। তবে বিভিন্ন রচনায় ভাষাগত উপাদানের মধ্যে যে একটি সার্বভৌম সর্ববঙ্গীয় আদর্শের যোগসূত্র ছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে তারই পরিচয় বিধৃত। কালক্রমে ভাষার আঞ্চলিক লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে থাকে এবং বলতে গেলে আধুনিক কালেই বাঙলাভাষায় আঞ্চলিক ধর্মের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ উপভাষাগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ একালেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাঙলার উপভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগে কোন সর্বজনমান্য সিদ্ধান্তে পৌছনো প্রায় অসম্ভব, এ জাতীয় কোন ভৌগোলিক জরীপ না হওয়াই এর কারণ। তবে নামে বা সংখ্যায়

যতই মতভেদ থাক না কেন, বাঙলাভাষার যে দুটিমাত্র উপভাষাই (রাঢ়ী ও বঙ্গালী প্রধান এবং অপরগুলো যে তাদের কোন-না-কোন একটির নিকট সম্পর্কিত, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডঃ সুকুমার সেন স্থূলবিবেচনায় বাঙলার প্রধান উপ-ভাষাগোষ্ঠিকে নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন —(১) মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', (২) পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের 'বঙ্গালী', (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের 'ঝাড়খণ্ডী', (৪) উত্তর বঙ্গের 'বরেন্দ্রী' এবং (৫) পূর্ববঙ্গের 'কামরূপী'। এদের মধ্যে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের 'রাঢ়ী' ও পূর্ববঙ্গের 'বঙ্গালী'—এই দুটি প্রধান ভাষাস্রোতের তুলনামূলক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে আলোচনাতেই সাধারণভাবে বাংলার আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

(ক) রাঢ়ী ও বঙ্গালী : তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য—

উপভাষা রূপে রাঢ়ী ও বঙ্গালীতে এবং অপর ভাষাগুলিতে নানা দিক থেকেই কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হলেও সবগুলিই বাঙলাভাষা বলে এদের মধ্যে সাধারণ ধর্মই বেশি দেখা যায়। রাঢ়ী উপভাষার প্রচলনস্থান প্রধানতঃ হুগলী, হাওড়া, বর্ধমানের কতকাংশ এবং চব্বিশ পরগণা জেলা অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাদে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রায় সমগ্র অংশই রাঢ়ী উপভাষা ভুক্ত অঞ্চল। এই আঞ্চলিক উপভাষার একটা শিষ্টমার্জিত রূপই 'চলিতভাষা' অথবা সর্ববঙ্গীয় আদর্শ কথ্যভাষা (Stardard Colloquial language) রূপেও পরিচিত। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী উপভাষা এত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত এবং তার মধ্যে বৈচিত্র্য এত বেশি যে এদের একটিমাত্র উপভাষাপুঞ্জে সীমাবদ্ধ রাখলে এর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। এ কারণে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এদের নিম্নোক্ত দুটি গুচ্ছে বিভক্ত করে থাকেন—(১) ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নদীয়ার অংশবিশেষ ও পশ্চিম শ্রীহট্ট একটি শ্রেণীতে এবং (২) অপর অংশ পড়ে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছাড় ও পূর্ব শ্রীহট্ট। লক্ষণীয় এই যে সাম্প্রতিক কালে ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শ কথ্য ভাষা পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠছে এবং এই ভাষায় বহু নাটক অভিনীত হচ্ছে। নিম্নে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলি চিহ্নিত হ'লো।

(১) **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :** রাঢ়ীতে 'অ' ধ্বনিটির উচ্চারণ অনেক স্থলেই 'ও' কারবৎ (অগ্নি ওগ্নি' পাগল—পাগোল, বড়—বড়ো) ; কিন্তু বঙ্গালীতে এই প্রবণতা নেই, বরং 'ও'-কার অনেক সময় 'উ' হ'য়ে যায় (চোর > চুর, ঘোড়া > ঘুরা)। রাঢ়ীতে 'এ' ধ্বনির 'এ' এবং "অ্যা" উচ্চারণই বর্তমান কিন্তু বঙ্গালীতে সর্বত্র নির্বিশেষে 'অ্যা' অথবা 'অ্যা' এবং 'এ'-র মাঝামাঝি একটা ধ্বনি শ্রুত হয়।

রাঢ়ীতে ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রকৃত বর্তমান উচ্চারণ থাকলেও বঙ্গালীতে তা' কণ্ঠনালীয় ধ্বনিতে রূপায়িত হয় (ঘা > গা—ভাত > বা'ত)। রাঢ়ীতে তালব্য ধ্বনিগুলির (চ-বর্গের) উচ্চারণ ঘৃষ্ট, বঙ্গালী উপভাষায় ঐগুলি উষ্মধ্বনিতে পরিণত (ছ-S, জ-Z)। রাঢ়ীর ড়, ঢ়' বঙ্গালীতে 'র, রহ'। রাঢ়ীতে তিনটি শিসধ্বনিই 'শ'-রূপে

উচ্চারিত হয়, বঙ্গালী উপভাষায় বহুস্থলেই এগুলি 'হ'-কারে পরিণত হয় (শেষে>হেসে, নকল > হগল), আবার মূলে যেখানে 'হ' আছে, বঙ্গালীতে তার উচ্চারণ দাঁড়ায় কণ্ঠনালীয় স্পর্শযুক্ত 'অ' (হাত>আত)। রাঢ়ীতে নাসিক্যীভবন এবং স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা আছে, (চন্দ্র—চন্দ>চাঁদ, পুথি >পুঁথি), পক্ষান্তরে বঙ্গালীতে, নাসিক্যধ্বনি প্রায় পরিত্যক্ত, তবে অর্ধঅনুশসিকের প্রবণতা রয়েছে (চন্দ্র—চান—চাদ)

অপিনিহিতি বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য (হাঁটিয়া>গাইট্যা, আজি>আইজ, রাঢ়ীতে 'অপিনিহিতি'একেবারে বর্জিত এবং তৎস্থলবর্তী হ'য়েছে 'অভিশ্রুতি'(হাইট্যা>হেঁটে, আইজ> আজ)। স্বরসঙ্গতি রাঢ়ীর ধ্বনি-পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ ক'রে (পূজা >পুজো', বিলাতি>বিলিতি), কিন্তু বঙ্গালীতে স্বরসঙ্গতির ভূমিকা নগণ্য। রাঢ়ীতে 'ণ' ও 'ল' পরিবর্তন-সহ (নৌকা / লৌকো, লাউ / নাউ), কিন্তু বঙ্গালীতে কোথাও 'ণ' কোথাও 'ল' পরিবর্তনসহ নয়। রাঢ়ীতে শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, বঙ্গালীতে শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্টতা নেই, অনেক সময় পড়েও না।

(২) **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**—রাঢ়ীতে সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায়-'এ' বিভক্তি, বঙ্গালীতে নির্বিশেষ। রাঢ়ীতে কর্ম-সম্প্রদানে-'কে' বিভক্তি বঙ্গালীতে-'রে'। সম্বন্ধ বহুবচনে রাঢ়ীতে -'দের', বঙ্গালীতে -'গো, -গোর'। অধিকরণে রাঢ়ীর-'তে' স্থলে বঙ্গালীর'-ৎ' (বাড়িৎ যাও)।

ক্রিয়ারূপে রাঢ়ীর সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ কালে -'ব' বিভক্তি, বঙ্গালীর উত্তম পুরুষে -'ম' (করুম, যামু)। অতীতকালে রাঢ়ীতে '-লুম্, -'লেম্', বঙ্গালীতে-'লাম'। রাঢ়ীর ঘটমান বর্তমান 'করছি' বঙ্গালীর পুরাঘটিত রূপ। রাঢ়ীতে প্রথমপুরুষে সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে '-লে', বঙ্গালীতে -'ল' বিভক্তি। বঙ্গালীর অঞ্চল-বিশেষে নঙর্থক ভবিষ্যৎকালে নিত্যবৃত্তের রূপ হয় (আমি যাইবাম কিন্তু থাকতাম না) এবং '-ইতে'- যুক্ত অসমাপিকারও পুরুষ ভেদে রূপান্তর ঘটে (আমি যাইতাম চাই, তুমি যাইতা চাও, রাম যাইতো চায়) কিন্তু রাঢ়ীতে এটি অব্যয়-বৎ রূপান্তরহীন (আমি যেতে চাই, তুমি যেতে চাও, রাম যেতে চায়)।

(৩) **শব্দভাণ্ডার :**—রাঢ়ী ও বঙ্গালীতে শব্দভাণ্ডারে মূলতঃ ঐক্য থাকলেও ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য বর্তমান (রাঢ়ীতে কেষ্ট, ছেরাদ্দ, নেমন্তন, বঙ্গালীতে 'কিশ্‌ন, ছাদ্দ, নিমন্তন্ন')। উভয় উপভাষায় আবার বিষম শব্দের ব্যবহারও কম নয়। যেমন, রাঢ়ীর 'ছেলেপুলে, চিরুনি, ছুরি, দাঁড়ান, পেয়ারা, বাতাবী, মর্তমান কলা, রান্না, লাফ, সুপুরি, বঙ্গালীতে হয় ' ছাওয়াল পাওয়াল / পোলাপান, কাকই, চাবুক, খাড়ন, শবরী আম / গয়া, জাম্বুরা, শবরী কলা, পাক / রসুই, ফাল, গুয়া'। কিছু কিছু খাঁটি তদ্ভব শব্দ বঙ্গালীতে ব্যবহৃত হলেও রাঢ়ীতে অপ্রচলিত। যেমন, বর্ধন>বাড়ন (ঝাড়ু), অলদ্রুম> আলুন্দা, আলধুনা (ঝুল), বদরী >বরই (কুল) প্রভৃতি। একই শব্দে উভয়বঙ্গে ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, যেমন—শিল, থোর, মরিচ।

(৪) **বাগ্‌ধারা** (Idiom) :—বাগ্‌ধারাতেও রাঢ়ী ও বঙ্গালীতে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। রাঢ়ীর 'ঘুম পাওয়া, ছুট দেওয়া, দোকান করা, ব্যথা পাওয়া, বারণ / মানা করা, মাছ ধরা, শীত করা,-স্থলে বঙ্গালীর 'ঘুম ধরা, দৌড় মারা, দোকান দেওয়া / পাতা, দুঃখু পাওয়া, না করা, মাছ মারা, শীতে ধরা।' রাঢ়ীর 'এই মরেছে' বঙ্গালীতে 'খাইছে', রাঢ়ীর 'কমবেশি' বঙ্গালীর 'ব্যাশকম'।

বাক্যগঠন তথা পদস্থাপনায় উভয় উপভাষায় তেমন লক্ষণীয় পার্থক্য না থাকলেও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বাঙলায় প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাতেই নঞর্থক 'না' বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হ'লেও চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলে তা সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বেই ব্যবহৃত হয়। যথা,—'আমি পারবো না' কিংবা 'আমি পারুম না' -স্থলে 'আমি না পরিবম্'।

(খ) **'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা'** :—মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ এবং ধলভূম ও মানভূম অঞ্চলে 'ঝাড়খণ্ডী' বা 'সুহ্মক' উপভাষা প্রচলিত। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উপর রাঢ়ী উপভাষার প্রভাব এত বেশি যে এটিকে বস্তুত রাঢ়ী উপভাষারই রূপভেদ বলে গ্রহণ করা চলে।

সাধারণভাবে স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে এর বিস্তর সাদৃশ্য রয়েছে। 'আ'-কারের পূর্ববর্তী 'ও'-কার স্থলে ঝাড়খণ্ডীতে 'অ' উচ্চারিত হয় (বোকা>বকা রোগা>রগা) এবং অপিনিহিতির প্রভাব এই ভাষায় লক্ষিত হয় (করিয়া>কর‍্যা)। স্বতো-নাসিক্যীভবন ঝাড়খণ্ডীতে অত্যন্ত বেশি (চা>চাঁ, উট>উঁট)। তরলবর্ণ-স্থলে অর্থাৎ 'ল' ও 'র'-স্থলে 'ল' বহুল ব্যবহৃত (লোকেরা>লকলা, নাতিপুতিরা>লাতি-পুঁতিলা)। অনেক অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঝাড়খণ্ডীতে মহাপ্রাণিত হয় (যাও>ঝাউ, আমাকে >হামাক)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় বহুবচনের বিভক্তি '-মন -মেন' (তাদের - তাসন্‌কার)। তাদর্থ্য বুঝাতে -'কে' বিভক্তির প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন—'ঘরের দিকে চল'—'ঘরকে চল'। অপাদান কারকে -'উ'-লে,-'ঠে' বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সর্বনামে ব্যবহৃত কয়েকটি অতিরিক্ত পদ 'মুই,-হামরা, মোনে' প্রভৃতি। বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষে -'উ' বিভক্তি এবং অতীত কালে উত্তম পুরুষে -'ই' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ-কালে স্বার্থে '-ক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় (হবেক, করলেক)। নামধাতুর ব্যবহার-বাহুল্য-'জলটা গঁধাচ্ছে (-গন্ধ করছে)। অস্ত্যর্থক 'বট্' ধাতুর ঝাড়খণ্ডীর বিশিষ্টতা (মিছা কথা বটে)।

(গ) **'বরেন্দ্রী উপভাষা** :—প্রধানতঃ বরেন্দ্রভূমিতে অর্থাৎ রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলে বরেন্দ্রী উপভাষা ব্যবহৃত হয়। রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে মূলে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মূল স্বরধ্বনি এতে প্রায় অক্ষুণ্ণ—এতে 'অ্যা' ধ্বনিও বর্তমান।

পদের আদিতে হ, ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকলেও পদান্তে এদের উচ্চারণ মৃদু। পদের আদি 'র'-এর আগম ও লোপ এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য রামবাবুর আমবাগান > আমবাবুর রামবাগান)। চ-বর্গের ঘৃষ্ট উচ্চারণ বজায় থাকলেও জ'-এর উচ্চারণ (জ-z)। এতে শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্টতা নেই।

শব্দবিভক্তি রাঢ়ীর মতই, তবে বৈশিষ্ট্য-গৌণকর্মে '-ক (হামাক্ দাও), অধিকরণে -'ৎ' বিভক্তি। ক্রিয়াবিভক্তিতে বঙ্গালী প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(খ) **'কামরূপী উপভাষা'** :—জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুরের কতকাংশ, পূর্ণিয়া ও দার্জিলিং-এর অংশবিশেষে প্রচলিত। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ও 'হ' পদের আদিতে যথাযথ হ'লেও পদের অন্ত্যে মৃদু। চ-বর্গের উচ্চারণ বঙ্গালীর মত উষ্ম এবং শ, ষ, স অনেকস্থলে 'হ'-রূপে, 'ড়' প্রায়শঃ 'র'-রূপে উচ্চারিত। পদের 'র'- এর লোপ, 'ল' ও 'ন' এর বিপর্যয় এবং পদের আদি 'অ'-স্থানে 'আ' হয় (অসুখ>আসুখ)। অন্যান্য সর্বনামের সঙ্গে 'মুই, মো' ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ারূপ বঙ্গালীর মত। নঞর্থক 'না' ক্রিয়ার আগে ব্যবহৃত হয় (না লেখিম্)।

প্রশ্ন ১৭। বাঙলার 'দেশী' এবং 'বিদেশী' শব্দ-সম্পদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

প্রশ্ন ১৮। তদ্ভব ও অর্ধতৎসম উভয় প্রকার শব্দই সংস্কৃতের পরিবর্তিত রূপ। তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা কর। এই প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণ' শব্দটির রূপান্তর আলোচনা করিয়া একটি সংস্কৃত শব্দের তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম রূপ একই সঙ্গে বাঙলায় কীভাবে প্রচলিত থাকিতে পারে তাহা দেখাও।

প্রশ্ন ১৯। বাঙলা শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২০। পর্যাপ্ত উদাহরণ দিয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিদেশী শব্দগুলির উৎস সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর: যে কোন ভাষার শক্তি নিহিত তার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে। যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ, সেই ভাষার ঐশ্বর্যও তত বেশি। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম চালানোর জন্য সীমিত শব্দ সম্ভারই যথেষ্ট মনে হলেও যে জাতি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনেক প্রাগ্রসর, সেই মননধর্মী জাতির প্রয়োজনে তার শব্দভাণ্ডার চিরকালই ক্রমবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। তার প্রয়োজনের যেন আর শেষ নেই, পথ চলতে গিয়ে তাকে অনবরতই সঞ্চয় বাড়িয়ে যেতে হয়, অবশ্য চলার পথে বহু প্রাচীন শব্দ পরিত্যক্তও হ'য়ে থাকে —শব্দভাণ্ডারে শব্দ সঞ্চয়ের দুটি রীতিই সাধারণতঃ গৃহীত হয়—একটি, নোতুন নোতুন শব্দের উদ্ভাবন, দ্বিতীয়টি, অপর ভাষা থেকে ঋণগ্রহণ। পৃথিবীর যে কোন সমৃদ্ধ ভাষার বিচারেই দেখা যায় যে, যুগে যুগে এই ভাবেই শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সংস্কৃতভাষাকে আমরা অতিশয় রক্ষণশীল ভাষা বলে মনে করে থাকি, অথচ এই সংস্কৃত ভাষাও তার শব্দসৃষ্টির অসীম ক্ষমতা এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে নানা জাতীয় ভাষা থেকে বিভিন্ন সময় প্রচুর পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছে তা' সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকলেও এটি ঐতিহাসিক সত্য। সংস্কৃত ভাষার বিশ্লেষণে তার এই চরিত্রটি সুস্পষ্ট হ'য়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধার করে দেখানো হলো কীভাবে সংস্কৃতভাষা অপর ভাষার শব্দকে আত্মসাৎ করেছে। সংস্কৃতে ব্যবহৃত ভ্রম্য, কেন্দ্র, সুড়ঙ্গ, সমিতা প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ গ্রীক, 'কর্ষাপণ', পুস্তক, লিপি' প্রভৃতি মূলতঃ পারসিক, 'ঘোটক, খল্ল,

পূজা, পুষ্প', প্রভৃতি মূলতঃ দ্রাবিড়, 'পতঙ্গ, উডুম্বর, ডিম্ব' প্রভৃতি মূলতঃ অষ্ট্রীক/নিষাদ এবং 'সিন্দূর, ম্লেচ্ছ, তসর' প্রভৃতি মূলতঃ চীনাভাষার শব্দ, অথচ এখন এই সব শব্দই সংস্কৃতরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

বাঙলাভাষার শব্দভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, এই ভাবে নানাজাতীয় শব্দের সম্ভারই আমাদের শব্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধন করেছে এবং এই প্রক্রিয়া এখনও সমভাবেই ক্রিয়াশীল থেকে ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে চল্‌ছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃতভাষা দেশকালোপযোগী বিবর্তন লাভ ক'রে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতে রূপায়িত হয়। প্রাকৃত ভাষাও প্রাচীন প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠ স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হ'য়ে আনুঃ দশম শতাব্দীর দিকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা বাঙলা আদি আঞ্চলিক ভাষারূপ ধারণ করেছে। অতএব যে শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে ক্রমবিবর্তন পথে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাঙলাভাষায় এসে পৌঁছেছে সেই শব্দগুলি খাঁটি বাঙলা শব্দ,- পারিভাষিক নামকরণে এদের 'তদ্ভব শব্দ' বলে। কাজেই এই তদ্ভব শব্দগুলিই বাঙলা শব্দ ভাণ্ডারের মূল ভিত্তি গঠন করেছে। কিন্তু বাঙলা ভাষার বিশ্লেষণে তদ্ভব শব্দের বাইরেও প্রচুর শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়—এদেরও বাঙলা শব্দ বলেই গ্রহণ করা হয়, যদিচ মূলে এরা পৃথকজাতীয় ছিল।

বাঙলা শব্দভাণ্ডার মূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (ক) 'মৌলিক' শব্দ ও (খ) 'আগন্তুক' বা 'কৃত-ঋণ' শব্দ। নিম্নে এদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হ'লো।

(ক) মৌলিক শব্দ :

সংস্কৃত শব্দ থেকেই ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দের উদ্ভব ঘটেছে বলে সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় শব্দকেই বাংলা ভাষার 'মৌলিক শব্দ' বলে গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃত থেকে বাংলা শব্দ গৃহীত হ'য়েছে ত্রিবিধ উপায়ে, তদনুযায়ী মৌলিক শব্দও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) তদ্ভব (২) তৎসম ও (৩) অর্ধতৎসম।

১. তদ্ভব শব্দ : যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে ক্রম-বিবর্তনের ধারায় বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে, এই শব্দগুলিকে বলা হয় 'তদ্ভব শব্দ', তদ্ভব শব্দগুলিকেই খাঁটি বাঙলা শব্দ বলে অভিহিত করা হয় এবং এই তদ্ভব শব্দই বাঙলা শব্দ ভাণ্ডারের মূল উপাদান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ সাধারণ শব্দ, বিভিন্ন প্রত্যয় বিভক্তি প্রভৃতি ক্রমবিবর্তনের পথেই বাঙলাভাষায় উপনীত হয়েছে। এই তদ্ভব শব্দগুলি প্রাকৃত-মাধ্যমে এসেছে বলে এদের 'প্রাকৃত-জ' শব্দ নামেও অভিহিত করা যায়। "আমাদের 'ঘরোয়া' এবং 'গাঁউয়া' বা 'গেঁয়ো' শব্দ মানব-দেহের অংশ ও সমাজ, সম্পর্ক, বৃত্তি, এবং সাধারণ দৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তু, পশু ও পক্ষী, এবং নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু প্রভৃতির নাম, সাধারণ গুণবাচক বিশেষণ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম, সাধারণ ক্রিয়া, সাধারণ অব্যয়, এবং প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি শব্দ ও শব্দাংশ, প্রায়শঃ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত—প্রাকৃতজ শব্দ। (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)। নিম্নে কিছু তদ্ভব

শব্দের দৃষ্টান্ত এবং বন্ধনীর মধ্যে মূল রূপটি প্রদত্ত হ'লো।—গা (গাত্র), হাত (হস্ত), দাঁত (দন্ত), ভাই (ভ্রাতৃ), এয়ো (অবিধবা), পিসি (পিতৃস্বসৃকা), ছুতার (সূত্রধর), ভুঁই (ভূমি) ভাত (ভক্ত), মাছ (মৎস), গাধা (গর্দভ), মিছা (মিথ্যা), দেউটি (দীপবর্তিকা), দেরখো (দীপবৃক্ষ), আধ (অর্ধ), আড়াই (অর্ধতৃতীয়), আমি (অস্মে), খায় (খাদতি), নাচে (নৃত্যতি), ভিতর (অভ্যন্তর) প্রভৃতি।

প্রাচীনকালে বিদেশি ভাষা থেকে যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হ'য়েছিল এবং পরে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাঙলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলিও তদ্ভব পর্যায়ভুক্ত। যেমন—দাম, সূচি, ঘোড়া প্রভৃতি।

২. **তৎসম শব্দ ঃ**—যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত আকারে বাঙলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, তাদের বলা হয় 'তৎসম শব্দ'। তৎসম শব্দ আসলে সংস্কৃত শব্দ – এদের কতকগুলি বাঙলা ভাষায় অবিকৃত উচ্চারণ-সহ বর্তমান, আবার কতক শব্দ বানানে সংস্কৃত-বৎ হ'লেও উচ্চারণে সংস্কৃত থেকে পৃথক্—বাঙলায় এদের সবগুলিকেই তৎসম-রূপে গ্রহণ করা হয়। বাঙলা ভাষার উদ্ভবপর্বে তৎসম শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হ'ত, তারপর ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে বাঙলা ভাষা বিনা দ্বিধায় সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে অজস্র শব্দ গ্রহণ করেছে এবং এখনও গ্রহণ ক'রে যাচ্ছে। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার যেন আমাদের পৈতৃক সম্পদ্, উত্তরাধিকারসূত্রেই আমরা এর অধিকারী,—এই বোধ থেকেই তৎসম শব্দকে ঋণ বলে গ্রহণ করা হয় না, তৎসমও আমাদের নিকট মৌলিক শব্দ বলে গৃহীত হয়। দৈনন্দিন জীবনে তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশি না হ'লেও সাধুভাষায় কিংবা শিষ্টভাষায় এবং লেখার কাজে আমরা প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকি।—'ঈশ্বর, পূজা, সূর্য, পিতা, মাতা, আকাশ, জল, পশু, পক্ষী প্রভৃতি তৎসম শব্দ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একালে বহু নোতুন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই নবোদ্ভূত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুযায়ী গঠিত—এদের বলা হয় 'অর্বাচীন তৎসম' শব্দ, যেমন—'বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেক্ষাপট, বাতানুকূল, চলচ্চিত্র' প্রভৃতি।

৩. **অর্ধতৎসম শব্দ ঃ**—কিছু তৎসম শব্দ যেমন অবিকৃত আকারে বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডারে গৃহীত হ'য়েছে, তেমনি আর কিছু তৎসম শব্দ গ্রহণ করা হ'য়েছে বিকৃত আকারেও। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে বিকৃত আকারে বাঙলাভাষায় গৃহীত হ'য়েছে, তাদের বলা হয় 'অর্ধতৎসম শব্দ'। যেমন, 'গিন্নি, চন্দোর, সুরুজ; কেষ্ট, ছেরেদ্দা, পিচামো' প্রভৃতি।

তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম—এই দুই জাতীয় শব্দই সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এই—তদ্ভব শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে বিবর্তিত হ'য়ে এসেছে বাঙলায়, শব্দ দেহে প্রথম পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল প্রাকৃত স্তরেই। কিন্তু অর্ধতৎসম শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাঙলায় এসেছে এবং শব্দ দেহে বিকৃতি এসেছে বাঙলাতেই। যেমন,—সংস্কৃত 'গৃহিণী', প্রাকৃতে গর্‌হণী, তা থেকে বাঙলায় 'ঘরণী'—এটি তদ্ভব শব্দ।

অথবা সং শ্রদ্ধা>প্রা সদ্ধা>বা সাধ—তদ্ভব শব্দ। আবার সং গৃহিণী সরাসরি বাঙলায় হয়েছে 'গিরনি>গিন্নী' কিংবা 'শ্রদ্ধা> ছেরেদ্দা'—এগুলি অর্ধতৎসম।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কৃষ্ণ' শব্দটি অবলম্বন ক'রে তৎসম, তদ্ভব এবং অর্ধ-তৎসম শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্ত ক্রমে: বাঙ্গলা-ভাষায় আগত ও ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ কিন্তু সর্বত্র অবিকৃত নাই। বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন বা আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া বহুস্থানে এগুলি ঈষৎ বা বহুল পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে; যেমন, সংস্কৃত 'কৃষ্ণ শব্দ অবিকৃত রূপে (অন্ততঃ লেখায়) বাঙ্গলায় 'কৃষ্ণ' শব্দের একটি উচ্চারণ ছিল [ক্রেষ্ট]; এই উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 'কৃষ্ণ', শব্দের বাঙ্গলায় একটি প্রচলিত রূপ দাঁড়াইয়াছে 'কেষ্ট'। ঐতিহাসিক ক্রমলব্ধ প্রাকৃত-জ• রূপ কান, কানু, কানাই' (কৃষ্ণ>কণ্‌হ>কাণ্‌হ>কান') ও বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতের বিকৃতজাত রূপ 'কেষ্ট'—এই দুইটিই মূল সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ' হইতে উদ্ভূত হইলেও, উভয়ে একেবারে পৃথক্—প্রথমটি ('কান') বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন স্তরের শব্দ, দ্বিতীয়টি ('কেষ্ট') অর্বাচীন --সংস্কৃত হইতে ধার করা শব্দের বিকৃতরূপ।"—আলোচনায় দেখা গেল তৎসম 'কৃষ্ণ', তদ্ভব 'কান/কানু' এবং অর্ধতৎসম 'কেষ্ট' কীভাবে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হ'য়েছে।

খ আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দ

সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও 'আগন্তুক/কৃতঋণ' শব্দগুলিও বাঙলা শব্দভাণ্ডারে কম সম্পদ জোগায়নি। অতিপ্রাচীনকালেও প্রচুর আগন্তুক শব্দ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে এক্ষণে সংস্কৃত শব্দরূপেই পরিচিত হ'চ্ছে। যে সকল আগন্তুক শব্দ বাঙলা ভাষায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে, সেগুলিও যে একসময় আর আগন্তুক বলে পরিচিত না হ'য়ে বাঙলা শব্দ বলেই অভিহিত হ'বে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙলা আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—(১) দেশি (২) বিদেশি ও (৩) প্রাদেশিক।

১. **দেশি শব্দ**:—আর্যভাষা নয়, এমন যে সকল ভারতীয় ভাষার শব্দ বাঙলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তাদের বলা হয় 'দেশি' শব্দ। কিছুকাল আগে পর্যন্তও এই শব্দগুলি 'অজ্ঞাতমূল শব্দ' বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ফলে এই সমাধানে পৌছানো গেছে যে দেশি শব্দগুলি অজ্ঞাতমূল নয়, বরং এদের বলা চলে 'অনার্যমূল শব্দ'। আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে যে সকল জাতি বসবাস করতো, তাদের মধ্যে অস্ট্রীক বা নিষাদ এবং দ্রাবিড়দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ নিষাদ এবং দ্রাবিড় ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাঙলা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছে, তাদেরই বলা হয় দেশি শব্দ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীনকাল সংস্কৃত ভাষাতেও প্রচুর দ্রাবিড় এবং নিষাদ শব্দ গ্রহণ করা হ'য়েছিল, কালক্রমে সংস্কৃতভাষার দেহে এই শব্দগুলি এমনভাবে মিশে গেছে এদের আর দেশি

শব্দ বলা হয় না, এগুলি তৎসম শব্দরূপেই পরিচিত। যে সকল দ্রাবিড় বা নিষাদ জাতীয় শব্দ সরাসরি ঐ সব ভাষা থেকে বাঙলায় চলে এসেছে, ঐগুলিই শুধু দেশি শব্দ রূপে অভিহিত হয়।—নিষাদ ভাষা থেকে আগত এরূপ কিছু শব্দ—'উচ্ছে, খড়, খোকা, ঝিঙে, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, মুড়ি' প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত—'আকাল, চুরুট, ইড্‌লি'।

২. **বিদেশি শব্দ ঃ** বহু বিদেশি জাতির ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিদেশি ভাষার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে। এই পরিচয়ের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি —বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ। ত্রয়োদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই গৌড়বঙ্গে তুর্কী আক্রমণ ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশে তুর্কীশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে পাঠান-মোগলরাও এদেশ শাসন করেছিল। এই বিদেশি জাতিরা সকলেই ফারসি ভাষাকে রাজভাষারূপে গ্রহণ করে। ফলে ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমে বহু তুর্কী ও আরবী শব্দ বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার লাভ করে। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত বিভিন্ন ভাষার যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তাদেরই 'বিদেশি শব্দ' বলা হয়। বিদেশি শব্দাবলীর প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমে আগত আরবী ও তুর্কী শব্দ। এদের মোট সংখ্যা প্রায় ২৫০০। এ জাতীয় বহু শব্দই আমাদের জাতীয় জীবন ও ভাষার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে আছে যে বাঙলা শব্দ ভাণ্ডারের বাইরে আর এদের রাখা সম্ভবপর নয়।

'তুর্কীশব্দ':—'বাবু, বিবি, বোচকা, বাবা, চাকু, কাঁচি, কোর্মা, গালিচা, দারোগা, লাশ, বেগম, বাহাদুর' প্রভৃতি।

'আরবী শব্দ'—'আইন, আক্কেল, কেচ্ছা, কিতাব, কলম, জাহান্নম, তাজ্জব, বিদায়' প্রভৃতি।

'ফারসি শব্দ' :—উকিল, খোদা, নমাজ, রোজা, জাহাজ, পেয়ালা, খুব, জোর, দুরবীন, মজুর' প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদেশিদের আগমন শুরু হয় য়ুরোপ থেকে। পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও জার্মানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে এসে কুঠি নির্মাণ করে এবং পরে শাসন-শোষণও চালিয়ে যেতে থাকে। এই সুবাদে বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ-হেতু এদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাঙলা ভাষায় এসে গেছে। ইংরেজরা দীর্ঘকাল এদেশ শাসন করেছিল বলে প্রভূত পরিমাণ ইংরেজি শব্দ বাঙলা শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু শব্দ এমন ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে এগুলিকে আর ইংরেজি বলে চেনা যায় না। এই শব্দ গুলিকে 'ইংরেজি তদ্ভব' এবং যে শব্দ প্রায় যথাযথরূপে বর্তমান আছে, তাদের 'ইংরেজি তৎসম' আখ্যা দেওয়া চলে।

'ইংরেজি তদ্ভব' ঃ—লাট (Lord) সান্ত্রী (Sentry), লম্ফ (Lamp), লণ্ঠন (Lantern) প্রভৃতি।

'ইংরেজি তৎসম' ঃ—স্কুল, কলেজ, সিনেমা, ইঞ্চ, অক্সিজেন, ফুটবল, গোল, কালচার, সোসাইটি' প্রভৃতি। 'পর্তুগীজ শব্দ' ঃ—আতা, আনারস, ফিতা, বালতি, সাবান, পাউরুটি, মিস্ত্রি, বেহালা' প্রভৃতি।

'ফরাসী শব্দ' ঃ—বিস্কুট, কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরাঁ, কাফে, রেনাসাঁস, আঁতাত, ম্যাটিনি, এলিট, প্রভৃতি।

'ওলন্দাজ শব্দ' ঃ—'রুইতন, হরতন, ইস্কাবন, তুরুপ, বোম', প্রভৃতি।

এগুলি ছাড়াও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এসেছে—রুশ ভাষার 'স্পুটনিক, ভদকা, বলশেভিক, প্রভৃতি ; জার্মান 'নাৎসি,' ইতালীয় 'ম্যাজেন্টা, ফ্যাসিস্ট' ; চীনা 'চা', লিচু,' জাপানি 'রিক্সা 'যুযুৎসু, হারাকিরি' প্রভৃতি শব্দ।

প্রাদেশিক শব্দ ঃ—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কিছু কিছু শব্দও বাঙলায় এসেছে। যেমন হিন্দীভাষায় 'কুত্তা, খতম, পানি, জলদি, লাগাতার, মিঠাই, বদলা'; গুজরাটি, 'হরতাল, খাদি, গরবা'; মারাঠি 'বরগী, চৌথ,' পাঞ্জাবী, শিখ, চাহিদা, অসমীয়া 'ডাঙ্গর' ;ওড়িয়া 'গুড়ি প্রভৃতি। এই প্রাদেশিক শব্দগুলিও এক্ষণে বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ২১। ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন হয় কেন? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

অথবা

শব্দার্থ-পরিবর্তনের কারণসমূহ উদাহরণ-সহ বর্ণনা কর।

উত্তর। অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় 'শব্দ', অতএব অর্থ বোঝানোর জন্যই শব্দের সৃষ্টি, কিন্তু এমন কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল চিরকালই যার একটিমাত্র অর্থই প্রচলিত রয়েছে। দেশকালপাত্রের প্রেক্ষাপটে শব্দের অর্থ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়—এই সহজ সত্যটি আর স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না—'পা' ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে বিভিন্ন 'পতি', পাতা, পিতা'—এই তিনটি শব্দেরই মূল অর্থ 'যিনি পালন করেন' অথচ তিনটি শব্দের ব্যবহারিক অর্থে কতপার্থক্য।

শব্দের অর্থ কেন পরিবর্তিত হয়, এক কথায় তার কোন উত্তর দেওয়া যায় না। নানা কারণেই শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই কারণের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হলেও স্থূল এবং প্রধান কারণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভবপর। বিভিন্ন ভাষা-বিজ্ঞানী শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন—(ক) ভিন্ন পারিবেশিক কারণ (খ) মনোবিষয়ক কারণ এবং (গ) আলঙ্কারিক কারণ।

(ক) **ভিন্ন পারিবেশিক কারণ**ঃ—কোন শব্দ যে অঞ্চলে যে অর্থে সৃষ্ট হয়েছিল, পরিবেশ-পরিবর্তনে তার অর্থের পরিবর্তন হতে পারে— তাই শব্দের এ জাতীয় অর্থ পরিবর্তনকে পারিবেশিক কারণ-জাত অর্থ পরিবর্তন বলে মনে করা হয়।

১ স্থান কালের পরিবর্তনে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। ফারসীতে 'দরিয়া' শব্দের অর্থ 'নদী, 'মুর্গ' অর্থ—যে কোন পাখি ; কিন্তু বাঙলায় এ দুটি শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে 'সমুদ্র' ও 'কুক্কুট'।

২. কালের পরিবর্তনেও শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে—'উষ্ট্র' একসময় 'আরণ্য বৃষ (Bison)' বোঝাতো এখন উট (camel)।

৩. ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র-জাতি প্রভৃতির কালানুক্রমিক পরিবর্তনেও শব্দের প্রচলিত অর্থ ভিন্ন রূপ ধারণ করে।—Mother ও Sister এখন পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করেছে আবার 'বুর্জোয়া, জোতদার, অসুর' প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ উৎকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪. একটি শব্দের একাধিক রূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে।—'ভোজ ও ভোজন', 'সৌজন্য ও সোহাগ' মূলতঃ একার্থক হলেও ব্যবহারিক অর্থে তাদের পার্থক্য রয়েছে, 'বিবাহ, পরিণয়, পাণিগ্রহণ' প্রভৃতি শব্দে যে বলপ্রয়োগের ভাব ছিল তা এখন অন্তর্হিত।

৫. পাত্র ও বস্তুর পরিবর্তনেও শব্দের অর্থান্তর ঘটে—'Penna' বা পালকের তৈরি লেখনী ছিল pen, এখন Steel-এরও pen হয়।

(খ) মনোবিষয়ক কারণ: শব্দার্থ-পরিবর্তনে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপর দুটি কারণের সঙ্গেও অনেক সময় এটি জড়িত থাকে।

(৬) নানাবিধ মানসিক সংস্কারের জন্য আমরা অশুভ—কুরুচিকর কিংবা ভীতিজনক শব্দ পরিহার করে ভিন্ন শব্দ দ্বারা ঐ বিষয়টি প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।—'চাউল' বাড়ন্ত, 'শাঁখা শীতলানো', শব্দ দিয়ে আমরা অশুভ শব্দকে এড়িয়ে যাই, বাথরুম পাওয়া বা 'ঘাটে যাওয়া' শব্দের সাহায্যে কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার পরিহার করি এবং বসন্তের বদলে 'মায়ের দয়া', সাপের পরিবর্তে 'লতা' ব্যবহার করে ভয়ের কারণটি বাদ দিতে চেষ্টা করি।

(৭) হীন কাজকে শোভনতা দানের উদ্দেশ্যেও আমরা মহৎ অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকি।—রান্না করার পুরুষকে 'মহারাজ/ঠাকুর' বলি, কাজের মেয়েকে কন্যার মর্যাদা দিয়ে বলি 'ঝি'। এখন ঝি বল্লেও তারা অসন্তুষ্ট হয় বলে তাদের বলি 'কাজের লোক।'

(৮) শব্দপ্রয়োগে অসতর্কতা বা অজ্ঞতার জন্যও শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়।—'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কিন্তু অজ্ঞতাহেতু এখন 'নিষ্ঠুর' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বারুণী' শব্দের অর্থ মদ্য, মধুসূদন বরুণপত্নী 'বরুণানী'-স্থলে 'বারুণী' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(৯) শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার ফলেও অর্থ-পরিবর্তন ঘটে।—'ক্ষৌরকর্ম' থেকে সংক্ষেপে 'কামানো', 'দণ্ডবৎ প্রণাম' থেকে 'দণ্ডবৎ', 'বাইসাইকেল' থেকে 'বাইক'।

(১০) সাদৃশ্য শব্দার্থ পরিবর্তনে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। দেহের মধ্যে মাথার স্থানই সর্বোচ্চে এবং মাথাই শ্রেষ্ঠ—এই বিবেচনায় যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতেই 'মাথা' শব্দ প্রযুক্ত হয়।—'দইয়ের মাথা, গাঁয়ের মাথা, মাথা খাওয়া, মাথা ধরা, তেমাথা' প্রভৃতি।

(গ) আলঙ্কারিক কারণ: মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—অলঙ্কার দিয়ে কথা বলা। এই অলঙ্কার আরোপের ফলে বাক্যের সৌন্দর্যই শুধু বৃদ্ধি পায় না, শব্দার্থেরও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়।

(১১) রূপকাদি অলঙ্কার ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থ এমনভাবে পরিবর্তিত হতে পারে যে মৌলিক অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। গোরুর চোখের মতো আকৃতি ছিল বাতায়নের তাই নাম ছিল 'গবাক্ষ'—কিন্তু এর আকৃতি চৌকো। 'বীণাবাদনে দক্ষ' বলেই 'প্রবীণ' কিন্তু এখন বীণার সঙ্গে প্রবীণতার সম্পর্ক নেই।

(১২) উপমা-উৎপ্রেক্ষা-আদি অলঙ্কার বাক্যে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে বোঝবার

উপায় নেই, ফলে পরিবর্তিত অর্থের সঙ্গে এর সম্পর্কও বোঝা যায় না।—'বেলাভূমিকে অতিক্রান্ত' অর্থে 'উদ্বেল' কিন্তু আমাদের হৃদয় উদ্বেল হয়।

(১৩) ব্যষ্টির স্থলে সমষ্টি এবং সমষ্টির স্থলে ব্যষ্টির প্রয়োগেও অর্থ-পরিবর্তন ঘটে।—'লাল পানি' মানে আর লাল রঙের যে কোন পানীয় নয়, একটি বিশেষ পানীয়। আবার 'ভাত-কাপড়' বলতে শুধু ভাত আর কাপড়ই বোঝায় না, যাবতীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থাই বোঝায়।

(১৪) নম্রতা প্রদর্শনের জন্যেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে।—দেবতার জন্য খাদ্য 'ভোগ', নিজের বাড়ি 'গরীবখানা'।

(১৫) বক্রোক্তির সাহায্যে দূষণীয় শব্দে ছদ্মবেশ পরিয়ে তার অর্থ পরিবর্তন করা হয়।—'হাতটান, 'শ্বশুরবাড়ি (-জেলখানা), শ্রীঘর বাস'।

প্রশ্ন ২২। বাঙলা ভাষার নিম্নোক্তরূপ শব্দার্থ-পরিবর্তনের প্রত্যেকটির অন্ততঃ দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর :

অথবা

বাঙলা ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন কতভাবে সম্পন্ন হ'য়ে থাকে, দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর। কোন ভাষার কোন শব্দই প্রায় চিরকাল একই অর্থ বহন করে না। নানা-কারণেই অধিকাংশ শব্দের অর্থান্তর ঘটে থাকে। শব্দার্থের এই পরিবর্তন নানা ধারায়ই সংঘটিত হলেও ভাষাবিজ্ঞানীগণ প্রধানতঃ পাঁচটি ধারাকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন :—(১) অর্থসঙ্কোচ, (২) অর্থপ্রসার, (৩) অর্থোন্নতি, (৪) অর্থাবনতি ও (৫) অর্থ-সংশ্লেষ/অর্থসংক্রম।

(ক) **অর্থসঙ্কোচ/শব্দার্থের সঙ্কোচ :** যে কোন শব্দের অর্থসমষ্টির মধ্যে যদি কোন এক প্রধান হ'য়ে ওঠে অথবা সমষ্টিবাচক শব্দকে ব্যষ্টি অর্থে সমগ্র থেকে অংশকে কিংবা কারণবাচক শব্দ থেকে কার্যবাচক শব্দ বোঝায় তখন শব্দের অর্থসঙ্কোচ ঘটে থাকে।—'মৃগ' শব্দের মূল অর্থ 'পশু' (মৃগয়া—পশুশিকার, মৃগেন্দ্র—সিংহ, পশুরাজ), কিন্তু এখানে ব্যষ্টি বোঝাতে সমষ্টিবাচক শব্দপ্রয়োগ হওয়াতে অর্থসঙ্কোচ হ'লো. কারণ শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'হরিণ'। 'মহোৎসব' শব্দের অর্থ 'যে কোন মহৎ উৎসব' কিন্তু বর্তমানে এটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ উৎসবে (মোচ্ছব) পরিণত হওয়াতে অর্থসঙ্কোচ হয়েছে। কৃপণ শব্দের মূল অর্থ 'কৃপার পাত্র', কিন্তু অর্থসঙ্কোচের ফলে 'ব্যয়কুণ্ঠ' অর্থ দাঁড়িয়েছে। 'বৈবাহিক' শব্দের মূল অর্থ 'বিবাহ-সম্পর্কিত', অর্থসঙ্কোচের ফলে 'বড় শ্যালক'।

(খ) **অর্থপ্রসার/শব্দার্থের প্রসার :** শব্দের মূল অর্থ যখন কোন কারণে

বস্তুর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে বস্তুনিরপেক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায় তখনই তার প্রসার ঘটে—একেই বলা হয় শব্দার্থের প্রসার। ধন্য শব্দের মূল অর্থ 'যার ধন আছে' কিন্তু এখন তার অর্থ প্রসারিত হ'য়ে যে কোন সৌভাগ্যবানকেই বোঝাতে পারে। 'কালী' বলতে বোঝাতো কোলো রঙ-এর তরল লিখবার উপাদান—এখন অর্থপ্রসার ঘটাতে এখন 'কালী' কালো রঙ ছাড়াও হয় এবং তরলতাবর্জিত ও লিখবার উপাদান না হ'লেও চলে (যেমন—জুতোর কালী)। ব্যক্তিনাম ব্যক্তি বা বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে সাধারণ বস্তু বা ভাবের পরিচায়ক হ'লে তার অর্থবিস্তার ঘটে—ম্যাকিন্‌ট্‌স্ (Macintosh) নামক ব্যক্তি, যে ধরনের বর্ষাতি ব্যবহার করতেন তারই নাম হয়ে দাঁড়ায় Macintosh। কোন স্থান থেকে আগত বস্তুর নাম ঐ স্থানের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে শব্দার্থের প্রসার ঘটাতে পারে।—'বাটাভিয়া' থেকে আনত ফল 'বাতাবী', কিংবা 'মার্তাবান' থেকে আগত কলা 'মর্তমান কলা'—এতে হয়েছে শব্দার্থের প্রসার।

(গ) **অর্থোন্নতি/শব্দার্থের উৎকর্ষ :** শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ অপেক্ষাও যদি এর প্রচলিত অর্থ ভাবের বিষয় বা ভাবকে প্রকাশ করে তবেই শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে থাকে।—'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গৃহ'। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ 'দেবগৃহ', কাজেই এখানে অর্থোন্নতি ঘটেছে। 'ভোগ' এবং 'ভোজ' দুইটি শব্দের একই অর্থ অথচ 'ভোগ' শব্দটি প্রধানত 'দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নাদি' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় বলে এখানে শব্দার্থের উৎকর্ষ ঘটেছে। 'ভীষণ সুন্দর' শব্দে 'ভীষণ' শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে কারণ 'ভীষণ' শব্দের মূল অর্থ, 'যা ভয় দেখায়'—'সুন্দর' কখনো ভয় দেখাতে পারে না বলেই ভীষণের অর্থোন্নতি।

(ঘ) **অর্থাবনতি/শব্দার্থের অপকর্ষ :** কোন শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ উৎকর্ষবাচক হ'লেও প্রচলিত অর্থ যদি অপেক্ষাকৃত হীন অর্থ বোঝায় তাহলে অর্থের অপকর্ষ ঘটে থাকে।—'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ 'মহৎ ব্যক্তি', কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ 'সুদখোর'—অতএব অসাধু ও নিষ্ঠুর হওয়াই সম্ভব তাই অর্থাবনতি ঘটলো। 'বৈষ্ণব পদাবলীতে 'রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম, কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ, 'অবৈধ প্রেম' অতএব এখানে শব্দের অর্থাপকর্ষ ঘটেছে। 'ইতর' শব্দের মূল অর্থ 'অপর, অন্য' কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'নীচ, ছোট লোক'—অতএব অর্থাবনতির দৃষ্টান্ত।

(ঙ) **অর্থসংক্রম/শব্দার্থের আমূল পরিবর্তন :** শব্দার্থের ক্রমিক সঙ্কোচ ও প্রসারের ফলে এবং মধ্যবর্তী স্তরে লুপ্ত হ'য়ে যায় বলে মূলের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের আর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না,—এই ভাবেই অর্থসংক্রম বা শব্দার্থের আমূল পরিবর্তন ঘটে থাকে।—'সন্দেশ' এবং 'তত্ত্ব' দু'টি শব্দেরই মূল অর্থ ছিল 'সংবাদ', প্রাচীনকালে যখন যাতায়াতের কোন সুব্যবস্থা ছিল না, তখন কন্যাগৃহে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য লোক পাঠানো হ'তো—অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকতো হাঁড়িতে মিষ্টদ্রব্য এবং পোটলায় কাপড়-চোপড়। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে সংবাদ আদানপ্রদান সহজসাধ্য হ'লেও কন্যার শ্বশুরগৃহের চিরকালের প্রাপ্য হাঁড়ি বোঝাই মিষ্টি এবং কাপড় চোপড়ের দাবী

কিন্তু বাতিল হ'লো না, ফলে সন্দেশ এবং তত্ত্ব সংবাদ ছেড়ে 'মিষ্ট দ্রব্য' ও 'কাপাড়চোপড়' বোঝাতেই ব্যবহৃত হতে লাগলো। 'বিবাহ' শব্দে জোর করে বহন করে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে এটি একেবারেই 'সামাজিক জীবন', 'গবেষণা' শব্দের মূল অর্থ 'গোরু খোঁজা'—এখন তা' কাগজপত্রেই নিবদ্ধ থাকায় অর্থসংক্রম ঘটেছে, 'শুশ্রূষা' শব্দের মূল অর্থ 'শোষণের ইচ্ছা' আমূল পরিবর্তনের ফলে 'পরিষেবা'।

প্রশ্ন ২৩। নিম্নলিখিত বাঙলা শব্দে মূল হইতে শব্দার্থ পরিবর্তন কিভাবে ঘটিয়াছে বুঝাইয়া দাও :

(ক) লেডিকেনি, গুড় বাড়ন্ত, বর, অর্ধচন্দ্র।

(খ) বর (groom), দুহিতা, বিবাহ, উদ্বেল, দারুণ, সন্দেশ, লেডিকেনি, গাঙ, অর্ধচন্দ্র, বাড়ন্ত (ঘরে চাল বাড়ন্ত)

(গ) বর, দুহিতা, বিবাহ, তৈল, সন্দেশ, লেডিকেনি, স্তম্ভিত, দারুণ, বাড়ন্ত, অর্ধচন্দ্র।

(ঘ) দরিয়া, মোরগ, মৃগ, অসুর, ওঝা, ঘড়ি, তুলি, মায়ের দয়া, ঘি, পাষণ্ড, ষণ্ডামার্ক ক্রন্দসী, কামানো, গবাক্ষ, প্রবীণ, হরতাল, শ্বাপদ, শ্রীঘর, সম্ভ্রম, মান, সাধু, ইতর, পীরিতি, অন্ন, খাজা, মোচ্ছব, গৌরচন্দ্রিকা, ফলার, জহর, জাউ, বয়কট, মণ্ডপ, ঘড়েল, গবেষণা।

উত্তর ১. **অন্ন** : 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্য', কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ প্রধান খাদ্য, বিশেষভাবে 'ভাত'—অতএব এখানে অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

২. **অর্ধচন্দ্র** : 'অর্ধচন্দ্র' শব্দের মূল অর্থ 'চন্দ্রের অর্ধাংশ', কিন্তু হাতের আঙুলগুলিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে গলাধাক্কা দেওয়া হয় বলে শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'গলাধাক্কা দেওয়া' অতএব এখানে একদিকে অর্থের প্রসার, অপরদিক অর্থাবনতি ঘটেছে।

৩. **অসুর** : 'অসুর' শব্দের মূল অর্থ 'প্রাণবান্' বা 'প্রাণদাতা'—সাধারণতঃ মহান্ দেবতাদেরই অসুর নামে অভিহিত করা হ'তো। কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থাবনতি ঘটিয়ে 'অ-দেব' অর্থাৎ দৈত্য-দানব পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. **ইতর** : 'ইতর' শব্দের মূল অর্থ 'অন্য, অপর' কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ 'ছোটলোক, হীনব্যক্তি' —এখানে শব্দার্থের অবনতি ঘটেছে।

৫. **উদ্বেল** : 'উদ্বেল' শব্দের অর্থ 'যা বেলাভূমিকে অতিক্রম ক'রে যায়' অর্থাৎ 'সাগর' সম্পর্কেই শব্দটি প্রযোজ্য হ'তে পারে, কিন্তু যখন বলা হয় 'হৃদয় উদ্বেল' তখন শব্দটির আমূল অর্থপরিবর্তন বা অর্থসংক্রম ঘটে।

৬ **ওঝা** : 'ওঝা' শব্দটির মূলে আছে 'উপাধ্যায়', যার অর্থ 'অধ্যাপক'। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ 'বিষবৈদ্য'—অতএব এখানে অর্থাবনতি হয়েছে।

৭. **কামানো** : 'ক্ষৌরকর্ম' শব্দটিকে সংযোগ ক'রে নিয়ে—মূল অর্থে 'কামানো' শব্দটি ব্যবহার করা হয়—অতএব এখানে অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

৮. **ক্রন্দসী** : সংস্কৃতে 'রোদসী' শব্দের অর্থ 'আকাশ', কারণ তা 'রোদন করে' অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়; এর সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন 'ক্রন্দসী' শব্দ

'আকাশ' অর্থে। কিন্তু 'ক্রন্দসী' শব্দটি পূর্ব থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রচলিত ছিল—কাজেই এখানে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৯. **খাজা :** 'খাজা' শব্দটির মূলে আছে 'খাদ্য' শব্দ, কিন্তু এটি একটি বিশেষ খাদ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে এখানে অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

১০. **গবাক্ষ :**—'গবাক্ষ' শব্দটির মূল অর্থ 'গোরুর চোখ' এবং তার সাদৃশ্যে সৃষ্টি 'বাতায়ন' কিন্তু বর্তমানে বাতায়নের আকার গবাক্ষ সাদৃশ্য নয়—অতএব এখানে অর্থপ্রসার ঘটেছে।

১১. **গাঙ :**—'গাঙ' শব্দটির মূলে আছে 'গঙ্গা' নামক একটি বিশেষ নদী ; কিন্তু 'গাঙ' বলতে এখন যে কোন নদীকেই বোঝায়, অতএব এখানে অর্থবিস্তার ঘটেছে।

১২. **গুড় :**—'গুড়' শব্দের মূল অর্থ 'দলাপাকানো' বা 'পিণ্ডাকৃতি' বস্তু। কিন্তু প্রচলিত অর্থে গুড় পিণ্ডাকৃতি না হয়ে অর্ধতরলও হ'তে পারে, অতএব অর্থবিস্তার ঘটেছে।

১৩. **গবেষণা :**—'গবেষণা' শব্দের মূল অর্থ গোরু খোঁজা ; কিন্তু প্রচলিত অর্থে কাজ কাগজে-পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকায় এখানে অর্থ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, অতএব অর্থসংক্রম।

১৪. **গৌরচন্দ্রিকা :**—'গৌরচন্দ্রিকা' মূলতঃ গৌরচন্দ্র -বিষয়ক গান-পদ কীর্তনের পূর্বে এ জাতীয় পদ গাইতে হয়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে যে কোন কাজ বা বক্তব্যের পূর্ববর্তী ভনিতাকে বোঝায়, অতএব এখানে অর্থবিস্তার ঘটেছে।

১৫. **ঘড়ি :**—ঘটিতে জল বা বালির সাহায্যে সময় পরিমাপ করা হতো এককালে, তাই সময় পরিমাপক যন্ত্রের নাম ঘটিকাযন্ত্র>ঘড়ি'। বর্তমানে ঘটির সঙ্গে সময় পরিমাপের সম্পর্ক না থাকলেও নামটি রয়ে গেছে,—এখানে অর্থবিস্তার ঘটেছে।

১৬. **ঘোড়েল :**—'ঘোড়েল' শব্দের মূল আছে 'ঘটিকাপাল>ঘড়িয়াল,' অর্থাৎ যিনি জলঘড়ির বা 'বালুকাঘড়ি'র রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাকে অতিশয় সচেতন থাকতে হ'তো ; তা-থেকে অর্থপ্রসারে 'অতিসতর্ক' ব্যক্তিকে বোঝায়।

১৭. **জহর :**—'জহর' শব্দের মূলে আছে জতুগৃহ>জউঘর>জউহর>জহর অর্থাৎ লাক্ষানির্মিত গৃহ। তা থেকে অর্থপ্রসারে 'আগুনে পুড়ে মরা'।

১৮. **জাউ :**—'জাউ' শব্দের মূলে 'যবাগূ' অর্থাৎ 'যবের মণ্ড'। তাথেকে অর্থপ্রসারে চাউলের মণ্ড বা 'ফেনাভাত' কেও বোঝায়।

১৯. **ঝি :**—'ঝি' শব্দের মূলে 'দুহিতা' শব্দ। দাসীকে মর্যদা দানের ইচ্ছায় 'ঝি' শব্দের অর্থাবনতি ঘটিয়ে তথা অর্থপ্রসার ঘটিয়ে 'দাসী' অর্থে 'ঝি' শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

২০. **তুলি :**—'তুলো' দিয়ে তৈরি হতো বলে 'তুলি' নাম, কিন্তু এক্ষণে ভিন্ন উপাদানে তৈরি হলেও 'তুলি' নামটি রয়ে গেছে, অতএব অর্থপ্রসার ঘটেছে।

২১. **তৈল :**—'তিল' থেকে জাত তরল দ্রব্য বিশেষ। এক্ষণে ভিন্ন উপাদান থেকে জাত বস্তুও তৈল আখ্যা পায়, অতএব অর্থপ্রসার ঘটেছে।

২২. **থান** :—'থান' শব্দের উৎপত্তি 'স্থান' থেকে কিন্তু থান শব্দে বিশেষভাবে দেবস্থানকেও বোঝায় বলে এখানে অর্থোন্নতি ঘটেছে।

২৩. **'দরিয়া'** :—'দরিয়া' শব্দের মূল অর্থ 'নদী', কিন্তু এই ফারসি শব্দটি বাঙলায় 'সাগর' অর্থে ব্যবহৃত হয়, অতএব এখানে অর্থবিস্তার ঘটেছে।

২৪. **দারুণ** :—'দারুণ' শব্দটির মূলে আছে 'দারু' অর্থাৎ 'কাঠ'—কাঠের মত শক্ত বা কঠিন এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে অর্থবিস্তার ঘটেছে।

২৫. **দুহিতা** :—'দুহিতা' শব্দের মূল 'দোহনকারিণী'-সম্ভবতঃ প্রাচীন আর্যজাতির গৃহে কন্যারা গো দোহন করতো, তাই তাদের বলতো 'দুহিতা' কিন্তু এখন কন্যারা গো দোহন করে না কিংবা যারা দোহন করে তাদেরও দুহিতা বলা হয় না, অতএব এখানে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

২৬. **পাষণ্ড** :—'পাষণ্ড' শব্দটির মূল অর্থ 'বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী', ক্রমিক অর্থ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার প্রচলিত অর্থ 'নিষ্ঠুর'—অতএব আমূল অর্থপরিবর্তনের ফলে এখানে অর্থ-সংক্রম হ'য়েছে।

২৭. **পীরিতি** :— 'পীরিতি' শব্দটির মূলে আছে 'প্রীতি'। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের 'আলৌকিক প্রেম' বোঝাতে 'পীরিতি' শব্দ ব্যবহৃত হতো। এর প্রচলিত অর্থ 'অবৈধ প্রেম'—অতএব এখানে শব্দার্থের অবনতি ঘটেছে।

২৮. **প্রবীণ** :— 'প্রবীণ' শব্দের মূলগত অর্থ 'যিনি বীণাবাদনে দক্ষ' ; ক্রমিক অর্থপরিবর্তনে এর প্রচলিত অর্থ 'বয়স্ক ব্যক্তি,—এখানে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

২৯. **ফলার** :—'ফলার' শব্দের মূলে রয়েছে 'ফলাহার', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'দই-চিড়াসহযোগে আম কলা আদি খাদ্য সংযোগ'—অতএব এখানে অর্থপ্রসার হ'য়েছে।

৩০. **বয়কট** :—জনৈক ইংরেজের নাম ছিল 'বয়কট', কোন কারণে তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করা হয়। তা থেকেই অর্থবিস্তারে কোন কিছু বা কাউকে বর্জন করার নাম 'বয়কট করা'।

৩১. **বর** :—'বর' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'নির্বাচনকারী', ক্রমিক অর্থপরিবর্তনের 'কন্যানির্বাচনকারী>নববিবাহার্থী>নববিবাহিত>স্বামী'—অতএব আমূল অর্থপরিবর্তনে এখানে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৩২. **বাড়ন্ত** :—'বাড়ন্ত' শব্দের মূল অর্থ 'যা বেড়ে চলছে'—কিন্তু যখন বলা হয় 'ঘরে চাল বাড়ন্ত', তখন অর্থ হ'লো>'ঘরে চাল নেই'। 'নেই' এই অশুভ শব্দটি পরিহারের উদ্দেশ্যে বিপরীতার্থক 'বাড়ন্ত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়—অতএব এখানে অর্থের প্রসার বা অর্থসংক্রম ঘটেছে বলা চলে।

৩৩. **বিবাহ** :—'বিবাহ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জোর করে বহন করে নিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দান', কিন্তু বর্তমানে 'যে অনুষ্ঠানে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়'—এই গৌণ অর্থটি প্রধান হওয়াতে অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

৩৪. বিলক্ষণ :—'বিলক্ষণ' শব্দের মূল অর্থ 'বিকৃত লক্ষণযুক্ত'—কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'যথেষ্ট' আমূল পরিবর্তিত হওয়াতে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৩৫. মণ্ডপ :—'মণ্ডপ' শব্দের মূল অর্থ 'মণ্ডপানকারী' কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'পূজাস্থান' বা 'মিলনস্থানের সঙ্গে এর কোন আপাত-সম্পর্ক দেখা যায় না। হয়তো মণ্ডপানকারীরা যে স্থানে একসঙ্গে জমায়েৎ হ'তো তাকেই 'মণ্ডপ' বলা হতো—অতএব এখানে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৩৬. মায়ের দয়া :—'বসন্ত রোগকে' 'মায়ের দয়া' বলা হয়—ভয়াবহ বস্তুকে সহনশীল করে তোলবার জন্যই প্রায় বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—অতএব এখানে অর্থের আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৩৭. মৃগ : 'মৃগ' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'পশু' (যেমন—মৃগয়া=পশুশিকার, মৃগেন্দ্র=পশুরাজ, সিংহ), অর্থ-সঙ্কোচের ফলে এর প্রচলিত অর্থ 'এক বিশেষ জাতীয় পশু' বা হরিণ।

৩৮. মোচ্ছব : 'মোচ্ছব'-এর মূলে 'মহোৎসব' অর্থাৎ যে কোন বড় দরের উৎসব। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ 'বৈষ্ণবদের কীর্তন ও আনুষঙ্গিক পংক্তি ভোজন', অতএব এখানে অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

৩৯ মোরগ : 'মোরগ' শব্দের মূলে আছে ফারসি 'মুর্গ', যার অর্থ 'যে-কোন পাখি',-কিন্তু বাঙলায় এর প্রচলিত অর্থ এক বিশেষজাতীয় পাখি 'কুক্কুট'—অতএব অর্থ-সঙ্কোচ ঘটেছে।

৪০. লেডি কেনি : 'লেডি ক্যানিং'-এর পছন্দমতো একজাতীয় মিষ্টির নাম তার নামেই করা হ য়েছিল, উচ্চারণ বিকৃতিতে তা হ'লো 'লেডিকেনি'। ব্যক্তিনাম অর্থ-প্রসারে ব নামে প্রচলিত হ'লো।

৪১. শ্বাপদ : 'শ্বাপদ' শব্দের মূল অর্থ 'কুকুরের পায়ের মতো পা যার', কিন্তু প্রচলিত অর্থে হিংস্র পশুমাত্রকেই বুঝিয়ে থাকে,—অতএব অর্থবিস্তার ঘটেছে।

৪২. শ্রীঘর : 'জেলখানা'-এই অনভিপ্রেত শব্দটিকে পরিহার ক'রে এর বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা বস্তুটিকে বোঝানর ফলে এখানে অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৪৩ ষণ্ডামার্ক : 'ষণ্ড' ও 'অমর্ক' নামক প্রহ্লাদের দুই শিক্ষক তাঁকে কৃষ্ণবিদ্বেষী ক'রে তুলতে চেষ্টা করতেন, তা' থেকে অর্থপ্রসারে 'গোঁয়ার' বা তজ্জাতীয় ব্যক্তিকে বোঝায় —অবশ্য লোকব্যুৎপত্তির জন্য (ষণ্ড+মার্কার সাদৃশ্যে) এর উচ্চারণে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

৪৪. সন্দেশ : মূল অর্থ 'সংবাদ'। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে অর্থসংক্রম ঘটে, প্রচলিত অর্থ 'মিষ্ট বিশেষ'।

৪৫. **সম্ভ্রম :** মূল অর্থ 'অতিশয় ভ্রম' কিংবা 'ভয়াদি-জনিত ত্বরা'। আমূল পরিবর্তিত, প্রচলিত অর্থ 'মর্যাদা, সম্মান'—অর্থসংক্রম ঘটেছে।

৪৬. **সাধু :** 'সৎ' ব্যক্তিকেই 'সাধু' বলা হয়। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বণিকদের বলা হ'তো 'সাধু' এবং তা থেকে উৎপন্ন 'সাহু / সাউ', সাধারণতঃ এরা অসাধু হয়, অতএব অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটায় অর্থসংক্রম হয়েছে।

৪৭. **স্তম্ভিত :** 'স্তম্ভিত' শব্দের মূল অর্থ 'স্তম্ভরূপ প্রাপ্ত'—কিন্তু তৎ-বৎ অবস্থা প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে অর্থ বিস্তার ঘটেছে।

৪৮. **হরতাল :** মূলতঃ গুজরাতি শব্দ, অর্থ, 'হাটে তালা' অর্থাৎ হাটবন্ধ। কিন্তু অর্থ পরিবর্তনে এখন স্কুল-কলেজ মিল-কারখানার ধর্মঘটও হরতাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব এখানে অর্থ প্রসার ঘটেছে।